পথের দাবী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



পথের দাবী

এক

অপূর্বর সঙ্গে তাহার বন্ধুদের নিম্নলিখিত প্রথায় প্রায়ই তর্ক-বিতর্ক হইত।

বন্ধুরা কহিতেন, অপূ, তোমার দাদারা প্রায় কিছুই মানেন না, আর তুমি মানো না শোনো না সংসারে এমন ব্যাপারই নেই।

অপূর্ব কহিত, আছে বৈ কি। এই যেমন দাদাদের দৃষ্টান্ত মানিনে এবং তোমাদের পরামর্শ শুনিনে।

বন্ধুরা পুরানো রসিকতার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিতেন, তুমি কলেজে পড়িয়া এম. এস্সি. পাস করিলে, কিন্তু তবু এখনও টিকি রাখিতেছ। তোমার টিকির মিডিয়ম দিয়া মগজে বিদ্যুৎ চলাচল হয় নাকি?

অপূর্ব জবাব দিত, এম. এস্সি.-র পাঠ্যপুস্তকে টিকির বিরুদ্ধে কোথাও কোন আন্দোলন নেই। সুতরাং টিকি রাখা অন্যায় এ ধারণা জন্মাতে পারেনি। আর বিদ্যুৎ চলাচলের সমস্ত ইতিহাসটা আজিও আবিষ্কৃত হয়নি। বিশ্বাস না হয়, বিদ্যুৎ-বিদ্যা অধ্যাপকদের বরঞ্চ জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিও।

তাঁহারা বিরক্ত হইয়া কহিতেন, তোমার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।

অপূর্ব হাসিয়া বলিত, তোমাদের এই কথাটি অভ্রান্ত সত্য, কিন্তু তবু ত তোমাদের চৈতন্য হয় না।

আসল কথা, অপূর্বর ডেপুটী-ম্যাজিস্ট্রেট পিতার বাক্যে ও ব্যবহারে উৎসাহ পাইয়া তাহার বড় ও মেজদাদারা যখন প্রকাশ্যেই মুরগি ও হোটেলের রুটি খাইতে লাগিল, এবং স্নানের পূর্বে গলার পৈতাটাকে পেরেকে টাঙ্গাইয়া রাখিয়া প্রায়ই ভুলিয়া যাইতে লাগিল, এমন কি ধোপার বাড়ি দিয়া কাচাইয়া ইস্ত্রি করিয়া আনিলে সুবিধা হয় কিনা আলোচনা করিয়া হাসি-তামাশা করিতে লাগিল, তখনও অপূর্বর নিজের পৈতা হয় নাই। কিন্তু ছোট হইলেও সে মায়ের গভীর

বেদনা ও নিঃশব্দ অশ্রুপাত বহুদিন লক্ষ্য করিয়াছিল। মা কিছুই বলিতেন না। একে ত বলিলেও ছেলেরা শুনিত না, অধিকন্তু স্বামীর সহিত নিরর্থক কলহ হইয়া যাইত। তিনি শ্বশুরকুলের পৌরোহিত্য ব্যবসাকে নিষ্ঠুর ইঙ্গিত করিয়া কহিতেন, ছেলেরা যদি তাদের মামাদের মত না হয়ে বাপের মতই হয়ে উঠে ত কি করা যাবে! মাথায় টিকির বদলে টুপি পরে বলেই যে মাথাটা কেটে নেওয়া উচিত আমার তা মনে হয় না।

সেই অবধি করুণাময়ী ছেলেদের সম্বন্ধে একেবারে নির্বাক হইয়া গিয়াছিলেন, কেবল নিজের আচার-বিচার নিজেই নীরবে ও অনাড়ম্বরে পালন করিয়া চলিতেন। তাহার পরে স্বামীর মৃত্যুতে বিধবা হইয়া তিনি গৃহে বাস করিয়াও একপ্রকার গৃহ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছিলেন। উপরের যে ঘরটায় তিনি থাকিতেন, তাহারই পার্শ্বের বারান্দায় খানিকটা ঘিরিয়া লইয়া তাঁহার ভাঁড়ার ও স্বহস্তে রান্নার কাজ চলিত। বধূদের হাতেও তিনি খাইতে চাহিতেন না। এমনি ভাবেই দিন চলিতেছিল।

এদিকে অপূর্ব মাথায় টিকি রাখিয়াছিল, কলেজে জলপানি ও মেডেল লইয়া যেমন সে পাসও করিত, ঘরে একাদশী-পূর্ণিমা-সন্ধ্যাহ্নিকও তেমনি বাদ দিত না। মাঠে ফুটবল-ক্রিকেট-হকি খেলাতেও তাহার যত উৎসাহ ছিল, সকালে মায়ের সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যাইতেও তাহার কোনদিন সময়াভাব ঘটিত না। বাড়াবাড়ি ভাবিয়া বধূরা মাঝে মাঝে তামাশা করিয়া বলিত, ঠাকুরপো, পড়াশুনা ত সাঙ্গ হল, এবার ডোর-কোপ্নি নিয়ে একটা রীতিমত গোঁসাই-টোঁসাই হয়ে পড়। এযে দেখচি বামুনের বিধবাকেও ছাড়িয়ে গেলে!

অপূর্ব সহাস্যে জবাব দিত, ছাড়িয়ে যেতে কি আর সাধে হয় বৌদি? মায়ের একটা মেয়ে-টেয়েও নেই, বয়স হয়েছে, হঠাৎ অসমর্থ হয়ে পড়লে একমুঠো হবিষ্যি রেঁধেও ত দিতে পারবো? আর ডোর-কোপ্নি যাবে কোথা? তোমাদের সংসারে যখন আছি, তখন একদিন তা সম্বল করতেই হবে।

বড়বধূ মুখখানি ম্লান করিয়া কহিত, কি করবো ঠাকুরপো, সে আমাদের কপাল!

তা বটে! বলিয়া অপূর্ব চলিয়া যাইত, কিন্তু মাকে গিয়া কহিত, মা, এ তোমার বড় অন্যায়। দাদারা যাই কেননা করুন, বৌদিরা কিছু আর মুরগিও খান না, হোটেলেও ডিনার করেন না, চিরকালটা কি তুমি রেঁধেই খাবে?

মা কহিতেন, একবেলা একমুঠো চাল ফুটিয়ে নিতে ত আমার কোন কষ্টই হয় না বাবা। আর নিতান্তই যখন অপারগ হব, ততদিনে তোর বৌও ঘরে এসে পড়বে।

অপূর্ব বলিত, তাই কেন না একটা বামুন-পণ্ডিতের ঘর থেকে আনিয়ে নাও না মা? খেতে দেবার সামর্থ্য আমার নেই, কিন্তু তোমার কষ্ট দেখলে মনে হয় দাদাদের গলগ্রহ হয়েই না হয় থাকবো।

মা মাতৃগর্বে দুই চক্ষু দীপ্ত করিয়া কহিতেন, অমন কথা তুই মুখেও আনিস নে অপূ! তোর সামর্থ্য নেই একটা বৌকে খেতে দেবার? তুই ইচ্ছে করলে যে বাড়ির সবাইকে বসে খাওয়াতে পারিস।

তোমার যেমন কথা মা! তুমি মনে কর ভূ-ভারতে তোমার মত এমন ছেলে আর কারও নেই। এই বলিয়া সে উদ্গত অশ্রু গোপন করিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িত।

কিন্তু নিজের শক্তি-সামর্থ্য সম্বন্ধে অপূর্ব যাহাই বলুক, তাই বলিয়া কন্যাভার-গ্রস্তের দল নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তাঁহারা দলে দলে আসিয়া বিনোদবাবুকে স্থানে-অস্থানে আক্রমণ করিয়া জীবন তাঁহার দুর্ভর করিয়া তুলিয়াছিলেন। বিনোদ আসিয়া মাকে ধরিতেন, মা, কোথায় কোন্ নিষ্ঠে-কিষ্ঠে জপ-তপের মেয়ে আছে তোমার ছেলের বিয়ে দিয়ে চুকিয়ে ফেল, না হয় আমাকে দেখছি বাড়ি ছেড়ে পালাতে হয়। বাপের বড় ছেলে,—বাইরে থেকে লোকে ভাবে আমিই বুঝি বা বাড়ির কর্তা।

ছেলের কঠিন বাক্যে করুণাময়ী মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইতেন, কিন্তু এইখানে তিনি আপনাকে কিছুতেই বিচলিত হইতে দিতেন না। মৃদু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে কহিতেন, লোকে ত মিথ্যে ভাবে না বাবা, তাঁর অবর্তমানে তুমিই বাড়ির কর্তা, কিন্তু অপূর সম্বন্ধে তুমি কাউকে কোন কথা দিয়ো না। আমি রূপ চাইনে, টাকাকড়ি চাইনে,—না বিনু, সে আমি আপনি দেখেশুনে তবে দেব।

বেশ ত মা, তাই দিয়ো। কিন্তু যা করবে দয়া করে একটু শীঘ্র করে কর। রাঙ্গা মাকালফল সামনে ঝুলিয়ে রেখে লোকগুলোকে আর দগ্ধে মেরো না। এই বলিয়া বিনোদ রাগ করিয়া চলিয়া যাইতেন।

করুণাময়ীর মনে মনে একটা সঙ্কল্প ছিল। স্নানের ঘাটে ভারী একটি সুলক্ষণা মেয়ে কিছুদিন হইতে তাঁহার চোখে পড়িয়াছিল। মেয়েটি মায়ের সহিত প্রায়ই গঙ্গাস্নানে আসিত। ইঁহারা যে তাঁহাদের স্ব-ঘর এ সংবাদ তিনি গোপনে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। স্নানান্তে মেয়েটি শিবপূজা করিত, কোথাও কিছু ভুল হয় কি না, করুণাময়ী অলক্ষ্যে লক্ষ্য করিয়া দেখিতেন। তাঁহার আরও কিছু কিছু জানিবার ছিল, এবং সে-পক্ষে তিনি নিশ্চেষ্টও ছিলেন না। তাঁহার বাসনা ছিল সমস্ত তথ্য যদি অনুকূল হয় ত আগামী বৈশাখেই ছেলের বিবাহ দিবেন।

এমন সময় অপূর্ব আসিয়া অকস্মাৎ সংবাদ দিল, মা, আমি বেশ একটি চাকরি পেয়ে গেছি।

মা খুশী হইয়া কহিলেন, বলিস কি রে? এই ত সেদিন পাস করলি, এরই মধ্যে তোকে চাকরি দিলে কে?

অপূর্ব হাসিমুখে কহিল, যার গরজ! এই বলিয়া সে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া কহিল, তাহাদের কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সাহেবই ইহা যোগাড় করিয়া দিয়াছেন। বোথা কোম্পানি বর্মার রেঙ্গুন শহরে একটা নূতন আফিস খুলিয়াছে, তাহারা বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও সচ্চরিত্র কোন বাঙালী যুবককে সমস্ত কর্তৃত্ব-ভার দিয়া পাঠাইতে চায়। বাসাভাড়া ছাড়া মাহিনা আপাতত চারি শত টাকা, এবং

চেষ্টা করিয়াও কোম্পানিকে যদি লালবাতি জ্বালাইতে না পারা যায় ত ছয় মাস পরে আরও দুই শত। এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

কিন্তু, বর্মা-মুল্লুকের নাম শুনিয়া মায়ের মুখ মলিন হইয়া গেল, তিনি নিরুৎসুককণ্ঠে কহিলেন, তুই কি ক্ষেপেছিস অপূ, সে-দেশে কি মানুষে যায়! যেখানে জাত, জন্ম, আচার-বিচার কিছু নেই শুনেচি, সেখানে তোকে দেব আমি পাঠিয়ে? এমন টাকায় আমার কাজ নেই।

জননীর বিরুদ্ধতায় অপূর্ব ভীত হইয়া কহিল, তোমার কাজ নেই, কিন্তু আমার ত আছে মা। তবে, তোমার হুকুমে আমি ভিখিরী হয়েও থাকিতে পারি, কিন্তু সারা জীবনে কি এমন সুযোগ আর জুটবে? তোমার ছেলের মত বিদ্যে-বুদ্ধি আজকাল শহরের ঘরে ঘরে আছে, অতএব, বোথা কোম্পানির আটকাবে না, কিন্তু প্রিন্সিপ্যাল সাহেব যে আমার হয়ে একেবারে কথা দিয়ে দিয়েছেন, তাঁর লজ্জার অবধি থাকবে না। তা ছাড়া বাড়ির সত্যকার অবস্থাও ত তোমার অজানা নয় মা?

মা বলিলেন, কিন্তু সেটা যে শুনেচি একেবারে ম্লেচ্ছ দেশ।

অপূর্ব কহিল, কে তোমাকে বাড়িয়ে বলেচে। কিন্তু এটা ত তোমার ম্লেচ্ছ দেশ নয়, অথচ যারা হতে চায় তাদের ত বাধে না মা।

মা ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া কহিলেন, কিন্তু এই বৈশাখে যে তোর বিয়ে দেব আমি স্থির করেচি।

অপূর্ব কহিল, একেবারে স্থির করে বসে আছ মা? বেশ ত, দু-এক মাস পেছিয়ে দিয়ে যেদিন তুমি ডেকে পাঠাবে সেই দিনই ফিরে এসে তোমার আজ্ঞা পালন করবো।

করুণাময়ী বাহিরের চক্ষে সেকেলে হইলেও অতিশয় বুদ্ধিমতী। তিনি অনেকক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে কহিলেন, যখন যেতেই হবে তখন আর উপায় কি। কিন্তু তোমার দাদাদের মত নিয়ো।

এই বর্মা-যাত্রা সম্পর্কে তাঁহার আর দু'টি সন্তানের উল্লেখ করিতে করুণাময়ীর অতীত ও বর্তমানের সমস্ত প্রচ্ছন্ন বেদনা যেন এককালে আলোড়িত হইয়া উঠিল, কিন্তু সে দুঃখ আর তিনি প্রকাশ পাইতে দিলেন না। তাঁহার পিতৃকুল গোকুল-দীঘির সুবিখ্যাত বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ, এবং বংশপরম্পরায় তাঁহারা অতিশয় আচারপরায়ণ ও নিষ্ঠাবান হিন্দু। শিশুকাল হইতে যে সংস্কার তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল উত্তরকালে তাহা স্বামী ও পুত্রদের হস্তে যতদূর আহত ও লাঞ্ছিত হইবার হইয়াছে, কেবল এই অপূর্বকে লইয়াই তিনি কোনমতে সহ্য করিয়া আজও গৃহে বাস করিতেছিলেন, সে ছেলেও আজ তাঁহার চোখের আড়ালে কোন্ অজানা দেশে চলিয়াছে। এ কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার ভয় ও ভাবনার সীমা রহিল না, শুধু মুখে বলিলেন, যে ক'টা দিন বেঁচে আছি অপূ, তুই কিন্তু আর আমাকে দুঃখ দিসনে বাবা। এই বলিয়া তিনি আঁচল দিয়া চোখ-দু'টি মুছিয়া ফেলিলেন।

অপূর্বর নিজের চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল, সে প্রত্যুত্তরে কেবল কহিল, মা, আজ তুমি ইহলোকে আছো, কিন্তু, একদিন তোমার স্বর্গবাসের ডাক এসে পৌঁছবে, সেদিন তোমার অপূকে ফেলে যেতে হবে জানি, কিন্তু, একটা দিনের জন্যেও যদি তোমাকে চিনতে পেরে থাকি মা, তাহলে সেখানে বসেও কখনো এ ছেলের জন্যে তোমাকে চোখের জল ফেলতে হবে না। এই বলিয়া সে দ্রুতবেগে অন্যত্র প্রস্থান করিল।

সেদিন সন্ধ্যাকালে করুণাময়ী তাঁহার নিয়মিত আহ্নিক ও মালায় মনঃসংযোগ করিতে পারিলেন না, উদ্বেগ ও বেদনার ভারে তাঁহার দুই চক্ষু পুনঃ পুনঃ অশ্রু-আবিল হইয়া উঠিতে লাগিল, এবং কি করিলে যে কি হয় তাহা কোন মতেই ভাবিয়া না পাইয়া অবশেষে তাঁহার বড় ছেলের ঘরের দ্বারের কাছে আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইলেন। বিনোদকুমার কাছারি হইতে ফিরিয়া জলযোগান্তে একবার সান্ধ্য-পোশাকে ক্লাবের উদ্দেশে যাত্রা করিতেছিলেন, হঠাৎ মাকে দেখিয়া

একেবারে চমকিয়া গেলেন। বস্তুতঃ, এ ঘটনা এমনি অপ্রত্যাশিত যে সহসা তাঁহার মুখে কথা যোগাইল না।

করুণাময়ী কহিলেন, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি বিনু।

কি মা?

মা তাঁহার চোখের জল এখানে আসিবার পূর্বে ভাল করিয়া মুছিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার আর্দ্রকণ্ঠ গোপন রহিল না। তিনি আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া শেষে অপূর্বর মাসিক বেতনের পরিমাণ উল্লেখ করিয়াও যখন নিরানন্দ-মুখে কহিলেন, তাই ভাবছি বাবা, এই ক'টা টাকার লোভে তাকে সেখানে পাঠাব কি না, তখন বিনোদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। সে রুক্ষস্বরে কহিল, মা, তোমার অপূর্বর মত ছেলে ভূ-ভারতে আর দ্বিতীয় নেই সে আমরা সবাই মানি, কিন্তু পৃথিবীতে বাস করে এ কথাটাও ত না মেনে পারিনে যে, প্রথমে চার শ এবং ছ মাসে ছ শ টাকা সে ছেলের চেয়েও অনেক বড়।

মা ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন, কিন্তু, সে যে শুনেছি একেবারে ম্লেচ্ছ দেশ।

বিনোদ কহিল, মা জগতে তোমার শোনা এবং জানাটাই কেবল অভ্রান্ত না হতে পারে।

ছেলের শেষ কথায় মা অত্যন্ত পীড়া অনুভব করিয়া কহিলেন, বাবা বিনু, এই একই কথা তোমাদের জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত শুনে শুনেও যখন আমার চৈতন্য হল না, তখন শেষ দশায় আর ও-শিক্ষা দিয়ো না। অপূর্বর দাম কত টাকা সে আমি জানতে আসিনি, আমি শুধু জানতে এসেছিলাম অতদূরে তাকে পাঠানো উচিত কি না।

বিনোদ হেঁট হইয়া ডান হাতে তাড়াতাড়ি মায়ের দুই পা স্পর্শ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, মা, তোমাকে দুঃখ দেবার জন্য একথা আমি বলিনি। বাবার সঙ্গেই আমাদের মিলত সে সত্যি, এবং টাকা জিনিসটা যে সংসারে দামী ও দরকারী এ তাঁর কাছেই শেখা। কিন্তু, এ ক্ষেত্রে সে লোভ তোমাকে আমি

দেখাচ্চি নে। তোমার ম্লেচ্ছ বিনুর এই হ্যাট-কোটের ভেতরটা হয়ত আজও ততবড় সাহেব হয়ে উঠেনি যে, ছোটভাইকে খেতে দেবার ভয়ে স্থান-অস্থানের বিচার করে না। কিন্তু তবুও বলি, ও যাক। দেশে আবহাওয়া যা বইতে শুরু করেছে মা, তাতে ও যদি দিন-কতক দেশ ছেড়ে কোথাও গিয়ে কাজে লেগে যেতে পারে ত ওর নিজেরও ভালো হবে, আমরাও সগোষ্ঠী হয়ত বেঁচে যাবো! তুমি ত জানো মা, সেই স্বদেশী আমলে ওর গলা টিপলে দুধ বেরোত, তবু তারই বিক্রমে বাবার চাকরি যাবার জো হয়েছিল।

করুণাময়ী শঙ্কিত হইয়া কহিলেন, না না, সে-সব অপূ আর করে না। সাত-আট বছর আগে তার কি বা বয়স ছিল, কেবল দলে মিশেই যা—

বিনোদ মাথা নাড়িয়া একটু হাসিয়া কহিল, হয়ত, তোমার কথাই ঠিক, অপূর্ব এখন আর কিছু করে না, কিন্তু, সকল দেশেই জন-কতক লোক থাকে মা, যাদের জাতই আলাদা,—তোমার ছোট ছেলেটি সেই জাতের। দেশের মাটি এদের গায়ের মাংস, দেশের জল এদের শিরার রক্ত; শুধু কি কেবল দেশের হাওয়া-আলো,— এর পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, চন্দ্র-সূর্য, নদী-নালা যেখানে যা কিছু আছে সব যেন সর্বাঙ্গ দিয়ে এরা শুষে নিতে চায়!বোধ হয় এদেরই কেউ কোন্ সত্যকালে জননী-জন্মভূমি কথাটা প্রথম আবিষ্কার করেছিল। দেশের সম্পর্কে এদের কখনো বিশ্বাস করো না মা, ঠকবে। এদের বেঁচে থাকা আর প্রাণ দেওয়ার মধ্যে এই এতটুকু মাত্র প্রভেদ! এই বলিয়া সে তাহার তর্জনীর প্রান্তভাগটুকু বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা চিহ্নিত করিয়া দেখাইয়া কহিল, বরঞ্চ তোমার এই ম্লেচ্ছাচারী বিনুটিকে তোমার ওই টিকিধারী গীতা-পড়া এম. এস্সি. পাস করা অপূর্বকুমারের চেয়ে ঢের বেশী আপনার বলে জেনো।

ছেলের কথাগুলো মা ঠিক যে বিশ্বাস করিলেন তাহা নয়, কিন্তু এক সময়ে নাকি এই লইয়া তাঁহাকে অনেক উদ্বেগ ভোগ করিতে হইয়াছে তাই মনে মনে চিন্তিত হইলেন। দেশের পশ্চিম দিগন্তে যে একটা মেঘের লক্ষণ দেখা

দিয়াছে এ সংবাদ তিনি জানিতেন। তাঁহার প্রথমেই মনে হইল তখন অপূর্বর পিতা জীবিত ছিলেন, কিন্তু এখন তিনি পরলোকগত।

বিনোদ মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিল, কিন্তু তাহার বাহিরে যাইবার ত্বরা ছিল, কহিল বেশ ত মা, সে ত আর কালই যাচ্চে না, সবাই একসঙ্গে বসে যা হোক একটা স্থির করা যাবে। এই বলিয়া সে একটু দ্রুতপদেই বাহির হইয়া গেল।

দুই

জাহাজের কয়টা দিন অপূর্ব চিঁড়া চিবাইয়া সন্দেশ ও ডাবের জল খাইয়া সর্বাঙ্গীণ ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করিয়া অর্ধমৃতবৎ কোনমতে গিয়া রেঙ্গুনের ঘাটে পৌঁছিল। নব-প্রতিষ্ঠিত বোথা কোম্পানির জন-দুই দরোয়ান ও একজন মাদ্রাজী কর্মচারী জেটিতে উপস্থিত ছিলেন, ম্যানেজারকে তাঁহারা সাদর সম্বর্ধনা করিলেন। তিনি ত্রিশ টাকা দিয়া বাসা ভাড়া করিয়া আফিসের খরচায় যথাযোগ্য আসবাবপত্রে ঘর সাজাইয়া রাখিয়াছেন এ সংবাদ দিতেও বিলম্ব করিলেন না।

ফাল্গুন মাস শেষ হইতে চলিয়াছে, গরম মন্দ পড়ে নাই। সমুদ্রপথের এই প্রাণান্ত বিড়ম্বনা ভোগের পর নিরালা গৃহের সজ্জিত শয্যার উপরে হাত-পা ছড়াইয়া একটুখানি শুইতে পাইবে কল্পনা করিয়া সে যথেষ্ট তৃপ্তি অনুভব করিল। পাচক ব্রাহ্মণ সঙ্গে আসিয়াছিল, হালদার পরিবারে বহুদিনের চাকরিতে তাহার নিখুঁত শুদ্ধাচারিতা করুণাময়ীর কাছে সপ্রমাণ হইয়া গেছে। তাই বাড়ির বহু অসুবিধা সত্ত্বেও এই বিশ্বস্ত লোকটিকে সঙ্গে দিয়া মা অনেকখানি সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন। আবার শুধু কেবল পাচকই নয়, পাক করিবার মত কিছু কিছু চাল-ডাল ঘি-তেল গুঁড়া মশলা, মায় আলু পটল পর্যন্ত সঙ্গে দিতে তিনি বিস্মৃত হন নাই। সুতরাং ঈষদুষ্ণ অন্ন-ব্যঞ্জনে মুখের শুকনা চিঁড়ার স্বাদটাও যে সে অবিলম্বে ফিরাইতে পারিবে এ ভরসাও তাহার মনের মধ্যে বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় চমকিয়া গেল। গাড়ি ভাড়া হইয়া আসিলে কর্মচারী বিদায় গ্রহণ করিলেন, কিন্তু মোটঘাট জিনিসপত্র লইয়া আফিসের দরোয়ানজী পথ দেখাইয়া সঙ্গে চলিল, এবং একটানা জলযাত্রা ছাড়িয়া শক্ত ডাঙার উপরে গাড়ির মধ্যে বসিতে পাইয়া অপূর্ব আরাম বোধ করিল। কিন্তু মিনিট-দশেকের মধ্যে গাড়ি যখন বাসার সম্মুখে আসিয়া থামিল, এবং দরোয়ানজী হাঁকডাকে প্রায় ডজন-খানেক কলিঙ্গ দেশীয়

কুলী জোগাড় করিয়া মোটঘাট উপরে তুলিবার আয়োজন করিল, তখন, সেই তাহার ত্রিশ টাকা ভাড়ার বাটীর চেহারা দেখিয়া অপূর্ব হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। বাড়ির শ্রী নাই, ছাঁদ নাই, সদর নাই, অন্দর নাই, প্রাঙ্গণ বলিতে এই চলাচলের পথটা ছাড়া আর কোথাও কোন স্থান নাই। একটা অপ্রশস্ত কাঠের সিঁড়ি রাস্তা হইতে সোজা তেতলা পর্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে, সেটা যেমন খাড়া তেমনি অন্ধকার। ইহা কাহারও নিজস্ব নহে, অন্ততঃ ছয়জন ভাড়াটিয়ার ইহাই চলাচলের সাধারণ পথ।এই উঠা-নামার কার্যে দৈবাৎ পা ফসকাইলে প্রথমে পাথর-বাঁধানো রাজার রাজপথ, পরে তাঁহারই হাসপাতাল, এবং তৃতীয় গতিটা না ভাবাই ভাল। এই দুরারোহ দারুময় সোপানশ্রেণীর সহিত পরিচিত হইয়া উঠিতে কিছু দীর্ঘকাল লাগে। অপূর্ব নূতন লোক, তাই সে প্রতি পদক্ষেপে অত্যন্ত সতর্ক হইয়া দরোয়ানের অনুবর্তী হইয়া উঠিতে লাগিল। দরোয়ান কতকটা উঠিয়া ডান দিকে দোতলার একটা দরজা খুলিয়া দিয়া জানাইল, সাহেব, ইহাই আপনার গৃহ।

ইহারই মুখোমুখি বামদিকের রুদ্ধদ্বারটা দেখাইয়া অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, এটাতে কে থাকে ?

দরোয়ান কহিল, কোই এক চীনা-সাহেব রহেতেঁহে শুনা।

অপূর্ব ঠিক তাহার মাথার উপরে তেতলায় কে থাকে প্রশ্ন করায় সে কহিল, এক কালা সাহেব ত রহেতেঁহে দেখা। কোই মান্দ্রাজ-বালে হোয়েঙ্গে জরুর!

অপূর্ব চুপ করিয়া রহিল। এই একমাত্র আনাগোনার পথে উপরে এবং পার্শ্বে এই দুটি একান্ত ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীর পরিচয়ে তাহার মুখ দিয়া কেবল দীর্ঘশ্বাস পড়িল। নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাহার আরও মন খারাপ হইয়া গেল। কাঠের বেড়া-দেওয়া পাশাপাশি ছোট-বড় তিনটি কুঠরী। একটিতে কল, স্নানের ঘর, রান্নার জায়গা প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় যাহা কিছু সমস্তই,—মাঝেরটি এই অন্ধকার সিঁড়ির ঘর, গৌরবে বৈঠকখানা বলা চলে, এবং সর্বশেষে রাস্তার ধারের কক্ষটি, অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার এবং আলোকিত,—এইটি শয়ন-মন্দির।

আফিসের খরচায় এই ঘরটিকেই খাট, টেবিল এবং গুটিকয়েক চেয়ার দিয়া সাজানো হইয়াছে। পথের উপর ছোট একটুখানি বারান্দা আছে, সময় কাটানো অসম্ভব হইলে এখানে দাঁড়াইয়া লোক-চলাচল দেখা যায়। ঘরে হাওয়া নাই, আলো নাই, একটার মধ্যে দিয়া আর একটায় যাইতে হয়,—ইহার সমস্তই কাঠের,—দেয়াল কাঠের, মেঝে কাঠের, ছাত কাঠের, সিঁড়ি কাঠের, আগুনের কথা মনে হইলে সন্দেহ হয় এতবড় সর্বাঙ্গসুন্দর জতুগৃহ বোধ করি রাজা দুর্যোধনও তাঁর পাণ্ডবভায়াদের জন্য তৈরি করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইহারই অভ্যন্তরে এই সুদূর প্রবাসে ঘরবাড়ি, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়া, বৌদিদিদের ছাড়িয়া, মাকে ছাড়িয়া থাকিতে হইবে স্মরণ করিয়া মুহূর্তের দুর্বলতায় তাহার চোখে জল আসিতে চাহিল। সামলাইয়া লইয়া সে খানিকক্ষণ এঘর-ওঘর করিয়া একটা জিনিস দেখিয়া কিছু আশ্বস্ত হইল যে কলে তখনও জল আছে, স্নান ও রান্না দুই-ই হইতে পারে। দরোয়ান সাহস দিয়া জানাইল, অপব্যয় না করিলে এ শহরে জলের অভাব হয় না, যেহেতু প্রত্যেক দুই ঘর ভাড়াটিয়ার জন্য এ বাড়িতে একটা করিয়া বড় রকমের জলের চৌবাচ্চা উপরে আছে, তাহা হইতে দিবারাত্রিই জল সরবরাহ হয়। ভরসা পাইয়া অপূর্ব পাচককে কহিল ঠাকুর, মা ত সমস্তই সঙ্গে দিয়েছেন, তুমি স্নান করে দুটি রাঁধবার উদ্যোগ কর, আমি ততক্ষণ দরোয়ানজীকে নিয়ে জিনিসপত্র কিছু কিছু গুছিয়ে ফেলি।

রসুই ঘরে কয়লা মজুত ছিল, কিন্তু বাঁধানো চুল্লী। নিকানো মুছানো তেমন হয় নাই, পরীক্ষা করিয়া কিছু কিছু কালির দাগ প্রকাশ পাইল। কে জানে এখানে কে ছিল, সে কোন জাত, কি রাঁধিয়াছে মনে করিয়া তাহার অত্যন্ত ঘৃণাবোধ হইল, ঠাকুরকে কহিল, এতে ত রাঁধা চল্বে না তেওয়ারী, অন্য বন্দোবস্ত করতে হবে। একটা তোলা-উনুন হলে বাইরের ঘরে বসে আজকের মতো দুটো চাল-ডাল ফুটিয়ে নেওয়া যেত, কিন্তু এ পোড়া দেশে কি তা মিলবে?

দরোয়ান জানাইল কোন অভাব নাই, মূল্য পাইলে সে দশ মিনিটের মধ্যে আনিয়া হাজির করিতে পারে। অতএব, সে টাকা লইয়া প্রস্থান করিল। ইতিমধ্যে তেওয়ারী রন্ধনের আয়োজন করিতে লাগিল, এবং অপূর্ব নিজে যথাযোগ্য স্থান মনোনীত করিয়া তোরঙ্গ, বাক্স প্রভৃতি টানাটানি করিয়া ঘর সাজাইতে নিযুক্ত হইল। কাঠের আলনায় জামাকাপড় সুট প্রভৃতি গুছাইয়া ফেলিল, বিছানা খুলিয়া খাটের উপর তাহা পরিপাটি করিয়া বিছাইয়া লইল, তোরঙ্গ হইতে একটা নূতন টেবিল-ক্লথ বাহির করিয়া টেবিলে পাতিয়া কিছু কিছু বই ও লিখিবার সরঞ্জাম সাজাইয়া রাখিল, এবং উত্তরে খোলা জানালার পাল্লা-দুটা আপ্রান্ত প্রসারিত করিয়া তাহার দুই কোণে দুটা কাগজ গুঁজিয়া দিয়া শোবার ঘরটাকে অধিকতর আলোকিত এবং নয়নরঞ্জন জ্ঞান করিয়া সদ্যরচিত শয্যায় চিত হইয়া পড়িয়া একটা নিঃশ্বাস মোচন করিল।

ক্ষণেক পরেই দরোয়ান লোহার চুল্লী কিনিয়া উপস্থিত করিলে তাহাতে আগুন দিয়া খিচুড়ি এবং যাহা-কিছু একটা ভাজাভুজি যত শীঘ্র সম্ভব প্রস্তুত করিয়া ফেলিতে আদেশ দিয়া অপূর্ব আর একদফা বিছানায় গড়াইয়া লইতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ মনে পড়িল মা মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন নামিয়াই একটা টেলিগ্রাফ করিয়া দিতে। অতএব, অবিলম্বে জামাটা গায়ে দিয়া প্রবাসের একমাত্র কর্ণধার দরোয়ানজীকে সঙ্গে করিয়া সে পোস্টআফিসের উদ্দেশে আর একবার বাহির হইয়া পড়িল, এবং তাহারই কথামত তেওয়ারী ঠাকুরকে আশ্বাস দিয়া গেল, ফিরিয়া আসিতে তাহার একঘণ্টার বেশি লাগিবে না, কিন্তু ইতিমধ্যে সমস্ত যেন প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আজ কি একটা খ্রীষ্টান পর্বোপলক্ষে ছুটি ছিল। অপূর্ব পথের দুইধারে চাহিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই বুঝিল এই গলিটা দেশী ও বিদেশী মেমসাহেবদের পাড়া, এবং প্রত্যেক বাটীতেই বিলাতী উৎসবের কিছু কিছু চিহ্ন

দেখা দিয়াছে। অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা দরোয়ানজী, এখানে আমাদের বাঙালী লোকও ত অনেক আছে শুনেচি, তাঁরা সব কোন্ পাড়ায় থাকেন?

প্রত্যুত্তরে সে জানাইল যে এখানে পাড়া বলিয়া কিছু নাই, যে যেখানে খুশি থাকে। তবে 'অপসর লোগ্' এই গলিটাকেই বেশী পছন্দ করে। অপূর্ব নিজেও একজন 'অপসর লোগ্', কারণ, সেও বড় চাকরি করিতেই এ দেশে আসিয়াছে, এবং আপনি গোঁড়া হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও কোন ধর্মের বিরুদ্ধে তাহার বিদ্বেষ ছিল না। তথাপি, এইভাবে আপনাকে উপরে নীচে দক্ষিণে বামে বাসায় ও বাসার বাহিরে চারিদিকেই খ্রীষ্টান প্রতিবেশী পরিবৃত দেখিয়া তাহার অত্যন্ত বিতৃষ্ণা বোধ হইল। জিজ্ঞাসা করিল, আর কি কোথাও বাসা পাওয়া যায় না দরোয়ান?

দরোয়ানজী এ বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নহে, সে চিন্তা করিয়া যাহা সঙ্গত বোধ করিল, তাহাই জবাব দিল, কহিল, খোঁজ করিলে পাওয়া যাইতেও পারে, কিন্তু এ ভাড়ায় এমন বাড়ি পাওয়া কঠিন।

অপূর্ব আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহারই নির্দেশমত অনেকখানি পথ হাঁটিয়া একটা ব্রাঞ্চ পোস্টআফিসে আসিয়া যখন উপস্থিত হইল, তখন মাদ্রাজী তার-বাবু টিফিন করিতে গিয়াছেন, ঘণ্টা-খানেক অপেক্ষা করিয়া যখন তাঁহার দেখা মিলিল, তিনি ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিলেন, আজ ছুটির দিন, বেলা দুইটার পরে আফিস বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু এখন দুটা বাজিয়া পনর মিনিট হইয়াছে।

অপূর্ব অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিল, সে দোষ তোমার, আমার নয়। আমি একঘণ্টা অপেক্ষা করিতেছি।

লোকটা অপূর্বর মুখের প্রতি চাহিয়া নিঃসঙ্কোচে কহিল, না, আমি মাত্র মিনিট-দশেক ছিলাম না।

অপূর্ব তাহার সহিত বিস্তর ঝগড়া করিল, মিথ্যাবাদী বলিয়া তিরস্কার করিল, রিপোর্ট করিবে বলিয়া ভয় দেখাইল, কিন্তু কিছুই হইল না। সে

নির্বিকারচিত্তে নিজের খাতাপত্র দুরস্ত করিতে লাগিল, জবাবও দিল না। আর সময় নষ্ট করা নিষ্ফল বুঝিয়া অপূর্ব ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ও ক্রোধে জ্বলিতে জ্বলিতে বড় টেলিগ্রাফ আফিসে আসিয়া অনেক ভিড় ঠেলিয়া অনেক বিলম্বে নিজের নির্বিঘ্ন পৌঁছান সংবাদ যখন মাকে পাঠাইতে পারিল, তখন বেলা আর বড় নাই।

দুঃখের সাথী দরোয়ানজী সবিনয়ে নিবেদন করিল, সাহেব, হাম্কো ভি বহুত দূর যানা হ্যায়।

অপূর্ব একান্ত পরিশ্রান্ত ও অন্যমনস্ক হইয়াছিল, ছুটি দিতে আপত্তি করিল না; তাহার ভরসা ছিল নম্বর-দেওয়া রাস্তাগুলা সোজা ও সমান্তরাল থাকায় গন্তব্যস্থান খুঁজিয়া লওয়া কঠিন হইবে না। দরোয়ান অন্যত্র চলিয়া গেল, সেও হাঁটিতে হাঁটিতে এবং গলির হিসাব করিতে করিতে অবশেষে বাটীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সিঁড়িতে পা দিয়াই দেখিল, দ্বিতলে তাহার দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তেওয়ারী ঠাকুর মস্ত একটা লাঠি ঠুকিতেছে এবং অনর্গল বকিতেছে, এবং প্রতিপক্ষ একব্যক্তি খালি-গায়ে পেন্টুলুন পরিয়া তেতালার কোঠায় নিজের খোলা দরজার সুমুখে দাঁড়াইয়া হিন্দী ও ইংরাজিতে ইহার জবাব দিতেছে, এবং একটা ঘোড়ার চাবুক লইয়া মাঝে মাঝে সাঁই সাঁই শব্দ করিতেছে। তেওয়ারী তাহাকে নীচে ডাকিতেছে, সে তাহাকে উপরে আহ্বান করিতেছে,—এবং এই সৌজন্যের আদান-প্রদান যে ভাষায় চলিতেছে তাহা না বলাই ভাল।

সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিয়া অপূর্ব তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল। এইটুকু সময়ের মধ্যে ব্যাপারটা যে কি ঘটিল, কি উপায়ে তেওয়ারীজী এইটুকু অবসরেই প্রতিবেশী সাহেবের সহিত এতখানি ঘনিষ্ঠতা করিয়া লইল সে তাহার কিছুই ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু অকস্মাৎ বোধ হয় দুই পক্ষের দৃষ্টিই তাহার উপর নিপতিত হইল। তেওয়ারী মনিবকে দেখিয়া আর একবার সজোরে লাঠি ঠুকিয়া কি একটা মধুর সম্ভাষণ করিল, সাহেব তাহার জবাব দিয়া প্রচণ্ডশব্দে চাবুক

আস্ফালন করিলেন, কিন্তু পুনশ্চ যুদ্ধঘোষণার পূর্বেই অপূর্ব দ্রুতপদে উঠিয়া গিয়া লাঠিসুদ্ধ তেওয়ারীর হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, তুই কি ক্ষেপে গেছিস? এই বলিয়া তাহাকে প্রতিবাদের অবসর না দিয়াই জোর করিয়া ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গেল। ভিতরে গিয়া সে রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিল, এই দেখুন হারামজাদা সাহেব কি কাণ্ড করেছে?

বাস্তবিক, কাণ্ড দেখিয়া অপূর্বর শ্রান্তি এবং ঘুম, ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা একই কালে অন্তর্হিত হইয়া গেল। সুসিদ্ধ খেচরান্নের হাঁড়ি হইতে তখন পর্যন্ত উত্তাপ ও মসলার গন্ধ বিকীর্ণ হইতেছে, কিন্তু তাহার উপরে, নীচে, আশেপাশে চতুর্দিকে জল থৈথৈ করিতেছে। এ ঘরে আসিয়া দেখিল তাহার সদ্যরচিত ধপধপে বিছানাটি ময়লা কালো জলে ভাসিতেছে। চেয়ারে জল, টেবিলে জল, বইগুলা জলে ভিজিয়াছে, বাক্স—তোরঙ্গের উপরে জল জমা হইয়া রহিয়াছে, এমন কি এককোণে-রাখা কাপড়ের আলনাটি অবধি বাদ যায় নাই। তাহার দামী নূতন সুটটির গায়ে পর্যন্ত ময়লা জলের দাগ লাগিয়াছে।

অপূর্ব নিশ্বাস রোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি করে হল?

তেওয়ারী আঙুল দিয়া উপরের ছাদ দেখাইয়া কহিল, ওই শালা সাহেবের কাজ। ঐ দেখুন—বস্তুতঃ, কাঠের ছাদের ফাঁক দিয়া তখন পর্যন্ত ময়লা জলের ফোঁটা স্থানে স্থানে চুয়াইয়া পড়িতেছিল। তেওয়ারী দুর্ঘটনা যাহা বিবৃত করিল তাহা সংক্ষেপে এইরূপ—

অপূর্ব যাইবার মিনিট-কয়েক পরেই সাহেব বাড়ি আসেন। আজ খ্রীষ্টানের পর্বদিন | এবং খুব সম্ভব উৎসব ঘোরালো করিবার উদ্দেশেই তিনি বাহিরে হইতেই একেবারে ঘোর হইয়া আসেন। প্রথমে গীত ও পরে নৃত্য শুরু হয়। এবং অচিরেই উভয় সংযোগে শাস্ত্রোক্ত ‘সংগীত’ এরূপ দুর্দাম হইয়া উঠে যে, তেওয়ারীর আশঙ্কা হয় কাঠের ছাদ হয়ত বা সাহেবের এত বড় আনন্দ বহন করিতে পারিবে না, সবসুদ্ধ তাহার মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িবে। ইহাও সহিয়াছিল,

কিন্তু রান্নার অদূরেই যখন উপর হইতে জল পড়িতে লাগিল, তখন সমস্ত নষ্ট হইবার ভয়ে তেওয়ারী বাহির হইয়া প্রতিবাদ করে।

কিন্তু সাহেব, —তা কালাই হউন বা ধলাই হউন, —দেশী লোকের এই স্পর্ধা সহ্য করিতে পারেন না, উত্তেজিত হইয়া উঠেন, এবং মুহূর্তকালেই এই উত্তেজনা এরূপ প্রচণ্ড ক্রোধে পরিণত হয় যে, তিনি ঘরের মধ্যে গিয়া বালতি বালতি জল ঢালিয়া দেন। ইহার পরে যাহা ঘটিয়াছে তাহা বলা বাহুল্য—অপূর্ব নিজেও কিছু কিছু স্বচক্ষে দেখিয়াছে।

অপূর্ব কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া কহিল, সাহেবের ঘরে কি আর কেউ নেই?

তেওয়ারী কহিল, কি জানি, আছে হয়ত। কে একজন মাতাল ব্যাটার সঙ্গে ঝুটোপুটি লড়াই করছিল। এই বলিয়া সে খিচুড়ির হাঁড়িটার প্রতি করুণচক্ষে চাহিয়া রহিল। অপূর্ব ইহার অর্থ বুঝিল। অর্থাৎ কে একজন প্রাণপণে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের দুর্ভাগ্য একতিল কমাইতে পারে নাই।

অপূর্ব নীরবে বসিয়া রহিল। যাহা হইবার হইয়াছে, কিন্তু নূতন উপদ্রব আর ছিল না। উৎসব-আনন্দ-বিহ্বল সাহেবের নব উদ্যমের কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। বোধ করি এখন তিনি জমি লইয়াছিলেন, – কেবল নিগার তেওয়ারীকে যে এখনও ক্ষমা করেন নাই, তাহারই অস্ফুট উচ্ছ্বাস মাঝে মাঝে শোনা যাইতে লাগিল।

অপূর্ব হাসিবার প্রয়াস করিয়া কহিল, তেওয়ারী, ভগবান না মাপালে এমনি মুখের গ্রাস নষ্ট হয়ে যায়। আয়, আমরা মনে করি আজও জাহাজে আছি। চিঁড়ে-মুড়কি-সন্দেশ এখনো ত কিছু আছে, – রাতটা চলে যাবে। কি বলিস?

তেওয়ারী মাথা নাড়িয়া সায় দিল, এবং ওই হাঁড়িটার প্রতি আর একবার সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া চিঁড়া-মুড়কির উদ্দেশে গাত্রোত্থান করিল। সৌভাগ্য এই যে, খাবারের বাক্সটা সেই যে ঢুকিয়াই রান্নাঘরের কোণে রাখা হইয়াছিল আর

স্থানান্তরিত করা হয় নাই, – খ্রীষ্টানের জল অন্ততঃ এই বস্তুটার জাত মারিতে পারে নাই।

ফলারের যোগাড় করিতে করিতে তেওয়ারী রান্নাঘর হইতে কহিল, বাবু এখানে ত থাকা চলবে না!

অপূর্ব অন্যমনস্কভাবে বলিল, বোধ হয় না।

তেওয়ারী হালদার পরিবারের পুরাতন ভৃত্য, আসিবার কালে মা তাহার হাত ধরিয়া যে কথাগুলি বলিয়া দিয়াছিলেন সেই-সকল স্মরণ করিয়া সে উদ্বিগ্নকণ্ঠে কহিল, না বাবু, এ ঘরে আর একদিনও না। রাগের মাথায় ভাল কাজ করিনি, সাহেবকে আমি অনেক গাল দিয়েছি।

অপূর্ব কহিল, হাঁ, গাল না দিয়ে তোর মারা উচিত ছিল।

তেওয়ারীর মাথায় ক্রোধের পরিবর্তে সুবুদ্ধির উদয় হইতেছিল, সে তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিয়া কহিল, না বাবু, না। ওরা হাজার হোক সাহেব। আমরা বাঙালী।

অপূর্ব চুপ করিয়া রহিল। তেওয়ারী সাহস পাইয়া প্রশ্ন করিল,আফিসের দরোয়ানজীকে বলে কাল সকালেই উঠে যাওয়া যায় না? আমার ত মনে হয় যাওয়াই ভাল।

অপূর্ব কহিল, বেশ ত, বলে দেখিস। সে মনে মনে বুঝিল সাহেবের প্রতি দেশী লোকের কর্তব্যবুদ্ধি ইতিমধ্যেই

তেওয়ারীর সুতীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। দুর্জনের প্রতি আর তাহার নালিশ নাই, বরঞ্চ, কালব্যয় না করিয়া নিঃশব্দে স্থানত্যাগই অবশ্যকর্তব্য স্থির অবশ্যকর্তব্য স্থির করিয়াছে। কহিল, তাই হবে, তুই খাবার যোগাড় কর।

এই যে করি বাবু, বলিয়া সে কতকটা নিশ্চিন্তচিত্তে স্বকার্যে মনোনিবেশ করিল, কিন্তু তাহারই কথার সূত্র ধরিয়া ওই ওপরওয়ালা ফিরিঙ্গিটার দুর্ব্যবহার স্মরণ করিয়া অকস্মাৎ অপূর্বর সমস্ত চিত্ত ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। তাহার মনে

হইল, এ ত কেবল আমি এবং ওই মাতালটাই শুধু নয়। সবাই মিলিয়া লাঞ্ছনা এমন নিত্যনিয়ত সহিয়া যাই বলিয়াই ত ইহাদেরও স্পর্ধা দিনের পর দিন পুষ্ট ও পুঞ্জীভূত হইয়া আজ এমন অভ্রভেদী হইয়া উঠিয়াছে যে আমাদের প্রতি অন্যায়ের ধিক্কার সে উচ্চ শিখরে আর পৌঁছিতে পর্যন্ত পারে না।

নিঃশব্দে ও নির্বিচারে সহ্য করাকেই কেবল নিজেদের কর্তব্য করিয়া তুলিয়াছি বলিয়া অপরের আঘাত করিবার অধিকার এমন স্বতঃই সুদৃঢ় ও উগ্র হইয়া উঠিয়াছে। তাই আজ আমার চাকরটা পর্যন্ত আমাকে অবিলম্বে পলাইয়া আত্মরক্ষার উপদেশ দিতে পারিল, লজ্জা-শরমের প্রশ্ন পর্যন্ত তাহার মনে উদয় হইল না! কিন্তু সে বেচারা রান্নাঘরে বসিয়া চিঁড়া-মুড়কির ফলাহার প্রভুর জন্য সযত্নে প্রস্তুত করিতে লাগিল, জানিতেই পারিল না তাহারই পরিত্যক্ত মোটা বাঁশের লাঠিটা হাতে করিয়া অপূর্ব নিঃশব্দ-পদে বাহির হইয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

দ্বিতলে সাহেবের দরজা বন্ধ ছিল, সেই রুদ্ধদ্বারে গিয়া সে বারংবার আঘাত করিতে লাগিল। কয়েক মুহূর্ত পরে ভীত নারীকণ্ঠের ইংরাজিতে সাড়া আসিল, কে?

অপূর্ব কহিল, আমি নীচে থাকি। সেই লোকটাকে একবার চাই।

কেন?

তাকে দেখাতে চাই সে আমার কত ক্ষতি করেচে। তার ভাগ্য ভাল যে আমি ছিলাম না।

তিনি শুয়েছেন।

অপূর্ব অত্যন্ত পরুষকণ্ঠে কহিল, তুলে দিন, এ শোবার সময় নয়। রাত্রে শুলে আমি বিরক্ত করতে আসব না। কিন্তু, এখন তার মুখের জবাব না নিয়ে আমি এক পা নড়ব না। এবং ইচ্ছা না করিলেও তাহার হাতের মোটা লাঠিটা কাঠের সিঁড়ির উপর ঠকাস করিয়া একটা মস্ত শব্দ করিয়া বসিল।

কিন্তু দ্বারও খুলিল না, কোন জবাবও আসিল না। মিনিট-দুই অপেক্ষা করিয়া অপূর্ব পুনশ্চ চীৎকার করিল, আমি কিছুতেই যাব না,—বলুন তাকে বাইরে আসতে।

ভিতরে যে কথা কহিতেছিল এবার সে রুদ্ধদ্বারের একান্ত সন্নিকটে আসিয়া নম্র ও অতিশয় মৃদুকণ্ঠে কহিল, আমি তাঁর মেয়ে। বাবার হয়ে আপনার কাছে আমি ক্ষমা চাইচি। তিনি যা কিছু করেছেন সজ্ঞানে করেন নি। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন, আপনার যত ক্ষতি হয়েছে কাল আমরা তার যথাসাধ্য ক্ষতিপূরণ করব।

মেয়েটি কোমল স্বরে অপূর্ব নরম হইল, কিন্তু তাহার রাগ পড়িল না। কহিল, তিনি বর্বরের মত আমার যথেষ্ট লোকসান এবং ততোধিক উৎপাত করেছেন। আমি বিদেশী লোক বটে, কিন্তু আশা করি কাল সকালে নিজে দেখা করে আমার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করবার চেষ্টা করবেন।

মেয়েটি কহিল, আচ্ছা। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, আপনার মত আমরাও এখানে সম্পূর্ণ নূতন। মাত্র কাল বৈকালে আমরা মৌলমিন থেকে এসেছি।

অপূর্ব আর কোন কথা না কহিয়া আস্তে আস্তে নীচে নামিয়া গেল। ঘরে গিয়া দেখিল তখন পর্যন্ত তেওয়ারী ভোজনের উদ্যোগেই ব্যাপৃত আছে, এত কাণ্ড সে টেরও পায় নাই।

দু’টি খাইয়া লইয়া অপূর্ব তাহার শোবার ঘরে আসিয়া ভিজা তোশক বালিশ প্রভৃতি নীচে ফেলিয়া দিয়া রাত্রিটার মত কোনমতে একটা শয্যা পাতিয়া লইয়া শুইয়া পড়িল। প্রবাসের মাটিতে পা দিয়া পর্যন্ত তাহার ক্ষতি, বিরক্তি ও হয়রানির অবধি নাই; কি জানি এ যাত্রা তাহার কিভাবে কাটিবে, কোথায় গিয়া ইহার কে পরিণাম ঘটিবে,—এই স্বস্তি-শান্তিহীন উদ্বিগ্ন চিন্তার সহিত মিশিয়া আরও একটা কথা তাহার মনে হইতেছিল ওই অপরিচিত খ্রীষ্টান মেয়েটিকে।

সে সম্মুখে বাহির হয় নাই,—কেমন দেখিতে, কত বয়স, কিরূপ স্বভাব কিছুই অনুমান করিতে পারে নাই—শুধু এইটুকু মাত্র জানা গিয়াছে তাহার ইংরাজি উচ্চারণ ইংরাজের মত নয়।

হয়ত, মাদ্রাজী হইবে, না হয়ত, গোয়ানিজ কিংবা আর কিছু হইবে,—কিন্তু আর যাহাই হউক, সে যে আপনাকে উদ্ধত খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী রাজার জাতি মনে করিয়া তাহার পিতার মত অত্যন্ত দর্পিতা নয়, সে যে তাঁহার অত্যাচারের জন্য লজ্জা অনুভব করিয়াছে,—তাহার সেই ভীত, বিনীত কণ্ঠের ক্ষমাভিক্ষা নিজের পরুষতীব্র অভিযোগের সহিত এখন যেন বেসুরা বাজিত লাগিল। স্বভাবতঃ, সে উগ্রপ্রকৃতির নহে, কাহাকেও কঠিন কথা বলিতে তাহার বাধে, বিশেষতঃ, তেওয়ারীর বর্ণনার সহিত মিলাইয়া যখন মনে হইল, হয়ত এই মেয়েটিই তাহার মাতাল ও দুর্বৃত্ত পিতাকে নিবারণ করিতে নীরবে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছে, তখন তাহার অনুতাপের সহিত মনে হইতে লাগিল, আজিকার মত চুপ করিয়া গেলেই ভাল হইত। যাহা ঘটিবার তাহা ত ঘটিয়াই ছিল, ক্রোধের উপর উপরে গিয়া কথাগুলি না বলিয়া আসিলেই চলিত।

ওঘরে তেওয়ারীর ঘষ-মাজার কর্কশ শব্দ অবিশ্রাম শুনা যাইতেছিল, হঠাৎ সেটা থামিল। এবং পরক্ষণেই তাহার গলা শোনা গেল, কে?

অপূর্ব চকিত হইয়া উঠিল, কিন্তু জবাব শুনিতে পাইল না। কিন্তু তৎপরিবর্তে তেওয়ারীর প্রবল কণ্ঠস্বরই তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিল। সে তাহার হিন্দুস্থানী ভাষায় বলিল, না না, মেমসাহেব, ও-সব তুমি নিয়ে যাও। বাবুর খাওয়া হয়ে গেছে,—ও-সব আমরা ছুঁইনে।

অপূর্ব উঠিয়া বসিয়া কান খাড়া করিয়া সেই খ্রীষ্টান মেয়েটির কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিল, কিন্তু কথা বুঝিতে পারিল না, বুঝাইয়া দিল তেওয়ারী। কহিল, কে বললে আমাদের খাওয়া হয়নি? হয়ে গেছে। ও-সব তুমি নিয়ে যাও, বাবু শুনলে ভারী রাগ করবেন বলচি।

অপূর্ব নিঃশব্দে উঠিয়া আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল, কি হয়েছে তেওয়ারী ?

মেয়েটি চৌকাটের এদিকে ছিল, তৎক্ষণাৎ সরিয়া গেল। তখন সেইমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে, আলো জ্বালা হয় নাই, সিঁড়ির দিক হইতে একটা অন্ধকার ছায়া ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে মেয়েটিকে বেশ স্পষ্ট দেখা না গেলেও বুঝা গেল। তাহার রঙ ইংরাজের মত সাদা নয়, কিন্তু খুব ফরসা। বয়স উনিশ-কুড়ি কিংবা কিছু বেশিও হইতে পারে, এবং একটু লম্বা বলিয়াই বোধ হয় কিছু রোগা দেখাইল। উপরের ঠোঁটের নীচে সুমুখের দাঁত-দুটি একটু উঁচু মনে না হইলে মুখখানি বোধ করি ভালই। পায়ে চটি-জুতা, পরনে চমৎকার একখানি মাদ্রাজী শাড়ী,—সম্ভবতঃ, উৎসব বলিয়া,—কিন্তু ধরনটা কতক বাঙালী, কতক পার্শীদের মত। একটি জাপানী সাজিতে করিয়া কয়েকটি আপেল, নাশপাতি, গুটি-দুই বেদানা এবং একগোছা আঙুর সুমুখে মেজের উপর রাখা রহিয়াছে।

অপূর্ব কহিল, এ-সব কেন ?

মেয়েটি বাহিরে হইতে ইংরাজিতে আস্তে আস্তে জবাব দিল, আজ আমাদের পর্বদিন, মা পাঠিয়ে দিলেন। তাছাড়া আজ ত আপনাদের খাওয়াও হয়নি।

অপূর্ব কহিল, আপনার মাকে ধন্যবাদ জানাবেন, কিন্তু আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে।

মেয়েটি চুপ করিয়া রহিল। অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের খাওয়া হয়নি তাঁকে কে বল্লে ?

মেয়েটি লজ্জিতস্বরে কহিল, ওই নিয়েই প্রথমে ঝগড়া হয়। তাছাড়া আমরা জানি।

অপূর্ব মাথা নাড়িয়া কহিল, তাঁকে সহস্র ধন্যবাদ, কিন্তু সত্যই আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে।

মেয়েটি একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া বলিল, তা’ বটে, কিন্তু সে ভাল হয়নি। আর এ-সব ত বাজারের ফল,—এতে ত কোন দোষ নেই।

অপূর্ব বুঝিল তাহাকে কোনমতে শান্ত করিবার জন্য অপরিচিত দুটি রমণীর উদ্বেগের অবধি নাই। অল্পক্ষণ পূর্বে সে লাঠি ও গলার শব্দে তাহার মেজাজের যে পরিচয় দিয়া আসিয়াছে, তাহাতে কাল সকালে যে কি হইবে এই ভাবিয়াই তাহাকে প্রসন্ন করিতে ইহারা এই ভেট লইয়া উপস্থিত হইয়াছে।

তাই, সদয়কণ্ঠে কহিল, না, কোন দোষ নেই। তেওয়ারীকে কহিল, বাজারের ফল, এ নিতে আর দোষ কি ঠাকুর ?

তেওয়ারী ঠাকুর খুশী হইল না, কহিল, বাজারের ফল ত বাজার থেকে আনলেই চলবে। আজ রাত্রে আমাদের দরকারও নেই, আর মা আমাকে এ-সব করতে বার বার নিষেধ করেছেন। মেমসাহেব, এ-সব তুমি নিয়ে যাও,—আমাদের চাইনে।

মা যে নিষেধ করিয়াছেন বা করিতে পারেন, ইহাতে অসম্ভব কিছু নাই, এবং বহুদিনের পুরাতন ও বিশ্বাসী তেওয়ারী ঠাকুরকে যে এ-সকল ব্যাপারে প্রবাসে তাহার অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া দিতে পারেন তাহাও সম্ভব। এই সেদিন সে জননীর কাছে কি প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া মনে মনে কহিল, শুধু ত কেবল মাতৃ-আজ্ঞা নয়, আমি সত্য দিয়া আসিয়াছি। কিন্তু তথাপি ওই সঙ্কুচিত, লজ্জিত, অপরিচিত মেয়েটি—যে তাহাকে প্রসন্ন করিতে ভয়ে ভয়ে তাহার দ্বারে আসিয়াছে—তাহার উপহারের সামান্য দ্রব্যগুলিকে অস্পৃশ্য বলিয়া অপমান করাকেও তাহার সত্য বলিয়া মনে হইল না। কিন্তু এ কথা সে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না, মৌন হইয়া রহিল, তেওয়ারী বলিল, ও-সব আমরা ছোঁব না মেমসাহেব, তুমি তুলে নিয়ে যাও, আমি জায়গাটা ধুয়ে ফেলি।

মেয়েটি চুপ করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া হাত বাড়াইয়া ডালাটি তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

অপূর্ব চাপা রুক্ষস্বরে কহিল, না হয় না-ই খেতিস, নিয়ে চুপি চুপি ফেলে দিতেও ত পারতিস!

তেওয়ারী আশ্চর্য হইয়া বলিল, নিয়ে ফেলে দেব ? মিছামিছি নষ্ট করে লাভ কি বাবু!

লাভ কি বাবু! মুখ্যু, গোঁয়ার কোথাকার! এই বলিয়া অপূর্ব শুইতে চলিয়া গেল। বিছানায় শুইয়া প্রথমটা তাহার তেওয়ারীর প্রতি ক্রোধে সর্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল, কিন্তু যতই সে ব্যাপারটা তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করতে লাগিল ততই মনে হইত লাগিল, এ আমি পারিতাম না, কিন্তু হয়ত এ ভালই হইয়াছে সে স্পষ্ট করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছে। হঠাৎ তাহার বড় মাতুলকে মনে পড়িল। সেই সদাচারী, নিষ্ঠাবান, পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ একদিন তাহাদের বাটীতে অন্নাহার করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। স্বীকার করিবার জো নাই করুণাময়ী তাহা জানিতেন, তথাপি স্বামীর সহিত ভ্রাতার মনোমালিন্য বাঁচাইতে কি একটা কৌশল অবলম্বন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাহাতে মৃদু হাসিয়া কহিয়াছিলেন, না দিদি, সে হতে পারে না। হালদার মহাশয় রাগী লোক, এ অপমান তিনি সইবেন না,—হয়ত বা তোমাকেও কিছু ভাগ নিতে হবে;—কিন্তু আমার স্বর্গীয় গুরুদেব বলতেন, মুরারি, সত্যপালনের দুঃখ আছে, তাকে আঘাতের মধ্যে দিয়ে বরঞ্চ একদিন পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু বঞ্চনা প্রতারণার মিষ্ট পথ দিয়ে সে কোনদিন আনাগোনা করে না। এই ভাল, যে আমি না খেয়েই চলে গেলাম বোন।

এই লইয়া করুণাময়ীর অনেকদিন অনেক দুঃখ গিয়াছে, কিন্তু কোনদিন দাদাকে তিনি দোষ দেন নাই। সেই কথা স্মরণ করিয়া অপূর্ব মনে মনে বার বার কহিতে লাগিল,—এ ভালই হয়েছে,—তেওয়ারী ঠিক কাজই করেছে।

তিন

অপূর্বর ইচ্ছা ছিল সকালে বাজারটা একবার ঘুরিয়া আসে। ইহার ম্লেচ্ছাচারের দুর্নাম ত সমুদ্র পার হইয়া তাহার মায়ের কানে পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিয়াছে, অতএব তাহাকে অস্বীকার করা চলে না,—মানিয়া লইতেই হইবে। কিন্তু, হিন্দুত্বের ধ্বজা বহিয়া সে-ই ত প্রথম কালাপানি পার হইয়া আসে নাই!—সত্যকার হিন্দু আরও ত থাকিতে পারেন যাঁহারা চাকরির প্রয়োজন ও শাস্ত্রের অনুশাসন দুয়ের মাঝামাঝি একটা পথ ইতিপূর্বেই আবিষ্কার করিয়া ধর্ম ও অর্থের বিরোধ ভঞ্জন করতঃ সুখে বসবাস করিতেছেন! সেই সুগম পথের সন্ধান লইতে ইঁহাদের সহিত পরিচিত হওয়া অত্যাবশ্যক, এবং, বিদেশে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিবার এত বড় সুযোগ বাজার ছাড়া আর কোথায় মিলিবে? বস্তুতঃ, নিজের কানে শুনিয়া ও চোখে দেখিয়া এই জিনিসটাই তাহার স্থির করা প্রয়োজন যে, জননীর বিরুদ্ধাচারী না হইয়া এ দেশে বাস্তবিক বাস করা চলে কি না। কিন্তু বাহির হইতে পারিল না, কারণ, উপরের সাহেবটা যে কখন ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আসিবে তাহার ঠিকানা নাই। সে যে আসিবেই তাহাতে সন্দেহ ছিল না। একে ত, উৎপাত সে সজ্ঞানে করে নাই, এবং আজ যখন তাহার নেশা ছুটিবে, তখন স্ত্রী ও কন্যা তাহাকে কিছুতেই অব্যাহতি দিবে না, তাহাদের মুখের এই অনুচ্চারিত ইঙ্গিত সে গতকল্যই আদায় করিয়া আসিয়াছে। মেয়েটিকে আজ ঘুম ভাঙ্গিয়া পর্যন্ত অনেকবার মনে পড়িয়াছে। ঘুমের মধ্যেও যেন তাহার ভদ্রতা, তাহার সৌজন্য, তাহার বিনয়নম্র কণ্ঠস্বর কানে কানে একটা জানা সুরের রেশের মত আনাগোনা করিয়া গেছে। মাতাল পিতার দুরাচারে ওই মেয়েটিরও যেমন লজ্জার অবধি ছিল না, মূর্খ তেওয়ারীর রূঢ়তায় অপূর্ব নিজেও তেমনি লজ্জা বোধ না করিয়া পারে নাই। পরের অপরাধে অপরাধী হইয়া এই দুটি অপরিচিত মনের

মাঝখানে বোধ করি এইখানেই একটি সমবেদনার সূক্ষ্ম সূত্র ছিল, যাহাকে না বলিয়া অস্বীকার করিতে অপূর্ব্বর মন সরিতে ছিল না। হঠাৎ মাথার উপরে প্রতিবেশীদের জাগিয়া উঠার সাড়া নীচে আসিয়া পৌঁছিল এবং প্রত্যেক স-বুট পদক্ষেপেই সে আশা করিতে লাগিল, এইবার সাহেব তাহার দরজায় নামিয়া আসিয়া দাঁড়াইবেন। ক্ষমা সে করিবে তাহা স্থির, কিন্তু, বিগত দিনের বীভৎসতা কি করিলে যে সহজ এবং সামান্য হইয়া বিবাদের দাগ মুছাইয়া দিবে ইহাই হইল তাহার চিন্তা। কিন্তু মার্জনা চাহিবার সময় বহিয়া যাইতে লাগিল। উপরে ছোটখাটো পদক্ষেপের সঙ্গে মিশিয়া সাহেবের জুতার শব্দ ক্রমশঃ সুস্পষ্টতর হইয়া উঠিতে লাগিল, তাহাতে তাঁহার পায়ের বহর ও দেহের ভারের পরিচয় দিল, কিন্তু দীনতার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না। এইরূপে আশায় ও উদ্বেগে প্রতীক্ষা করিয়া ঘড়িতে যখন নয়টা বাজিল, এবং নিজের নূতন আফিসের জন্য প্রস্তুত হইবার সময় তাহার আসন্ন হইয়া উঠিল, তখন শোনা গেল সাহেব নীচে নামিতে শুরু করিয়াছেন। তাঁহার পিছনে আরও দুটি পায়ের শব্দ অপূর্ব কান পাতিয়া শুনিল। অনতিবিলম্বে তাহার কবাটের লোহার কড়ার ভীষণ ঝন্ঝনা উঠিল, এবং রান্নাঘর হইতে তেওয়ারী ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল, বাবু, কালকের সাহেব ব্যাটা এসে কড়া নাড়চে। তাহার উত্তেজনা কণ্ঠস্বরে গোপন রহিল না।

অপূর্ব কহিল, দোর খুলে দিয়ে তাঁকে আসতে বল্।

তেওয়ারী দ্বার খুলিয়া দিতেই অপূর্ব অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠের ডাক শুনিতে পাইল,—এই, তুম্হারা সাব্ কিধর্ ?

উত্তরে তেওয়ারী কি কহিল ভাল শুনা গেল না, খুব সম্ভব সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিল কিন্তু প্রত্যুত্তরে সাহেবের আওয়াজ সিঁড়ির কাঠের ছাদে ধাক্কা খাইয়া যেন হুঙ্কার দিয়া উঠিল, বোলাও!

ঘরের মধ্যে অপূর্ব চমকিয়া উঠিল। বাপ্ রে! একি অনুতাপের গলা! একবার মনে করিল সাহেব সকালেই মদ খাইয়াছে, অতএব, এ সময়ে যাওয়া উচিত কিনা ভাবিবার পূর্বেই পুনশ্চ হুকুম আসিল, বোলাও জল্দি।

অপূর্ব আস্তে আস্তে কাছে গিয়া দাঁড়াইল। সাহেব এক মুহূর্ত তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি ইংরাজি জান ?

জানি।

আমি ঘুমিয়ে পড়ার পরে কাল তুমি আমার উপরে গিয়েছিলে ?

হাঁ।

সাহেব কহিলেন, ঠিক। লাঠি ঠুকেছিল ? অনধিকার প্রবেশের জন্য দোর ভাঙতে চেষ্টা করেছিলে?

অপূর্ব বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। সাহেব বলিলেন, দৈবাৎ দোর খোলা থাকলে ঘরে ঢুকে তুমি আমার স্ত্রীকে কিংবা মেয়েকে আক্রমণ করতে। তাই আমি জেগে থাকতে যাওনি ?

অপূর্ব ধীরে ধীরে কহিল, তুমি ত ঘুমিয়েছিলে, এ-সব জানলে কি করে ?

সাহেব কহিলেন, সমস্ত আমার মেয়ের কাছে শুনেচি। তাকে তুমি গালিগালাজ করে এসেচ। এই বলিয়া সে তাহার পার্শ্ববর্তিনী কন্যাকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিল। এ সেই মেয়েটি কিন্তু কালও ইহাকে ভাল করিয়া অপূর্ব দেখিতে পায় নাই, আজও সাহেবের বিপুলায়তনের অন্তরালে তাহার কাপড়ের পাড়টুকু ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাইল না। সে ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল কিনা তাহাও বুঝা গেল না, কিন্তু এটুকু বুঝা গেল ইহারা সহজ মানুষ নয়। সমস্ত ব্যাপারটাকে ইচ্ছা করিয়া বিকৃত ও উলটা করিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। অতএব, অত্যন্ত সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

সাহেব কহিলেন, আমি জেগে থাকলে তোমাকে লাথি মেরে রাস্তায় ফেলে দিতাম, এবং একটা দাঁতও তোমার মুখে আস্ত রাখতাম না, কিন্তু সে সুযোগ যখন হারিয়েছি, তখন, পুলিশের হাতে যেটুকু বিচার পাওয়া যায় সেইটুকু নিয়েই এখন সন্তুষ্ট হতে হবে। আমরা যাচ্ছি তুমি এর জন্যে প্রস্তুত থাক গে।

অপূর্ব মাথা নাড়িয়া কহিল, আচ্ছা। কিন্তু তাহার মুখ অত্যন্ত ম্লান হইয়া গেল।

সাহেব মেয়ের হাত ধরিয়া কহিলেন, এস। এবং নামিতে নামিতে বলিলেন, কাওয়ার্ড! অরক্ষিত স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দেবার চেষ্টা! আমি তোমাকে এমন শিক্ষা দেব যা তুমি জীবনে ভুলবে না।

তেওয়ারী পাশে দাঁড়াইয়া সমস্ত শুনিতেছিল, তাঁহারা অন্তর্হিত হইতেই কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিল, কি হবে ছোটবাবু?

অপূর্ব তাচ্ছিল্যভরে কহিল, হবে আবার কি!

কিন্তু তাহার মুখের চেহারা যে অন্যকথা কহিল তেওয়ারী তাহা বুঝিল। কহিল, তখনি ত বলেছিলুম বাবু, যা হবার হয়ে গেছে আর ওদের ঘেঁটিয়ে কাজ নেই। ওরা হ'ল সাহেব-মেম।

অপূর্ব কহিল, সাহেব-মেম তা কি?

তেওয়ারী কহিল, ওরা যে পুলিশে গেল!

অপূর্ব বলিল, গেল ত কি ?

তেওয়ারী ব্যাকুল হইয়া কহিল, বড়বাবুকে একটা তার করে দিই ছোটবাবু, তিনি না হয় এসে পড়ুন।

তুই ক্ষেপ্লি তেওয়ারী! যা দেখ্ গে, ওদিকে বুঝি সব পুড়ে-ঝুড়ে গেল। সাড়ে দশটায় আমাকে বেরোতে হবে। এই বলিয়া সে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। তেওয়ারীও রান্নাঘরে গিয়া প্রবেশ করিল কিন্তু রাঁধা-বাড়ার কাজ হইতে বাবুর আফিসে যাওয়া পর্যন্ত যা কিছু সমস্তই তাহার কাছে একেবারে অর্থহীন হইয়া

গেল। এবং যতই সে মনে মনে আপনাকে সমস্ত আপদের হেতু বলিয়া ধিক্কার দিতে লাগিল, ততই তাহার উদ্ভ্রান্ত চিত্ত এদেশের ম্লেচ্ছতার উপরে, গ্রহনক্ষত্রের মন্দ দৃষ্টির উপরে, পুরোহিতের গণনার ভ্রমের উপরে এবং সর্বোপরি করুণাময়ীর অর্থলিপ্সার উপরে দোষ চাপাইয়া কোনমতে একটু সান্ত্বনা খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল।

এমনিধারা মন লইয়াই তাহাকে রান্নার কাজ শেষ করিতে হইল। করুণাময়ীর হাতেগড়া মানুষ সে, অতএব মন তাহার যতই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাক হাতের কাজে কোথাও ভুলচুক হইল না। যথাসময়ে আহারে বসিয়া অপূর্ব তাহাকে সাহস দিবার অভিপ্রায়ে রন্ধনের কিছু বাড়াবাড়ি প্রশংসা করিল। একদফা অন্ন-ব্যঞ্জনের চেহারার যশঃকীর্তন করিল এবং দুই-এক গ্রাস মুখে পুরিয়াই কহিল, আজ রেঁধেছিস্ যেন অমৃত, তেওয়ারী। ক'দিন খাইনি, ভেবেছিলাম বুঝি বা সব পুড়িয়ে-ঝুড়িয়ে ফেলবি। যে ভীতু লোক তুই—আচ্ছা মানুষটিকে মা বেছে বেছে সঙ্গে দিয়েছিলেন।

তেওয়ারী কহিল, হুঁ। অপূর্ব তাহার প্রতি চাহিয়া সহাস্যে কহিল, মুখখানা যে একেবারে তোলো হাঁড়ি করে রেখেছিস রে? এবং শুধু কেবল তেওয়ারীর নয়, নিজের মন হইতেও সমস্ত ব্যাপারটা লঘু করিয়া দিবার চেষ্টায় কৌতুক করিয়া বলিল, হারামজাদা ফিরিঙ্গীর শাসানোর ঘটাটা একবার দেখলি ? পুলিশ যাচ্চেন!—আরে, যা না তাই! গিয়ে করবি কি শুনি ? তোর সাক্ষী আছে ?

তেওয়ারী শুধু কহিল, সাহেব-মেমদের কি সাক্ষী-সাবুদ লাগে বাবু, ওরা বললেই হয়।

অপূর্ব কহিল, হাঁ বললেই হয়! আইন-কানুন যেন নেই! তাছাড়া, ওরা আবার কিসের সাহেব-মেম? রঙটি ত একেবারে আমার বার্নিশ-করা জুতো! ব্যাটা কচি ছেলেকে যেন জুজুর ভয় দেখিয়ে গেল! নচ্ছার, পাজী, হারামজাদা!

তেওয়ারী চুপ করিয়া রহিল। আড়ালে গালি-গালাজ করিবার মত তেজও আর তাহার ছিল না।

অপূর্ব কিছুক্ষণ নিঃশব্দে আহার করার পরে হঠাৎ মুখ তুলিয়া কহিল, আর ঐ মেয়েটা কি বজ্জাত, তেওয়ারী! কাল এলো যেন ভিজে বেড়ালটি! আর ওপরে গিয়েই যত সব মিছে কথা লাগিয়েচে! চেনা ভার!

তেওয়ারী কহিল, খিস্টান যে!

তা বটে! অপূর্বর তৎক্ষণাৎ মনে হইল ইহাদের খাদ্যাখাদ্যের জ্ঞান নাই, এঁটো-কাঁটা মানে না, সামাজিক ভাল-মন্দের কোন বোধ নাই,—কহিল, হতভাগা, নচ্ছার ব্যাটারা। জানিস তেওয়ারী, আসল সাহেবেরা এদের কি রকম ঘেন্না করে—এক টেবিলে বসে কখন খায় না পর্যন্ত—যতই হ্যাটকোট পরুন, আর যতই কেননা গীর্জেয় আনাগোনা করুন। যারা জাত দেয়, তারা কি কখখনো ভাল হতে পারে তুই মনে করিস ?

তেওয়ারী তাহা কোনো দিনই মনে করে না, কিন্তু নিজেদের এই আসন্ন সর্বনাশের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অপরে কে ভাল আর কে মন্দ, এ আলোচনায় তাহার প্রবৃত্তি হইল না। ছোটবাবুর আফিসে যাইবার সময় হইয়া আসিতেছে, তখন একাকী ঘরের মধ্যে যে কি করিয়া তাহার সময় কাটিবে সে জানে না। সাহেব থানায় খবর দিতে গিয়াছে, ফিরিয়া আসিয়া হয়ত দোর ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, হয়ত পুলিশের দল সঙ্গে করিয়া আনিবে,—হয়ত তাহাকে বাঁধিয়া লইয়া যাইবে,—কি যে হইবে, আর কি যে হইবে না সমস্ত অনিশ্চিত। এ অবস্থায় আসল ও নকল সাহেবের প্রভেদ কতখানি, একের টেবিলে অপরে খায় কি না, এবং না খাইলে অন্যপক্ষের লাঞ্ছনা ও মনস্তাপ কতদূর বৃদ্ধি পায় এ-সকল সংবাদের প্রতি সে লেশমাত্র কৌতূহল অনুভব করিল না। আহারাদি শেষ করিয়া অপূর্ব কাপড় পরিতেছিল, তেওয়ারী ঘরের পর্দাটা একটুখানি সরাইয়া মুখ বাহির করিয়া কহিল, একটু দেখে গেলে হোতো না ?

কি দেখে গেলে ?

ওদের ফিরে আসা পর্যন্ত—

অপূর্ব কহিল, তা কি হয়! আজ আমার চাকরির প্রথম দিন,—কি তারা ভাববে বল ত?

তেওয়ারী চুপ করিয়া রহিল। অপূর্ব কহিল, তুই দোর দিয়ে নির্ভয়ে বসে থাক না—আমি যত শীঘ্র পারি ফিরে আসবো,—দোর ত আর ভাঙ্তে পারবে না,—কি করবে সে ব্যাটা!

তেওয়ারী কহিল, আচ্ছা। কিন্তু সে যে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিবার চেষ্টা করিল অপূর্ব তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইল। বাহির হইবার সময়ে দ্বারে খিল দিবার পূর্বে তেওয়ারী গলাটা খাটো করিয়া বলিল, আজ আর হেঁটে যাবেন না ছোটবাবু, রাস্তায় একটা গাড়ি ডেকে নেবেন।

আচ্ছা সে দেখা যাবে, এই বলিয়া অপূর্ব সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া গেল। তাহার চলার ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল না যে তাহার মনের মধ্যে নূতন চাকরির আনন্দ আর কিছুমাত্র অবশিষ্ট আছে।

বোথা কোম্পানির অংশীদার, পূর্ব অঞ্চলের ম্যানেজার রোজেন সাহেব সম্প্রতি বর্মায় ছিলেন, রেঙ্গুনের আফিস তিনিই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, অপূর্বকে যথেষ্ট সহৃদয়তার সহিত গ্রহণ করিলেন এবং তাহার চেহারা, কথাবার্তা ও ইউনিভারসিটির ডিগ্রী প্রভৃতি দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন। সমস্ত কর্মচারীদের ডাকিয়া পরিচয় করাইয়া দিলেন, এবং যে মাস দুই-তিন কাল তিনি এখানে আছেন তাহার মধ্যে ব্যবসায়ের সমস্ত রহস্য শিখাইয়া দিবেন আশা দিলেন। কথায়-বার্তায়, আলাপে-পরিচয়ে ও নূতন উৎসাহে ভিতরের গ্লানিটা তাহার এক সময়ে কাটিয়া গেল। একটি লোক তাহাকে বিশেষ করিয়া আকৃষ্ট করিল সে আফিসের অ্যাকাউন্টেন্ট। মারাঠি ব্রাহ্মণ, নাম রামদাস তলওয়ারকর। বয়স বোধ হয় তারই মত,—হয়ত বা কিছু বেশি। দীর্ঘাকৃতি, বলিষ্ঠ, গৌরবর্ণ,—সুপুরুষ

বলিলে অতিশয়োক্তি হয় না।পরনে পায়জামা ও লম্বা কোট, মাথায় পাগড়ি, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা;—ইংরাজি কথাবার্তা চমৎকার শুদ্ধ, কিন্তু, অপূর্বর সহিত সে প্রথম হইতে হিন্দীতে কথাবার্তা শুরু করিল। অপূর্ব ভাল হিন্দী জানিত না, কিন্তু যখন দেখিল, সে হিন্দী ছাড়া আর কিছুতেই জবাব দেয় না, তখন সেও হিন্দী বলিতে আরম্ভ করিল। অপূর্ব কহিল, এ-ভাষা আমি ভাল জানিনে, অনেক ভুল হবে।

রামদাস কহিল, ভুল আমারও হয়, আমাদের কারও এটা মাতৃভাষা নয়।

অপূর্ব বলিল, যদি পরের ভাষাতেই বলতে হয় ত, ইংরিজি দোষ করলে কি?

রামদাস কহিল, ইংরিজি আমার আরও ঢের বেশী ভুল হয়। একটু হাসিয়া কহিল, আপনি না হয় ইংরাজিতেই বলবেন, কিন্তু আমি হিন্দীতে জবাব দিলে আমাকে মাপ করতে হবে।

অপূর্ব কহিল, আমিও হিন্দী বলতেই চেষ্টা করব, কিন্তু ভুল হলে আমাকেও মাপ করতে হবে।

এই আলাপের মধ্যে রোজেন সাহেব নিজেই ম্যানেজারের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, হল্যান্ডের লোক, বেশভূষার পারিপাট্য নাই, মুখে প্রচুর দাড়ি-গোঁফ, ইংরাজি উচ্চারণ ভাঙ্গা-ভাঙ্গা, পাকা ব্যবসায়ী—ইতিমধ্যেই বর্মার নানাস্থানে ঘুরিয়া, নানা লোকের কাছে তথ্য সংগ্রহ করিয়া কাজকর্মের একটা খসড়া প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছেন, সেই কাগজখানা অপূর্বর টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, এ সম্বন্ধে আপনার মন্তব্য একটা জানতে চাই। তলওয়ারকরকে কহিলেন, আপনার ঘরেও এক কপি পাঠিয়ে দিয়েছি। না না, এখন থাক—আজ ম্যানেজারের সম্মানে দুটোর সময় আফিসের ছুটি। দেখুন, আমি ত শীঘ্রই চলো যাবো, তখন, আপনাদের দুজনের পরেই সমস্ত কাজকর্ম নির্ভর করবে। আমি ইংলিশম্যান নই,—যদিচ, এ রাজ্য একদিন

আমাদেরই হতে পারত,—তবুও তাদের মত আমরা ইণ্ডিয়ানদের ছোট মনে করিনে, নিজেদের সমকক্ষই ভাবি,—কেবল ফার্মের নয়, আপনাদের নিজেদের উন্নতিও আপনাদের নিজেদের কর্তব্যজ্ঞানের উপরে—আচ্ছা, গুড ডে—আফিস দুটোর সময় বন্ধ হওয়া চাই—ইত্যাদি বলিতে বলিতে তিনি যেমন ক্ষিপ্রপদে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তেমনি ক্ষিপ্রপদে বাহির হইয়া গেলেন। এবং ইহার অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার মোটরের শব্দ বাহিরের দ্বারের কাছে শুনিতে পাওয়া গেল।

বেলা দুইটার সময় উভয়ে একত্র পথে বাহির হইল। তলওয়ারকর শহরে থাকে না, প্রায় দশ মাইল পশ্চিমে ইন্সিন্ নামক স্থানে তাহার বাসা। বাসায় তাহার স্ত্রী ও একটি ছোট মেয়ে থেকে, সঙ্গে খানিকটা জমি আছে, সেখানে তরিতরকারি অনায়াসে জন্মাইতে পারা যায়, চমৎকার খোলা জায়গা, শহরের গণ্ডগোল নাই,—যথেষ্ট ট্রেন, যাতায়াতের কোন অসুবিধা হয় না।—হালদার বাবুজী, কাল আফিসের পরে আমার ওখানে আপনার চায়ের নিমন্ত্রণ রইল।

অপূর্ব কহিল, আমি চা খাইনে বাবুজী!

খান না ? আমিও পূর্বে খেতাম না, আমার স্ত্রী এখনও রাগ করেন, —আচ্ছা, না হয় ফলমূল—শরবত— কিংবা—আমরা ত আপনার মতই ব্রাহ্মণ—

অপূর্ব হাসিয়া কহিল, ব্রাহ্মণ ত বটেই। কিন্তু আপনারা যদি আমাদের হাতে খান তবেই আমি শুধু আপনার স্ত্রীর হাতে খেতে পারি।

রামদাস কহিল, আমি ত খেতে পারিই,কিন্তু আমার স্ত্রীর কথা,—আচ্ছা,সে তাঁকে জিজ্ঞেসা করে বলব। আমাদের মেয়েরা বড়,—আচ্ছা, আপনার বাসা ত কাছেই, চলুন না আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি, আমার ট্রেন ত সেই পাঁচটায়।

অপূর্ব প্রমাদ গণিল। এতক্ষণ সে সমস্ত ভুলিয়াছিল, বাসার কথায় চক্ষের নিমিষে তাহার সমস্ত হাঙ্গামা, সমস্ত কদর্যতা বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় চমকিয়া মুখের সরস শ্রী যেন মুছিয়া দিয়া গেল। এখানে পা দিয়াই সে এমন একটা কদর্য নোংরা

ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে এ কথা জানিতে দিতে তাহার মাথা কাটা গেল। এতক্ষণ সেখানে যে কি হইয়াছে সে কিছুই জানে না। হয়ত, কত কি হইয়াছে। একাকী তাহারই মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে। এমন একজন পরিচিত মানুষকে সঙ্গে পাইলে কত সুবিধা, কত সাহস। কিন্তু সদ্য পরিচয়ের এই আরম্ভকালেই সে যে হঠাৎ কি ভাবিয়া বসিবে এই কথা মনে করিয়া অপূর্ব একান্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল, কহিল, দেখুন, সমস্ত বিশৃঙ্খল—মুখের কথাটা সে শেষ করিতেও পারিল না। তাহার সঙ্কোচ ও লজ্জা অনুভব করিয়া রামদাস সহাস্যে কহিল, এক রাত্রে শৃঙ্খলা আমি ত আশা করিনে বাবুজী। আমাকেও একদিন নূতন বাসা পাততে হয়েছিল, তবু ত আমার স্ত্রী ছিলেন, আপনার তাও সঙ্গে নেই। আপনি আজ লজ্জা পাচ্ছেন, কিন্তু তাঁকে না নিয়ে এলে এক বচ্ছর পরেও এই লজ্জা আপনার ঘুচবে না তা বলে রাখচি। চলুন, দেখি কি করতে পারি,—বিশৃঙ্খলার মাঝখানেই ত বন্ধুর দরকার।

অপূর্ব চুপ করিয়া রহিল। সে স্বভাবতঃ রহস্যপ্রিয় লোক, তাহার স্ত্রীর একান্ত অসদ্ভাবের কথাটা সে অন্য সময়ে কৌতুক করিয়া বলিতেও পারিত, কিন্তু এখন হাসি-তামাশার কথা তাহার মনেও আসিল না। এই নির্বান্ধব দেশে আজ তাহার বন্ধুর একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু, সদ্যপরিচিত এই বিদেশী বন্ধুটিকে সেই প্রয়োজনে আহ্বান করিতে তাহার লজ্জা করিতে লাগিল।, তাহার কথায় সে যে ঠিক সায় দিল তাহা নহে, কিন্তু উভয়ে চলিতে চলিতে যখন তাহার বাসার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তলওয়ারজীকে গৃহে আমন্ত্রণ না করিয়া পারিল না। উপরে উঠিতে গিয়া দেখিতে পাইল সেই ক্রীশ্চান মেয়েটিও ঠিক সেই সময়েই অবতরণ করিতেছে। বাপ তাহার সঙ্গে নাই, সে একা। দুজনে একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। মেয়েটি কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত করিল না, ধীরে ধীরে নামিয়া কিছু দূরে রাস্তায় গিয়া যখন পড়িল, রামদাস জিজ্ঞাসা করিল, এঁরা তেতলায় থাকেন বুঝি ?

অপূর্ব কহিল, হাঁ!

আপনাদেরই বাঙালী ?

অপূর্ব মাথা নাড়িয়া কহিল, না দেশী ক্রীশ্চান। খুব সম্ভব, মাদ্রাজী, কিংবা গোয়ানিজ, কিংবা আর কিছু,—কিন্তু বাঙালী নয়।

রামদাস কহিল, কিন্তু কাপড় পরার ধরন ত ঠিক আপনাদের মত ?

অপূর্ব কিছু আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল, আমাদের ধরন আপনি জানলেন কি করে ?

রামদাস বলিল, আমি ? বোম্বায়ে, পুণায়, সিমলায় অনেক বাঙালী মহিলাকে আমি দেখেচি, এমন সুন্দর কাপড়-পরা ভারতবর্ষের আর কোন জাতের নেই।

তা হবে—এই বলিয়া অন্যমনস্ক অপূর্ব তাহার বাসার রুদ্ধদ্বারে আসিয়া পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিল। খানিক পরে ভিতর হইতে সতর্ক-কণ্ঠের সাড়া আসিল, কে?

আমি রে, আমি, দোর খোল্, তোর ভয় নেই, বলিয়া অপূর্ব হাসিল। কারণ, ইতিমধ্যে ভয়ানক কিছু ঘটে নাই, তেওয়ারী নিরাপদে ঘরের মধ্যেই আছে অনুভব করিয়া তাহার মস্ত যেন একটা ভার নামিয়া গেল।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া রামদাস এ-ঘর ও-ঘর ঘুরিয়া খুশী হইল, কহিল, আমি যা ভয় করেছিলাম তা নয়! আপনার চাকরটি ভাল, সমস্তই একপ্রকার গুছিয়ে ফেলেছে। আসবাবগুলি আমিই পছন্দ করে কিনেছিলাম। আপনার আরও কি-কি দরকার আমাকে জানালেই কিনে পাঠিয়ে দেব,—রোজেন সাহেবের হুকুম আছে।

তেওয়ারী মৃদুস্বরে কহিল, আর আসবাবে কাজ নেই বাবু, ভালয়-ভালয় বেরুতে পারলে বাঁচি।

তাহার মন্তব্যে কেহ মনোযোগ করিল না, কিন্তু, অপূর্বর কানে গেল। সে একসময়ে আড়ালে জিজ্ঞাসা করিল, আর কিছু হয়েছিল রে?

না।

তবে যে ও—কথা বললি?

তেওয়ারী জবাব দিল, বললুম সাধে? সারা দুপুরবেলাটা সাহেব যা ঘোড়দৌড় করে বেড়িয়েচে তাতে মানুষ টিক্তে পারে?

অপূর্ব ভাবিল, ব্যাপারটা সত্যই হয়ত গুরুতর নয়, অন্ততঃ, একটা ইতরের ছোটখাটো সমস্ত তুচ্ছ উপদ্রবকেই বড় করিয়া তুলিয়া অনুক্ষণ তেওয়ারীর সহিত একযোগে অশান্তির জের টানিয়া চলাও অত্যন্ত দুঃখের, তাই সে কতকটা তাচ্ছিল্যভরে কহিল, তা সে কি চলবে না তুই বলতে চাস? কাঠের ছাদে একটু বেশী শব্দ হয়ই।

তেওয়ারী রাগ করিয়া কহিল, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘোড়ার মত পা ঠোকা কি চলা?

অপূর্ব বলিল, তা হলে হয়ত আবার মদ খেয়েছিল—

তেওয়ারী উত্তর, দিল, তা হবে। মুখ শুঁকে তার দেখিনি। এই বলিয়া সে বিরক্তমুখে রান্নাঘরে চলিয়া গেল, এবং বলিতে বলিতে গেল, তা সে যাই হোক, এ ঘরে বাস করা আর পোষাবে না।

তেওয়ারীর অভিযোগ অন্যায়ও নয়, অপ্রত্যাশিতও নয়; দুর্জনের অসমাপ্ত অত্যাচার যে একটা দিনেই সমাপ্ত হইবে এ ভরসা সে করে নাই, তথাপি অনিশ্চিত আশঙ্কায় মন তাহার অতিশয় বিষণ্ন হইয়া উঠিল। প্রবাসের প্রথম প্রভাতটা তাহার কুয়াশার মধ্যেই আরম্ভ হইয়াছিল, মাঝে কেবল আফিসের সম্পর্কে একটুখানি আলোর আভাস দেখা দিয়াছিল, কিন্তু দিনান্তের কাছাকাছি মেঘাচ্ছন্ন আকাশ আবার তাহার চোখে পড়িল।

ট্রেনের সময় হইতে রামদাস বিদায় গ্রহণ করিল। কি জানি তেওয়ারীর নালিশ ও তাহার মনিবের মুখের চেহারায় সে কিছু অনুমান করিয়াছিল কিনা, যাইবার সময় সহসা প্রশ্ন করিল, বাবুজী, এ বাসায় কি আপনার সুবিধা হচ্ছে না?

অপূর্ব ঈষৎ হাসিয়া কহিল, না। এবং রামদাস জিজ্ঞাসুমুখে চাহিয়া আছে দেখিয়া কহিল, উপরে যাঁরা আছেন আমার সঙ্গে বড় সদয় ব্যবহার করচেন না!

রামদাস বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, ওই মহিলাটি?

হাঁ, ওঁর বাপ ত বটেই। এই বলিয়া অপূর্ব কাল বিকালের ও আজ সকালের ঘটনা বিবৃত করিল। রামদাস কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আমি হলে এর ইতিহাস আর এক রকম হতো। ক্ষমা প্রার্থনা না করে এই দরজা থেকে সে এক পা নীচে নামতে পারত না।

অপূর্ব কহিল। ক্ষমা না চাইলে কি করতেন?

রামদাস কহিল, এই যে বললুম—নামতে দিতাম না।

অপূর্ব কথাটা যে তাহার বিশ্বাস করিল তাহা নয়, তবুও সাহসের কথায় একটু সাহস পাইল। সহাস্যে কহিল, কিন্তু এখন আমরা ত নামি চলুন, আপনার গাড়ীর সময় হয়ে যাচ্ছে। এই বলিয়া সে বন্ধুর হাত ধরিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, আসিবার সময় যেমন, যাইবার সময়েও ঠিক তেমনি সিঁড়ির মুখেই সেই মেয়েটির সহিত দেখা হইল। হাতে তাহার ছোট একটি কাগজের মোড়ক, বোধ করি কিছু কিনিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিতেছে। তাহাকে পথ দিবার জন্য অপূর্ব একধারে সরিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু হঠাৎ হতবুদ্ধি হইয়া দেখিল, রামদাস পথ না ছাড়িয়া একেবারে সেটা সম্পূর্ণ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংরাজি করিয়া কহিল, আমাকে এক মিনিট মাপ করতে হবে, আমি এই বাবুজীর বন্ধু। এঁদের প্রতি অহেতুক দুর্ব্যবহারের জন্য আপনাদের অনুতপ্ত হওয়া উচিত।

মেয়েটি চোখ তুলিয়া ক্রুদ্ধস্বরে কহিল, ইচ্ছা হয় এ-সব কথা আমার বাবাকে বলতে পারেন।

আপনার বাবা বাড়ি আছেন ?

না।

তাহলে অপেক্ষা করবার আমার সময় নেই। আমার হয়ে তাঁকে বলবেন যে তাঁর উপদ্রবে ইনি থাকতে পারচেন না।

মেয়েটি তেমনি তিক্তকণ্ঠে কহিল, তাঁর হয়ে আমিই জবাব দিচ্চি যে ইচ্ছে করলে ইনি চলে যেতে পারেন।

রামদাস একটু হাসিল, কহিল, ভারতবর্ষীয় ক্রীশ্চান 'বুলি'দের আমি চিনি। এর চেয়ে বড় জবাব তাদের মুখে আমি আশা করিনি। কিন্তু তাতে তাঁর সুবিধে হবে না, কারণ, এঁর জায়গায় আমি আসবো। আমার নাম রামদাস তলওয়ারকর,—আমি মারাঠী ব্রাহ্মণ। তলওয়ার শব্দটার একটা অর্থ আছে, আপনার বাবাকে সেটা জেনে নিতে বলবেন। গুড্ ইভনিং। চলুন বাবুজী,—এই বলিয়া সে অপূর্বর হাত ধরিয়া একেবারে রাস্তায় আসিয়া পড়িল।

মেয়েটির মুখের চেহারা অপূর্ব কটাক্ষে দেখিতে পাইয়াছিল, শেষ দিকটায় সে যে কিরূপ কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল মনে করিয়া কিছুক্ষণ পর্যন্ত সে কথা কহিতেই পারিল না, তারপরে আস্তে আস্তে বলিল, এটা কি হল তলওয়ারকর?

তলওয়ারকর উত্তরে কহিল, এই হল যে আপনি উঠে গেলেই আমাকে আসতে হবে। শুধু খবরটা যেন পাই।

অপূর্ব কহিল, অর্থাৎ, দুপুরবেলা আপনার স্ত্রী এখানে একাকী থাকবেন?

রামদাস কহিল, না, একাকী নয়, আমার দু'বছরের একটি মেয়ে আছে।

অর্থাৎ, আপনি পরিহাস করচেন ?

না, আমি সত্যি বলচি। পরিহাস করতে আমি জানিই নে।

অপূর্ব তাহার সঙ্গীর মুখের প্রতি একবার চাহিয়া দেখিল, তারপরে ধীরে ধীরে কহিল, তাহলে এ বাসা আমার ছাড়া চলবে না। তাহার মুখের কথা শেষ না হইতেই রামদাস অকস্মাৎ তাহার দুই হাত নিজের বলিষ্ঠ দুই হাতে ধরিয়া ফেলিয়া প্রচণ্ড একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিয়া উঠিল, এই আমি চাই বাবুজী, এই ত আমি চাই। অত্যাচারের্ ভয়ে আমরা অনেক পালিয়েচি, কিন্তু,— ব্যস!

একটা হাত সে ছাড়িয়া দিল, কিন্তু একটা হাত সে শেষ পর্যন্ত ধরিয়াই রহিল। কেবল ট্রেন ছাড়িলে সেই হাতে আর একবার মস্ত নাড়া দিয়া নিজের দুই হাত এক করিয়া নমস্কার করিল।

সন্ধ্যা হইতে তখনও বিলম্ব ছিল, ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে ট্রেনেরও আর সময় ছিল না বলিয়া স্টেশনের এই দিকের প্লাটফর্মে যাত্রীর ভিড় ছিল না। এইখানে অপূর্ব পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল কাল হইতে আজ পর্যন্ত এই একটা দিনের ব্যবধানে জীবনটা যেন কোথা দিয়া কেমন করিয়া একেবারে বহু বৎসর দীর্ঘ হইয়া গেছে।

খেলাধূলা ও এমনি সব তুচ্ছ কাজের মধ্যে সে কখন যেন ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, অকস্মাৎ যেখানে ঘুম ভাঙ্গিল, সেখানে সমস্ত দুনিয়ার কর্মস্রোত কেবলমাত্র কাজের বেগেই যেন ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। বিশ্রাম নাই, বিরতি নাই, আনন্দ নাই, অবসর নাই,—মানুষে মানুষে সংঘর্ষের মধ্যাহ্ন সূর্য দুই হাতে কেবল মুঠা মুঠা করিয়া অহরহ আগুন ছড়াইয়া চলিয়াছে। এখানে মা নাই, দাদারা নাই, বৌদিদিরা নাই,—স্নেহচ্ছায়া কোথাও নাই,—কর্মশালার অসংখ্য চক্র দক্ষিণে, বামে, মাথার উপরে, পায়ের নীচে, সর্বত্র অন্ধবেগে ঘুরিয়া চলিয়াছে, এতটুকু অসতর্ক হইলে রক্ষা পাইবার কোথাও কোন পথ নাই,—সমস্ত একেবারে নিষ্ঠুরভাবে অবরুদ্ধ। চোখের দুই কোণ জলে ভরিয়া গেল,—অদূরে একটা কাঠের বেঞ্চ ছিল, সে তাহারই উপরে বসিয়া পড়িয়া চোখ মুছিতেছে, হঠাৎ পিছন হইতে একটা প্রবল ধাক্কায় উপুড় হইয়া একেবারে মাটির উপর পড়িয়া গেল। তাড়াতাড়ি

কোনমতে উঠিয়া দাঁড়াইতে দেখিল জন পাঁচ-ছয় ফিরিঙ্গী ছোঁড়া,—কাহারও মুখে সিগারেট, কাহারও মুখে পাইপ,—দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে। সম্ভবতঃ, যে ধাক্কা মারিয়াছিল সে বেঞ্চের গায়ে একটা লেখা দেখাইয়া কহিল, শালা, ইহ্ সাহেব লোগ্‌কাবাস্তে তুম্হারা নেহি—

লজ্জায়, ক্রোধে ও অপমানে অপূর্বর সজল চক্ষু আরক্ত হইয়া উঠিল, ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল, সে প্রত্যুত্তরে কি যে বলিল, বুঝা গেল না। তাহার অবস্থা দেখিয়া ফিরিঙ্গীর দল অত্যন্ত আমোদ অনুভব করিল, একজন কহিল, শালা দুধবালা, আভ্‌ভি গরম করতা—ফাটকমে জায়েগা ? সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল,—একজন তাহার মুখের সামনে একটা অশ্লীল ভঙ্গী শিষ করিয়া দিল।

অপূর্বর হিতাহিতজ্ঞান প্রায় লোপ পাইয়া আসিতেছিল, হয়ত মুহূর্ত পরে সে ইহাদের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িত, কিন্তু কতকগুলি হিন্দুস্থানী কর্মচারী অনতিদূরে বসিয়া বাতি পরিষ্কার করিতেছিল, তাহারা মাঝখানে পড়িয়া তাহাকে টানিয়া প্লাটফর্মের বাহির করিয়া দিল, একটা ফিরিঙ্গী ছোঁড়া ছুটিয়া আসিয়া ভিড়ের মধ্যে পা গলাইয়া অপূর্বর সাদা পিরাণের উপর বুটের পদচিহ্ন আঁকিয়া দিল। এই হিন্দুস্থানী দলের হাত হইতে মুক্তি লাভের জন্য সে টানাটানি করিতেছিল, একজন তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিল, আরে বাঙালী বাবু, সাহেব লোককা বদন্ ছুয়েগা ত ইঁহা এক বরস্ জেল খাটেগা—যাও—ভাগো—একজন কহিল, আরে বাবু হ্যায়, —ধাক্কা মাৎ দেও—এই বলিয়া সে তারের গেটটা টানিয়া বন্ধ করিয়া দিল। বাহিরে তাহাকে ঘিরিয়া ভিড় জমিবার উপক্রম করিতেছিল, যাহারা দেখিতে পায় নাই তাহারা কারণ জিজ্ঞাসা করিল, যাহারা দেখিয়াছে, তাহারা নানারূপ মন্তব্য প্রকাশ করিল, একজন হিন্দুস্থানী চানা-ভাজা বিক্রি করে, সে কলিকাতায় থাকিয়া বাংলা শিখিয়াছিল, সেই ভাষায় বুঝাইয়া দিল যে, এদেশে চট্টগ্রামের অনেক লোক দুধের ব্যবসা করে, তাহারা পিরাণ গায়ে দেয়, জুতা পরে,— অপূর্ব আফিসের পোশাক ছাড়িয়া সাধারণ

বাঙালীর পোশাকে স্টেশনে আসিয়াছিল, সুতরাং, সাহেবেরা সেই দুধবালা মনে করিয়া মারিয়াছে, কেরানীবাবু বলিয়া চিনিতে পারে নাই। তাহার কৈফিয়ত, সঙ্গ ও সহানুভূতির দায় এড়াইয়া অপূর্ব স্টেশনে খোঁজ করিয়া সোজা স্টেশন মাস্টারের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

তিনিও সাহেব,—কাজ করিতেছিলেন, মুখ তুলিয়া চাহিলেন। অপূর্ব জুতার দাগ দেখাইয়া ঘটনা বিবৃত করিল। তিনি বিরক্ত ও অবজ্ঞা ভরে মিনিট-খানেক শুনিয়া কহিলেন, ইউরোপীয়ানদের বেঞ্চে তুমি বসিতে গেলে কেন?

অপূর্ব উত্তেজনায় সহিত কহিল, আমি জানতাম না—

তোমার জানা উচিত ছিল।

কিন্তু তাই বলে খামকা ভদ্রলোকের গায়ে হাত দেবে?

সাহেব দ্বারের দিকে হাত বাড়াইয়া কহিলেন—গো—গো—গো—চাপ্রাশি ইস্কো বহর্ কর্ দেও—বলিয়া কাজে মন দিলেন।

তাহার পরে অপূর্ব কি করিয়া যে বাসায় ফিরিয়া আসিল সে ঠিক জানে না! ঘণ্টা-দুই পূর্বে রামদাসের সহিত এই পথে একত্রে আসিবার কালে সবচেয়ে যে দুর্ভাবনা তাহার মনে বেশী বাজিতেছিল সে তাহার অকারণ মধ্যস্থতা। একে ত উৎপাত ও অশান্তির মাত্রা তাহাতে কমিবে না, বরঞ্চ বাড়িবে, তা ছাড়া, সে ক্রীশ্চান মেয়েটির যত অপরাধই কেন না থাক কেবলমাত্র মেয়েমানুষ বলিয়াই ত পুরুষের মুখ হইতে ওরূপ কঠিন কথা বাহির হওয়া সঙ্গত হয় নাই,—তাহাতে আবার সে তখন একাকী ছিল। তাহার শিক্ষিত, ভদ্র অন্তঃকরণ রামদাসের কথায় ক্ষুণ্ণই হইয়াছিল,—কিন্তু এখন ফিরিবার পথে তাহার সে ক্ষোভ কোথায় যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল তাহার ঠিকানা ছিল না। তাহাকে মনে যখন হইল, তখন মেয়েমানুষ বলিয়া আর মনে হইল না, —মনে হইল ক্রীশ্চানের মেয়ে, সাহেবের মেয়ে বলিয়া,—যে ছোঁড়াগুলো তাহাকে এইমাত্র অকারণে অপমানের একশেষ করিয়াছে—যাহাদের কুশিক্ষা, ইতরতা ও বর্বরতার অবধি নাই—তাহাদেরই

ভগিনী বলিয়া,—যে সাহেবটা একান্ত অবিচারে তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিল—মানুষের সামান্য অধিকারটুকুও দিল না—তাহারই পরম আত্মীয়া বলিয়া।

তেওয়ারী আসিয়া কহিল, ছোটবাবু আপনার খাবার তৈরি হয়েছে। অপূর্ব কহিল, যাই—

মিনিট দশ-পনেরো পরে সে পুনরায় আসিয়া জানাইল, খাবার যে সব জুড়িয়ে গেল বাবু—

অপূর্ব রাগ করিয়া বলিল, কেন বিরক্ত করিস তেওয়ারী, আমি খাব না, —আমার ক্ষিদে নেই।

চোখে তাহার ঘুম আসিল না। রাত্রি যত বাড়িতে লাগিল, সমস্ত বিছানাটা যেন তাহার কাছে শয্যাকণ্টক হইয়া উঠিল। একটা মর্মান্তিক কণ্টক-বেদনা তাহার সকল অঙ্গে ফুটিতে লাগিল, এবং তাহারই মাঝে মাঝে মনে পড়িতে লাগিল স্টেশনের সেই হিন্দুস্থানী লোকগুলোকে, যাহারা সদলবলে উপস্থিত থাকিয়া তাহার লাঞ্ছনার কোন অংশ লয় নাই, বরঞ্চ, তাহার অপমানের মাত্রা বাড়াইয়া তুলিতেই সাহায্য করিয়াছে। দেশের লোকের বিরুদ্ধে দেশের শোকের এতবড় লজ্জা, এতবড় গ্লানি জগতের আর কোন্ দেশে আছে? কেন এমন হইল? কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হইল?

চার

দুই-তিনদিন নিরুপদ্রবে কাটিয়া গেল, উপরতলা হইতে সাহেবের অত্যাচার আর যখন নব-নবরূপে প্রকাশিত হইল না, তখন অপূর্ব বুঝিল ক্রীশ্চান মেয়েটা সেদিনের কথা তাহার পিতাকে জানায় নাই। এবং তাহার সেই ফলমূল দিতে আসার ঘটনার সঙ্গে মিলাইয়া এই না-বলার ব্যাপারটা শুধু সম্ভব নয়, সত্য বলিয়াই মনে হইল। অনেক প্রকার কালো ফরসা সাহেবের দল উপরে যায় আসে, মেয়েটির সহিতও বার-দুই সিঁড়ির পথে সাক্ষাৎ হইয়াছে, সে মুখ ফিরাইয়া নামিয়া যায়, কিন্তু সেই দুঃশাসন গৃহকর্তার সহিত একদিনও মুখোমুখি ঘটে নাই। কেবল, সে যে ঘরে আছে সেটা বুঝা যায় তাহার ভারী বুটের শব্দে। সেদিন সকালে ছোটবাবুকে ভাত বাড়িয়া দিয়া তেওয়ারী হাসিমুখে কহিল, সাহেব দেখছি নালিশ ফরিদ আর কিছু করলে না।

অপূর্ব কহিল, না। যতটা গর্জায় ততটা বর্ষায় না।

তেওয়ারী বলিল, আমাদেরও কিন্তু বেশী দিন এ বাসায় থাকা চলবে না। ব্যাটা মাতাল হলেই আবার কোন্ দিন ফ্যাসাদ বাধাবে।

অপূর্ব কহিল, নাঃ—সে ভয় বড় নেই।

তেওয়ারী কহিল, তা হোক, তবু মাথার ওপরে মেলেচ্ছ ক্রীশ্চান,—যা সব খায়-দায়, মনে হলেই—

আঃ তুই থাম্ তেওয়ারী। সে নিজে তখন খাইতেছিল, ক্রীশ্চানের খাদ্যদ্রব্যের ইঙ্গিতে তাহার সর্বাঙ্গে যেন কাঁটা দিয়া উঠিল। কহিল, এ মাসটা গেলে উঠে ত যেতেই হবে। কিন্তু একটা ভাল বাসাও ত খুঁজে পাওয়া চাই!

এ সময়ে ও উল্লেখ ভাল হয় নাই, তেওয়ারী মনে মনে লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া রহিল।

সেই দিন বৈকালে আফিস হইতে ফিরিয়া অপূর্ব তেওয়ারীর প্রতি চাহিয়া অবাক হইয়া গেল। সে যেন এই একটা বেলার মধ্যে শুকাইয়া অর্ধেক হইয়া গেছে।

কি রে তেওয়ারী?

প্রত্যুত্তরে সে আলপিনে গাঁথা কয়েক খণ্ড ছাপানো হলদে রঙের কাগজ অপূর্বর হাতে দিল। ফৌজদারী আদালতের সমন, বাদী জে. ডি. জোসেফ, প্রতিবাদী তিন নম্বর ঘরের অপূর্ব বাঙালী ও তাহার চাকর। ধারা একটা নয়, গোটা-চারেক। দুপুরবেলা কোর্টের পিয়াদা জারি করিয়া গেছে, এবং কাল সকালে আর একটা জারি করিতে আসিবে। সঙ্গে সেই সাহেব ব্যাটা। হাজির হইবার দিন পরশু। অপূর্ব নিঃশব্দে কাগজগুলা আদ্যোপান্ত পড়িয়া ফিরাইয়া দিয়া কহিল, তা আর হবে কি। কোর্টে হাজির হলেই হবে।

তেওয়ারী কাঁদ-কাঁদ গলায় কহিল, কখনও যে কাঠগড়ায় উঠিনি বাবু।

অপূর্ব বিরক্ত হইয়া বলিল, আমি কি উঠেছি নাকি? সবতাতেই কাঁদবি ত বিদেশে আসতে গেলি কেন?

আমি যে কিছু জানিনে ছোটবাবু!

জানিস নে ত লাঠি নিয়ে বেরুতে গেলি কেন? ঘরের মধ্যে চুপ করে বসে থাকলেই ত হতো! এই বলিয়া অপূর্ব কাপড় ছাড়িতে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। পরদিন তাহার নিজের পরওয়ানা আসিয়া পৌঁছিল, এবং তাহার পরদিন তেওয়ারীকে সঙ্গে লইয়া যথাসময়ে আদালতে উপস্থিত হইল। নালিশ মকদ্দমার কোন অভিজ্ঞতাই তাহার ছিল না; বিদেশ, কোন লোকের সহিত আলাপ-পরিচয় নাই, কাহার সাহায্য লইতে হয়, কি করিয়া তদবির করিতে হয় কিছুই জানে না, তবুও কোন ভয়ই হইল না। হঠাৎ কি করিয়া যে তাহার মন এমন শক্ত হইয়া গেল সে নিজেই ভাবিয়া পাইল না। এ বিষয়ে রামদাসকে কোন কথা বলিতে,

কোন সাহায্য চাহিতে তাহার লজ্জা বোধ হইল। শুধু কাজের অজুহাতে সাহেবের কাছে সে একটা দিনের ছুটি লইয়া আসিয়াছিল।

যথাসময়ে ডাক পড়িল। ডেপুটী কমিশনর নিজের ফাইলেই মকদ্দমা রাখিয়াছিলেন। বাদী জোসেফ সাহেব সত্য-মিথ্যা যা খুশি এজাহার দিয়া গেল, প্রতিবাদীর উকিল ছিল না, অপূর্ব নিজের জবাবে একটি কথাও গোপন করিল না, একটা কথাও বাড়াইয়া বলিল না। বাদীর সাক্ষী তার মেয়ে, আদালতের মাঝখানে এই মেয়েটির নাম এবং তাঁহার বিবরণ শুনিয়া অপূর্ব স্তব্ধ হইয়া রহিল। ইনি কোন এক স্বর্গীয় রাজকুমার ভট্টাচার্যের কন্যা, বাটী পূর্বে ছিল বরিশাল, এখন বাঙ্গালোর। নিজের নাম মেরি-ভারতী; ভট্টাচার্য মহাশয় নিজেই স্বেচ্ছায় অন্ধকার হইতে আলোকে আসেন। তাঁহার স্বর্গীয় হওয়ার পরে মা কোন এক মিশনরি-দূহিতার দাসী হইয়া বাঙ্গালোরে আসেন, সেখানে জোসেফ সাহেবের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। ভারতী পৈত্রিক ভট্টাচার্য নামটা কদর্য বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া জোসেফ নাম গ্রহণ করিয়াছে, সেই অবধি সে মিস মেরি-ভারতী জোসেফ নামে পরিচিত। হাকিমের প্রশ্নে সে ফলমূল উপহার দিতে যাওয়া অস্বীকার করিল, কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বর হইতে মুখের চেহারায় মিথ্যা বলার বিড়ম্বনা এমনি ফুটিয়া উঠিল যে, শুধু হাকিম নয়, তাঁহার পিয়াদাটার চক্ষুকে পর্যন্ত তাহা ফাঁকি দিতে পারিল না। কোন পক্ষেই উকিল ছিল না, সুতরাং জেরার প্যাঁচে প্যাঁচে পাক খাইয়া তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র বস্তু সুবৃহৎ হইয়া উঠিবার অবকাশ পাইল না। বিচার একদিনেই শেষ হইল, তেওয়ারী রেহাই পাইল, কিন্তু বিচারক অপূর্বর কুড়ি টাকা অর্থদণ্ড করিলেন। জীবনের এই প্রভাতকালে রাজদ্বারে বিনা অপরাধে দণ্ডিত হইয়া তাহার মুখ মলিন হইয়া গেল। টাকা-কয়টি গণিয়া দিয়া সে বাহির হইতেছে, দেখিল, দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রামদাস। অপূর্বর মুখ দিয়া প্রথমেই কুড়ি টাকা ফাইন হল রামদাস, কি করা যাবে? আপিল??বাহির হইয়া গেল,

আবেগ ও উত্তেজনায় তাহার কণ্ঠস্বরের শেষ দিকটা হঠাৎ যেন কাঁপিয়া উঠিল। রামদাস তাহার ডান হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া হাসিয়া কহিল, অর্থাৎ কুড়ি টাকার বদলে দু হাজার টাকা আপনি লোকসান করতে চান?

তা হোক, কিন্তু এ যে ফাইন! শাস্তি! রাজদণ্ড!

রামদাস হাসিয়া কহিল, কিসের দণ্ড? যে মিথ্যে মামলা আনলে, মিথ্যে সাক্ষী দেওয়ালে, আর যে তাকে প্রশ্রয় দিলে তাদের দণ্ড ত? কিন্তু এর উপরেও একটা আদালত আছে, যার বিচারক ভুল করেন না, সেখানে আপনি বেকসুর খালাস পেয়েছেন বলে দিচ্চি।

অপূর্ব বলিল কিন্তু লোকে ত বুঝবে না রামদাস। তাদের কাছে এ দুর্নাম যে আমার চিরকালের সঙ্গী হয়ে রইল।

রামদাস সস্নেহে তাহার হাতের উপর একটা চাপ দিয়া বলিল, চলুন, আমরা নদীর ধারে একটু বেড়িয়ে আসি গে।

পথে চলিতে চলিতে কহিল, অপূর্ববাবু, আমি আফিসের কাজে আপনার ছোট হলেও বয়সে বড়।

যদি দুটো কথা বলি কিছু মনে করবেন না। অপূর্ব চুপ করিয়া রহিল। রামদাস বলিতে লাগিল, এ মকদ্দমার কথা আমি আগেই জানতাম, কি হবে তাতেও আমার সন্দেহ ছিল না। লোকের কথা আপনি বলছিলেন, যে লোক, সে জানবে হালদারের সঙ্গে জোসেফের মামলা বাধলে ইংরাজের আদালতে কি হয়! আর কুড়ি টাকার জরিমানার দুর্নাম—

কিন্তু বিনা দোষে যে রামদাস?

রামদাস কহিল, হাঁ হাঁ, বিনা দোষেই বটে। এমনি বিনা দোষেই আমি দু বৎসর জেল খেটেচি।

জেল খেটেচ? দু' বৎসর?

হাঁ, দু বৎসর, এবং, এই বলিয়া সে পুনশ্চ একটু হাসিয়া অপূর্বর হাতখানা তাহার পিঠের নীচে টানিয়া লইয়া কহিল, এই জামাটা যদি সরাতে পারতাম ত দেখতে পেতেন এখানে বেতের দাগে দাগে আর জায়গা নেই।

বেত খেয়েচ রামদাস?

রামদাস সহাস্যে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ, এবং এমনই বিনা দোষে। তবু এত নির্লজ্জ আমি যে আজও লোকের কাছে মুখ দেখাচ্চি। আর আপনি কুড়ি টাকার আঘাত সইতে পারবেন না বাবুজী?

অপূর্ব তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। যে ল্যাম্পপোস্ট আশ্রয় করিয়া তাহারা দাঁড়াইয়াছিল তাহাতে আলো জ্বালিতে আসিল। সন্ধ্যা হইয়াছে দেখিয়া রামদাস চকিত হইয়া কহিল, আর না, চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আমি বাড়ি যাই।

অপূর্ব আবেগের সহিত বলিল, এখনি চলে যাবেন? অনেক কথা যে আমার জানবার রইল বাবুজী?

রামদাস হাসিমুখে কহিল, সব আজই জেনে নেবেন? সে হবে না। হয়ত অনেক দিন ধরে আমাকে বলতে হবে। এই অনেকদিন কথাটার উপর সে এমনি কি একটা জোর দিল যে অপূর্ব সবিস্ময়ে তাহার মুখের প্রতি না চাহিয়া পারিল না। কিন্তু সেই সহাস্য প্রশান্ত মুখে কোন রহস্যই প্রকাশ পাইল না। রামদাস গলির ভিতরে আর প্রবেশ করিল না, বড় রাস্তা হইতেই বিদায় লইয়া সোজা স্টেশনের দিকে চলিয়া গেল।

অপূর্ব তাহার বাসার দরজায় আসিয়া রুদ্ধদ্বারে ঘা দিতেই তেওয়ারী প্রভুর সাড়া পাইয়া দ্বার খুলিয়া দিল। সে পূর্বাহ্নে আসিয়া গৃহকর্মে রত হইয়াছিল, মুখ তাহার যেমন গম্ভীর তেমনি বিষণ্ণ। কহিল, তখন তাড়াতাড়িতে দু'খানা নোট ফেলে গিয়েছিলেন।

অপূর্ব আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় ফেলে গিয়েছিলাম রে?

এই যে এখানে, বলিয়া সে পা দিয়া দ্বারের কাছে মেঝের উপর একটা জায়গা নির্দেশ করিয়া দেখাইল। কহিল, আপনার বালিশের তলায় রেখে দিয়েছি। পকেট থেকে বাইরে পড়ে যায়নি এই ভাগ্যি।

কি করিয়া যে পড়িয়া গিয়াছিল এই কথা ভাবিতে ভাবিতে অপূর্ব ঘরে চলিয়া গেল।

পাঁচ

রাত্রে আহারাদির পরে তেওয়ারী করজোড়ে সাশ্রুনয়নে কহিল, আর না ছোটবাবু, এইবার বুড়োমানুষের কথাটা রাখুন। চলুন, কাল সকালেই আমরা যেখানে হোক চলে যাই।

অপূর্ব কহিল, কাল সকালেই, কোথায় শুনি? তুই কি ধর্মশালায় গিয়ে থাকতে বলিস নাকি?

তেওয়ারী বলিল, এর চেয়ে সেও ভাল। মকদ্দমা জিতেছে, এইবার কোন্ দিন ঘরে ঢুকে আমাদের দুজনকে মেরে যাবে।

অপূর্ব আর সহিতে পারিল না, রাগ করিয়া কহিল, তোকে কি আমার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতেই মা সঙ্গে দিয়েছিলেন? তোকে আর আমার দরকার নেই, কাল জাহাজ আছে তুই বাড়ি চলে যা, আমার কপালে যা আছে তা হবে।

তেওয়ারী আর তর্ক করিল না, আস্তে আস্তে শুইতে চলিয়া গেল। তাহার কথাগুলা অপূর্বকে অপমানের একশেষ করিল বলিয়াই সে এরূপ কঠোর জবাব দিল, না হইলে সে যে বিশেষ অসঙ্গত কিছু কহে নাই অপূর্ব মনে মনে তাহা অস্বীকার করিতে পারিল না। যাহা হউক, পরদিন সকাল হইতেই একটা নূতন বাসার খোঁজ চলিতে লাগিল, এবং শুধু তলওয়ারকর ছাড়া আফিসের প্রায় সকলকেই সে এই মর্মে অনুরোধ করিয়া রাখিল। অতঃপর তেওয়ারীও অনুযোগ করিল না, অপূর্বও মনের কথা প্রকাশ করিল না, কিন্তু প্রভু ও ভৃত্য উভয়েরই একপ্রকার সশঙ্কিতভাবেই দিন কাটিতে লাগিল। আফিস হইতে ফিরিবার পথে অপূর্ব প্রত্যহই ভয় করিত, আজ না জানি কি গিয়া শুনিতে হয়! কিন্তু কোনদিন কিছুই শুনিতে হইল না। মকদ্দমাবিজয়ী জোসেফ পরিবারের নানাবিধ ও বিচিত্র উপদ্রব নব নব রূপে নিত্য প্রকাশ পাইবে ইহাই স্বাভাবিক, কিন্তু উৎপাত ত

দূরের কথা, উপরে কেহ আছে কি না অনেক সময়ে তাহাই সন্দেহ হইতে লাগিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে কেহই কাহাকে কোন কথা কহিত না। নিরুপদ্রবেই দিন কাটিতেছিল—এই ভাল। সপ্তাহ-খানেক পরে একদিন আফিস হইতে ফিরিবার পথে তেওয়ারী প্রফুল্লমুখে মনের আনন্দ যথাসাধ্য সংযত করিয়া কহিল, আর শুনেছেন ছোটবাবু?

অপূর্ব কহিল, কি?

সাহেব যে ঠ্যাঙ ভেঙ্গে একবারে হাসপাতালে। বাঁচে কি না বাঁচে! আজ ছ'দিন হল—ঠিক তার পরের দিনই!

অপূর্ব বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করিল,—তুই কি করে জানলি?

তেওয়ারী বলিল, বাড়িয়ালার সরকার আমাদের জেলার লোক কিনা, তার সঙ্গে আজ পরিচয় হল। ভাড়া আদায় করতে এসেছিল। কে বা ভাড়া দেবে,—মদ খেয়ে মারামারি করে জেটি থেকে নীচে পড়ে সাহেব ত হাসপাতালে শুয়ে আছেন।

তা' হবে, বলিয়া অপূর্ব কাপড় ছাড়িতে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। কলিকাতা ত্যাগ করার পরে এই প্রথম তেওয়ারী মন সত্যকার প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহার একান্ত অভিলাষ ছিল এই লইয়া সে আজ বেশ একটুখানি আলোচনা করে, কিন্তু মনিব তাহাতে উৎসাহ দিলেন না। নাই দিন, তবুও সে বাহির হইতে নানা উপায়ে শুনাইয়া দিল যে এরূপ একদিন ঘটিবেই তাহা সে জানিত। তেওয়ারী সন্ধ্যা-আহ্নিক শিখিতে পারেন নাই, কিন্তু গায়ত্রীটা তাহার মুখস্থ হইয়াছিল, সেই গায়ত্রী সে জরিমানার দিন হইতে সকাল-সন্ধ্যা একশত আট করিয়া দুইশত যোল বার প্রত্যহ জপ করিয়াছে। সাহেবের পা-ভাঙ্গার যথাহেতু কি, ছেলেমানুষ মনিব তাহা অনুধাবন করিল কিনা সন্দেহ, কিন্তু এই মন্ত্রের অসাধারণ শক্তির প্রতি তেওয়ারীর বিশ্বাস সহস্রগুণে বাড়িয়া গেল। ম্লেচ্ছ

হইয়া ব্রাহ্মণের মাথার উপরে যে ঘোড়ার মত পা ঠুকিয়াছে, পা তাহার ভাঙ্গিবে না ত কি!

পরদিন সকালে তাহার আফিসের আরদালির কাছে খবর পাইয়া অপূর্ব তেওয়ারীকে ডাকিয়া কহিল, একটা বাসার সন্ধান পাওয়া গেছে তেওয়ারী, গিয়ে দেখে আয় দেখি পোষাবে কিনা।

তেওয়ারী একটু হাসিয়া কহিল, আর বোধ হয় দরকার হবে না বাবু, সে-সব আমি ঠিক করে নিয়েছি। আসছে পয়লা তারিখে যারা যাবার তারাই যাবে। বাসা বদলানো ত সোজা ঝঞ্ঝাট নয় ছোটবাবু!

ঝঞ্ঝাট যে সোজা নয় অপূর্ব নিজেও তাহা জানিত, কিন্তু সাহেবের অবর্তমানে যে উৎপাত বন্ধ হইয়াছে, তাঁহার প্রত্যাগমনের পরেও যে তাহা বজায় থাকিবে এ ভরসা তাহার ছিল না। বাসা তাহাকে বদল করিতেই হইবে, কিন্তু আফিসে যাইবার পূর্বে তেওয়ারী যখন ছুটি চাহিয়া জানাইল যে আজ দুপুরবেলা সে বর্মাদের ফয়ার মন্দিরে তামাশা দেখিতে যাইবে, তখন অপূর্ব না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। সকৌতুকে প্রশ্ন করিল, তোর যে আবার তামাশা দেখতে শখ হ'ল তেওয়ারী?

তেওয়ারী কহিল, বিদেশের যা-কিছু সব দেখা ভাল ছোটবাবু।

অপূর্ব বলিল, তা বটে। খোঁড়া সাহেব হাসপাতালে, এখন আর রাস্তায় বেরোতে ভয় নেই। তা যাস, কিন্তু একটু সকাল সকাল ফিরে আসিস। কেউ সঙ্গে থাকবে ত?

তাহার স্বদেশবাসী যে লোকটির সহিত কাল তেওয়ারীর আলাপ হইয়াছে সেই আসিয়া আজ তাহাকে তামাশা দেখাইয়া আনিবে স্থির হইয়াছিল। সাহেবের দুর্ঘটনার সংবাদে এতই সে খুশী হইয়াছিল যে তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইতে তাহার মুহূর্ত বিলম্ব ঘটে নাই।

তাহাকে বাহিরে যাইবার হুকুম দিয়া অপূর্ব যথাসময়ে আফিসে চলিয়া গেল, এবং ইহার ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই তেওয়ারীর দেশের লোক আসিয়া তাহাকে বর্মা তামাশা দেখাইয়া আনিতে সঙ্গে লইয়া গেল। তালার একটা চাবি অপূর্বর নিজের কাছেই থাকিত, সুতরাং ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব ঘটিলেও ছোটবাবুর যে বিশেষ অসুবিধা হইবে না তেওয়ারীর তাহা জানা ছিল। নিষ্কণ্টক হইয়া আজ আর তাহার স্ফূর্তির অবধি ছিল না।

অপরাহ্নবেলায় ঘরে ফিরিয়া অপূর্ব দেখিল দরজায় তালা বন্ধ, তেওয়ারী তখন পর্যন্ত তামাশা দেখিয়া ফিরে নাই। পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া খুলিতে গিয়া দেখিল চাবি লাগে না, এ কোন্ এক অপরিচিত তালা, এ ত তাহাদের নয়! তেওয়ারী এ কোথায় পাইল, কেনই বা সে তাহাদের পুরাতন ভালো তালার বদলে এই একটা নূতন তালা দিতে গেল, ইহার চাবিই বা কোথায়, কেমন করিয়াই বা সে ঘরে ঢুকিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না।

বোধ হয় মিনিট-দুই সে এইভাবে দাঁড়াইয়া ছিল, ত্রিতলের দ্বার খুলিয়া সেই ক্রীশ্চান মেয়েটি মুখ বাহির করিয়া কহিল, দাঁড়ান, আমি খুলে দিচ্চি, এই বলিয়া সে নীচে নামিয়া আসিয়া অসঙ্কোচে অপূর্বর পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে সে বিস্ময়ে ও লজ্জায় যেন একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তেওয়ারী নাই, কি তার হইল, এবং কি জন্য কেমন করিয়া ঘরের চাবি সাহেবের মেয়ের হাতে গিয়া পড়িল তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। স্বল্প আলোকিত এই সংকীর্ণ সিঁড়িটায় দুজনের দাঁড়াইবার মত যথেষ্ট স্থান ছিল না, অপূর্ব এক ধাপ নীচে নামিয়া আর এক দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল। অনাত্মীয় যুবতী রমণীর সহিত নির্জনে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া কথা কহা তাহার অভ্যাসই ছিল না, তাই মেয়েটি যখন তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, মা বলছিলেন চাবি বন্ধ করে আমি ভাল কাজ করিনি, হয়ত বিপদে পড়তেও পারি, তখন অপূর্বর মুখ দিয়া সহসা কোন উত্তরই বাহির হইল না। ভারতী কবাট খুলিয়া ফেলিয়া কহিল, আমার মা ভয়ানক ভীতু মানুষ, তিনি

আমাকে তখন থেকে বকছেন যে আপনি বিশ্বাস না করলে আমাকেও চুরির দায়ে জেল খাটতে হবে। আমার কিন্তু সে ভয় একটুও নেই।

অপূর্ব বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে?

ভারতী কহিল, ঘরে গিয়ে দেখুন না কি হয়েছে। এই বলিয়া সে পথ ছাড়িয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। অপূর্ব ঘরে ঢুকিয়া যাহা দেখিল তাহাতে দুই চক্ষু তাহার কপালে উঠিল। তোরঙ্গ-দুটার ডালা ভাঙ্গা, বই, কাগজ, বিছানা, বালিশ, কাপড়-চোপড় সমস্ত মেঝের উপর ছড়ানো, তাহার মুখ দিয়া কেবল বাহির হইল, কি করে এমন হ'ল? কে করলে?

ভারতী একটু হাসিয়া কহিল, আর যেই করুক, কিন্তু আমি নয়, তা শত্রু হলেও আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে। এই বলিয়া সে ঘটনাটা যাহা বিবৃত করিল তাহা এই—দুপুরবেলা তাহার সদ্য পরিচিত দেশওয়ালী বন্ধুর সহিত তেওয়ারী যখন তামাশা দেখিতে বাহির হইয়া যায়, ভারতীর মা বারান্দায় বসিয়া তাহাদের দেখিতে পান। অল্পক্ষণ পরেই নীচের ঘর হইতে একপ্রকার সন্দেহজনক শব্দ শুনিতে পাইয়া ভারতীকে দেখিতে বলেন। তাহাদের মেঝের একধারে একটা ফুটা আছে, চোখ পাতিয়া দেখিলে অপূর্বর ঘরের সমস্তই দেখা যায়। সেই ফুটা দিয়া দেখিয়াই সে চীৎকার করিতে থাকে। যাহারা বাক্স ভাঙ্গিতেছিল তাহারা সবেগে পলায়ন করে, তখন নীচে নামিয়া সে দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া পাহারা দিতে থাকে পুনরায় না তাহারা ফিরিয়া আসে। এখন অপূর্বকে দেখিতে পাইয়া সে ঘর খুলিয়া দিতে আসিয়াছে।

বিবর্ণ, পাংশুমুখে অপূর্ব তাহার খাটের উপর ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। ভারতী দরজা হইতে মুখ বাড়াইয়া কহিল, এ ঘরে আপনার কোন খাবার জিনিস আছে কি? আমি ঘরে এসে একবার দেখতে পারি?

অপূর্ব ঘাড় নাড়িয়া শুধু কহিল, আসুন।

সে ঘরে আসিলে তাহার মুখপানে চাহিয়া অপূর্ব বিমূঢ়ের মত প্রশ্ন করিল, এখন কি করা যায়?

ভারতী কহিল, করা ত অনেক কিছু যায়, কিন্তু সকলের আগে দেখতে হবে কি কি চুরি গেছে।

অপূর্ব বলিল, বেশ ত, তাই দেখুন না কি-কি চুরি গেল।

ভারতী হাসিল, কহিল, আসবার সময় আপনার তোরঙ্গ গুছিয়েও আমি দিইনি, চুরিও করিনি, —সুতরাং, কি ছিল আর কি নেই আমি জানব কি করে?

অপূর্ব লজ্জা পাইয়া কহিল, সে ত ঠিক কথা। তাহলে তেওয়ারী আসুক, সে হয়ত সমস্ত জানে। এই বলিয়া সে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জিনিসগুলার প্রতি করুণচক্ষে চাহিল।

তাহার নিরুপায়ের মত মুখের চেহারায় ভারতী আমোদ বোধ করিল। হাসিমুখে কহিল, সে জানতে পারে আর আপনি পারেন না? আচ্ছা, কি করে জানতে হয় আপনাকে আমি শিখিয়ে দিচ্চি। এই বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া সুমুখের ভাঙ্গা তোরঙ্গটা হাতের কাছে টানিয়া লইয়া কহিল, আচ্ছা, জামা-কাপড়গুলো আগে সব গুছিয়ে তুলি। এ-সব নিয়ে যাবার বোধ হয় তারা সময় পায়নি। এই বলিয়া সে এলোমেলো ধুতি, চাদর, পিরান, কোট প্রভৃতি একটির পর একটি ভাঁজ করিয়া সাজাইয়া তুলিতে লাগিল। তাহার শিক্ষিত হস্তের নিপুণতা কয়েক মুহূর্তেই অপূর্বর চোখে পড়িল। এটা কি? মুর্শিদাবাদ সিল্কের সুট বুঝি? এরকম ক' জোড়া আছে বলুন ত?

অপূর্ব কহিল, দু'জোড়া।

ঠিক মিলেছে। এই এখানে আর এক জোড়া, এই বলিয়া সে সুট দু'টি সাজাইয়া বাক্সে তুলিল। ঢাকাই ধুতি—একটা, দুটো, তিনটে;—চাদর—এক, দুই, তিন,—ঠিক মিলেছে। বোধ হয় তিন-জোড়াই ছিল, না?

অপূর্ব কহিল, হাঁ, আমার মনে আছে, তিন জোড়াই বটে।

এটা কি, আলপাকার কোট? কৈ ওয়েস্ট কোট, প্যান্ট দেখছি না যে? ও—না, এ যে গলা বন্ধ দেখছি। এর সুট ছিল না, না?

অপূর্ব বলিল, না, ওটা আলাদাই বটে। ওর সুট ছিল না।

তাহাদের গুছাইয়া তুলিয়া ভারতী আর একটা হাতে তুলিয়া কহিল, এটা দেখছি ফ্লানেল সুট,—আপনি সেখানে টেনিস খেলতেন বুঝি? তা হলে একটা, দুটো, তিনটে, ওই আলনায় একটা, আপনার গায়ে একটা,—সুট তা হলে পাঁচ-জোড়া, না?

অপূর্ব খুশী হইয়া কহিল, ঠিক তাই। পাঁচ-জোড়াই বটে।

কাপড়ের ভাঁজের মধ্যে উজ্জ্বল কি একটা পদার্থ চোখে পড়িতে টানিয়া বাহির করিয়া কহিল, এ যে সোনার চেন, ঘড়ি গেল কোথায়?

অপূর্ব খুশী হইয়া বলিল, যাক বাঁচা গেছে—চেনটা তারা দেখতে পায়নি। এটি আমার পিতৃদত্ত, তাঁরই স্মৃতিচিহ্ন—

কিন্তু ঘড়িটা?

এই যে, বলিয়া অপূর্ব তাহার কোটের পকেট হইতে সোনার ঘড়ি বাহির করিয়া দেখাইল।

ভারতী কহিল, চেন, ঘড়ি পাওয়া গেল, বলুন ত আংটি আপনার কটা? হাতে ত একটিও নেই দেখছি।

অপূর্ব বলিল, হাতেও নেই, বাক্সেও ছিল না। আংটিই আমার কখনো হয়নি।

তা ভাল। সোনার বোতাম? সে বোধ হয় আপনার গায়ে সার্টে লাগানো আছে?

অপূর্ব ব্যস্ত হইয়া বলিল, কৈ না। সে যে একটা গরদের পাঞ্জাবীর সঙ্গে তোরঙ্গের মধ্যে সুমুখেই ছিল।

ভারতী আলনার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিল, যে-সকল বস্ত্র তখনও তোলা হয় নাই, একপাশে ছিল, তাহার মধ্যে অনুসন্ধান করিল, তার পরে একটু হাসিয়া কহিল, জামাসুদ্ধ এটা গেছে দেখছি। অন্য বোতাম ছিল না ত?

অপূর্ব মাথা নাড়িয়া জানাইল, ছিল না। ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, ট্রাঙ্কে টাকা ছিল ত? অপূর্ব 'ছিল' বলিয়া সায় দিলে ভারতী উদ্বিগ্নমুখে কহিল, তা হলে তাও গেছে। কত ছিল জানেন না? তা আমি আগেই বুঝেচি। আপনার মনিব্যাগ আছে জানি। বার করে আমাকে দিন ত দেখি—

অপূর্ব পকেট হইতে তাহার ছোট চামড়ার থলেটি বাহির করিয়া ভারতীর হাতে দিতে সে মেঝের উপর ঢালিয়া ফেলিয়া সমস্ত গণনা করিয়া বলিল, দু'শ পঞ্চাশ টাকা আট আনা। বাড়ি থেকে কত টাকা নিয়ে বার হয়েছিলেন মনে আছে?

অপূর্ব কহিল, আছে বৈ কি। ছ'শ টাকা।

ভারতী টেবিলের উপর হইতে এক টুকরা কাগজ ও পেন্সিল লইয়া লিখিতে লাগিল, জাহাজ ভাড়া, ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া, কুলি ভাড়া,—পৌঁছে বাড়িতে টেলিগ্রাম করেছিলেন ত? আচ্ছা, তারও এক টাকা, তারপরে এই দশ দিনের বাসাখরচ—

অপূর্ব বাধা দিয়া কহিল, সে ত তেওয়ারীকে জিজ্ঞাসা না করলে জানা যাবে না।

ভারতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, তা যাবে, দু'এক টাকার তফাত হতে পারে, বেশী হবে না। যে ফুটা দিয়া আজ সে চুরি করা দেখিয়াছিল, সেই ছিদ্রপথে চোখ পাতিয়া সে যে এই ঘরের যাবতীয় ব্যাপার নিরীক্ষণ করিত, তেওয়ারীর বাজার করা হইতে আরম্ভ করিয়া খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন পর্যন্ত কিছুই বাদ যাইত না, এ কথা বলিল না, কাগজে ইচ্ছামত একটা অঙ্ক লিখিয়া সহসা মুখ তুলিয়া কহিল, এ ছাড়া আর বাজে খরচ নেই ত?

না।

ভারতী কাগজের উপর হিসাব করিয়া কহিল, তাহলে দু'শ আশি টাকা চুরি গেছে।

অপূর্ব চমকিয়া কহিল, এত টাকা? রোস রোস, আর কুড়ি টাকা বাদ দাও—জরিমানার টাকাটা ধরা হয়নি।

ভারতী মাথা নাড়িয়া বলিল, না সে ত অন্যায়, মিথ্যে জরিমানা—এ টাকা আমি বাদ দেব না।

অপূর্ব আশ্চর্য হইয়া কহিল, কি বিপদ! জরিমানা করাটা মিথ্যে হতে পারে, কিন্তু আমার টাকা দেওয়াটা ত মিথ্যে নয়?

ভারতী কহিল, দিলেন কেন? ও টাকা আমি বাদ দেব না। দু'শ আশি টাকা চুরি গেছে।

অপূর্ব বলিল, না, দু'শ ষাট টাকা।

ভারতী বলিল, না, দু'শ আশি টাকা।

অপূর্ব আর তর্ক করিল না। এই মেয়েটির প্রখর বুদ্ধি ও সকল দিকে অদ্ভুত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখিয়া সে আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল; অথচ এই সোজা বিষয়টা না বুঝিবার দিকে তাহার জিদ দেখিয়া তাহার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। বিচারের ন্যায়-অন্যায় যাহাই হউক, টাকা ব্যয় হইলে সে যে আর হাতে থাকে না এ কথা যে বুঝিতে চাহে না, তাহাকে সে আর কি বলিবে?

ভারতী অবশিষ্ট কাপড়গুলি গোছ করিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, পুলিশে খবর দেওয়া কি আপনি উচিত মনে করেন?

ভারতী মাথা নাড়িয়া কহিল, তা বটে। উচিত শুধু এই দিক থেকে হতে পারে যে তাতে আমার টানাটানির আর অন্ত থাকবে না। নইলে, তারা এসে আপনার টাকার কিনারা করে দিয়ে যাবে এ আশা বোধ হয় করেন না?

অপূর্ব চুপ করিয়া রহিল। ভারতী বলিল, ক্ষতি যা হবার হয়েছে, এর পরে আবার তারা এলে অপমান শুরু হবে।

কিন্তু আইন আছে —

অপূর্বর কথা শেষ হইল না, ভারতী অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল; বলিল, আইন থাকে থাক; এ আপনাকে আমি কিছুতে করতে দিতে পারবো না। আইন সেদিনও ছিল আপনি যেদিন জরিমানা দিয়ে এসেছিলেন। এর মধ্যেই বুঝি তা ভুলে গেছেন?

অপূর্ব কহিল, লোকে যদি মিথ্যে বলে, মিথ্যে মামলা সাজায়, সে কি আইনের দোষ?

ভারতীর মুখ দেখিয়া মনে হইল না সে কিছুমাত্র লজ্জা পাইল। বলিল, লোকে মিথ্যে বলবে না, মিথ্যে মামলা সাজাবে না, তবেই আইন নির্দোষ হয়ে উঠবে, এই আপনার মত নাকি? এ হলে ত ভালই হয়, কিন্তু সংসারে তা হয় না, এবং হবার বোধ করি বিস্তর বিলম্ব আছে। এই বলিয়া সে একটু হাসিল, কিন্তু অপূর্ব চুপ করিয়া রহিল, তর্কে যোগ দিল না। সেই প্রথম দিনে এই মেয়েটির কণ্ঠস্বরে, তাহার সুমিষ্ট সলজ্জ ব্যবহারে, বিশেষ করিয়া তাহার এই সকরুণ সহানুভূতিতে অপূর্বর মনের মধ্যে যে একটুখানি মোহের মত জন্মিয়াছিল, তাহার পরবর্তী আচরণে সে ভাব আর তাহার ছিল না। ভারতীর এই চুরি গোপন করিবার আগ্রহ এখন হঠাৎ কেমন তাহার ভারী খারাপ লাগিল। এই-সকল অযাচিত সাহায্যকেও আর যেন সে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিতে পারিল না এবং কি একপ্রকার অজানা শঠতার সংশয়ে সমস্ত অন্তঃকরণ তাহার দেখিতে দেখিতে কালো হইয়া উঠিল। সেদিনের সেই সভয়ে, সঙ্কোচে, গোপনে ফলমূল দিতে আসা, পরক্ষণেই আবার ঘরে গিয়া সমস্ত ঘটনা বিকৃত করিয়া মিথ্যা করিয়া বলা, তারপরে সেই আদালতে সাক্ষ্য দেওয়া,—নিমেষে সমস্ত ইতিহাস মনের মধ্যে তড়িৎরেখায় খেলিয়া গেল এবং মুখ তাহার গম্ভীর ও কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া উঠিল।

এ সমস্তই অভিনয়, সমস্তই ছলনা! তাহার মুখের এই আকস্মিক পরিবর্তন ভারতী লক্ষ্য করিল, কিন্তু কারণ বুঝিতে পারিল না, বলিল, আমার কথার জবাব দিলেন না যে বড়?

অপূর্ব কহিল, এর আর জবাব কি? চোরকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না,—পুলিশে একটা খবর দিতেই হবে।

ভারতী ভয় পাইয়া কহিল, সে কি কথা! চোরও ধরা পড়বে না, টাকাও আদায় হবে না,—মাঝে থেকে আমাকে নিয়ে যে টানাটানি করবে। আমি দেখেচি, তালাবন্ধ করেচি, সমস্ত গুছিয়ে তুলে রেখেচি,—আমি যে বিপদে পড়ে যাবো।

অপূর্ব কহিল, যা ঘটেছে তাই বলবেন।

ভারতী ব্যাকুল হইয়া জবাব দিল, বললে কি হবে! এই সেদিন আপনার সঙ্গে তুমুল কাণ্ড হয়ে গেল, মুখ দেখাদেখি নাই, কথাবার্তা বন্ধ, হঠাৎ আপনার জন্যে আমার এত মাথাব্যথা পুলিশে বিশ্বাস করবে কেন?

অপূর্বর মন সন্দেহে অধিকতর কঠোর হইয়া উঠিল, কহিল, আপনার আগাগোড়া মিছে কথা তারা বিশ্বাস করতে পারলে আর সত্য কথা পারবে না? টাকা সামান্যই গেছে, কিন্তু চোরকে আমি শাস্তি না দিয়ে ছাড়বো না!

তাহার মুখের পানে ভারতী হতবুদ্ধির ন্যায় চাহিয়া রহিল; কহিল, আপনি বলেন কি অপূর্ববাবু! বাবা ভাল লোক নন, তিনি অকারণে আপনার প্রতি অত্যন্ত অন্যায় করেছেন, আমি যে সাহায্য করেছি তাও আমি জানি, কিন্তু তাই বলে, ঘর ভেঙ্গে বাক্স ভেঙ্গে আপনার টাকা চুরি করব আমি? এ কথা আপনি ভাবতে পারলেন, কিন্তু আমি ত পারিনি! এ দুর্নাম রটলে আমি বাঁচব কি করে! বলিতে বলিতে তাহার ওষ্ঠাধর ফুলিয়া কাঁপিয়া উঠিল, এবং দাঁত দিয়া জোর করিয়া ঠোঁট চাপিতে চাপিতে সে যেন ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া গেল।

ছয়

পরদিন সকালে কি ভাবিয়া যে অপূর্ব পুলিশ-থানার দিকে পা বাড়াইয়া দিল তাহা বলা শক্ত। চুরির ব্যাপার পুলিশের গোচর করিয়া যে কোন ফল নাই তাহা সে জানিত। টাকা আদায় হইবে না, সম্ভবতঃ, চোর ধরা পড়িবে না,—এ বিশ্বাসটুকু পুলিশের উপরে তাহার ছিল। কিন্তু ওই ক্রীশ্চান ম্লেচ্ছ মেয়েটার প্রতি তাহার ক্রোধ ও বিদ্বেষের আর সীমা ছিল না। ভারতী নিজে চুরি করিয়াছে, কিংবা চুরি করিতে সাহায্য করিয়াছে এ বিষয়ে তেওয়ারীর মত নিঃসংশয় হইতে সে এখনও পারে নাই, কিন্তু তাহার শঠতা ও ছলনা তাহাকে একেবারে ক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছিল। জোসেফ সাহেবকে আর যে-কোন দোষই দেওয়া যাক, আপনাকে সুস্পষ্ট করিবার পক্ষে শুরু হইতে কোন ত্রুটি তাঁহার ঘটিয়াছে এ অপবাদ দেওয়া চলে না। তাঁহার শয়তানী নিরতিশয় ব্যক্ত, তাঁহার চাবুকের আস্ফালন দ্বিধাহীন, জড়িমাবর্জিত, প্রতিবেশীর প্রতি তাঁহার মনোভাবে কোথাও কোন হেঁয়ালি নাই, তাঁহার কণ্ঠ নিঃসঙ্কোচ, বক্তব্য সরল ও প্রাঞ্জল, তাঁহার মদমত্ত পদক্ষেপ অনুভব করিতে কান খাড়া করিয়া রাখিতে হয় না,— এক কথায়, তাঁহাকে বুঝা যায়। কিন্তু, এই মেয়েটির কথা ও কাজের যেন কোন উদ্দেশ খুঁজিয়া মিলে না। ক্ষতি সে যত করিয়াছে সেজন্যও তত নয়, কিন্তু গোড়া হইতে তাহার বিচিত্র আচরণ যেন অনুক্ষণ কেবল অপূর্বর বুদ্ধিকেই উপহাস করিয়া আসিয়াছে। রাগের মাথায় থানায় ঢুকিয়া সে শেষ পর্যন্ত সমস্ত কাহিনী পুলিশের কাছে বিবৃত করিতে পারিত কি না সন্দেহ, কিন্তু ততদূর গড়াইল না। পিছন হইতে ডাক শুনিল, এ কি অপূর্ব নাকি | এখানে যে!

অপূর্ব ফিরিয়া দেখিল, সাধারণ ভদ্র বাঙালীর পোশাকে দাঁড়াইয়া তাহাদের পরিচিত নিমাইবাবু। ইনি বাঙলা দেশের একজন বড় পুলিশ-কর্মচারী। অপূর্বর

পিতা ইঁহার চাকরি করিয়া দেন, তিনিই ছিলেন ইঁহার মুরব্বি।নিমাইবাবু তাঁহাকে দাদা বলিতেন, এবং সেই সূত্রে অপূর্বরা সকলেই ইঁহাকে নিমাইকাকা বলিয়া ডাকিত। স্বদেশীযুগে অপূর্ব যে ধরা পড়িয়া শাস্তি ভোগ করে নাই, সে অনেকটা ইঁহারই প্রসাদে। পথের মধ্যেই অপূর্ব তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিজের চাকরির সংবাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু আপনি যে এদেশে?

নিমাইবাবু আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, বাবা, কচিছেলে তুমি, তোমাকে এতটা দূরে ঘরদোর মা–বোন ছেড়ে আসতে হয়েচে আর আমাকে হতে পারে না? পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিয়া কহিলেন, আমার সময় নেই, কিন্তু তোমার ত আফিসে যাবার এখনও ঢের দেরি আছে। চল না বাবা, পথে যেতে যেতে দুটো কথা শুনি। কতকাল যে তোমাদের খবর নিতে পারিনি তার ঠিক নেই। মা ভাল আছেন? দাদারা?

সকলেই ভাল আছেন জানাইয়া অপূর্ব প্রশ্ন করিল, আপনি এখন কোথায় যাবেন?

জাহাজ ঘাটে। চল না আমার সঙ্গে।

চলুন। আপনাকে কি আর কোথাও যেতে হবে?

নিমাইবাবু হাসিয়া কহিলেন, হতেও পারে। যে মহাপুরুষকে সংবর্ধনা করে নিয়ে যাবার জন্যে দেশ ছেড়ে এতদূর আসতে হয়েছে, তাঁর মর্জির উপরেই এখন সমস্ত নির্ভর করচে। তাঁর ফটোগ্রাফও আছে, বিবরণও দেওয়া আছে, কিন্তু এখানের পুলিশের বাবার সাধ্য নেই যে তাঁর গায়ে হাত দেয়। আমিই পারব কিনা তাই ভাবচি।

অপূর্ব মহাপুরুষের ইঙ্গিত বুঝিল। কৌতূহলী হইয়া কহিল, মহাপুরুষটি কে কাকাবাবু? যখন আপনি এসেছেন, তখন বাঙালী সন্দেহ নেই,—খুনী আসামী, না?

নিমাইবাবু কহিলেন, ঐটি বলতে পারব না বাবা। তিনি যে কি, এবং কি নয়—এ কথা ঠিক কেউ জানে না। এঁর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোন চার্জও নেই, অথচ যে চার্জ আছে তা আমাদের পিনাল কোডের কোহিনূর। এঁকে চোখে চোখে রাখতে এতবড় গবর্নমেন্ট যেন হিমসিম খেয়ে গেল।

অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, পোলিটিক্যাল আসামী বুঝি?

নিমাইবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, ওরে বাবা, পোলিটিক্যাল আসামী ত লোকে তোদেরও একসময় বলত। কিন্তু সে বললে এঁর কিছুই বুঝায় না। ইনি হচ্চেন রাজবিদ্রোহী! রাজার শত্রু! হাঁ, শত্রু বলবার লোক বটে! বলিহারি তাঁর প্রতিভাকে যিনি এই ছেলেটির নাম রেখেছিলেন সব্যসাচী। মহাভারতের মতে নাকি তাঁর দুটো হাতই সমানে চলত, কিন্তু প্রবলপ্রতাপান্বিত সরকার বাহাদুরের সুগুপ্ত ইতিহাসের মতে এই মানুষটির দশ-ইন্দ্রিয়ই নাকি বাবা সমান বেগে চলে। বন্দুক-পিস্তলে এঁর অভ্রান্ত লক্ষ্য, পদ্মানদী সাঁতার কেটে পার হয়ে যান, বাধে না,—সম্প্রতি অনুমান এই যে চট্টগ্রামের পথে পাহাড় ডিঙিয়ে তিনি বর্মা মুলুকে পদার্পণ করেছেন। এখন ম্যাণ্ডেলে থেকে নদীপথে জাহাজে চড়ে রেঙ্গুনে আসবেন, কিংবা, রেলপথে ট্রেনে সওয়ার হয়ে শুভাগমন করছেন সঠিক সংবাদ নেই,—তবে তিনি যে রওনা হয়েছেন সে কথা ঠিক। তাঁর উদ্দেশ্য নিয়ে কোন সন্দেহ, কোন তর্ক নেই,—শত্রুমিত্র সকলের মনেই তার স্থিরসিদ্ধান্ত হয়ে আছে, এবং নশ্বর দেহটি তাঁর পঞ্চভূতের জিম্মায় না দিতে পারা পর্যন্ত এ জন্মে যে এর আর পরিবর্তন নেই তাও সকলে জানি, শুধু এদেশে এসে কোন্ পথে যে তিনি পা বাড়াবেন সেইটি কেবল আমরা জানিনে। কিন্তু দেখো বাবা, এ-সব কথা যেন কোথাও প্রকাশ করো না। তা হলে এই বৃদ্ধবয়সে সাতাশ বছরের পেন্সনটি ত মারা যাবেই, হয়ত বা কিছু উপরি পাওনাও ভাগ্যে ঘটতে পারে।

অপূর্ব উৎসাহ ও উত্তেজনায় চঞ্চল হইয়া কহিল, এতদিন কোথায় এবং কি করছিলেন ইনি? সব্যসাচী নাম ত কখনো শুনেছি মনে হচ্চে না?

নিমাইবাবু সহাস্যে কহিলেন, ওরে বাবা, এই–সব বড় লোকদের কি আর কেবল একটা নামে কাজ চলে? অর্জুনের মত দেশে দেশে কত নামই হয়ত এঁর প্রচলিত আছে। সেকালে হয়ত শুনেও থাকবে, এখন চিনতে পারচো না। আর, কি যে ইতিমধ্যে করছিলেন সম্যক ওয়াকিবহাল নই। রাজশত্রুরা ত তাঁদের সমস্ত কাজকর্ম ঢাকপিটে করতে পছন্দ করেন না, তবে পুনায় একদফা তিন মাস, এবং সিঙ্গাপুরে আর একদফা তিন বচ্ছর জেল খেটেছেন জানি। ছেলেটি দশ–বারোটা ভাষা এমন বলতে পারে যে বিদেশী লোকের পক্ষে চেনা ভার ইনি কোথাকার। জারমেনির জেনা না কোথায় ডাক্তারি পাস করেচে, ফ্রান্সে ইঞ্জিনিয়ারীং পাস করেচে, বিলেতে আইন পাস করেচে, আমেরিকায় কি পাস করেচে জানিনে, তবে সেখানে ছিল যখন, তখন কিছু একটা করেই থাকবে,—এ–সব বোধ করি এর তাস–পাশা খেলার সামিল,—রিক্রিয়েশান,—কিন্তু, কিছুই কোন কাজে এলো না বাবা, এর সর্বাঙ্গের শির দিয়ে ভগবান এমনি আগুন জ্বেলে দিয়েছেন যে ওকে জেলেই দাও আর শূলেই দাও—ঐ যে বললুম পঞ্চভূত ছাড়া আর আমাদের শান্তি–স্বস্তি নেই! এদের না আছে দয়া–মায়া, না আছে ধর্ম–কর্ম, না আছে কোন ঘরদোর,—বাপ রে বাপ! আমরাও ত এদেশেরই মানুষ, কিন্তু এ ছেলে যে কোত্থেকে এসে বাঙলা মুলুকে জন্মালো তা ভেবেই পাওয়া যায় না!

অপূর্ব সহসা কথা কহিতে পারিল না,—শিরার মধ্যে দিয়া তাহারও যেন আগুন ছুটিতে লাগিল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চলার পরে আস্তে আস্তে কহিল, এঁকে কি আজ আপনি অ্যারেস্ট করবেন?

নিমাইবাবু হাসিয়া বলিলেন, আগে ত পাই!

অপূর্ব কহিল, ধরুন পেলেন।

না বাবা, অত সহজ বস্তু নয়। আমার নিশ্চয় বিশ্বাস সে শেষমুহূর্তে আর কোন পথ দিয়ে আর কোথাও সরে গেছে।

আর যদি তিনি এসেই পড়েন তা হলে?

নিমাইবাবু একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, তাঁকে চোখে চোখে রাখবারই হুকুম আছে। দুদিন দেখি। ধরার চেয়ে ওয়াচ্ করার মূল্য বেশি,—এই ত সম্প্রতি গভর্মেন্টের ধারণা।

কথাটা অপূর্ব ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিল না, কারণ, তিনি যাই হোন তবুও পুলিশ। তথাপি, তাহার মুখ দিয়া একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়িল। কহিল, এঁর বয়স কত?

নিমাইবাবু কহিলেন, বেশি নয়। বোধ হয় ত্রিশ-বত্রিশের মধ্যেই।

কি রকম দেখতে?

এইটিই ভারী আশ্চর্য বাবা। এতবড় একটা ভয়ঙ্কর লোকের মধ্যে কোন বিশেষত্ব নেই, নিতান্তই সাধারণ মানুষ। তাই চেনাও শক্ত, ধরাও শক্ত। আমাদের রিপোর্টের মধ্যে এই কথাটাই বিশেষ করে উল্লেখ করা আছে।

অপূর্ব কহিল, কিন্তু ধরা পড়ার ভয়েই ত এঁর হাঁটা-পথে পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে আসা?

নিমাইবাবু বলিলেন, নাও হতে পারে। হয়ত কি একটা মতলব আছে, হয়ত পথটা একবার চিনে রাখতে চায়— কিছুই বলা যায় না অপূর্ব। এরা যে পথের পথিক, তাতে সহজ মানুষের সোজা হিসেবের সঙ্গে এদের হিসেব মেলে না,—আজ এরই ভুল কি আমাদেরই ভুল তার একটা পরীক্ষা হবে। এমনও হতে পারে সমস্ত ছুটোছুটি আমাদের বৃথা।

অপূর্ব এবার হাসিয়া কহিল, তাই যেন হয় আমি ভগবানের কাছে সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি কাকাবাবু! নিমাইবাবু নিজেও হাসিলেন, বলিলেন, বোকা ছেলে, পুলিশের কাছে এ কথা কি বলতে আছে? তোমার বাসার নম্বরটা কত বললে? তিরিশ? কাল সকালে পারি ত একবার গিয়ে দেখে আসবো। এই সামনের জেটিতেই বোধ হয় এদের স্টিমার লাগে,—আচ্ছা, তোমার আবার আফিসের সময় হয়ে এল, নতুন চাকরি, দেরি হওয়া ভাল নয়। এই বলিয়া তিনি

পাশ কাটাইয়া একটু দ্রুতপদে চলিবার উপক্রম করিতেই অপূর্ব কহিল, শুধু দেরি কেন, আজ আফিস কামাই হয়ে গেলেও আপনাকে ছাড়চি নে। আমি চাইনে যে তিনি এসে আপনার হাতে পড়েন, কিন্তু সে দুর্ঘটনা যদি ঘটেই তবুও ত একবার চোখে দেখতে পাবো। চলুন।

ইচ্ছে না থাকিলেও নিমাইবাবু বিশেষ আপত্তি করিলেন না, শুধু একটু সতর্ক করিয়া দিয়া কহিলেন, দেখবার লোভ যে হয় তা অস্বীকার করিনে, কিন্তু এ–সকল লোকের সঙ্গে কোন রকম আলাপ–পরিচয়ের ইচ্ছে করাও বিপজ্জনক তা তোমাকে বলে রাখি অপূর্ব! এখন আর তুমি ছেলেমানুষ নও, বাবাও বেঁচে নেই,—ভবিষ্যৎ ভেবে কাজ করার দায়িত্ব এখন একা তোমারই।

অপূর্ব হাসিয়া কহিল, আলাপ–পরিচয়ের সুযোগই কি আপনারা কাউকে কখনো দেন কাকাবাবু? দোষ করেন নি, কোন অভিযোগও নেই, তবুও ত তাঁকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টায় এতদূরে ছুটে এসেছেন।

ইহার উত্তরে নিমাইবাবু শুধু একটু মুচকিয়া হাসিলেন। তাহার অর্থ অতীব গভীর। মুখে কহিলেন, কর্তব্য!

কর্তব্য! এই ছোট্ট একটি কথার আড়ালে পৃথিবীর কত ভাল, এবং কত মন্দই না সঞ্চিত হইয়া আছে। এই কথা মনে করিয়া অপূর্ব আর কোন প্রশ্ন করিল না। উভয়ে জেটিতে যখন প্রবেশ করিলেন তখন সেইমাত্র ইরাবতী নদীর প্রকাণ্ড স্টিমার তীরে ভিড়িবার চেষ্টা করিতেছিল। পাঁচ–সাতজন পুলিশ–কর্মচারী সাদা পোশাকে পূর্বে হইতেই দাঁড়াইয়াছিল, নিমাইবাবুর প্রতি তাহাদের একপ্রকার চোখের ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়া অপূর্ব তাহাদের স্বরূপ চিনিতে পারিল।

ইহারা সকলেই ভারতবর্ষীয়,—ভারতের কল্যাণের নিমিত্ত সুদূর বর্মায় বিদ্রোহী–শিকারে বাহির হইয়াছেন। সেই শিকারের বস্তু তাঁহাদের করতলগতপ্রায়। সফলতার আনন্দ ও উত্তেজনার প্রচ্ছন্ন দীপ্তি তাঁহাদের মুখে–চোখে প্রকাশ পাইয়াছে অপূর্ব স্পষ্ট দেখিতে পাইল। লজ্জায় ও দুঃখে সে মুখ

ফিরাইয়া দাঁড়াইতেই অকস্মাৎ একমুহূর্তে তাহার সমস্ত ব্যথিত চিত্ত গিয়া যেন কোন এক অদৃষ্টপূর্ব অপরিচিত দুর্ভাগার পদপ্রান্তে উপুড় হইয়া পড়িয়া তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। জাহাজের খালাসীরা তখন জেটির উপরে দড়ি ছুঁড়িয়া ফেলিতেছিল, কত লোক রেলিং ধরিয়া তাহাই উদ্গ্রীব হইয়া দেখিতেছে,—ডেকের উপরে ব্যগ্রতা, কলরব ও ছুটাছুটির অবধি নাই, —হয়ত, ইহাদেরই মাঝখানে দাঁড়াইয়া একজন এমনি উৎসুকচক্ষে তীরের প্রতীক্ষা করিতেছে, কিন্তু অপূর্বর চোখে সমস্ত দৃশ্যই চোখের জলে একেবারে ঝাপসা একাকার হইয়া গেল। উপরে, নীচে, জলে, স্থলে এত নরনারী দাঁড়াইয়া, কাহারও কোন শঙ্কা, কোন অপরাধ নাই, শুধু যে লোক তাহার তরুণ হৃদয়ের সকল সুখ, সকল স্বার্থ, সকল আশা স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়াছে, কারাগার ও মৃত্যুর পথ কি কেবল তাহারই জন্য হাঁ করিয়া রহিয়াছে! জাহাজ জেটির গায়ে আসিয়া ভিড়িল, কাঠের সিঁড়ি নীচে আসিয়া লাগিল, নিমাইবাবু তাঁহার দলবল লইয়া পথের দু'ধারে সারি দিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু অপূর্ব নড়িল না। সে সেখানে নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত দাঁড়াইয়া একান্তমনে বলিতে লাগিল, মুহূর্ত পরে তোমার হাতে শৃঙ্খল পড়িবে, কৌতূহলী নর-নারী তোমার লাঞ্ছনা ও অপমান চোখ মেলিয়া দেখিবে, তাহারা জানিতেও পারিবে না তাহাদের জন্য তুমি সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছ বলিয়াই তাহাদের মধ্যে আর তোমার থাকা চলিবে না। তাহার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল, এবং যাহাকে সে কোন দিন দেখে নাই, তাহাকেই সম্বোধন করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, তুমি ত আমাদের মত সোজা মানুষ নও,—তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিয়াছ, তাই ত দেশের খেয়াতরী তোমাকে বহিতে পারে না, সাঁতার দিয়া তোমাকে পদ্মা পার হইতে হয়; তাই ত দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ, দুর্গম পাহাড়-পর্বত তোমাকে ডিঙাইয়া চলিতে হয়;—কোন্ বিস্মৃত অতীতে তোমারই জন্য ত প্রথম শৃঙ্খল রচিত হইয়াছিল, কারাগার ত শুধু তোমাকে মনে করিয়াই প্রথম নির্মিত হইয়াছিল,—সেই ত তোমার গৌরব! তোমাকে অবহেলা

করিবে সাধ্য কার! এই যে অগণিত প্রহরী, এই যে বিপুল সৈন্যভার, সে ত কেবল তোমারই জন্য! দুঃখের দুঃসহ গুরুভার বহিতে তুমি পারো বলিয়াই ত ভগবান এত বড় বোঝা তোমারই স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন! মুক্তিপথের অগ্রদূত! পরাধীন দেশের হে রাজবিদ্রোহী! তোমাকে শতকোটী নমস্কার! এত লোকের ভিড়, এত লোকের আনাগোনা, এত লোকের চোখের দৃষ্টি কিছুতেই তাহার খেয়াল ছিল না,—নিজের মনের উচ্ছ্বসিত আবেগে অবিচ্ছিন্ন অশ্রুধারে তাহার গণ্ড, তাহার চিবুক, তাহার কণ্ঠ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সময় যে কত কাটিল সেদিকেও তাহার কিছুমাত্র দৃষ্টি ছিল না, হঠাৎ নিমাইবাবুর কণ্ঠস্বরে সে চকিত হইয়া তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিল। তাহার তদ্গত বিহ্বল ভাব তিনি লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য হইলেন, কিন্তু কোন প্রশ্ন করিলেন না, বলিলেন, যা ভয় করেছিলাম তাই! পালিয়েছে।

কি করে পালালো?

নিমাইবাবু কহিলেন, তাই যদি জানবো ত সে কি পালায়? প্রায় শ’-তিনেক যাত্রী, বিশ–পঁচিশটা সাহেব ফিরিঙ্গী, উড়ে, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী তাও শ’দেড়েক হবে, বাকী বর্মা—সে যে কার পোশাক আর কার ভাষা বলতে বলতে বেরিয়ে গেল তা দেবা ন জানন্তি—বুঝলে না বাবাজী—আমরা ত পুলিশ! চেনবার জো নেই তিনি বিলেতের কি বাঙলার! কেবল জগদীশবাবু সন্দেহ করে জন–ছয়েক বাঙালীকে থানায় টেনে নিয়ে গেছেন, একটা লোকের সঙ্গে চেহারার মিলও আছে মনে হয়, কিন্তু ওই মনে হওয়া পর্যন্তই,—সে নয়। যাবে না কি বাবা, একবার লোকটাকে চোখে দেখবে?

অপূর্বর বুকের মধ্যে ধড়াস করিয়া উঠিল, কহিল, তাদের যদি মারধর করেন ত আমি যেতে চাইনে।

নিমাইবাবু একটু হাসিয়া কহিলেন, এতগুলো লোককে নিঃশব্দে ছেড়ে দিলাম আর এ বেচারারা বাঙালী বলেই শুধু বাঙালী হয়ে এদের প্রতি অত্যাচার

করব? ওরে বাবা, বাইরে থেকে তোরা পুলিশকে যত মন্দ মনে করিস, সবাই তা নয়। ভাল–মন্দ সকলের মধ্যেই আছে, কিন্তু মুখ বুজে যত দুঃখ আমাদের পোহাতে হয় তা যদি জানতে ত তোমার এই দারোগা কাকাবাবুটিকে অত ঘৃণা করতে পারতে না অপূর্ব!

অপূর্ব লজ্জিত হইয়া কহিল, আপনি কর্তব্য করতে এসেছেন, তাই বলে আপনাকে ঘৃণা কেন করব কাকাবাবু!

এই বলিয়া সে হেঁট হইয়া তাঁহার পদস্পর্শ করিয়া কপালে ঠেকাইল। নিমাইবাবু খুশী হইয়া আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, হয়েছে, হয়েছে। চল একটু শীঘ্র যাওয়া যাক, লোকগুলো ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সারা হচ্চে, একটু পরীক্ষা করে ছেড়ে দেওয়া যাক। এই বলিয়া তিনি হাত ধরিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাহির করিয়া আনিলেন।

পুলিশ-স্টেশনে প্রবেশ করিয়া দেখা গেল, সুমুখের হলঘরে জন-ছয়েক বাঙালী মোট-ঘাট লইয়া বসিয়া আছে, জগদীশবাবু ইতিমধ্যেই তাহাদের টিনের তোরঙ্গ ও ছোট-বড় পুঁটুলি খুলিয়া তদারক শুরু করিয়া দিয়াছেন। শুধু যে-লোকটির প্রতি তাঁহার অত্যন্ত সন্দেহ হইয়াছে তাহাকে আর একটা ঘরে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে। ইহার সকলেই উত্তর-ব্রহ্মে বর্মা-অয়েল-কোম্পানির তেলের খনির কারখানায় মিস্ত্রীর কাজ করিতেছিল, সেখানের জলহাওয়া সহ্য না হওয়ায় চাকরির উদ্দেশে রেঙ্গুনে চলিয়া আসিয়াছে। ইহাদের নাম ধাম ও বিবরণ লইয়া ও সঙ্গের জিনিসপত্রের পরীক্ষা করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল, পোলিটিক্যাল সাসপেক্ট সব্যসাচী মল্লিককে নিমাইবাবুর সম্মুখে হাজির করা হইল। লোকটি কাশিতে কাশিতে আসিল। অত্যন্ত ফরসা রং রৌদ্রে পুড়িয়া যেন তামাটে হইয়াছে। বয়স ত্রিশ-বত্রিশের অধিক নয়, কিন্তু ভারী রোগা দেখাইল। এইটুকু কাশির পরিশ্রমেই সে হাঁপাইতে লাগিল। সহসা আশঙ্কা হয়, সংসারের মিয়াদ বোধ করি বেশী দিন নাই; ভিতরের কি একটা দুরারোগ্য রোগে সমস্ত দেহটা যেন দ্রুতবেগে

ক্ষয়ের দিকে ছুটিয়াছে। কেবল আশ্চর্য সেই রোগা মুখের অদ্ভুত দুটি চোখের দৃষ্টি। সে চোখ ছোট কি বড়, টানা কি গোল, দীপ্ত কি প্রভাহীন এ-সকল বিবরণ দিতে যাওয়াই বৃথা—অত্যন্ত গভীর জলাশয়ের মত কি যে তাহাতে আছে, ভয় হয় এখানে খেলা চলিবে না, সাবধানে দূরে দাঁড়ানোই প্রয়োজন। ইহারই কোন্ অতল তলে তাহার ক্ষীণ প্রাণশক্তিটুকু লুকানো আছে, মৃত্যুও সেখানে প্রবেশ করিতে সাহস করে না।—কেবল এই জন্যই যেন সে আজও বাঁচিয়া আছে। অপূর্ব মুগ্ধ হইয়া সেইদিকে চাহিয়া ছিল, সহসা নিমাইবাবু তাহার বেশভূষার বাহার ও পারিপাট্যের প্রতি অপূর্বর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া সহাস্যে কহিলেন, বাবুটির স্বাস্থ্য গেছে, কিন্তু শখ ষোলআনাই বজায় আছে তা স্বীকার করতে হবে। কি বল অপূর্ব?

এতক্ষণে অপূর্ব তাহার পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল। তাহার মাথার সম্মুখদিকে বড় বড় চুল, কিন্তু ঘাড় ও কানের দিকে নাই বলিলেই চলে,— এমনি ছোট করিয়া ছাঁটা। মাথায় চেরা সিঁথি,—অপর্যাপ্ত তৈলনিষিক্ত, কঠিন, রুগ্ন, কেশ হইতে নিদারুণ নেবুর তেলের গন্ধে ঘর ভরিয়া উঠিয়াছে। গায়ে জাপানী সিল্কের রামধনু রঙের চুড়িদার পাঞ্জাবী, তাহার বুক-পকেট হইতে বাঘ-আঁকা একটা রুমালের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে, উত্তরীয়ের কোন বালাই নাই। পরনে বিলাতী মিলের কালো মকমল পাড়ের সূক্ষ্ম শাড়ী, পায়ে সবুজ রঙের ফুল মোজা—হাঁটুর উপরে লাল ফিতা দিয়া বাঁধা, বার্নিশ-করা পাম্প শু, তলাটা মজবুত ও টিকসই করিতে আগাগোড়া লোহার নাল বাঁধানো, হাতে একগাছি হরিণের শিঙের হাতল দেওয়া বেতের ছড়ি,—কয়দিনের জাহাজের ধকলে সমস্তই নোংরা হইয়া উঠিয়াছে,—ইহার আপাদমস্তক অপূর্ব বারবার নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, কাকাবাবু, এ লোকটিকে আপনি কোন কথা জিজ্ঞেসা না করেই ছেড়ে দিন, যাকে খুঁজছেন সে যে এ নয়, তার আমি জামিন হতে পারি।

নিমাইবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। অপূর্ব কহিল, আর যাই হোক, যাঁকে খুঁজছেন তাঁর কাল্চরের কথাটা একবার ভেবে দেখুন।

নিমাইবাবু হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন, কহিলেন, তোমার নাম কি হে?

আজ্ঞে, গিরীশ মহাপাত্র।

একদম মহাপাত্র! তুমিও তেলের খনিতেই কাজ করছিলে, না? এখন রেঙ্গুনেই থাকবে? তোমার বাক্স বিছানা ত খানাতল্লাশী হয়ে গেছে, দেখি তোমার ট্যাঁকে এবং পকেটে কি আছে?

তাহার ট্যাঁক হইতে একটি টাকা ও গণ্ডা-ছয়েক পয়সা বাহির হইল, পকেট হইতে একটা লোহার কম্পাস, মাপ করিবার কাঠের একটা ফুটরুল, কয়েকটা বিড়ি, একটা দেশলাই ও একটা গাঁজার কলিকা বাহির হইয়া পড়িল।

নিমাইবাবু কহিলেন, তুমি গাঁজা খাও?

লোকটি অসঙ্কোচে জবাব দিল, আজ্ঞে না।

তবে, এ বস্তুটি পকেটে কেন?

আজ্ঞে, পথে কুড়িয়ে পেলাম, যদি কারও কাজে লাগে তাই তুলে রেখেচি।

জগদীশবাবু এই সময়ে ঘরে ঢুকিতে নিমাইবাবু হাসিয়া কহিলেন, দেখ জগদীশ, কিরূপ সদাশয় ব্যক্তি ইনি। যদি কারও কাজে লাগে তাই গাঁজার কল্কেটি কুড়িয়ে পকেটে রেখেচেন। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, গাঁজা খাবার সমস্ত লক্ষণই তোমাতে বিদ্যমান বাবা, বললেই পারতে, খাই। কিন্তু ক'দিনই বা বাঁচবে,—এই ত তোমার দেহ,—আর খেয়ো না। বুড়োমানুষের কথাটা শুনো।

মহাপাত্র মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া বলিল, আজ্ঞে না মাইরি খাইনে। তবে ইয়ার বন্ধু কেউ তৈরি করে দিতে বললে দিই,—এই মাত্র! নইলে নিজে খাইনে।

জগদীশবাবু চটিয়া উঠিয়া কহিলেন, দয়ার সাগর! পরকে সেজে দি, নিজে খাইনে | মিথ্যেবাদী কোথাকার!

অপূর্ব কহিল, বেলা হয়ে গেল, আমি এখন তবে চললুম কাকাবাবু।

নিমাইবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পারো মহাপাত্র। কি বল জগদীশ, পারে ত? জগদীশ সম্মতি জানাইলে কহিলেন, কিন্তু নিশ্চয় কিছুই বলা যায় না ভায়া, আমার মনে হয় এ শহরে আরও কিছুদিন নজর রাখা দরকার। রাত্রের মেল ট্রেনটার প্রতি একটু দৃষ্টি রেখো, সে যে বর্মায় এসেছে এ খবর সত্য।

জগদীশ কহিলেন, তা হতে পারে, কিন্তু এই জানোয়ারটাকে ওয়াচ্ করবার দরকার নেই বড়বাবু। নেবুর তেলের গন্ধে ব্যাটা থানাসুদ্ধ লোকের মাথা ধরিয়ে দিলে! বড়বাবু হাসিতে লাগিলেন। অপূর্ব পুলিশ-স্টেশন হইতে বাহির হইয়া আসিল, এবং প্রায় তাহার সঙ্গে সঙ্গেই মহাপাত্র তাঁহার ভাঙ্গা টিনের তোরঙ্গ ও চাটাই-জড়ানো ময়লা বিছানার বাণ্ডিল বগলে চাপিয়া ধীর মন্থরপদে উত্তর দিকের রাস্তা ধরিয়া সোজা প্রস্থান করিল।

সাত

আশ্চর্য এই যে, এত বড় সব্যসাচী ধরা পড়িল না, কোন দুর্ঘটনা ঘটিল না এমন সৌভাগ্যকেও অপূর্বর মন যেন গ্রাহ্যই করিল না। বাসায় ফিরিয়া দাড়ি-গোঁফ কামানো হইতে শুরু করিয়া সন্ধ্যাহ্নিক, স্নানাহার, পোশাক-পরা, আফিস যাওয়া প্রভৃতি নিত্য কাজগুলায় বাধা পাইল না সত্য, কিন্তু ঠিক কি যে সে ভাবিতে লাগিল তাহার নির্দেশ নাই, অথচ, চোখ-কান ও বুদ্ধি তাহার সাংসারিক সকল ব্যাপার হইতেই একেবারে যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন্ এক অদৃষ্ট অপরিজ্ঞাত রাজবিদ্রোহীর চিন্তাতেই ধ্যানস্থ হইয়া রহিল। এই অত্যন্ত অন্যমনস্কতা তলওয়ারকর লক্ষ্য করিয়া চিন্তিতমুখে জিজ্ঞাসা করিল, আজ বাড়ি থেকে কোন চিঠি পেয়েছেন নাকি ?

কৈ না।

বাড়ির খবর সব ভাল ত?

অপূর্ব কিছু আশ্চর্য হইয়া কহিল,যতদূর জানি সবাই ভালই ত আছেন।

রামদাস আর কোন প্রশ্ন করিল না। টিফিনের সময় উভয়ে একত্র বসিয়া জলযোগ করিত। রামদাসের স্ত্রী অপূর্বকে একদিন সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন, যতদিন তাঁহার মা কিংবা বাটীর আর কোন আত্মীয়া নারী এদেশে আসিয়া বাসার উপযুক্ত ব্যবস্থাদি না করেন ততদিন এই ছোট বহিনের হাতের তৈরি যৎসামান্য মিষ্টান্ন প্রত্যহ তাঁহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে। অপূর্ব রাজী হইয়াছিল। আফিসের একজন ব্রাহ্মণ পিয়াদা এই-সকল বহিয়া আনিত। আজও সে নিরালা পাশের ঘরটায় ভোজ্যবস্তুগুলি যখন সাজাইয়া দিয়া গেল, তখন আহারে বসিয়া অপূর্ব নিজেই কথা পাড়িল। কাল তাহার ঘরে চুরি হইয়া গেছে; সমস্তই যাইতে পারিত, কেবল উপরের সেই ক্রীশ্চান মেয়েটির কৃপায় টাকাকড়ি

ছাড়া আর সমস্ত বাঁচিয়াছে। সে চোর তাড়াইয়া দরজায় নিজের তালা বন্ধ করিয়াছে, আমি বাসায় পৌঁছিলে চাবি খুলিয়া দিয়া অনাহুত আমার ঘরে ঢুকিয়া ছড়ানো জিনিসপত্র গুছাইয়া দিয়াছে, সমস্ত ফর্দ করিয়া কি আছে আর কি গেছে তার এমন নিখুঁত হিসাব করিয়া দিয়াছে যে বোধ হয় তোমার মত পাশ-করা এ্যাকাউন্টেন্টের পক্ষেও বিস্ময়কর। বাস্তবিক, এমন তৎপর, এতবড় কার্যকুশলা মেয়ে আর যে কেহ আছে মনে হয় না হে তলওয়ারকর! তা ছাড়া এত বড় বন্ধু!

রামদাস কহিল, তার পর?

অপূর্ব বলিল, তেওয়ারী ঘরে ছিল না, বর্মা নাচ দেখতে ফয়ায় গিয়েছিল, ইত্যবসরে এই ব্যাপার। তার বিশ্বাস এ কাজ ও ছাড়া আর কেউ করেনি। আমারও অনুমান কতকটা তাই। চুরি না করুক, সাহায্য করেচে।

তার পর?

তার পর সকালে গেলাম পুলিশে খবর দিতে। কিন্তু পুলিশের দল এমন কাণ্ড করলে, এমন তামাশা দেখালে যে ও-কথা আর মনেই হল না। এমন ভাবচি, যা গেছে তা যাক, তাদের চোর ধরে দিয়ে আর কাজ নেই, তারা বরঞ্চ এমনিধারা বিদ্রোহী ধরে ধরেই বেড়াক। এই বলিয়া তাহার গিরীশ মহাপাত্র ও তাহার পোশাক-পরিচ্ছদের বাহার মনে পড়িয়া হঠাৎ হাসির ছটায় যেন দম আটকাইবার উপক্রম হইল। হাসি থামিলে সে বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শী বিলাতের ডাক্তার উপাধিধারী রাজশত্রু মহাপাত্রের স্বাস্থ্য, তাহার শিক্ষা ও রুচি, তাহার বল-বীর্য, তাহার রামধনু রঙের জামা, সবুজ রঙের মোজা ও লোহার নালঠোকা পাম্প শু, তাহার নেবুর তেলের গন্ধবিলাস, সর্বোপরি তাহার পরহিতায় গাঁজার কলিকাটির আবিষ্কারের ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণনা করিতে করিতে তাহার উৎকট হাসির বেগ কোনমতে আর একবার সংবরণ করিয়া শেষে কহিল, তলওয়ারকর, মহা হুঁশিয়ার পুলিশের দলকে আজকের মত নির্বোধ আহম্মক

হতে বোধ করি কেউ কখনো দেখেনি। অথচ, গভর্নমেন্টের কত টাকাই না এরা বুনো হাঁসের পিছনে ছুটোছুটি করে অপব্যয় করলে!

রামদাস হাসিয়া কহিল, কিন্তু বুনো হাঁস ধরাই যে এদের কাজ; আপনার চোর ধরে দেবার জন্যে এরা নেই। আচ্ছা, এরা কি আপনাদের বাঙলা দেশের পুলিশ?

অপূর্ব কহিল, হাঁ। তা ছাড়া আমার বড় লজ্জা এই যে এদের যিনি কর্তা তিনি আমার আত্মীয়, আমার পিতার বন্ধু। বাবাই একদিন এঁর চাকরি করে দিয়েছিলেন।

রামদাস কহিল, তাহলে আপনাকেই হয়ত আর একদিন তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কিন্তু কথাটা বলিয়া ফেলিয়া সে-ই একটু অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিল,—আত্মীয়ের সম্বন্ধে এরূপ একটা মন্তব্য প্রকাশ করা হয়ত শোভন হয় নাই। অপূর্ব তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া অর্থ বুঝিল, কিন্তু এই ধারণা যে সত্য নয়, ইহাই সতেজে ব্যক্ত করিতে সে জোর করিয়া বলিল, আমি তাঁকে কাকা বলি, আমাদের তিনি আত্মীয়, শুভাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু তাই বলে আমার দেশের চেয়ে ত তিনি আপনার নন। বরঞ্চ, যাঁকে তিনি দেশের টাকায়, দেশের লোক দিয়ে শিকারের মত তাড়া করে বেড়াচ্চেন তিনি ঢের বেশী আমার আপনার।

রামদাস মুচকিয়া একটু হাসিয়া কহিল, বাবুজী, এ-সব কথা বলার দুঃখ আছে।

অপূর্ব কহিল, থাকে, তাই নেব। কিন্তু তাই বলে তলওয়ারকর,—শুধু কেবল আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর যে-কোন দেশে, যে-কোন যুগে যে-কেউ জন্মভূমিকে তার স্বাধীন করবার চেষ্টা করেচে, তাকে আপনার নয় বলবার সাধ্য আর যার থাক আমার নেই। বলিতে বলিতে কণ্ঠস্বর তাহার তীক্ষ্ণ এবং চোখের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল; মনে মনে বুঝিল কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িতেছে, কিন্তু সামলাইতে পারিল না, বলিল, তোমার মত সাহস আমার নেই, আমি ভীরু,

কিন্তু তাই বলে অবিচারে দণ্ডভোগ করার অপমান আমাকে কম বাজে না রামদাস। বিনা দোষে ফিরিঙ্গী ছোঁড়ারা আমাকে যখন লাথি মেরে প্ল্যাটফর্ম থেকে বার করে দিলে, এবং এই অন্যায়ের প্রতিবাদ যখন করতে গেলাম, তখন সাহেব স্টেশনমাস্টার কেবলমাত্র আমাকে দেশী লোক বলেই দেশের স্টেশন থেকে কুকুরের মত দূর করে দিলে,—তার লাঞ্ছনা এই কালো চামড়ার নীচে কম জ্বলে না তলওয়ারকর! এমন ত নিত্য-নিয়তই ঘটচে, —আমার মা, আমার ভাই-বোনকে যারা এই-সব সহস্র কোটি অত্যাচার থেকে উদ্ধার করতে চায় তাদের আপনার বলে ডাকবার যে দুঃখই থাক আমি আজ থেকে মাথায় তুলে নিলাম।

রামদাসের সুশ্রী গৌরবর্ণ মুখ ক্ষণকালের জন্য আরক্ত হইয়া উঠিল, বলিল, কৈ এ ঘটনা ত আমাকে বলেন নি!

অপূর্ব কহিল, বলা কি সহজ রামদাস? হিন্দুস্থানের লোক সেখানে কম ছিল না, কিন্তু, আমার অপমান কারও গায়েই ঠেকল না এমনি তাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। লাথির চোটে আমার যে হাড়-পাঁজরা ভেঙ্গে যায়নি এই সুখবরে তারা সব খুশী হয়ে গেল। তোমাকে জানাবো কি—মনে হলে দুঃখে লজ্জায় ঘৃণায় নিজেই যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাই।

রামদাস চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু তাহার দুই চোখ ছলছল করিয়া আসিল। সুমুখের ঘড়িতে তিনটা বাজিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বোধ হয় কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু কিছুই না বলিয়া হঠাৎ হাত বাড়াইয়া অপূর্বর ডান হাতটা টানিয়া লইয়া একটা চাপ দিয়া নিঃশব্দে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

সেই দিন বিকালে আফিসের ছুটি হইবার পূর্বে বড়সাহেব একখানা লম্বা টেলিগ্রাম হাতে অপূর্বর ঘরে ঢুকিয়া কহিলেন, আমাদের ভামোর আফিসে কোন শৃঙ্খলাই হচ্চে না। ম্যান্ডালে, শোএবো, মিক্থিলা এবং এদিকে প্রোম সব-কটা আফিসেই গোলযোগ ঘটচে। আমার ইচ্ছা তুমি একবার সবগুলো দেখে আস।

আমার অবর্তমানে সমস্ত ভারই ত তোমার,—একটা পরিচয় থাকা চাই,—সুতরাং বেশী দেরি না কোরে কাল-পরশু যদি একবার—

অপূর্ব তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া বলিল, আমি কালই বার হয়ে যেতে পারি। বস্তুতঃ, নানা কারণে রেঙ্গুনে তাহার আর একমুহূর্ত মন টিকিতে ছিল না। উপরন্তু, এই সূত্রে দেশটাও একবার দেখা হইবে। অতএব যাওয়াই স্থির হইল, এবং পরদিনই অপরাহ্নবেলায় সুদূর ভামো নগরের উদ্দেশে যাত্রা করিয়া সে ট্রেনে চাপিয়া বসিল। সঙ্গে রহিল আরদালি এবং আফিসের একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ পিয়াদা। তেওয়ারী খবরদারির জন্য বাসাতেই রহিল। পা-ভাঙ্গা সাহেব হাসপাতালে পড়িয়া, সুতরাং তেমন আর ভয় নাই। বিশেষতঃ, এই ম্লেচ্ছদেশের রেঙ্গুন শহরটা বরং সহিয়াছিল, কিন্তু আরও অজানা স্থানে পা বাড়াইবার তাহার প্রবৃত্তিই ছিল না। তলওয়ারকর তেওয়ারীর পিঠ ঠুকিয়া দিয়া সাহস দিয়া কহিল, তোমার চিন্তা নেই ঠাকুর, কোন কিছু হলেই আফিসে গিয়ে আমাকে সংবাদ দিয়ো।

গাড়ি ছাড়িতে বোধ করি তখনও মিনিট-পাঁচেক বিলম্ব ছিল, অপূর্ব হঠাৎ চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, ওই যে!

তলওয়ারকর ঘাড় ফিরাইতেই বুঝিল, এই সেই গিরীশ মহাপাএ। সেই বাহারে জামা, সেই সবুজ রঙের ফুল মোজা, সেই পাম্প শু এবং ছড়ি, প্রভেদের মধ্যে এখন কেবল সেই বাঘ-আঁকা রুমালখানি বুকপকেট ছাড়িয়া তাঁহার কণ্ঠে জড়ানো। মহাপাএ এই দিকেই আসিতেছিল, সুমুখে আসিতেই অপূর্ব ডাকিয়া কহিল, কি হে গিরীশ, আমাকে চিনতে পারো? কোথায় চলেচ?

গিরীশ শশব্যস্তে একটা মস্ত নমস্কার করিয়া কহিল, আজ্ঞে, চিনতে পারি বৈ কি বাবুমশায়। কোথায় আগমন হচ্ছেন?

অপূর্ব সহাস্যে কহিল, আপাততঃ ভামো যাচ্চি। তুমি কোথায়?

গিরীশ কহিল, আজ্ঞে, এনাঞ্জাং থেকে দু'জন বন্ধু নোক আসার কথা ছিল,—আমাকে কিন্তু বাবু ঝুটমুট হয়রান করা। হাঁ, আনে বটে কেউ কেউ আপিং সিদ্ধি নুকিয়ে, কিন্তু, আমি বাবু ভারী ধর্মভীরু মানুষ। বলি কাজ কি বাপু জুচ্চুরিতে—কথায় বলে পরোধর্ম ভয়াবয়। লল্লাটের লেখা ত খণ্ডাবে না!

অপূর্ব হাসিয়া কহিল, আমারও ত তাই বিশ্বাস। কিন্তু তোমার বাপু একটা ভুল হয়েছে, আমি পুলিশের লোক নই, আফিম সিদ্ধির কোন ধার ধারিনে,—সেদিন কেবল তামাশা দেখতেই গিয়েছিলাম।

তলওয়ারকর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতেছিল, কহিল, বাবুজী, ম্যয় নে আপকো ত জরুর কঁহা দেখা—

গিরীশ কহিল, আশ্চয্যি নেহি হ্যায় বাবু সাহেব, নোকরির বাস্তে কেত্তা যায়গায় ত ঘুমতা হ্যায়,—

অপূর্বকে বলিল, কিন্তু আমার ওপর মিথ্যা সন্দেহ রাখবেন না বাবুমশায়, আপনাদের নজর পড়লে চাকরিও একটা জুটবে না। বামুনের ছেলে, বাংলা লেখাপড়া, শাস্তর-টাস্তর সবই কিছু কিছু শিখেছিলাম, কিন্তু এমন অদেষ্ট যে—বাবুমশায় আপনারা—

অপূর্ব কহিল, আমি ব্রাহ্মণ।

আজ্ঞে, তা হলে নমস্কার। এখন তবে আসি,—বাবুসাহেব, রাম রাম—বলিতে বলিতে গিরীশ মহাপাত্র একটা উদ্গত কাশির বেগ সামলাইয়া লইয়া ব্যগ্রপদে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল।

অপূর্ব কহিল, এই সব্যসাচীটির পিছনেই কাকাবাবু সদলবলে এদেশ ওদেশ করে বেড়াচ্ছেন তলওয়ারকর! বলিয়া সে হাসিল। কিন্তু এই হাসিতে তলওয়ারকর যোগ দিল না।পরক্ষণে বাঁশী বাজাইয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিলে সে হাত বাড়াইয়া বন্ধুর করমর্দন করিল, কিন্তু তখনও মুখ দিয়া তাহার কথাই বাহির হইল না। নানা কারণে অপূর্ব লক্ষ্য করিল না, কিন্তু করিলে দেখিতে পাইত এই

মুহূর্তকালের মধ্যে রামদাসের প্রশস্ত উজ্জ্বল ললাটের উপরে যেন কোন এক অদৃশ্য মেঘের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে, এবং সেই সুদূর দুর্নিরীক্ষ্য লোকেই তাহার সমস্ত মনশ্চক্ষু একেবারে উধাও হইয়া গিয়াছে।

অপূর্ব প্রথমশ্রেণীর যাত্রী, তাহার কামরায় আর কেহ লোক ছিল না। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে সে পিরানের মধ্যে হইতে পৈতা বাহির করিয়া বিনা জলেই সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিল, এবং যে-সকল ভোজ্যবস্তু শাস্ত্রমতে স্পর্শদুষ্ট হয় না জানিয়া সে সঙ্গে আনিয়াছিল, পিতলের পাত্র হইতে বাহির করিয়া আহার করিল, জল ও পান তাহার ব্রাহ্মণ আরদালী পূর্বাহ্নেই রাখিয়া গিয়াছিলও, এবং শয্যাও সে প্রস্তুত করিয়া দিয়া গিয়াছিল, অতএব রাত্রির মত অপূর্ব ভোজনাদি শেষ করিয়া হাতমুখ ধুইয়া পরিতৃপ্ত সুস্থচিত্তে শয্যা আশ্রয় করিল। তাহার ভরসা ছিল প্রভাতকাল পর্যন্ত আর তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিবে না। কিন্তু ইহা যে কতবড় ভ্রম তাহা কয়েকটা স্টেশন পরেই সে অনুভব করিল। সেই রাত্রির মধ্যে বার-তিনেক তাহার ঘুম ভাঙ্গাইয়া পুলিশের লোক তাহার নাম ও ধাম ও ঠিকানা লিখিয়া লইয়াছে। একবার সে বিরক্ত হইয়া প্রতিবাদ করায় বর্মা সব-ইনস্পেক্টর সাহেব কটুকণ্ঠে জবাব দেয়, তুমি ত ইউরোপিয়ান নও!

অপূর্ব কহে, না। কিন্তু আমি ত ফার্স্ট ক্লাস প্যাসেঞ্জার,—রাত্রে ত আমার তুমি ঘুমের বিঘ্ন করিতে পারো না।

সে হাসিয়া বলে, ও নিয়ম রেলওয়ে কর্মচারীর জন্য,—আমি পুলিশ; ইচ্ছা করিলে আমি তোমাকে টানিয়া নীচে নামাইতে পারি।

ইহার পরে আর অপূর্ব প্রত্যুত্তর করে নাই। কিন্তু শেষের দিকে ঘণ্টা তিন-চারেক নিরুপদ্রবে কাটার পরে সকালে যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন বিগত রাত্রির গ্লানির কথা আর তাহার মনে ছিল না। একটা বড় পাহাড়ের অনতিদূর দিয়া গাড়ি মন্থর গতিতে চলিয়াছিল, খুব সম্ভব এটা চড়াইয়ের পথ। এইখানে জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া সে অকস্মাৎ বিস্ময়ে একেবারে স্তব্ধ

হইয়া রহিল। চক্ষের পলকে বুঝিল,পৃথিবীর এতবড় সৌন্দর্যসম্পদ সে আর কখনও দেখে নাই। গিরিশ্রেণী অর্ধবৃত্তাকারে বিস্তৃত হইয়া যেন পিছন ও সুমুখের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার বিরাট দেহ ব্যাপিয়া কি গভীর বন, এবং গগনস্পর্শী কি বিপুলকায় বৃক্ষরাজিই না তাহার সুবিস্তীর্ণ পাদমূল ঘেরিয়া সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছে! বোধ হয় সবেমাত্র সূর্যোদয় হইয়াছে,বামদিকের শিখর ডিঙাইয়া রথ তাঁহার আকাশে এখনও দেখা দেয় নাই, কিন্তু অগ্রবর্তী কিরণচ্ছটায় উপরের নীল অরণ্যে সোনা মাখাইয়া সেই তাঁহার আসার সংবাদ দিকে দিকে প্রচারিত হইতে আর বাকী নাই। খাদের মধ্যে শির-নিঃসৃত জলের ধারা বহিয়াছে, বনের ছায়ার নীচে তাহার শান্ত প্রবাহ অশ্রুরেখার মতই সকরুণ হইয়া উঠিয়াছে। অপূর্ব মুগ্ধ হইয়া গেল। একি আশ্চর্য সুন্দর দেশ! এখানে যারা যুগ-যুগান্ত ধরিয়া বাসা বাঁধিতে পাইয়াছে তাহাদের সৌভাগ্যের কি সীমা আছে? কিন্তু কেবলমাত্র সীমা নাই বলিয়া, শুধু একটা অনির্দিষ্ট আনন্দের আভাসমাত্র লইয়াই মানবের হৃদয় পূর্ণ-তৃপ্তি মানিতে চাহে না, তাই সে ইহাকে মূর্তি দিয়া, রূপ দিয়া মনে মনে সহস্রবিধ রসে ও রঙে পল্লবিত করিয়া ক্রোশের পর ক্রোশ অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিল। এমনি করিয়া তাহার ভাবুক চিত্ত যখন অন্তরে-বাহিরে আচ্ছন্ন অভিভূত হইয়া আসিতেছিল, তখন হঠাৎ যেন কঠিন ধাক্কায় চমকিয়া দেখিল তাহার কল্পনার রথচক্র মেদিনী গ্রাস করিতেছে। রামদাস তলওয়ারকরের কথাগুলা মনে পড়িল। আসিয়া পর্যন্ত এই ব্রহ্মদেশের অনেক গুপ্ত ও ব্যক্ত কাহিনী সে সংগ্রহ করিতেছিল।

সেই প্রসঙ্গে একদিন সে বলিয়াছিল, বাবুজী, শুধু কেবল শোভা-সৌন্দর্যই নয়, প্রকৃতি-মাতার দেওয়া এতবড় সম্পদও কম দেশে আছে। ইহার বন ও অরণ্য অপরিমেয়, মাটির মধ্যে ইহার অফুরন্ত তেলের প্রস্রবণ, ইহার মহামূল্য রত্নখানির মূল্য নিরূপিত হয় না, আর ওই যে আকাশচুম্বী মহাদ্রুমের সারি, জগতে ইহার তুলনা কোথায়? সে বেশী দিনের কথা নয়, সংবাদ পাইয়া একদিন

ইংরাজ বণিকের লুব্ধদৃষ্টি ইহারই প্রতি একেবারে একান্ত হইয়া পড়িল। তাহার অনিবার্য পরিণাম অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং সোজা। বিবাদ বাধিল, মানোয়ারি জাহাজ আসিল, বন্দুক-কামান আসিল, সৈন্যসামন্ত আসিল, লড়াই বাধিল, যুদ্ধে হারিয়া দুর্বল অক্ষম রাজা নির্বাসিত হইলেন এবং তাঁহার রানীদের গায়ের গহনা বেচিয়া লড়াইয়ের খরচ আদায় হইল। অতঃপর, দেশের ও দশের কল্যাণে, মানবতার কল্যাণে, সভ্যতা ও ন্যায়ধর্মের কল্যাণে ইংরাজ রাজশক্তি বিজিত দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়া তাহাদের অশেষবিধ ভালো করিতে কায়মনে লাগিয়া গেলেন। তাই ত আজ তথায় সতর্কতার অবধি নাই, তাই ত সেই বিজিত দেশের পুলিশ কর্মচারী তাহারই মত আর এক পরাধীন দেশের নিরীহ ব্যক্তিকে বারংবার ঘুম ভাঙ্গাইয়া নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারিল, তুমি ত সাহেব নও, যে তোমাকে অপমান করিতে আমার বাধিবে? অপূর্ব মনে মনে কহিল, বটেই ত! ইহার অধিক আমাকে সে কি দিবে ? ইহার বড় আমিই বা কোন্ মুখে তাহার কাছে দাবী, করিব ?

অরণ্যশিরে প্রভাতসূর্যের কনক আভা তখনও রঙ হারায় নাই, কিন্তু তাহার চোখে অত্যন্ত ম্লান ও ক্লান্তিহীন ঠেকিল, সমুন্নত পর্বতমালা তাহার কাছে সামান্য এবং বৃক্ষশ্রেণীর যে বিপুলতা দেখিয়া সে ক্ষণেক পূর্বে বিস্ময়-মুগ্ধ হইয়াছিল তাহারাই তাহার দৃষ্টিতে সাধারণ ও নিতান্ত বিশেষত্ববর্জিত বলিয়া বোধ হইল। তাহার নদীমাতৃক, সমতল, শস্যশ্যামল বঙ্গভূমিকে মনে পড়িয়া দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল,—প্রবাসী পীড়িতচিত্ত তাহার বুকের মধ্যে আর্তনাদ করিয়া যেন বার বার করিয়া বলিতে লাগিল, ওরে দুর্ভাগা দেশের শক্তিহীন নরনারী! ওই অশেষ ঐশ্বর্যময়ী জন্মভূমির প্রতি তোদের অধিকার কিসের? যে ভার, যে গৌরব তোরা বহিতে পারিবি না তাহার প্রতি এই ব্যর্থ-লোভ তোদের কিসের জন্য? স্বাধীনতার জন্মগত অধিকার আছে কেবল মনুষ্যত্বের, শুধু মানুষ বলিয়াই থাকে না; এ কথা আজ কে অস্বীকার করিবে? ভগবানও যে ইহা হরণ করিতে পারেন

না! তোদের ওই-সব ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, পঙ্গু হাত-পাগুলাকেই কি তোরা মানুষ বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়া আছিস? ভুল, ভুল; ইহার বড় আত্মঘাতী ভুল ত আর হইতেই পারে না! এমনি কত কি যে আপনাকে আপনি বলিতে বলিতে তাহার সময় কাটিতে লাগিল তাহার হিসাব ছিল না, অকস্মাৎ, ট্রেনের গতি মন্দীভূত হওয়ায় তাহার চেতনা হইল। তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিল গাড়ি স্টেশনের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

আট

ছেলেবেলা হইতেই মেয়েদের প্রতি অপূর্বর শ্রদ্ধা ছিল না। বরঞ্চ, কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণার ভাব ছিল। বৌদিদিরা ঠাট্টা-তামাশা করিলে সে মনে মনে রাগ করিত, ঘনিষ্ঠতা করিতে আসিলে দূরে সরিয়া যাইত। মা ভিন্ন আর কাহারও সেবাযত্ন তাহার ভালই লাগিত না। কোন মেয়ে কলেজে পড়িয়া একজামিন পাস করিয়াছে শুনিলে সে খুশী হইত না এবং সেদিন যখন বিলাতে ইহারা কোমড় বাঁধিয়া রাজনৈতিক অধিকারের জন্যে লড়াই করিতেছিল খবরের কাগজে সেই-সকল কাহিনী পড়িয়া তাহার সর্বাঙ্গ জ্বলিতে থাকিত। তবে একটা জিনিস ছিল, তাহার স্বভাবতঃ কোমল ভদ্র-হৃদয়। এইখানে সে নরনারী-নির্বিশেষে প্রাণিমাত্রকেই অত্যন্ত ভালবাসিত, কাহাকেও কোন কারণেই ব্যথা দিতে তাহার বাধিত। তাহার এই একটি দুর্বলতাই যে ভারতীকে অপরাধী জানিয়াও শেষ পর্যন্ত শাস্তি দিতে দেয় নাই এ সংবাদ তাহার অগোচর ছিল না। কিন্তু পুরুষের যৌবন-চিত্ততলে আরও যে অনেক প্রকারের দুর্বলতা একান্ত সংগোপনে বাস করে, সেই খবরটাই আজও তাহার কাছে পৌঁছে নাই। এই ক্রীশ্চান মেয়েটিকে কোনদিন কঠিন দণ্ড দেওয়া যে তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ইহা সত্য না হইতে পারে, কিন্তু নারীর প্রতি তাহার বিমুখতা সত্য বলিয়াই যে মন তাহার ভারতীকেও অনায়াসে চিরদিন দূরে সরাইয়া রাখিতে পারিবে তাহাও তেমনিই সত্য না হইতে পারে। অথচ, আজ যে সেই নিষ্ঠুর মিথ্যাচারিণী রমণীর প্রতি তাহার বিরাগ ও বিদ্বেষের অবধি ছিল না এ কথাও ত তাহার অন্তর্যামী দেখিতেছিলেন।

দিন-পনর হইল সে ভামোয় আসিয়াছে। এখানকার কাজ তাহার একপ্রকার সমাধা হইয়াছে, কাল-পরশু তাহার মিক্থিলা রওনা হইবার কথা। সন্ধ্যার পরে আজ অফিস হইতে ফিরিয়া নিজের ঘরের বারান্দায় বসিয়া সে মনে

মনে একটা অত্যন্ত জটিল সমস্যার সমাধানে নিযুক্ত ছিল। নারীর স্বাধীনতার প্রসঙ্গে মন তাহার কোনকালেই সায় দিতে চাহিত না। ইহাতে মঙ্গল নাই, ইহা ভাল নয়—তাহার রুচি ও আজন্ম সংস্কার এ কথা অনুক্ষণ তাহার কানে কানে বলিত। অথচ, শাস্ত্রীয় অনুশাসনগুলার মধ্যেও যে ইহাদের প্রতি গভীর অবিচার নিহিত আছে এ সত্য তাহার ন্যায়নিষ্ঠ চিত্ত কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারিত না। ইহাতে সে দুঃখ পাইত কিন্তু পথ পাইত না। অকস্মাৎ, আজ এই দ্বিধা তাহার যে কারণে একেবারে কাটিয়া গেল তাহা এইরূপ—

যে দ্বিতল ঘরটিতে সে বাসা লইয়াছে তাহার নীচের তলায় একটি ব্রহ্মদেশীয় ভদ্রলোক সপরিবারে বাস করিতেছিলেন। সকালে আফিসে যাইবার পূর্বে তাঁহার সংসারে এক বিষম অনর্থ ঘটে। তাঁহার চার কন্যা, সকলেই বিবাহিতা। কি একটা উৎসব উপলক্ষে জামাতারা সকলেই আজ উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভোজের সময় সম্ভ্রম ও ইজ্জত লইয়া প্রথমে মেয়েদের মধ্যে, এবং অনতিকাল পরেই বাবাজীবনদের মধ্যে লাঠালাঠি রক্তারক্তি বাধিয়া যায়; অপূর্ব খবর লইতে গিয়া হতবুদ্ধি হইয়া শুনিল যে ইঁহাদের একজন মাদ্রাজের চুলিয়া মুসলমান, একজন চট্টগ্রামের বাঙালী-পর্তুগীজ, একজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সাহেব, এবং ছোট-জামাতাটি চীনা, কয়েক পুরুষ হইতে এই শহরেই বাস করিয়া চামড়ার কারবার করিতেছেন।

এইরূপ পৃথিবীসুদ্ধ জাতির শ্বশুর হইবার গৌরব অন্যত্র দুর্লভ হইলেও এখানে অতিশয় সুলভ। তত্রাচ, প্রতিবারেই নাকি ভদ্রলোক সভয়ে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু মেয়েদের অপ্রতিহত স্বাধীনতা তাহাতে কান পর্যন্ত দেয় নাই। এক-একদিন এক-একটি কন্যাকে বাটীর মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, আবার এক-একদিন করিয়া তাহারা ফিরিয়া আসিল, এবং সঙ্গে আসিল এই বিচিত্র জামাইয়ের দল। তাহাদের ভাষা আলাদা, ভাব আলাদা, ধর্ম আলাদা, মেজাজ আলাদা,—শিক্ষা সংস্কার কাহারও সহিত কাহারও এক নয়,–এই যে দেশের মধ্যে

ভারতের হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নের মত ধীরে ধীরে এক অতি কঠিন সমস্যার উদ্ভব হইতেছে ইহার মীমাংসা হইবে কি করিয়া? ক্ষোভে, দুঃখে, ক্রোধে, বিরক্তিতে সে মনে মনে লাফাইতে লাগিল, এবং মেয়েদের এই সামাজিক স্বাধীনতাকেই একশ' বার করিয়া বলিতে লাগিল, এ হইতেই পারে না,—এমন কিছুতেই চলিবে না। বর্মা নষ্ট হইতেছে, ইয়োরোপ উচ্ছন্ন যাইতে বসিয়াছে—সেই ধার-করা সভ্যতা আমাদের দেশেও আমদানি করিলে আমরা সমূলে মরিব। আমাদের সমাজ যাঁহারা গড়িয়াছিলেন নারীকে তাঁহারা চিনিয়াছিলেন, তাই ত এই সতর্ক বিধি-নিষেধ। ইহা কঠোর হউক, কিন্তু কল্যাণে পরিপূর্ণ। এ দুর্দিনে যদি না তাঁহাদের অসংশয়ে ধরিয়া থাকিতে পারি ত, মৃত্যু হইতে কেহই আমাদের বাঁচাইতে পারিবে না। এমনি ধারা কত কি সেই অন্ধকারে একাকী বসিয়া আপন মনে বলিয়া চলিতে লাগিল। কিন্তু হায় রে! এই সোজা কথাটা তাহার একবারও উদয় হইল না যে, যে মুক্তিমন্ত্রকে সে এ জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া কায়মনে গ্রহণ করিতে চাহিতেছে, তাহারই আর এক মূর্তিকে সে দুই হাতে ঠেলিয়া মুক্তির সত্যকার দেবতাকেই অসম্মানে দূর করিয়া দিতেছে! মুক্তি কি তোমার এমনই ছোট্ট একটুখানি জিনিস? তাহাকে কি তোমার আরামে চোখ বুজিয়া স্নান করিবার চৌবাচ্চা স্থির করিয়া বসিয়া আছ? সে সমুদ্র। আছেই ত তাহাতে ভয়, আছেই ত তাহাতে উত্তাল তরঙ্গ, আছেই ত তাহাতে কুমির হাঙ্গর! তরী সেইখানেই ডোবে,—তবু সেইখানেই আছে জগতের প্রাণ, তারই মধ্যে আছে সকল শক্তি, সকল সম্পদ, সকল সার্থকতা। নিরাপদ পুকুর লইয়া কেবলমাত্র প্রাণধারণ করাটুকুই চলে, বাঁচা চলে না।

বাবুজী, আপনার খাবার তৈরি।

অপূর্ব চকিত হইয়া কহিল, রামশরণ, একটা আলো নিয়ে আয়। কাল সকালের গাড়িতেই আমরা মিক্থিলা যাবো। ম্যানেজারকে একটা খবর পাঠিয়ে দে।

আরদালি কহিল, কিন্তু আপনার যে পরশু যাবার কথা ছিল?

না, আর পরশু নয়, কালই,—একটা আলো দিয়ে যা, এই বলিয়া অপূর্ব এ সম্বন্ধে আলোচনা বন্ধ করিয়া দিল। সমাজের মধ্যে মেয়েদের স্বাধীনতার একটা নূতন দিক দেখিয়া মন তাহার উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু আরও যে দিক আছে, যাহার বর্ণ ও আলো সমস্ত গগন উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতে পারে, এ দৃশ্য আজ তাহার মনে স্বপ্নেও উদয় হইল না।

পরদিন যথাসময়ে সে মিক্‌থিলার উদ্দেশে যাত্রা করিল। কিন্তু এখানে আসিয়া তাহার মন টিকিল না। দেশী ও বিলাতী পল্টনের ছাউনি আছে, বাঙালী অনেকগুলি সপরিবারে বাস করিতেছেন,—খাসা শহর, নূতন লোকের পক্ষে দেখিয়া বেড়াইবার অনেক বস্তু আছে, কিন্তু এ-সকল তাহার ভালই লাগিল না। মনটা রেঙ্গুনের জন্য কেবলই ছটফট করিতে লাগিল। ভামোয় থাকিতে রিডাইরেক্ট-করা মায়ের একখানা পত্র সে পাইয়াছিল, রামদাসেরও গোটা-দুই চিঠি তারপর আসিয়াছিল, কিন্তু সেও প্রায় দশ-বারোদিন পূর্বে।

রামদাস জানাইয়াছিল তাহার ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত বাসাবদল করিবার প্রয়োজন নাই, এবং সে নিজে গিয়া দেখিয়া শুনিয়া আসিয়াছে তেওয়ারীজী সুখে এবং শান্তিতে বাস করিতেছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই সে কেমন আছে, তাহার সুখ-শান্তি বজায় আছে, কিংবা দুই-ই অন্তর্হিত হইয়াছে কোন খবরই তাহাকে দেওয়া হয় নাই। খুব সম্ভব সমস্তই ঠিক আছে, ব্যাঘাত কিছুই হয় নাই কিন্তু তবু একদিন সে ভামোর মতই হঠাৎ জিনিসপত্র বাঁধিয়া স্টেশনের জন্য গাড়ি ডাকিতে হুকুম করিয়া দিল। এই স্থানটাকে মনে রাখিবার মত কিছুই তাহার ঘটে নাই, যৎসামান্য কাজকর্মের মধ্যে বিশেষত্ব কিছুই ছিল না, কিন্তু ছাড়িয়া যাইবার মিনিট-পনর পূর্বে স্টেশনে আসিয়া এমন একটা ব্যাপার ঘটিল যাহা আপাততঃ সামান্য ও সাধারণ বোধ হইলেও ভবিষ্যতে বহুদিন তাহাকে স্মরণ করিতে হইয়াছে। একজন মাতাল বাঙালীর ছেলেকে রেলের লোকে ট্রেন হইতে নামাইয়াছে। পরনে

তাহার মলিন ও ছিন্ন হ্যাট-কোট প্রভৃতি বিলাতি পোশাক। সঙ্গে কেবল একটা ভাঙ্গা বেহালার বাক্স, না আছে বিছানা, না আছে কিছু। টিকিটের পয়সায় সে মদ কিনিয়া খাইয়াছে এইমাত্র তাহার অপরাধ। বাঙালীর ছেলে, পুলিশে লইয়া যায়, – অপূর্ব তাহার ভাড়া চুকাইয়া দিল, আরও গোটা-পাঁচেক টাকা তাহার হাতে দিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িতেছিল, হঠাৎ সে হাতজোড় করিয়া কহিল, মশাই, আমার এই বেহালাখানা আপনি নিয়ে যান। বিক্রি করে টাকাটা আপনার কেটে নিয়ে বাকী আমাকে ফিরিয়ে দেবেন। তাহার কণ্ঠস্বরের জড়িমা সত্ত্বেও ইহা বুঝা গেল সে সজ্ঞানেই কথা কহিতেছে।

অপূর্ব কহিল, কোথায় ফিরিয়ে দেব?

সে কহিল, আপনার ঠিকানা বলে দিন, আপনাকে আমি চিঠি লিখে জানাব।

অপূর্ব কহিল, তোমার বেহালা তোমার থাক বাপু, ও আমি বিক্রি করতে পারব না। আমার নাম অপূর্ব হালদার, রেঙ্গুনের বোথা কোম্পানিতে চাকরি করি, যদি কখনো তোমার সুবিধে হয় টাকা পাঠিয়ে দিয়ো।

সে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আচ্ছা মশাই, নমস্কার,—আমি নিশ্চয় পাঠিয়ে দেব। বার হবার পথ বুঝি ওই দিকে? বেশ বড় শহর, না? বোধ হয় সব জিনিসই পাওয়া যায়! বাস্তবিক মশায়, আপনার দয়া আমি কখনো ভুলব না। এই বলিয়া সে আর একটা নমস্কার করিয়া বেহালার বাক্স বগলে চাপিয়া চলিয়া গেল। তাহার চেহারাটা এইবার অপূর্ব লক্ষ্য করিয়া দেখিল। বয়স বেশী নয় কিন্তু ঠিক কত বলা শক্ত। বোধ হয় সর্বপ্রকার নেশার মাহাত্ম্যে বছর-দশেকের ব্যবধান ঘুচিয়া গেছে। বর্ণ গৌর, কিন্তু রৌদ্রে পুড়িয়া তামাটে হইয়াছে; মাথার রুক্ষ লম্বা চুল কপালের নীচে ঝুলিতেছে, চোখের দৃষ্টি ভাসা-ভাসা, নাক খাঁড়ার মত সোজা এবং তীব্র। দেহ শীর্ণ, হাতের আঙুলগুলা দীর্ঘ এবং সরু—সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া উপবাস ও অত্যাচারের চিহ্ন আঁকা। সে চলিয়া গেলে অপূর্বর কেমন যেন একটা কষ্ট

হইতে লাগিল। তাহাকে আর অধিক টাকা দেওয়া বৃথা, এমন কি অন্যায়—এ কথা সে বুঝিয়াছিল, কিন্তু আর কোন-কিছু একটা উপকার করা যদি সম্ভব হইত! কিন্তু, এ লইয়া চিন্তা করিবার আর সময় ছিল না, তাহাকে টিকিট কিনিয়া গাড়ির জন্য প্রস্তুত হইতে হইল।

পরদিন রেঙ্গুনে যখন সে পৌঁছিল তখন বেলা বারোটা। যেমন কড়া রৌদ্র, তেমনি গোমট গরম। তাহার উপর বিপদ এই হইয়াছিল যে তাড়াতাড়ি ও অসাবধানে তাহার খাবারের পাত্রটা মুসলমান কুলি ছুঁইয়া ফেলিয়াছিল। স্নান নাই, আহার নাই,—ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্লান্তিতে তাহার দেহ যেন টলিতে লাগিল।

কোনমতে বাসায় পৌঁছিয়া স্নান করিয়া একবার শুইতে পাইলে যেন বাঁচে। ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া হইয়া আসিলে জিনিসপত্র বোঝাই দিয়া বাসার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে মিনিট-দশেক মাত্র লাগিল। কিন্তু উপরের দিকে চাহিয়া তাহার ক্রোধের অবধি রহিল না। তেওয়ারীর কোন উৎকণ্ঠাই নাই, রাস্তার দিকে বারান্দার কবাটটা পর্যন্ত খোলে নাই, গাড়ির শব্দে একবার নামিয়াও আসিল না। দ্রুতপদে উঠিয়া গিয়া দ্বারের উপরে সজোরে করাঘাত করিয়া ডাকিল,—তেওয়ারী! ওরে ও তেওয়ারী! ক্ষণকাল পরে আস্তে, অত্যন্ত সাবধানে কবাট খুলিয়া গেল। ক্রুদ্ধ অপূর্ব ঘরের মধ্যে পা বাড়াইবে কি বিস্ময়ে অবাক ও হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সুমুখে দাঁড়াইয়া ভারতী। তাহার এ কি মূর্তি! পায়ে জুতা নাই, পরনে একখানি কালো রঙের শাড়ী, চুল শুকনো এলোমেলো, মুখের উপর শান্ত-গভীর বিষাদের ছায়া,—এ যেন কোন বহুদূরের তীর্থযাত্রী, রোদে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া, অনাহারে অনিদ্রায় রাত্রি-দিবা পথ চলিয়াছে—যে-কোন মুহূর্তেই পথের পরে পড়িয়া মরিতে পারে। ইহার প্রতি কেহ যে কোনদিন রাগ করিতে পারে অপূর্ব মনে করিতেই পারিল না। ভারতী মাথা নোয়াইয়া একটু নমস্কার করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, আপনি এসেছেন,—এবার তেওয়ারী বাঁচবে।

ভয়ে অপূর্বর স্বর জড়াইয়া গেল, কহিল, কি হয়েছে তার?

ভারতী তেমনিই মৃদুকণ্ঠে বলিল, এদিকে অনেকের বসন্ত হচ্চে, তারও হয়েচে। কিন্তু আপনি ত এখন এত পরিশ্রমের পরে এ ঘরে ঢুকতে পারেন না। উপরের ঘরে চলুন, ঐখানে বরঞ্চ স্নান করে একটু জিরিয়ে নীচে আসবেন। তা ছাড়া ও ঘুমোচ্চে, জাগলে আপনাকে খবর দেব।

অপূর্ব আশ্চর্য হইয়া কহিল, উপরের ঘরে?

ভারতী বলিল, হাঁ। ঘরটা এখনো আমাদেরই আছে, কিন্তু আমি চলে গেছি। বেশ পরিষ্কার করা আছে, কলে জল আছে, কেউ নেই, আপনার কষ্ট হবে না, চলুন। কিন্তু আপনার লোকজন কৈ? সঙ্গের জিনিসপত্রগুলো তারা ওইখানেই নিয়ে আসুক।

কিন্তু তাদের ত আমি স্টেশন থেকেই ছেড়ে দিয়েচি। তারাও ত আমারি মত ক্লান্ত হয়েছিল।

ভারতী কহিল, তা বটে, কিন্তু এখন কি কুলী পাওয়া যাবে? আচ্ছা দেখি।

আপনাকে দেখতে হবে না, আমিই দেখচি। ওই ক'টা জিনিস আমি নিজেই আনতে পারবো, বলিয়া অপূর্ব নীচে যাইতেছিল, গাড়োয়ান মুখ বাড়াইয়া ভাড়া চাহিল। ভারতী তাহাকে ইশারায় উপরে ডাকিয়া কহিল, এখন ত লোক পাওয়া যাবে না, তুমি যদি একটু কষ্ট করে জিনিসগুলো তুলে দিয়ে যাও তোমাকে তার দাম দেব। তাহার স্নিগ্ধ কথায় খুশী হইয়া গাড়োয়ান জিনিস আনিতে গেল।

সমস্ত আসিয়া পড়িলে ভারতী পথের দিকের ঘরটায় মেঝের উপরে পরিপাটি করিয়া নিজের হাতে বিছানা করিয়া দিয়া কহিল, এইবার স্নান করে আসুন।

অপূর্ব কহিল, সমস্ত ব্যাপারটা আগে আমাকে খুলে বলুন।

ভারতী কলের ঘরটা দেখাইয়া দিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, না, আগে স্নান করে আপনার সন্ধ্যে-আহ্নিকগুলো সেরে আসুন।

অপূর্ব জিদ করিল না। খানিক পরে সে স্নান প্রভৃতি সারিয়া আসিলে ভারতী একটু হাসিয়া বলিল, আপনার এই গেলাসটা নিন, জানালার উপরে কাগজে মোড়া ওই চিনি আছে, নিয়ে আমার সঙ্গে কলের কাছে আসুন, কি করে শরবত তৈরি করতে হয় আমি শিখিয়ে দিই। চলুন।

অধিক বলার প্রয়োজন ছিল না, তৃষ্ণায় তাহার বুক ফাটিতেছিল, সে নির্দেশমত শরবত তৈরি করিয়া পান করিল, এবং একটু নেবুর রস হইলে আরও ভাল হইত তাহা নিজেই কহিল।

ভারতী বলিল, আপনাকে যে আরও একটা দুঃখ আমাকে দিতে হবে, বলিয়া সে মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অপূর্বর সেই চুরির দিনের কথাবার্তা, কাজকর্মের ধরন-ধারণ মনে পড়িয়া নিজেরও কথা কহা যেন সহজ হইয়া পড়িল, জিজ্ঞাসা করিল, কি রকম দুঃখ?

ভারতী কহিল, নীচে থেকে আমি কয়লা এনে রেখেচি, টেলিগ্রাম পেয়ে সুমুখের বাড়ির উড়ে ছেলেটিকে দিয়ে আপনার সেই লোহার উনুনটি মাজিয়ে ধুইয়ে নিয়েচি,—চাল আছে, ডাল আছে, আলু, পটল, ঘি, তেল, নুন সমস্ত মজুত আছে,—পেতলের হাঁড়িটি এনে দিচ্চি আপনি শুধু একটু জল দিয়ে ধুয়ে নিয়ে চড়িয়ে দেবেন। এই বলিয়া সে অপূর্বের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মনের ভাব আন্দাজ করিয়া বলিল, সত্যি বলচি, কিচ্ছু শক্ত কাজ নয়। আমি সমস্ত দেখিয়ে দেব, আপনি শুধু চড়াবেন আর নামাবেন। আজকের মত এই কষ্টটি করুন, কাল অন্য ব্যবস্থা হবে।

তাহার কণ্ঠস্বরের ঐকান্তিক ব্যাকুলতা অপূর্বকে হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা মারিল। সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু আপনার খাবার ব্যবস্থা কি-রকম হয়? কখন বাসায় যান?

ভারতী কহিল, বাসায় নাই গেলাম, কিন্তু আমাদের খাবার ভাবনা আছে নাকি? এই বলিয়া সে কথাটা উড়াইয়া দিয়া প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি আনিতে তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল।

ঘণ্টা-খানেক পরে অপূর্ব রাঁধিতে বসিলে সে ঘরের চৌকাটের বাহিরে দাঁড়াইয়া কহিল, এখানে দাঁড়ালে দোষ হয় না তা জানেন ত ?

অপূর্ব কহিল, জানি, কারণ, হলে আপনি দাঁড়াতেন না। জীবনে সে এই প্রথম রাঁধিতে বসিয়াছে অপটু হস্তের সহস্র ত্রুটিতে মাঝে মাঝে ভারতীর ধৈর্যচ্যুতি হইতে লাগিল, কিন্তু রাঁধা ডাল বাটিতে ঢালিতে গিয়া যখন বাটি ছাড়া আর সর্বত্রই ছড়াইয়া পড়িল, তখন সে আর সহিতে পারিল না। রাগ করিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, আচ্ছা, আপনাদের মত অকর্মা লোকগুলোকে কি ভগবান সৃষ্টি করেন শুধু আমাদের জব্দ করতে? খাবেন কি করে বলুন ত?

অপূর্ব নিজেই অপ্রতিভ হইয়াছিল, কহিল, এ যে হাঁড়ির ওদিক দিয়ে না পড়ে এদিক দিয়ে গড়িয়ে পড়বে কি করে জানব বলুন? আচ্ছা, ওপর থেকে একটু তুলে নেব?

ভারতী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, নেবেন বৈ কি! নইলে আর বিচার থাকবে কি করে! নিন উঠুন, জল দিয়ে ও-সব ধুয়ে ফেলে দিয়ে এই আলু-পটলগুলো তেল আর জল দিয়ে সেদ্ধ করে ফেলুন। গুঁড়ো মশলা ওই শিশিটাতে আছে, নুন দেবার সময়ে আমি না হয় দেখিয়ে দেব,—তরকারি বলে ওই দিয়ে আজ আপনাকে খেতে হবে। ভাতের ফ্যান ত সব ভাতের মধ্যেই আছে, নেহাত মন্দ হবে না। আঃ—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনার রান্না দেখার চেয়ে বরং নরকভোগ ভাল।

ইহার ঘণ্টা-দেড়েক পরে অপূর্বর আহার শেষ হইলে সে কৃতজ্ঞতার আবেগ দমন করিয়া শান্ত-মৃদুকণ্ঠে কহিল, আপনাকে আমি যে কি বলব ভেবে

পাইনে, কিন্তু এবার আপনি বাসায় যান। এখন থেকে আমিই দেখতে পারব, আর আপনাকে বোধ হয় এত দুঃখ ভোগ করতে হবে না।

ভারতী চুপ করিয়া রহিল। অপূর্ব নিজেও ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিতে লাগিল, কিন্তু ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলুন। এদিকে আরও দশজনের বসন্ত হচ্চে, তেওয়ারীরও হয়েচে—এ পর্যন্ত খুব সোজা। কিন্তু এ বাসা থেকে আপনাদের সবাই চলে গেলে এই নির্বান্ধব দেশে এবং ততোধিক বন্ধুহীন পুরীতে আপনি কি করে যে তার প্রাণ দিতে রয়ে গেলেন, এইটেই আমি কোন মতে ভেবে পাইনে। জোসেফ সাহেবও কি আপত্তি করেন নি?

ভারতী কহিল, বাবা বেঁচে নেই, তিনি হাসপাতালেই মারা গেছেন।

মারা গেছেন? অপূর্ব অনেকক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকিয়া বলিল, আপনার কালো কাপড় দেখে এমনি কোন একটা ভয়ানক দুর্ঘটনা আমার পূর্বেই অনুমান করা উচিত ছিল।

ভারতী কহিল, তার চেয়েও বড় দুর্ঘটনা ঘটলো হঠাৎ মা যখন মারা গেলেন –

মা মারা গেছেন? অপূর্ব স্তব্ধ অসাড় হইয়া বসিয়া রহিল। নিজের মায়ের কথা মনে পড়িয়া তাহার বুকের মধ্যে কি-একরকম করিতে লাগিল কখনো সে পূর্বে অনুভব করে নাই। ভারতী নিজেও জানালার বাহিরে মিনিট-দুই নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া অশ্রু সংবরণ করিল। মুখ ঘুরাইতে গিয়া দেখিল অপূর্ব সজলচক্ষে তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। আবার তাহাকে জানালার বাহিরে চোখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইল। কাহারো কাছেই অশ্রুপাত করিতে তাহার অত্যন্ত লজ্জা করিত। কিন্তু আপনাকে শান্ত করিয়া লইতেও তাহার বিলম্ব হইত না, মিনিট দুই-তিন পরে ধীরে ধীরে বলিল, তেওয়ারী বড় ভাল লোক। আমার মা অনেকদিন থেকেই শয্যাগত ছিলেন, যে-কোন সময়েই তাঁর মৃত্যু হতে

পারে আমরা সবাই জানতুম। তেওয়ারী আমাদের অনেক করেছে। আমার চলে যাবার সময় সে কাঁদতে লাগলো, কিন্তু এত ভাড়া আমি কোথা থেকে দেব?

অপূর্ব নীরবে শুনিতে লাগিল। ভারতী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আপনার সেই চুরি ধরা পড়েচে,—টাকা, বোতাম পুলিশে জমা আছে আপনি খবর পেয়েছেন?

কৈ না!

হাঁ, ধরা পড়েচে। ওকে যারা সেদিন তামাশা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল তাদেরই দল। আরও কার কার চুরি করার পরে বোধ হয় ভাগাভাগি নিয়ে বনিবনাও না হওয়াতেই একজন সমস্ত বলে দিয়েছে। এক চেঠির দোকানে যা-কিছু জমা রেখেছিল, পুলিশ সমস্ত উদ্ধার করেচে। আমি একজন সাক্ষী, এইখানে সন্ধান নিয়ে তারা একদিন আমার কাছে উপস্থিত,—সেই খবরটা দিতে এসেই ত দেখি এই ব্যাপার। কবে মকদ্দমা ঠিক জানিনে, কিন্তু সমস্ত ফিরে পাওয়া যাবে শুনেচি।

এই শেষ-কথাটা হয়ত সে না বলিলেই পারিত; কারণ লজ্জায় অপূর্বর মুখ শুধু আরক্তই হইল না, এই ব্যাপারে নিজের সেই-সকল ব্যক্ত ও অব্যক্ত ইঙ্গিতগুলা মনে করিয়া তাহার গায়ে কাঁটা দিল। কিন্তু ভারতী এ-সব লক্ষ্যও করিল না, বলিতে লাগিল, ভেতর থেকে দোর বন্ধ, কিন্তু হাজার ডাকাডাকিতেও কেউ সাড়া দিলে না। আমাদের উপরের ঘরের চাবিটা আমার কাছে ছিল, খুলে ভেতরে গেলাম। মেঝেতে আমার একটা প্রসিদ্ধ ফুটো আছে,—বলিয়া সে একটুখানি লজ্জার মৃদুহাসি গোপন করিয়া কহিল, তার মধ্যে দিয়ে আপনার ঘরের সমস্ত দেখা যায়, দেখি, সমস্ত জানালা বন্ধ, অন্ধকারে কে একজন আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে,—তেওয়ারী বলেই বোধ হল। সেই ফুটো দিয়ে চেঁচিয়ে এক শ' বার বললাম, তেওয়ারী, আমি, আমি ভারতী, কি হয়েছে দোর খোল। নীচে এসে আবার তেমনি ডাকাডাকি করতে লাগলাম, মিনিট-কুড়ি পরে তেওয়ারী হামাগুড়ি দিয়ে এসে কোনমতে দোর খুলে দিলে। তার চেহারা দেখে আমার

বলবার কিছু আর রইল না। দিন-চারেক পূর্বে সুমুখের বাড়ির নীচের ঘর থেকে বসন্ত-রোগী জন-দুই তেলেগু কুলীকে পুলিশের লোকে হাসপাতালে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তাদের কান্না আর অনুনয়-বিনয় তেওয়ারী নিজের চোখে দেখেছে,—আমার পা-দুটো সে দু হাতে চেপে ধরে একেবারে হাউহাউ করে কেঁদে উঠে বললে, মাইজী, আমাকে পেলেগ হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়ো না তাহলে আমি আর বাঁচব না।

কথাটা মিথ্যে নেহাত নয়, ফিরতে কাউকে বড় শোনা যায় না । সেই ভয়ে সে দোর-জানালা দিবারাত্রি বন্ধ করে পড়ে আছে,—পাড়ার কেউ ঘুণাক্ষরে জানলে আর রক্ষে নেই।

অপূর্ব অভিভূতের ন্যায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, কহিল, আর সেই থেকে আপনি একলা দিনরাত আছেন,—আমাকে একটা খবর পাঠালেন না কেন? আমাদের আফিসের তলওয়ারকরবাবুকে ত জানেন, তাঁকে বলে পাঠালেন না কেন?

ভারতী কহিল, কে যাবে? লোক কৈ? ভেবেছিলাম, হয়ত খবর নিতে একদিন তিনি আসবেন, কিন্তু এলেন না। এ বিপদ যে ঘটেচে তিনিই-বা কি করে ভাববেন? তা ছাড়া জানাজানি হয়ে যাবার ভয় আছে।

তা বটে। বলিয়া অপূর্ব একটা দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে কহিল, আপনার নিজের চেহারা কি হয়ে গেছে দেখেছেন?

ভারতী একটু হাসিয়া বলিল, অর্থাৎ এর চেয়ে আগে ঢের ভাল ছিল?

অপূর্বর মুখে সহসা এ কথার উত্তর যোগাইল না, কিন্তু তাহার দুই চোখের মুগ্ধদৃষ্টি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার গঙ্গাজল দিয়া যেন এই তরুণীর সর্বাঙ্গের সকল গ্লানি, সকল ক্লান্তি ধুইয়া মুছিয়া দিতে চাহিল। অনেকক্ষণ পরে কহিল, মানুষে যা করে না, তা আপনি করেছেন, কিন্তু এবার আপনার ছুটি। তেওয়ারী শুধু

আমার চাকর নয়, সে আমার বন্ধু, আমার আত্মীয়,—তার কোলে পিঠে চড়ে আমি বড় হয়েচি। এখন থেকে তার রোগে আমিই সেবা করব,—কিন্তু তার জন্যে আপনাকে আমি পীড়িত হতে দিতে পারব না। এখনো আপনার স্নানাহার হয়নি, আপনি বাসায় যান। সে কি এখান থেকে বেশী দূরে?

ভারতী মাথা নাড়িয়া কহিল, আচ্ছা। বাসা আমার তেলের কারখানার পাশে, নদীর ধারে। আমি কাল আবার আসব। দুইজনে নীচে নামিয়া আসিল, তালা খুলিয়া উভয়ে ঘরে প্রবেশ করিল। তেওয়ারীর সাড়া নাই, ঘুম ভাঙ্গিলেও সে অধিকাংশ সময় অজ্ঞান আচ্ছন্নের মত পড়িয়া থাকে। অপূর্ব গিয়া তাহার বিছানার পাশে বসিল। এবং যে দুই-চারিটা অপরিষ্কার পাত্র তখনও মাজিয়া ধুইয়া রাখা হয় নাই, সেইগুলি হাতে লইয়া ভারতী স্নানের ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার ইচ্ছা ছিল যাইবার পূর্বে রোগীর সম্বন্ধে গোটা-কয়েক প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়া এই দুর্দান্ত ভয়ানক রোগের মধ্যে আপনাকে সাবধানে রাখিবার অত্যাবশ্যকতা বার বার স্মরণ করাইয়া দিয়া যায়। হাতের কাজ শেষ করিয়া সে এই কথাগুলিই মনে মনে আবৃত্তি করিয়া এ ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল অপূর্ব অচেতন তেওয়ারীর অতি-বিকৃত মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া যেন পাথরের মূর্তির মত বসিয়া আছে, তাহার নিজের মুখ একেবারে ছাইয়ের মত সাদা। বসন্ত রোগ সে জীবনে দেখে নাই, ইহার ভীষণতা তাহার কল্পনার অগম্য। ভারতী কাছে গিয়া দাঁড়াইতে সে মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার দুই চক্ষু ছলছল করিয়া আসিল, এবং সেই চক্ষে পলক না পড়িতেই ঠিক ছেলেমানুষের মতই ব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আমি পারব না।

নয়

ভারতী ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া শুধু কহিল,পারবেন না? তাই ত!

তাহার কণ্ঠস্বরে একটুখানি বিস্ময়ের আভাস ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, কিন্তু এই কি জবাব? এই কি সে তাহার কাছে আশা করিয়াছিল? হঠাৎ যেন মার খাইয়া অপূর্বর তন্দ্রা ছুটিয়া গেল।

ভারতী কহিল, তাহলে একটা খবর দিয়ে ত ওকে হাসপাতালেই পাঠাতে হয়। তাহার কথার মধ্যে শ্লেষও ছিল না, ঝাঁজও ছিল না, কিন্তু লজ্জায় অপূর্বর মাথা হেঁট হইল। লজ্জা শুধু তাহার না-পারার জন্য নয়, যে পারে তাহাকেই পারিতে বলার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতের মধ্যে লুকাইয়া আরও প্রচ্ছন্ন যে দাবী ছিল, ভারতীর শান্ত প্রত্যাখ্যানে সে যখন কঠিন তিরস্কারের আকারে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে বাজিল, তখন আনতমুখে বসিয়া অত্যন্ত অনুশোচনার সহিত তাহাকে আর একবার মনে করিতে হইল, এই মেয়েটিকে সে যথার্থই চিনে নাই। দুঃখ দুশ্চিন্তা কোথাও কিছু ছিল না,—ছিল যেন কেবল কত দীপ, কত আলো জ্বালা;—হঠাৎ কে যেন সমস্ত এক ফুঁয়ে নিবাইয়া দিয়া অসমাপ্ত নাটকের মাঝখানে যবনিকা টানিয়া দিল। ভয়ানক অন্ধকারে রহিল শুধু সে আর তাহার অপরিত্যাজ্য মরণোন্মুখ অচেতন তেওয়ারী।

ভারতী বলিল, বেলা থাকতে থাকতেই কিছু করা চাই। বলেন ত আমি যাবার পথে হাসপাতালে একটা টেরিফোঁ করে দিয়ে যেতে পারি। তারা গাড়ি এনে তুলে নিয়ে যাবে।

অপূর্ব তাহার আচ্ছন্ন ভাব জোর করিয়া কাটাইয়া মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু আপনি যে বললেন সেখানে গেলে কেউ বাঁচে না?

ভারতী কহিল, কেউ বাঁচে না এ কথা ত বলিনি।

অপূর্ব অত্যন্ত মলিনমুখে বলিল, তাহলে বেশী লোকেই ত মরে যায়?

ভারতী মাথা নাড়িয়া বলিল, তা যায়। এই জন্যই জ্ঞান থাকতে কেউ সেখানে কিছুতে যেতে চায় না।

অপূর্ব চুপ করিয়া ক্ষণকাল বসিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, তেওয়ারীর কি কিচ্ছু জ্ঞান নেই?

ভারতী কহিল, কিছু আছে বৈ কি। সব সময়ে না থাকলেও মাঝে মাঝে সমস্তই টের পায়।

এই সময়ে তেওয়ারী সহসা কি-একপ্রকার আর্তনাদ করিয়া উঠিতে অপূর্ব এমনি চমকিয়া উঠিল যে, ভারতী তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইল। সে কাছে আসিয়া রোগীর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিল, কি চাই তেওয়ারী?

তেওয়ারী ঠোঁট নাড়িয়া যাহা বলিল, অপূর্ব তাহার কিছুই বুঝিল না, কিন্তু ভারতী সাবধানে তাহাকে পাশ ফিরাইয়া দিয়া ঘটি হইতে একটুখানি জল তাহার মুখে দিয়া কানে কানে কহিল, তোমার বাবু এসেছেন যে!

প্রত্যুত্তরে তেওয়ারী অব্যক্ত ধ্বনি করিল, ডান হাতটা একবার তুলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু নাড়িতে পারিল না। পরক্ষণেই দেখা গেল তাহার নিমীলিত চোখের কোণ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে। অপূর্বর নিজের দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি কোঁচার খুঁট দিয়া তাহা সে মুছিয়া ফেলিল, কিন্তু থামাইতে পারিল না,—বারে বারেই সেই দুটি আর্দ্র চক্ষু প্লাবিত করিয়া অজস্র ধারায় ঝরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল। মিনিট দুই-তিন কেহ কোন কথা কহিল না। সমস্ত ঘরখানি দুঃখ ও শোকের ঘন-মেঘে যেন থমথম করিতে লাগিল। কথা কহিল প্রথমে ভারতী। সে একটুখানি সরিয়া আসিয়া চুপি চুপি বলিল, কি আর করা যাবে, হাসপাতালেই পাঠিয়ে দিন।

অপূর্ব চোখের উপর হইতে তখনও আবরণ সরাইতে পারিল না, কিন্তু মাথা নাড়িয়া জানাইল না।

ভারতী তেমনি আস্তে আস্তে কহিল, সেই ভাল। আমি এখন তাহলে চললুম। যদি সময় পাই কাল একবার আসবো।

তখনও অপূর্ব চোখ খুলিতে পারিল না, স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। যাইবার পূর্বে ভারতী বলিল, সবই আছে, কেবল মোমবাতি ফুরিয়ে গেছে, আমি নীচে থেকে এক বাণ্ডিল কিনে দিয়ে যাচ্চি, এই বলিয়া সে নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। মিনিট-কয়েক পরে বাতি লইয়া যখন ফিরিয়া আসিল, তখন কতকটা পরিমাণে বোধ হয় আপনাকে অপূর্ব সামলাইয়া লইতে পারিয়াছিল। চোখ মোছা শেষ হইয়াছে, কিন্তু ভেজা পাতার নীচে সে-দুটি রাঙ্গা হইয়া আছে। ভারতী ঘরে ঢুকিতেই সে আর একদিকে মুখ ফিরাইল। হাতের মোড়কটি কাছে রাখিয়া দিয়া কি যেন সে একবার বলিতে চাহিল, কিন্তু আর একজন যখন কথা না কহিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল, তখন সেও আর প্রশ্ন না করিয়া পলকমাত্র নিঃশব্দে থাকিয়া প্রস্থানের জন্য দ্বার খুলিতেই, অপূর্ব অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল, তেওয়ারী যদি জল খেতে চায়?

ভারতী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, জল দেবেন।

অপূর্ব কহিল, আর যদি পাশ ফিরে শুতে চায়?

ভারতী বলিল, পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দেবেন।

বলা ত সহজ। আমি শোব কোথায় শুনি? তাহার কণ্ঠস্বরে ক্রোধ চাপা রহিল না, কহিল, বিছানা ত রইল পড়ে ওপরের ঘরে!

ভারতী কি মনে করিল তাহার মুখ দেখিয়া বুঝা গেল না। একমুহূর্ত স্থির থাকিয়া তেমনি শান্ত-মৃদুকণ্ঠে কহিল, আর একটা বিছানা ত আপনার খাটের উপরে আছে, তাতে ত অনায়াসে শুতে পারবেন।

অপূর্ব কহিল, আপনি ত বলবেনই ও-কথা। আর আমার খাবার বন্দোবস্ত কি-রকম হবে?

ভারতী চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু এই অসঙ্গত ও অত্যন্ত খাপছাড়া প্রশ্নে গোপন হাসির আবেগে তাহার চোখের পাতা-দুটি যেন কাঁপিতে লাগিল। খানিক পরে পরম গাম্ভীর্যের সহিত কহিল, আপনার শোওয়া এবং খাওয়ার ব্যবস্থা করার ভার কি আমার উপরে আছে?

তাই কি আমি বলচি?

এইমাত্র ত বললেন। এবং ভাল করে নয়, রাগ করে।

অপূর্ব ইহার আর উত্তর খুঁজিয়া পাইল না। তাহার মলিন বিপন্ন-মুখের প্রতি চাহিয়া ভারতী ধীরে ধীরে কহিল, আপনার বলা উচিত ছিল, দয়া করে আমার এই-সব বিলি-ব্যবস্থা আপনি করে দিন।

অপূর্ব কোন দিকে না চাহিয়া কহিল, তা বলা আর শক্ত কি?

ভারতী কহিল, বেশ ত, তাই বলুন না!

তাই ত বলচি, বলিয়া অপূর্ব মুখ ভারী করিয়া আর একদিকে চোখ ফিরাইয়া রহিল।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কখনো কি কারও রোগে সেবা করেন নি?

না।

আর কখনো বিদেশেও আসেন নি?

না। মা আমাকে কোথাও যেতে দেন না।

তবে, এবারে যে বড় আপনাকে ছেড়ে দিলেন?

অপূর্ব চুপ করিয়া রহিল। কেমন করিয়া এবং কি কারণে যে তাহার বিদেশে আসায় মা সম্মত হইয়াছিলেন এ কথা সে পরের কাছে বলিতে চাহিল না। ভারতী কহিল, এতবড় চাকরি,—না ছেড়ে দিলেই বা চলবে কেন? কিন্তু তিনি সঙ্গে এলেন না কেন?

তাহার এই প্রকার তীক্ষ্ণ মন্তব্য প্রকাশে অপূর্ব ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, আমার মাকে আপনি দেখেন নি, নইলে এ কথা বলতে পারতেন না। অনেক দুঃখেই আমাকে ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু বিধবা মানুষ, এই ম্লেচ্ছদেশে তিনি নিজে আসবেন কেমন করে?

ভারতী একমুহূর্ত স্থির থাকিয়া বলিল, ম্লেচ্ছদের প্রতি আপনাদের ভয়ানক ঘৃণা। কিন্তু রোগ ত শুধু গরীবের জন্য সৃষ্টি হয়নি, আপনারও হতে পারতো। এখনো ত হতে পারে,—মা কি তাহলে আসেন না?

অপূর্বর মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল, কহিল, এমন করে ভয় দেখালে আমি কি করে একলা থাকবো?

ভারতী কহিল, ভয় না দেখালেও আপনি একলা থাকতে পারবেন না। আপনি অত্যন্ত ভীতু মানুষ।

অপূর্ব প্রতিবাদ করিতে সাহস পাইল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

ভারতী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেসা করি আমি। আমার হাতে জল খেয়ে তেওয়ারীর ত জাত গেছে, ভাল হয়ে সে কি করবে?

অপূর্ব ইহার শাস্ত্রোক্ত বিধি জানিত না, একটু চিন্তা করিয়া কহিল, সে ত আর সজ্ঞানে খায়নি, মরণাপন্ন ব্যারামে খেয়েচে, না খেলে হয়ত মরে যেত। এতে বোধ হয় জাত যায় না, একটা প্রায়শ্চিত্ত করলেই হতে পারে।

ভারতী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, হুঁ। তার খরচ বোধ হয় আপনাকেই দিতে হবে,—নইলে, আপনি বা তার হাতে খাবেন কি করে?

অপূর্ব তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া কহিল, আমিই দেব বৈ কি, নিশ্চয় দেব। ভগবান করুন সে শীঘ্র ভাল হয়ে উঠুক!

ভারতী বলিল, আর আমিই শুশ্রূষা করে তাকে ভাল করে তুলি, না?

তাহার শান্ত কঠিন কণ্ঠস্বর অপূর্ব লক্ষ্যই করিল না, কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া উত্তর দিল, সে আপনার দয়া। তেওয়ারী বাঁচুক, কিন্তু আপনিই ত তার প্রাণ দিলেন।

ভারতী একটুখানি হাসিল। কহিল, ম্লেচ্ছতে প্রাণ দিলে দোষ নেই, মুখে জল দিলেই তার প্রায়শ্চিত্ত চাই, না? এই বলিয়া সে পুনরায় একটু হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, এখন আমি চললাম। কাল যদি সময় পাই ত একবার দেখে যাবো। এই কথা বলিয়া সে যাইতে উদ্যত হইয়া হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আর যদি আসতে না পারি ত তেওয়ারী ভাল হলে তাকে বলবেন, আপনি না এসে পড়লে আমি যেতাম না, কিন্তু ম্লেচ্ছদেরও একটা সমাজ আছে, আপনার সঙ্গে একঘরে রাত্রি কাটালে তারাও ভাল বলে না। কাল সকালে আপনার পিয়ন এলে তলওয়ারকরবাবুকে খবর দেবেন। তিনি পাকা লোক, সমস্ত ব্যবস্থাই করে দিতে পারবেন। আচ্ছা, নমস্কার।

অপূর্ব কহিল, পাশ ফিরিয়ে দিলে ওর লাগবে না?

ভারতী বলিল, না।

রাত্রে যদি বিছানা বদলে দেবার দরকার হয়? কি করে দেব?

ভারতী কহিল, সাবধানে দেবেন। আমি মেয়েমানুষ হয়ে যদি পেরে থাকি আপনি পারবেন না?

অপূর্ব শঙ্কিতমুখে স্থির হইয়া রহিল। ভারতী যাইবার জন্য দ্বার খুলিতেই অপূর্ব সভয়ে বলিয়া উঠিল, আর যদি হঠাৎ বসে? যদি কাঁদে?

ভারতী এ-সকল প্রশ্নের আর কোন জবাব দিবার চেষ্টা না করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া সাবধানে দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। তাহার মৃদু পদশব্দ কাঠের সিঁড়ির উপরে যতক্ষণ শুনা গেল ততক্ষণ পর্যন্ত অপূর্ব কাঠের মূর্তির মত বসিয়া রহিল, কিন্তু শব্দ থামিবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন তাহার চোখের উপরে কোথা হইতে একটা কালো জাল নামিয়া আসিয়া সমস্ত দেহ কি করিয়া

যে উঠিল সে জীবনে কখনো অনুভব করে নাই। ভয়ে ছুটিয়া গিয়া বারান্দার কবাট খুলিয়া ফেলিয়া নীচে চাহিয়া দেখিল ভারতী দ্রুতপদে রাস্তায় চলিয়াছে। মিস্ জোসেফ নামটা সে মুখ দিয়া উচ্চারণ করিতেই পারিল না, উচ্চকণ্ঠে ডাক দিল, ভারতী!

ভারতী মাথা তুলিয়া চাহিতে অপূর্ব দুই হাত জোড় করিয়া কহিল, একবার আসুন—মুখ দিয়া আর তাহার কথা বাহির হইল না। ভারতী দ্বিরুক্তি না করিয়া ফিরিল। মিনিট-দুই পরে দ্বার খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল অপূর্ব নাই, তেওয়ারী একাকী পড়িয়া আছে।

আগাইয়া আসিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল বারান্দায় সে নাই—কোথাও নাই। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, স্নানের ঘরের কবাট খোলা। কিন্তু মিনিট পাঁচ-ছয় অপেক্ষা করিয়াও যখন কেহ আসিল না, তখন সে সন্দিগ্ধচিত্তে দরজার ভিতরে গলা বাড়াইয়া যাহা দেখিতে পাইল তাহাতে ভয়ের আর সীমা রহিল না। অপূর্ব মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া, দুপুরবেলা যাহা কিছু খাইয়াছিল সমস্ত বমি করিয়াছে, তাহার চোখ মুদিত এবং সর্বাঙ্গ ঘামে ভাসিয়া যাইতেছে। কাছে গিয়া ডাকিল, অপূর্ববাবু!

প্রথম ডাকেই অপূর্ব চোখ মেলিয়া চাহিল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার চোখ বুজিয়া তেমনি স্থির হইয়া রহিল। ভারতী মুহূর্তকালমাত্র দ্বিধা করিল, তাহার পরেই সে অপূর্বর কাছে বসিয়া মাথায় হাত দিয়া আস্তে আস্তে বলিল, উঠে বসতে হবে যে। মাথায় মুখে জল না দিলে ত শরীর শোধরাবে না অপূর্ববাবু!

অপূর্ব উঠিয়া বসিলে সে হাত ধরিয়া তাহাকে কলের কাছে আনিয়া জল খুলিয়া দিলে সে হাত-মুখ ধুইয়া ফেলিল। তখন ধীরে ধীরে তাহাকে তুলিয়া আনিয়া খাটের উপরে শোয়াইয়া দিয়া ভারতী গামছার অভাবে নিজের আঁচল দিয়া তাহার হাত ও পায়ের জল মুছাইয়া দিল এবং একটা হাতপাখা খুঁজিয়া

আনিয়া বাতাস করিতে করিতে কহিল, এইবার একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন, আপনি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আমি যাবো না।

অপূর্ব লজ্জিত মৃদুকণ্ঠে কহিল, কিন্তু আপনার যে এখনো খাওয়া হয়নি।

ভারতী বলিল, খেতে আর আপনি দিলেন কৈ? আপনি ঘুমোন।

ঘুমিয়ে পড়লে ত আপনি চলে যাবেন না?

না, আপনার ঘুম না ভাঙ্গা পর্যন্ত অপেক্ষা করব।

অপূর্ব খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, আপনাকে মিস্ ভারতী বলে ডাকলে কি আপনি রাগ করবেন?

নিশ্চয় করব। অথচ শুধু ভারতী বলে ডাকলে করব না।

কিন্তু অন্য সকলের সামনে?

ভারতী একটু হাসিয়া কহিল, হলই বা অন্য সকলের সামনে। কিন্তু চুপ করে একটু ঘুমোন দিকি,—আমার ঢের কাজ আছে।

অপূর্ব বলিল, ঘুমোতে আমার ভয় করে আপনি পাছে ফাঁকি দিয়ে চলে যান।

কিন্তু জেগে থাকলেও যদি যাই, আপনি আটকাবেন কি করে?

অপূর্ব চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। ভারতী কহিল, আমাদের ম্লেচ্ছসমাজে কি সুনাম দুর্নাম বলে জিনিস নেই? আমাকে কি তার ভয় করে চলতে হয় না?

অপূর্বর বুদ্ধি ঠিক প্রকৃতিস্থ ছিল না, প্রত্যুত্তরে সে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করিয়া বসিল। কহিল, আমার মা এখানে নেই, আমি রোগে পড়ে গেলে তখন আপনি কি করবেন? তখন ত আপনাকেই থাকতে হবে।

ভারতী কহিল, আমাকেই থাকতে হবে? আপনার বন্ধু তলওয়ারকরবাবুদের খবর দিলে হবে না?

অপূর্ব সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, না, তা কিছুতেই হবে না। হয় আমার মা, না হয় আপনি,— একজনকে দেখতে না পেলে আমি কখনো

বাঁচব না। কাল যদি আমার বসন্ত হয়, এ কথা যেন আপনি কিছুতেই ভুলে যাবেন না। তাহার অনুরোধের শেষ দিকটা কি যে একরকম শুনাইল, ভারতী হঠাৎ আপনাকে যেন বিস্মৃত হইয়া গেল। বিছানার একপ্রান্তে বসিয়া পড়িয়া সে অপূর্বর গায়ের উপর একটা হাত রাখিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—না না, ভুলব না, ভুলব না! এ কি কখনো আমি ভুলতে পারি? কিন্তু কথাটা উচ্চারণ করিয়াই সে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া চক্ষের পলকে উঠিয়া দাঁড়াইল। জোর করিয়া একটু হাসিয়া কহিল, কিন্তু ভাল হয়েও ত বিপদ কম ঘটবে না অপূর্ববাবু! ঘটা করে আবার ত প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

কিন্তু ভয় নেই, তার দরকার হবে না। আচ্ছা, চুপ করে একটু ঘুমোন; বাস্তবিক, আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।

কি কাজ?

ভারতী কহিল, কি কাজ! খাওয়া ত দূরে থাক, সারাদিন স্নান পর্যন্ত করবার সময় পাইনি।

কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় স্নান করলে অসুখ করবে না?

ভারতী বলিল, করতেও পারে, অসম্ভব নয়। কিন্তু স্নানের ঘরে যে কাণ্ড করে রেখেছেন তা পরিষ্কার করার পরে না নেয়ে কি কারু উপায় আছে নাকি? তারপরে দুটো খেতেও হবে ত?

অপূর্ব অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া কহিল, কিন্তু সে-সব আমি সাফ করে ফেলবো,—আপনি যাবেন না। এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিতে যাইতেছিল। ভারতী রাগ করিয়া কহিল, আর বাহাদুরির দরকার নেই, একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন। কিন্তু এত বড় ঠুনকো জিনিসটিকে যে মা কোন্ প্রাণে বিদেশে পাঠিয়েছিলেন আমি তাই শুধু ভাবি! সত্যি বলচি, উঠবেন না যেন। তিনি নেই,—কিন্তু এখানে আমার কথা না শুনলে ভারী অন্যায় হবে বলে দিচ্চি। এই বলিয়া

সে কৃত্রিম ক্রোধের স্বরে শাসনের হুকুম জারি করিয়া দিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

উদ্বিগ্ন, শ্রান্ত ও একান্ত নির্জীবের ন্যায় অপূর্ব কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল সে জানিতেও পারে নাই, তাহার ঘুম ভাঙ্গিল ভারতীর ডাকে। চোখ মুছিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়া সম্মুখের ঘড়িতে চাহিয়া দেখিল রাত্রি বারোটা বাজিয়া গেছে। ভারতী পাশে দাঁড়াইয়া। অপূর্বর প্রথম দৃষ্টি পড়িল তাহার চুলের আয়তন ও দীর্ঘতার প্রতি। সদ্য-স্নান-সিক্ত বিপুল কেশভার ভিজিয়া যেমন নিবিড় কালো হইয়াছে, তেমনি ঝুলিয়া প্রায় মাটিতে পড়িয়াছে। স্নিগ্ধ সাবানের গন্ধে ঘরের সমস্ত রুদ্ধ বায়ু হঠাৎ যেন পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে। পরনে একখানি কালপাড়ের সুতার শাড়ী, —গায়ে জামা না থাকায় বাহুর অনেকখানি দেখা যাইতেছে। ভারতীর এ যেন আর এক নূতন মূর্তি, অপূর্ব পূর্বে কখনো দেখে নাই। তাহার মুখ দিয়া প্রথমেই বাহির হইল, এত ভিজে চুল শুকোবে কি করে?

ভারতী কহিল, শুকোবে না। কিন্তু সে জন্যে ভাবতে হবে না, আপনি আসুন দিকি আমার সঙ্গে।

তেওয়ারী কেমন আছে?

ভাল আছে। অন্তত, আজ রাত্রির মত আপনাকে ভাবতে হবে না। আসুন।

তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্নানের ঘরে আসিয়া দেখিল ছোট একটি টুকরিতে কতকগুলি ফলমূল, একটা বঁটি, একটা থালা, একটা গেলাস— ভারতী দেখাইয়া কহিল, এর বেশী করা ত চলবে না। কলের জলে সমস্ত ধুয়ে ফেলুন,—বঁটি, থালা, গেলাস সব। গেলাসে করে জল নিন, নিয়ে ও-ঘরে আসুন, আমি আসন পেতে রেখেছি।

অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, এ-সকল আপনি কখন আনলেন?

ভারতী বলিল, আপনি ঘুমোলে। কাছেই একটা ফলের দোকান আছে, দূরে যেতে হয়নি। আর টুকরিটা ত আপনাদেরই। এই বলিয়া সে অন্যত্র চলিয়া গেল, শুধু সতর্ক করিয়া দিয়া গেল, বঁটি ধুইতে গিয়া যেন হাত না কাটে।

খানিক পরে আসনে বসিয়া অপূর্ব ফল কাটিতেছিল, এবং ভারতী অদূরে বসিয়া হাসিতেছিল। অপূর্ব কহিল, আপনি হাসুন ক্ষতি নেই। পুরুষ মানুষে বঁটিতে কাটতে পারে না সবাই জানে। কিন্তু আপনি আমার খাবার জন্যে যে যত্ন করেছেন সেজন্যে আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ। মা ছাড়া এমন আর কেউ করতেন না।

তাহার শেষ কথাটা ভারতী কানেই তুলিল না। আগের কথার উত্তরে কহিল, হাসি কি সাধে অপূর্ববাবু! পুরুষ মানুষে বঁটিতে কাটতে পারে না সবাই জানে সত্যি, কিন্তু, তাই বলে এমনটি কি সবাই জানে? তেওয়ারী ভাল হয়ে গেলে মাকে আমি নিশ্চয় চিঠি লিখে দেব, হয় তিনি আসুন, না হয় ছেলেকে তাঁর ফিরিয়ে নিয়ে যান। এ মানুষকে বাইরে ছেড়ে রাখা চলবে না।

অপূর্ব কহিল, মা তাঁর ছেলেকে ভাল করেই জানেন। কিন্তু, দেখুন, আমি না হয়ে আমার দাদাদের কেউ হলে আপনার এত কথা আজ চলত না। আপনাকে দিয়েই তাঁরা সব কাজ করিয়ে নিতেন।

ভারতী বুঝিতে পারিল না। অপূর্ব বলিল, দাদারা ছোঁন না, খান না এমন জিনিসই নেই। মুরগি এবং হোটেলের ডিনার না হলে ত তাঁদের খাওয়াই হয় না।

ভারতী আশ্চর্য হইয়া কহিল, বলেন কি?

অপূর্ব কহিল, ঠিক তাই। বাবা ত অর্ধেক ক্রীশ্চান ছিলেন বললেই হয়। মাকে কি এই নিয়ে কম দুঃখ পেতে হয়েছে!

ভারতী উৎসুক হইয়া কহিল, সত্যি নাকি? কিন্তু মা বুঝি ভয়ানক হিন্দু?

অপূর্ব বলিল, ভয়ানক আর কি, হিন্দুঘরের মেয়ের যথার্থ যা হওয়া উচিত, তাই। মায়ের কথা বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠস্বর করুণ এবং স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল,

বলিল, বাড়িতে দুটি বউ, তবু মাকে আমার নিজে রেঁধে খেতে হয়। কিন্তু এমনি মা যে কখখনো কারু ওপর জোর করেন না, কখখনো কাউকে এর জন্যে অনুযোগ করেন না। বলেন, আমিও ত নিজের আচার-বিচার ত্যাগ করে আমার স্বামীর মতে মত দিতে পারিনি, এখন, ওরাও যদি আমার মতে সায় দিতে না পারে ত নালিশ করা উচিত নয়। আমার বুদ্ধি এবং আমার সংস্কার মেনেই যে বউব্যাটাদের চলতে হবে তার কি মানে আছে?

ভারতী ভক্তি ও শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া কহিল, মা সেকেলে মানুষ, কিন্তু ধৈর্য ত খুব বেশি।

অপূর্ব উদ্দীপ্ত হইয়া বলিল, ধৈর্য? মায়ের ধৈর্যের কি সীমা আছে নাকি? আপনি তাঁকে দেখেন নি, কিন্তু দেখলে একেবারে আশ্চর্য হয়ে যাবেন বলে দিচ্চি।

ভারতী প্রসন্ন মৌনমুখে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, অপূর্ব ফলের খোসা ছাড়ানো বন্ধ রাখিয়া বলিতে লাগিল, ধরলে, সমস্ত জীবনই মা আমার দুঃখ পেয়ে আসছেন, এবং সমস্ত জীবনই স্বামী-পুত্রদের ম্লেচ্ছাচার বাড়ির মধ্যে নিঃশব্দে সহ্য করে আসছেন। তাঁর একটি মাত্র ভরসা আমি। অসুখে-বিসুখে কেবল আমার হাতেই দুটো হবিষ্য সিদ্ধ তিনি মুখে দেন।

ভারতী কহিল, এখন ত তাঁর কষ্ট হতে পারে।

অপূর্ব বলিল, পারেই ত। হয়ত হচ্চেও। তাইত আমাকে তিনি প্রথমে ছেড়ে দিতে চাননি। কিন্তু, আমিও ত চিরকাল ঘরে বসে থাকতে পারিনে! কেবল তাঁর একটি আশা আমার বউ এলে আর তাঁকে রেঁধে খেতে হবে না।

ভারতী একটুখানি হাসিয়া কহিল, তাঁর সেই আশাটি কেন পূর্ণ করেই এলেন না? সেই ত উচিত ছিল!

অপূর্ব তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া বলিয়া উঠিল—ছিলই ত। মেয়ে নিজে পছন্দ করে মা যখন সমস্ত ঠিক করছিলেন তখনি আমাকে তাড়াতাড়ি চলে আসতে

হল, সময় হল না। কিন্তু বলে এলাম, মা, যখনি চিঠি লিখবে তখনি ফিরে এসে তোমার আদেশ পালন করব।

ভারতী বলিল, তাই ত উচিত।

অপূর্ব মাতৃস্নেহে বিগলিত হইয়া কহিল, উচিত নয়? বারব্রত করবে, বিচার-আচার জানবে, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরের মেয়ে হবে,—মাকে কখনো দুঃখ দেবে না,—সেই ত আমি চাই। কাজ কি আমার গান-বাজনা-জানা কলেজে-পড়া বিদুষী মেয়ে?

ভারতী বলিল, দরকার কি!

অপূর্ব নিজেই যে একদিন ইহার বিরোধী ছিল এবং বৌদিদির স্বপক্ষে লড়াই করিয়া মাকে রাগ করিয়া বলিয়াছিল—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘর হইতে যা হউক একটা মেয়ে ধরিয়া আনিয়া ল্যাঠা চুকাইয়া দিতে, সে-কথা আজ সে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইল। বলিতে লাগিল, দেখুন আপনি আমাদের জাতও নয়, সমাজেরও নয়, জলটুকু পর্যন্ত নেওয়া যায় না, ছোঁয়াছুঁয়ি হলে কাপড়খানি অবধি ছেড়ে ফেলতে হয় এত তফাত, তবু আপনি যা বোঝেন আমার দাদারা কিংবা বৌদিদিরা তা বুঝতে চান না।

যার যা ধর্ম তাই ত তার মেনে চলা চাই? একবাড়ি লোকের মধ্যে থেকেও যে মা আমার একলা, এর চেয়ে দুর্ভাগ্য কি আর আছে? তাই ভগবানের কাছে আমি শুধু এই প্রার্থনা করি, আমার কোন আচরণে আমার মা যেন না কোনদিন ব্যথা পান। বলিতে বলিতে তাহার গলা ভারী হইয়া অশ্রুভারে দুই চক্ষু টলটল করিতে লাগিল।

এই সময়ে ঘুমন্ত তেওয়ারী কি একটা শব্দ করিতে ভারতী তাড়াতাড়ি উঠিয়া চলিয়া গেল। অপূর্ব হাতের উলটা পিঠে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া পুনরায় ফল বানাইতে প্রবৃত্ত হইল। মাকে সে অতিশয় ভালবাসিত, এবং বাড়িতে থাকিতে সেই মাকে খুশী রাখিতে সে মাথার টিকি হইতে একাদশীর দিনে ভাতের বদলে

লুচি খাওয়া অবধি সবই পালন করিয়া চলিত। বস্তুতঃ, ব্রাহ্মণ সন্তানের আচারভ্রষ্টতাকে সে নিন্দাই করিত, কিন্তু প্রবাসে আসিয়া আচার-বিচারের প্রতি তাহার এরূপ প্রগাঢ় অনুরাগ বোধ হয় তাহার জননীও সন্দেহ করিতে পারিতেন না। আসল কথা এই যে, আজ তাহার দেহমন ভয়ে ও ভাবনায় নিরতিশয় বিকল হইয়াছিল, মাকে কাছে পাইবার একটা অন্ধ আকুলতায় ভিতরে ভিতরে তাহার কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করিতেছিল, সেখানে সমস্ত ভাবই যে পরিমাণ হারাইয়া বিকৃত আতিশয্যে রূপান্তরিত হইয়া উঠিতেছিল এ খবর অন্তর্যামীর অগোচর রহিল না, কিন্তু ভারতীর বুকের মধ্যেটা অপমানের বেদনায় একেবারে টনটন করিতে লাগিল।

সে খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, অপূর্ব কোনমতে ফল-কাটা শেষ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। কহিল, বসে আছেন, খাননি?

অপূর্ব বলিল, না, আপনার জন্য বসে আছি।

কিসের জন্য?

আপনি খাবেন না?

না। দরকার হলে আমার আলাদা আছে।

অপূর্ব ফলের থালাটা হাত দিয়া একটুখানি ঠেলিয়া দিয়া বলিল, বাঃ—তা কি কখন হয়? আপনি সারাদিন খাননি, আর—

তাহার কথাটা তখনও শেষ হয় নাই, একটা অত্যন্ত শুষ্ক চাপা কণ্ঠস্বরে জবাব আসিল, আঃ—আপনি ভারী জ্বালাতন করেন। ক্ষিদে থাকে খান, না হয় জানালা দিয়ে ফেলে দিন। এই বলিয়া সে মুহূর্ত অপেক্ষা না করিয়া ও-ঘরে চলিয়া গেল। বস্তুতঃ, মুহূর্তমাত্রই তাহার মুখের চেহারা অপূর্ব দেখিতে পাইয়াছিল, কিন্তু সেই মুহূর্তকালই তাহার বুকে মরণকাল পর্যন্ত ছাপ মারিয়া দিল। এ মুখ সে আর ভুলিল না। সেই আসার দিন হইতে অনেকবার দেখা হইয়াছে; বিবাদে,

সৌহৃদ্যে, শত্রুতায়, বন্ধুত্বে, সম্পদে ও বিপদে কতবারই ত এই মেয়েটিকে সে দেখিয়াছে, কিন্তু, সে-দেখার সহিত এ-দেখার সাদৃশ্য নাই। এ যেন আর কেহ।

ভারতী চলিয়া গেল, ফলের পাত্র তেমনি পড়িয়া রহিল এবং তেমনি নির্বাক নিস্পন্দ কাঠের মত অপূর্ব বসিয়া রহিল। কিসে যে কি হইল সে যেন তাহার উপলব্ধির অতীত।

ঘণ্টা-খানেক পরে সে এ ঘরে আসিয়া দেখিল তেওয়ারীর শিয়রের কাছে একটা মাদুর পাতিয়া ভারতী বাহুতে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে। সে যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল তেমনি নিঃশব্দে ফিরিয়া গিয়া তাহার খাটে শুইয়া পড়িল, এবং শ্রান্ত চক্ষু ঘুমে মুদিত হইতে তিলার্ধ বিলম্ব হইল না। এই ঘুম যখন ভাঙ্গিল তখন ভোর হইয়াছে।

ভারতী কহিল, আমি চললুম।

অপূর্ব ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, কিন্তু ভাল করিয়া চেতনা হইবার পূর্বেই দেখিল, সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেছে।

দশ

শেষোক্ত ঘটনার পরে মাসাধিক কাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। তেওয়ারী আরোগ্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু গায়ে এখনও জোর পায় নাই। যে লোকটি সঙ্গে ভামোয় গিয়াছিল সেই রাঁধিতেছে। তেওয়ারীকে বাঁচাইবার জন্য প্রায় আফিসসুদ্ধ সকলেই অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াছে, রামদাস নিজে কতদিন ত বাসায় পর্যন্ত যাইতে পারে নাই। শহরের একজন বড় ডাক্তার চিকিৎসা করিয়াছেন, তাঁহারই সুপারিশে তাহাকে বসন্ত-হাসপাতালে লইয়া যায় নাই। এই ব্রহ্মদেশটা তেওয়ারীর কোনদিনই ভাল লাগে নাই, অপূর্ব তাহাকে ছুটি দিয়াছে, স্থির হইয়াছে আর একটু সারিলেই সে বাড়ি চলিয়া যাইবে। আগামী সপ্তাহে বোধ হয় তাহা অসম্ভব হইবে না, তেওয়ারী নিজে এইরূপ আশা করে। ভারতী সেই যে গিয়াছে, কোনদিন খবর লইতেও আসে নাই। অথচ, এত বড় একটা আশ্চর্য ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে তাহার উল্লেখ পর্যন্ত হইত না। ইহাতে তেওয়ারীর বিশেষ অপরাধ ছিল না; বরঞ্চ সে যেন ভয়ে ভয়েই থাকিত পাছে কেহ তাহার নাম করিয়া ফেলে। ভারতী শত্রুপক্ষীয়া, এখানে আসা অবধি তাহাদের অশেষ প্রকারে দুঃখ দিয়াছে, মিথ্যা সাক্ষ্যের জোরে অপূর্বকে জেল খাটাইবার চেষ্টা পর্যন্ত করিয়াছে; মনিবের অবর্তমানে তাহাকেই ঘরে ডাকিয়া আনার কথায় সে লজ্জা ও সঙ্কোচ দুই অনুভব করিত। কিন্তু সে কবে এবং কি ভাবে চলিয়া গেছে তেওয়ারী জানে না। জানিবার জন্য ছটফট করিত,—তাহার উদ্বেগ ও আশঙ্কার অবধি ছিল না, কিন্তু কি করিয়া যে জানা যায় কিছুতেই খুঁজিয়া পাইত না। কখনো ভাবিত ভারতী চালাক মেয়ে, অপূর্বর আসার সংবাদ পাইয়া সে নিজেই লুকাইয়া পলাইয়াছে; কখনো ভাবিত অপূর্ব আসিয়া পড়িয়া হয়ত তাহাকে অপমান করিয়া দূর করিয়া দিয়াছে। কিন্তু এই দূয়ের যাহাই কেন না ঘটিয়া থাক, ভারতী আপনি

ইচ্ছা করিয়া যে এ বাটীতে আর তাহাকে দেখিতে আসিবে না সে বিষয়ে তেওয়ারী নিশ্চিন্ত ছিল। অপূর্ব নিজে কিছুই বলে না, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে তেওয়ারীর এই ভয়টাই সবচেয়ে বেশী করিত পাছে তাহারই জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা সকল কথা ব্যক্ত হইয়া পড়ে। ঝগড়া-বিবাদের কথা চুলায় যাক, সে যে তাহার হাতে জল খাইয়াছে, তাহার রাঁধা সাগু বার্লি খাইয়াছে,—হয়ত এমন ভয়ানক জাত গিয়াছে যে তাহার প্রায়শ্চিত্ত পর্যন্ত নাই। তেওয়ারী স্থির করিয়া রাখিয়াছিল কোনমতে এখান হইতে কলিকাতায় গিয়া সে সোজা বাড়ি চলিয়া যাইবে। সেখানে গঙ্গাস্নান করিয়া, গোপনে গোবর প্রভৃতি খাইয়া, কোন একটা ছল-ছুতায় ব্রাহ্মণাদি ভোজন করাইয়া দেহটাকে কাজচলাগোছের শুদ্ধ করিয়া লইবে। কিন্তু ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া কথাটাকে একবার মায়ের কানে তুলিয়া দিলে যে কিসে কি দাঁড়াইবে তাহার কিছুই বলা যায় না। হালদার বাড়ির চাকরি ত ঘুচিবেই, এমন কি তাহাদের গ্রামের সমাজ পর্যন্ত গিয়া টান ধরাও বিচিত্র নয়।

কিন্তু ইহাই তেওয়ারীর সবটুকু ছিল না। এই স্বার্থ ও ভয়ের দিক ছাড়া তাহার অন্তরের আর একটা দিক ছিল তাহা যেমন মধুর, তেমনি বেদনায় ভরা। অপূর্ব আফিসে চলিয়া গেলে দুপুরবেলায় সে প্রত্যহ একখানি বেতের মোড়া লইয়া বারান্দায় আসিয়া বসিত। দুর্বল দেহটিকে দেয়ালের গায়ে এলাইয়া দিয়া গলির যে অংশটি গিয়া বড় রাস্তায় মিলিয়াছে সেইখানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত। এই পথে ভারতীর কোন দিন প্রয়োজন হইবে না, ওই মোড় অতিক্রম করিবার বেলা, অভ্যাসবশতঃও একবার এদিকে সে চাহিবে না এমন হইতেই পারে না।

অপূর্ব ভামোয় চলিয়া গেলে এই মেয়েটির সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। যেদিন দুপুরবেলা হঠাৎ তাহার মা মরিয়া যায়, তখনও তেওয়ারীর খাওয়া হয় নাই, মেয়েটা কাঁদিয়া আসিয়া তাহার রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত করে। দিন-দুই পূর্বে জোসেফ সাহেব মরিয়াছে, তাহার সে ভয় ছিল না, আসিয়া কবাট খুলিতেই ভারতী ঘরে ঢুকিয়া তাহার দুই হাত ধরিয়া সে কি কান্না! কে বলিবে সে ম্লেচ্ছ,

কে বলিবে সে ক্রীশ্চানের মেয়ে! তেওয়ারীর রাঁধা-ভাত হাঁড়িতেই রহিল, সারাদিন চিঠি লইয়া তাহাকে কোথায় না সেদিন ঘুরিয়া বেড়াইতে হইল! পরদিন কফিন লইয়া যাইবার বেলা এই বারান্দায় দাঁড়াইয়া চোখের জল যেন তাহার আর থামিতেই চাহে না। এই সময় হইতেই ভারতীকে সে কখনো মা, কখনো বা দিদি বলিতে শুরু করিয়াছিল, এবং জোর করিয়া তাহাকে সে চার-পাঁচদিন রাঁধিতে দেয় নাই, নিজে রাঁধিয়া খাওয়াইয়াছিল। তারপরে যেদিন ভারতী জিনিসপত্র লইয়া স্থানান্তরে উঠিয়া গেল, সেদিন সন্ধ্যাবেলাটা তাহার যেন আর কাটিবে না এমনি মনে হইয়াছিল। তাহার বসন্ত রোগে ভারতী কতখানি কি করিয়াছিল তাহা সে ভাল জানিতও না, ভাবিতও না। মনে হইলেই মনে হইত জাত যাইবার কথা। কিন্তু, এই সঙ্গেই আর একটা কথা সে সর্বদাই ভাবিবার চেষ্টা করিত। সকালবেলা স্নান করিয়া মস্ত ভিজা চুলের রাশি পিঠে মেলিয়া দিয়া সে একবার করিয়া তেওয়ারীর তত্ত্ব লইতে আসিত। রান্নাঘরেও ঢুকিত না, কোন কিছু স্পর্শও করিত না, চৌকাটের বাহিরে মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিত, আজ কি-কি রাঁধলে দেখি তেওয়ারী।

দিদি, একটা আসন পেতে দিই।

না। আবার ত কাচতে হবে!

তেওয়ারী কহিত, বাঃ, আসন কি কখনো ছোঁয়া যায় নাকি?

ভারতী বলিত, যায় বৈ কি। তোমার বাবু ত ভাবেন আমি থাকার জন্যে সমস্ত বাড়িটাই ছোঁয়া গেছে। নিজের হলে বোধ হয় আগুন ধরিয়ে একে পুড়িয়ে শুদ্ধ করে নিতেন। ঠিক না তেওয়ারী?

তেওয়ারী হাসিয়া কহিত, তোমার এক কথা দিদি! তুমি নিজে দেখতে পারো না বলে সবাইকে তাই ভাবো। কিন্তু আমার বাবুকে যদি একবার ভাল করে জানতে ত তুমিও বলতে এমন মানুষ সংসারে নেই।

ভারতী বলিত, নেই তা আমিও ত বলি। নইলে যে চুরি করা আটকালে, তাকেই গেলেন চোর বলে ধরিয়ে দিতে।

এই ব্যাপারে নিজের অপরাধ স্মরণ করিয়া তেওয়ারী মর্মাহত হইয়া পড়িত। কথাটাকে চাপা দিয়া তাড়াতাড়ি কহিত, কিন্তু তুমিও ত কিছু কম করনি। সমস্ত মিথ্যে জেনেও ত বাবুর কুড়ি টাকা দণ্ড করালে, দিদি।

ভারতী অপ্রতিভ হইয়া বলিত, তেমনি দণ্ড ত নিজেই নিলাম তেওয়ারী, তোমার বাবুকে ত আর দিতে হল না।

দিতে হল না কি রকম? স্বচক্ষে দেখলাম যে দু'খানা নোট দিয়ে তবে তিনি বার হলেন।

আমি যে স্বচক্ষে দেখলাম তেওয়ারী, তুমি ঘরে ঢুকেই দু'খানা নোট কুড়িয়ে পেয়ে তা বাবুর হাতে তুলে দিলে।

তেওয়ারীর হাতের খুন্তি হাতেই থাকিত—ওঃ! তাই বটে।

কিন্তু ভাজাটা যে পুড়ে উঠল তেওয়ারী, ও যে আর মুখে দেওয়া চলবে না।

তেওয়ারী কড়াটা নামাইয়া লইয়া কহিত, বাবুকে কিন্তু এ কথা আমি বলে দেব দিদি।

ভারতী সহাস্যে জবাব দিত, দিলেই বা। তোমার বাবুকে কি আমি ভয় করি নাকি?

কিন্তু এতবড় আশ্চর্য কথাটা ছোটবাবুকে জানাইবার তেওয়ারীর আর সুযোগ মিলিল না। কবে এবং কেমন করিয়া যে মিলিবে ইহাও সে খুঁজিয়া পাইত না। একদিন আলস্যবশতঃ সে বাসী হলুদ দিয়া তরকারি রাঁধিতে গিয়া ভারতীর কাছে বকুনি খাইয়াছিল। আর একদিন স্নান না করিয়াই রাঁধিয়াছিল বলিয়া ভারতী তাহার হাতে খায় নাই। তেওয়ারী রাগ করিয়া বলিয়াছিল, তোমরা যে খ্রীষ্টান

দিদি, তোমাদেরও এত বাচ-বিচার? এ যে দেখি আমাদের মা-ঠাকরুনকেও ছাড়িয়া গেলে!

ভারতী শুধু হাসিয়া চলিয়া গিয়াছিল, জবাব দেয় নাই। বস্তুতঃ রান্নার ব্যাপারে একা মা-ঠাকুরানী ছাড়া তাহার শুচিতায় কেহ প্রশ্ন করিতে পারে ইহাতে সে মনে মনে আহত হইয়াছিল, কিন্তু আচার-বিচার লইয়া এই ম্লেচ্ছ মেয়েটার কাছেও সে সতর্ক না হইয়া পারে নাই। তখন এ-সকল তাহার ভাল লাগে নাই, যাহা ভালও লাগিয়াছে তাহারও তেমন করিয়া মর্যাদা উপলব্ধি করে নাই, অথচ, এই সব চিন্তাই যেন এখন তাহাকে বিভোর করিয়া দিত। বর্মায় সে আর ফিরিবে না। যাইবার পূর্বে দেখা হইবার আর আশা নাই, দেখা করিবার হেতু নাই, যত কিছু সে জানে বলিবার লোক নাই, দিনের পর দিন একই পথের প্রান্তে নিষ্ফল দৃষ্টি পাতিয়া একাকী চুপ করিয়া বসিয়া তাহার বুকের মধ্যেটা যেন আঁচড়াইতে থাকিত।

সেদিন আফিস হইতে ফিরিয়া অপূর্ব হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, ভারতীর বাসাটা ঠিক কোন্ জায়গায় রে তেওয়ারী?

তেওয়ারী সংশয়তিক্তকণ্ঠে জবাব দিল, আমি কি গিয়ে দেখে এসেছি নাকি?

যাবার সময় তোকে বলেনি?

আমাকে বলতে যাবে কিসের জন্যে!

অপূর্ব কহিল, আমাকে বলেছিল বটে, কিন্তু জায়গাটা ঠিক মনে নেই। কাল একবার খুঁজে দেখতে হবে।

তেওয়ারীর মনটা দুলিতে লাগিল, হয়ত কি আবার একটা ফ্যাসাদ জুটিয়াছে, কিন্তু এ সাহস তাহার হইল না যে কারণ জিজ্ঞাসা করে। অপূর্ব নিজেই ব্যক্ত করিয়া কহিল, সে চুরির জিনিসগুলো এখন পুলিশের লোকে দিতে চায়, কিন্তু ভারতীর একটা সই চাই।

তেওয়ারী আর একদিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল, অপূর্ব বলিতে লাগিল, সেদিন এই কথাই ত জানাতে এসে তোর অবস্থা দেখে আর ফিরতে পারলেন না। তিনি না দেখলে ত তুই কবে মরে ভূত হয়ে যেতিস তেওয়ারী, আমার সঙ্গে পর্যন্ত দেখা হতো না।

তেওয়ারী হাঁ না কিছুই কহিল না, শেষ কথাটা শুনিবার জন্য নিঃশব্দে কাঠের মত বসিয়া রহিল। অপূর্ব বলিল, এসে দেখি অন্ধকার ঘরে তুই আর তিনি। দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই, কি যে ঘটবে তার ঠিক নেই, কোথায় খাওয়া কোথায় শোওয়া, দুদিন আগে নিজের বাপ-মা মরে গেছে,—কিন্তু কি শক্ত মেয়েমানুষ, তেওয়ারী, কিছুতে ভ্রূক্ষেপই নেই।

তেওয়ারী আর থাকিতে না পারিয়া বলিল, কবে গেলেন তিনি?

অপূর্ব কহিল, আমার আসার পরদিনই। ভোর না হতেই 'চললুম' বলে যেন একেবারে উবে গেলেন।

রাগ করে চলে গেলেন নাকি?

রাগ করে? অপূর্ব একটু ভাবিয়া কহিল, কি জানি, হতেও পারে। তাঁকে বোঝাই ত যায় না,—নইলে তোর উপর এত যত্ন, একবার খবর নিতেও ত এলেন না তুই ভাল হলি কি না?

এই কথা তেওয়ারীর ভাল লাগিল না। বলিল, তাঁর নিজেরই হয়ত অসুখ-বিসুখ কিছু করেচে।

নিজের অসুখ-বিসুখ! অপূর্ব চমকিয়া গেল। তাহার সম্বন্ধে অনেকদিন অনেক কথাই মনে হইয়াছে, কিন্তু কোনদিন এ আশঙ্কা মনে আসে নাই। যাবার সময়ে সে হয়ত রাগ করিয়াই গিয়াছে, এবং এই রাগ করা লইয়াই মন তাহার যত কিছু কারণ খুঁজিয়া ফিরিয়াছে। কিন্তু অন্য সম্ভাবনাও যে থাকিতে পারে এদিক পানে ক্ষুব্ধ চিত্ত তাহার দৃষ্টিপাতই করে নাই। হঠাৎ অসুখের কথায় এ লইয়া যত আলোচনা সে রাত্রে হইয়াছিল সমস্ত একনিমিষে মনে পড়িয়া অপূর্ব বসন্ত ছাড়া

আর কিছু ভাবিতেই পারিল না। তাহার নূতন বাসায় দেখিবার কেহ নাই, হয়ত হাসপাতালে লইয়া গেছে, হয়ত এতদিনে বাঁচিয়াও নাই, মনে মনে সে একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল।

একটা চেয়ারে বসিয়া আফিসের কলার নেকটাই ওয়েস্টকোট খুলিতে খুলিতে তাহাদের আলাপ শুরু হইয়াছিল, হাতের কাজ তাহার সেইখানেই বন্ধ হইয়া গেল, মুখে তাহার শব্দ রহিল না, সেই চেয়ারে মাটির পুতুলের মত বসিয়া এই একপ্রকারের অপরিচিত, অস্পষ্ট অনুভূতি যেন তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল যে সংসারে আর তাহার কোন কাজ করিবার নাই।

কিছুক্ষণ অবধি কেহই কথা কহিল না। এমনি একভাবে মিনিট কুড়ি-পঁচিশ কাটিয়া গেলেও যখন অপূর্ব নড়িবার চেষ্টা পর্যন্ত করিল না, তখন তেওয়ারী মনে মনে শুধু আশ্চর্য নয় উদ্বিগ্ন হইল। আস্তে আস্তে কহিল, ছোটবাবু, বাড়িওয়ালার লোক এসেছিল; যদি তেতলার ঘরটাই নেওয়া হয় ত, এই মাসের মধ্যেই বদলানো চাই বলে গেল। আমার ভাবনা হয় পাছে কেউ আবার এসে পড়ে!

অপূর্ব মুখ তুলিয়া বলিল, কে আর আসচে!

তেওয়ারী কহিল, আজ মায়ের একখানা পোস্টকার্ড পেয়েচি। দরোয়ানকে দিয়ে তিনি লিখিয়েছেন।

কি লিখেছেন?

আমি ভাল হয়েচি বলে অনেক আহ্লাদ করেছেন। দরোয়ানের ভাই ছুটি নিয়ে দেশে যাচ্চে, তার হাতে বিশ্বেশ্বরের নামে পাঁচ টাকার পূজো পাঠিয়েছেন।

অপূর্ব কহিল, ভালই ত। মা তোকে ছেলের মত ভালবাসেন।

তেওয়ারী শ্রদ্ধায় বিগলিত হইয়া কহিল, ছেলের বেশী। আমি চলে যাবো, মার ইচ্ছে ছুটি নিয়ে আমরা দুজনেই যাই। চারিদিকে অসুখ-বিসুখ—

অপূর্ব বলিল, অসুখ-বিসুখ কোথায় নেই? কলকাতায় হয় না? তুই বুঝি ভয় দেখিয়ে নানা কথা লিখেছিলি?

আজ্ঞে না। তেওয়ারী ভাবিয়া রাখিয়াছিল আসল কথাটা সে রাত্রে আহারাদির পরে ধীরে-সুস্থে পাড়িবে। কিন্তু আর অপেক্ষা করা চলিল না। কহিল, কালীবাবু একেবারে নাছোড়াবান্দা হয়ে ধরেছেন। বোধ হয় সকলেরই ইচ্ছে মাঝের চোত্ মাসটা বাদ দিয়ে বোশেখের প্রথমেই শুভ কাজটা হয়ে যায়।

কালীবাবু অতিশয় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, তাঁহার পরিবারে আচারপরায়ণতার খ্যাতি প্রসিদ্ধ। তাঁহারই কনিষ্ঠ কন্যাকে মাতাঠাকুরানী পছন্দ করিয়াছেন এ আভাস তাঁহার কয়েকখানা পত্রেই ছিল। তেওয়ারীর কথাটা অপূর্বর ভাল লাগিল না। কহিল, এত তাড়াতাড়ি কিসের? কালীবাবুর গৌরীদানের সবুর না সয়, তিনি ত আর কোথাও চেষ্টা করতে পারেন!

তেওয়ারী একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, তাড়াতাড়ি তাঁর কি মা'র, কি করে জানবো ছোটবাবু? লোকে হয়ত তাঁকে ভয় দেখায় বর্মা দেশটা তেমন ভাল নয়,—এখানে ছেলেরা বিগড়ে যায়।

অপূর্ব খামকা ভয়ানক জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, দ্যাখ তেওয়ারী, তুই আমার ওপর অত পণ্ডিতি করিস নে বলে দিচ্ছি। মাকে তুই রোজ রোজ অত চিঠি লিখিস কিসের? আমি ছেলেমানুষ নই।

এই অকারণ-ক্রোধে তেওয়ারী প্রথমে বিস্মিত হইল, বিশেষতঃ রোগ হইতে উঠিয়া নানা কারণে তাহারও মেজাজ খুব ভাল ছিল না, সেও রাগিয়া বলিল, আসবার সময়ে মাকে এ কথা বলে আসতে পারেন নি? তাহ'লে ত বেঁচে যেতাম, জাতজন্ম খোয়াতে জাহাজে চড়তে হতো না।

অপূর্ব চোখ রাঙ্গাইয়া চট করিয়া কলার ও নেকটাই তুলিয়া লইয়া গলায় পরিতে লাগিল। তেওয়ারী বহুকাল হইতেই ইহার অর্থ জানিত। কহিল, তাহলে জলটল কিছু খাবেন না?

অপূর্ব তাহার প্রশ্নের জবাবে আলনা হইতে কোট লইয়া তাহাতে হাত গলাইতে গলাইতে দুমদুম করিয়া বাহির হইয়া গেল।

তেওয়ারী গরম হইয়া বলিল, কাল রবিবারে চাটগাঁ দিয়ে একটা জাহাজ যায়—আমি তাতেই বাড়ি যাব বলে রাখলাম। অপূর্ব সিঁড়ি হইতে কহিল, না যাস ত তোর দিব্যি রইল!—বলিয়া নীচে চলিয়া গেল।

মিনিট-পাঁচেকের মধ্যে প্রভু ও ভৃত্যে কিসের জন্য যে এমন একটা রাগারাগি হইয়া গেল, অনভিজ্ঞ কেহ উপস্থিত থাকিলে সে একেবারে আশ্চর্য হইয়া যাইত, সে ভাবিয়াও পাইত না যে, এমনি অর্থহীন আঘাতের পথ দিয়াই মানুষের ব্যথিত বিক্ষুব্ধ চিত্ত চিরদিন আপনাকে সহজের মধ্যে ফিরাইয়া আনিবার পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে।

এগার

অপূর্বর যাইবার জায়গা একমাত্র ছিল তলওয়ারকরের বাটী। এখানে বাঙালীর অভাব নাই, কিন্তু আসিয়া পর্যন্ত এমন ঝড়-ঝাপটার মধ্যেই তাহার দিন কাটিয়াছে যে কাহারও সহিত পরিচয় করিবার আর ফুরসত পায় নাই। বাহির হইয়া আজও সে রেলওয়ে স্টেশনের দিকেই চলিয়াছিল, কিন্তু হঠাৎ মনে পড়িল আজ শনিবারে তাহার সস্ত্রীক থিয়েটারে যাইবার কথা। অতএব, পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ানো ব্যতীত অন্য কিছু করিবার যখন রহিল না এবং কোথায় যাইবে যখন ভাবিতেছে, তখন অকস্মাৎ ভারতীকে মনে পড়িয়া তাহার প্রতি গভীর অকৃতজ্ঞতা আজ তাহাকে তীক্ষ্ণ করিয়া বিঁধিল। তাহার আহত অপরাধী মন তাহারি কাছে যেন জবাবদিহি করিয়া বারবার বলিতে লাগিল, সে ভালই আছে, তাহার কিছুই হয় নাই; নহিলে, এতবড় জীবন-মরণ সমস্যায় একটা খবর পর্যন্ত দিত না তাহা হইতেই পারে না, তবুও সে ওই জবাবদিহির বেশী আর অগ্রসর হইল না। তেলের কারখানার কাছাকাছি কোথাও তাহার নূতন বাসা ইহা সে ভুলে নাই, ইহাই খুঁজিয়া বাহির করিবার কল্পনায় মন তাহার নাচিয়া উঠিল, কিন্তু এমন করিয়া যে লোক আত্মগোপন করিয়া আছে, এতকাল পরে তাহার তত্ত্ব লইতে যাওয়ার লজ্জাও সে সম্পূর্ণ কাটাইয়া উঠিতে পারিল না। হয়ত সে ইহা চাহে না, হয়ত সে তাহাকে দেখিয়া বিরক্ত হইবে, তাই চলিতে চলিতে আপনাকে আপনি সে একশত-বার করিয়া বলিতে লাগিল, পুলিশের লোকে তাহার সই চাহে, অতএব কাজের জন্যই সে আসিয়াছে; সে কেমন আছে, কোথায় আছে এ-সকল অকারণ কৌতূহল তাহার নাই। এতদিন পরে এ অভিযোগ ভারতী কোন মতেই তাহার প্রতি আরোপ করিতে পারিবে না।

এ অঞ্চলে অপূর্ব আর কখনো আসে নাই। পূর্বমুখে প্রশস্ত রাস্তা সোজা গিয়াছে, অনেক দূর হাঁটিয়া ডান দিকে নদীর ধারে যে পথ, সেইখানে আসিয়া একজনকে সে জিজ্ঞাসা করিল, এদিকে সাহেব-মেমেরা কোথায় থাকে জানো? লোকটি প্রত্যুত্তরে আশেপাশের যে-সকল ছোট-বড় বাঙলো দেখাইয়া দিল তাহাদের আকৃতি, অবয়ব ও সাজসজ্জা দেখিয়াই অপূর্ব বুঝিল তাহার প্রশ্ন করা ভুল হইয়াছে। সংশোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, অনেক বাঙালীরাও ত থাকে এখানে, কেউ কারিগর, কেউ মিস্ত্রী, তাদের মেয়েছেলেরা—

লোকটি কহিল, ঢের, ঢের। আমিই ত একজন মিস্ত্রী। আমার তাঁবেই ত পঞ্চাশ জন কারিগর—যা করব তাই! ছোট সাহেবকে বলে জবাব পর্যন্ত দিতে পারি। কাকে খোঁজেন?

অপূর্ব চিন্তা করিয়া কহিল, দেখো আমি যাকে খুঁজি,—আচ্ছা, যারা বাঙালী ক্রীশ্চান কিংবা—

লোকটি আশ্চর্য হইয়া বলিল, বলছেন বাঙালী,—আবার খ্রীষ্টান কিরকম? খ্রীষ্টান হলে আবার বাঙালী থাকে নাকি? খ্রীষ্টান—খ্রীষ্টান। মোচলমান—মোচলমান! বস্, এই ত জানি মশায়!

অপূর্ব বলিল, আহা! বাঙলা দেশের লোক ত! বাংলা ভাষা বলে ত!

সে গরম হইয়া কহিল, ভাষা বললেই হল? যে জাত দিয়ে খ্রীষ্টান হয়ে গেল তাতে আর পদার্থ রইল কি মশায়? কোন বাঙালী তার সঙ্গে আহার-ব্যবহার করুক একবার দেখি ত! ওই যে কোত্থেকে সব মেয়ে-মাস্টার এসেচে ছেলেপুলেদের পড়ায়—বস্! তা বলে কেউ কি তাদের সঙ্গে খাচ্চে, না বসচে?

অপূর্ব কূল দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কোথায় থাকেন জানো?

সে কহিল, তা আর জানিনে! এই রাস্তায় সোজা গাঙের ধারে গিয়ে জিজ্ঞেসা করবেন নতুন ইস্কুল-ঘর কোথায়,—কচি ছেলেটা পর্যন্ত দেখিয়ে দেবে। ডাক্তারবাবু থাকেন কিনা! মানুষ ত নয়,— দেব্তা! মরা বাঁচাতে পারেন!—এই

বলিয়া সে নিজের কাজে চলিয়া গেল। সেই পথে সোজা আসিয়া অপূর্ব লাল রঙের একখানি কাঠের বাড়ি দেখিতে পাইল।

বাড়িটি দ্বিতল, একেবারে নদীর উপরে। তখন রাত্রি হইয়াছে, পথে লোক নাই—উপরের খোলা জানালা হইতে আলো আসিতেছে,—কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবার জন্য সে সেইখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু মনের মধ্যে তাহার সন্দেহ রহিল না যে এইখানেই ভারতী থাকে, এবং ওই জানালাতেই তাহার দেখা মিলিবে।

মিনিট-পনেরো পরে জন দুই-তিন লোক বাহির হইয়া তাহাকে দেখিয়া সহসা যেন চকিত হইয়া উঠিল। একজন প্রশ্ন করিল, কে? কাকে চান?

তাহার সন্দিগ্ধ কণ্ঠস্বরে অপূর্ব সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, মিস জোসেফ বলে কোন স্ত্রীলোক থাকেন এখানে?

সে তৎক্ষণাৎ বলিল, থাকেন বৈ কি—আসুন।

অপূর্বর ঠিক যাইবার সঙ্কল্প ছিল না, কিন্তু দ্বিধা করিতেই লোকটি কহিল, আপনি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন? কিন্তু তিনি ত ঘরেই আছেন,—আসুন। আমরা আপনাকে নিয়ে যাচ্চি, এই বলিয়া সে অগ্রসর হইল।

তাহার ত্বরা দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা গেল ইহারা তাহাকে যাচাই করিয়া লইতে চায়। অতএব দ্বার হইতে এখন না বলিয়া ফিরিতে চাহিলে সন্দেহ ইহাদের এমনিই বিশ্রী হইয়া উঠিবে যে সে তাহা ভাবিতেই পারিল না। তাই চলুন বলিয়া সে লোকটির অনুসরণ করিয়া একমুহূর্ত পরেই এই কাঠের বাড়ির নীচেকার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহারই এক পাশ দিয়া উপরে উঠিবার সিঁড়ি। ঘরটি হলের মত প্রশস্ত। ছাদ হইতে ঝুলানো একটা মস্ত আলো, গোটা-কয়েক টেবিল চেয়ার, একটা কালো বোর্ড এবং সমস্ত দেয়াল জুড়িয়া নানা আকারের ও নানা রঙের ম্যাপ টাঙানো। ইহাই যে নূতন ইস্কুল-ঘর অপূর্ব তাহা দেখিয়াই চিনিল। তথায় চার-পাঁচজন স্ত্রীলোক ও পুরুষে মিলিয়া বোধ হয় একটা তর্কই

করিতেছিল, সহসা একজন অপরিচিত লোককে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চুপ করিল। অপূর্ব একবার মাত্র তাহাদের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া যে তাহাকে আনিয়াছিল তাহারই পিছনে পিছনে উপরে উঠিয়া গেল। ভারতী ঘরেই ছিল, অপূর্বকে দেখিয়া তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কাছে আসিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া চেয়ারে বসাইয়া কহিল, এতদিন আমার খোঁজ নেননি যে বড়?

অপূর্ব বলিল, আপনিও ত আমাদের খোঁজ নেননি! কিন্তু কথাটা যে জবাব হিসাবে ঠিক হইল না তাহা সে বলিয়াই বুঝিল। ভারতী শুধু একটু হাসিল, কহিল, তেওয়ারী বাড়ি যেতে চাচ্চে, যাক। না গেলে সে সারবে না।

অপূর্ব কহিল, অর্থাৎ আপনি যে আমাদের খবর নেন না এ অভিযোগ সত্য নয়।

ভারতী পুনশ্চ একটু হাসিয়া কহিল, কাল রবিবার, কাল কিছু আর হবে না, কিন্তু পরশু বারোটার মধ্যেই কোর্টে গিয়ে টাকা আর জিনিসগুলো আপনার ফিরিয়ে আনবেন। একটু দেখে শুনে নেবেন যেন ঠকায় না।

আপনার কিন্তু একটা সই চাই।

তা জানি।

অপূর্ব প্রশ্ন করিল, আপনার সঙ্গে তেওয়ারীর বোধ হয় দেখা হয়, না?

ভারতী মাথা নাড়িয়া বলিল, না। কিন্তু আপনি যেন গিয়ে তার ওপর মিছে রাগ করবেন না।

অপূর্ব কহিল, মিছে না হোক, সত্যি রাগ করা উচিত। আপনি তার প্রাণ দিয়েছেন এটুকু কৃতজ্ঞতা তার থাকা উচিত ছিল।

ভারতী বলিল, নিশ্চয়ই আছে। নইলে, সে ত আমাকে জেলে পাঠাবার একবার অন্ততঃ চেষ্টা করেও দেখতো।

অপূর্ব এ ইঙ্গিত বুঝিল। আনতমুখে ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে বলিল, আপনি আমার উপর ভয়ানক রাগ করে আছেন।

ভারতী বলিল, কখখনো না। সারাদিন ইস্কুলে ছেলেমেয়ে পড়িয়ে, ঘরে ফিরে আবার সমিতির সেক্রেটারির কাজে অসংখ্য চিঠিপত্র লিখে, বিছানায় শুতে-না শুতেই ত ঘুমিয়ে পড়ি,—রাগ করবার সময় কোথায় আমার?

অপূর্ব কহিল, ওঃ—রাগ করবারও সময়টুকু নেই!

ভারতী বলিল, কৈ আর আছে? আপনি বরঞ্চ কোন দিন সকাল থেকে এসে দেখবেন সত্যি না মিছে!

অপূর্বর মুখ দিয়া অলক্ষিতে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল। কহিল, দেখবার আমার দরকার কি! একটুখানি থামিয়া কহিল, ইস্কুলে আপনাকে কত মাইনে দেয়?

ভারতী হাসি চাপিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, বেশ ত আপনি! মাইনের কথা বুঝি কাউকে জিজ্ঞাসা করতে আছে? এতে তার অপমান হয় না?

অপূর্ব ক্ষুণ্ণকণ্ঠে কহিল, অপমান করবার জন্যে ত আর বলিনি। চাকরিই যখন করছেন—

ভারতী কহিল, না করে কি শুকিয়ে মরতে বলেন?

অপূর্ব বলিল, এ যা চাকরি, এই ত শুকিয়ে মরা! তার চেয়ে বরঞ্চ আমাদের আফিসে একটা চাকরি আছে, মাইনে একশ' টাকা,—হয়ত দু-এক ঘণ্টার বেশী খাটতেও হবে না।

ভারতী প্রশ্ন করিল, আমাকে সেই চাকরি করতে বলেন?

অপূর্ব কহিল, দোষই বা কি?

ভারতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, আমি করব না। আপনি ত তার কর্তা, কাজে ভুলচুক হলেই লাঠি হাতে দরজায় এসে দাঁড়াবেন।

অপূর্ব জবাব দিল না। সে মনে মনে বুঝিল ভারতী শুধু পরিহাস করিয়াছে, তথাপি তাহার সেই একটা দিনের আচরণের ইঙ্গিত করায় তাহার গা জ্বলিয়া গেল। কিছুক্ষণ হইতেই একটা তর্ক-বিতর্কের কলরোল নীচে হইতে শুনা যাইতেছিল, সহসা তাহা উদ্দাম হইয়া উঠিল। অপূর্ব ভাল মানুষটির মত জিজ্ঞাসা করিল, আপনাদের ইস্কুল বসলো বোধ হয়—ছেলেরা সব পড়ায় মন দিয়েছে।

ভারতী গম্ভীরমুখে কহিল, তাহলে হাঁকাহাঁকিটা কিছু কম হতো। তাদের শিক্ষকেরা বোধ করি বিষয় নির্বাচনে মন দিয়েছেন।

আপনি যাবেন না?

যাওয়া ত উচিত, কিন্তু আপনাকে ছেড়ে যেতে যে মন সরে না। এই বলিয়া সে মুখ টিপিয়া হাসিল। কিন্তু অপূর্বর কান পর্যন্ত রাঙ্গা হইয়া উঠিল। সে আর একদিকে চোখ ফিরাইয়া পাশের দেয়ালের গায়ে সাজানো কাঁচা ঝাউপাতা দিয়া লেখা কয়েকটা অক্ষরের প্রতি সহসা দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিল, ওটা কি লেখা ওখানে?

ভারতী কহিল, পড়ুন না।

অপূর্ব ক্ষণকাল মনঃসংযোগ করিয়া বলিল, পথের-দাবী। তার মানে?

ভারতী কহিল, ওই আমাদের সমিতির নাম, ওই আমাদের মন্ত্র, ওই আমাদের সাধনা! আপনি আমাদের সভ্য হবেন?

অপূর্ব বলিল, আপনি নিজে একজন সভ্য নিশ্চয়ই, কিন্তু কি আমাদের করতে হবে?

ভারতী বলিল, আমরা সবাই পথিক। মানুষের মনুষ্যত্বের পথে চলবার সর্বপ্রকার দাবী অঙ্গীকার করে আমরা সকল বাধা ভেঙ্গেচুরে চলবো। আমাদের পরে যারা আসবে তারা যেন নিরুপদ্রবে হাঁটতে পারে, তাদের অবাধ মুক্ত গতিকে কেউ যেন না রোধ করতে পারে, এই আমাদের পণ। আসবেন আমাদের দলে?

অপূর্ব কহিল, আমরা পরাধীন জাতি, ইংরেজ নই, ফরাসী নই, আমেরিকান নই,—কোথায় পাবো আমরা অপ্রতিহত গতি? স্টেশনের একটা বেঞ্চে বসবার আমাদের অধিকার নেই, অপমানিত হয়ে নালিশ করবার পথ নেই,—বলিতে বলিতে সেদিনের সমস্ত লাঞ্ছনা,— ফিরিঙ্গী ছোঁড়াদের বুটের আঘাত হইতে স্টেশন মাস্টারের বাহির করিয়া দেওয়া অবধি সকল অপমান স্পষ্ট অনুভব করিয়া তাহার দুই চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কহিল, আমরা বসলে বেঞ্চ অপবিত্র হয়, আমরা গেলে ঘরের হাওয়া কলুষিত হয়,—আমরা যেন মানুষ নই! আমাদের যেন মানুষের প্রাণ, মানুষের রক্ত-মাংস গায়ে নেই! এই যদি আপনাদের সাধনা হয়, আছি আমি আপনাদের দলে।

ভারতী কহিল, আপনি কি মানুষের জ্বালা টের পান অপূর্ববাবু? সত্যিই কি মানুষের ছোঁয়ায় মানুষের আপত্তি করবার কিছু নেই, তার গায়ের বাতাসে আর একজনের ঘরের বাতাস অপবিত্র হয়ে ওঠে না?

অপূর্ব তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, নিশ্চয় নয়। মানুষের চামড়ার রঙ ত তার মনুষ্যত্বের মাপকাঠি নয়! কোন একটা বিশেষ দেশে জন্মানই ত তার অপরাধ হতে পারে না! মাপ করবেন আপনি, কিন্তু জোসেফ সাহেব ক্রীশ্চান বলেই ত শুধু আদালতে আমার কুড়ি টাকা দণ্ড হয়েছিল। ধর্ম্মমত ভিন্ন হলেই কি মানুষে হীন প্রতিপন্ন হবে? এ কোথাকার বিচার! এই বলচি আপনাকে আমি, এর জন্যেই এরা একদিন মরবে। এই যে মানুষকে অকারণে ছোট করে দেখা, এই যে ঘৃণা, এই যে বিদ্বেষ, এ অপরাধ ভগবান কখখনো ক্ষমা করবেন না।

বেদনা ও লাঞ্ছনার মত মানুষের সত্যবস্তুটিকে টানিয়া বাহিরে আনিতে ত দ্বিতীয় পদার্থ নাই, তাই সে সমস্ত ভুলিয়া অপমানকারীর বিরুদ্ধে অপমানিতের, পীড়কের বিরুদ্ধে পীড়িতের মর্ম্মান্তিক অভিযোগে সহস্রমুখ হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতী তাহার দৃপ্ত মুখের প্রতি চাহিয়া এতক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া ছিল, কিন্তু কথা তাহার শেষ হইতেই সে শুধু একটু মুচকিয়া হাসিয়া মুখ ফিরাইল। অপূর্ব চমকিয়া

উঠিল, তাহার মুখের উপর কে যেন সজোরে মারিল। ভারতীর কোন প্রশ্নই এতক্ষণ সে খেয়াল করে নাই, কিন্তু সেগুলি অগ্নিরেখার মত তাহার মাথার মধ্যে দিয়া সশব্দে খেলিয়া গিয়া তাহাকে একেবারে বাক্যহীন করিয়া দিল।

মিনিট-খানেক পরে ভারতী পুনরায় যখন মুখ ফিরাইয়া চাহিল, তখন তাহার ওষ্ঠাধরে হাসির চিহ্নমাত্র ছিল না, কহিল, আজ শনিবারে আমাদের ইস্কুল বন্ধ, কিন্তু সমিতির কাজ হয়। চলুন না, নীচে গিয়ে আপনাকে ডাক্তারের সঙ্গে পরিচিত করে দিয়ে পথের-দাবীর সভ্য করে নিই।

তিনি বুঝি সভাপতি?

সভাপতি? না, তিনি আমাদের মূল-শিকড়। মাটির তলায় থাকেন, তাঁর কাজ চোখে দেখা যায় না।

শিকড়ের প্রতি অপূর্বর কিছুমাত্র কৌতূহল জন্মিল না। জিজ্ঞাসা করিল, আপনাদের সভ্যরা বোধ হয় সকলে ক্রীশ্চান?

ভারতী কহিল, না, আমি ছাড়া সকলেই হিন্দু।

অপূর্ব আশ্চর্য হইয়া কহিল, কিন্তু মেয়েদের গলা পাচ্ছি যে?

ভারতী কহিল, তাঁরাও হিন্দু।

অপূর্ব মুহূর্তকাল দ্বিধা করিয়া বলিল, কিন্তু তাঁহার বোধ হয় জাতিভেদ,—অর্থাৎ কিনা, খাওয়া-ছোঁয়ার বিচার বোধ করি করেন না?

ভারতী বলিল, না। তারপরে হাসিমুখে কহিল, কিন্তু কেউ যদি মেনে চলেন, তাঁর মুখেও আমরা কেউ খাবার জিনিস জোর করে গুঁজে দিইনে। মানুষের ব্যক্তিগত প্রবৃত্তিকে আমরা অত্যন্ত সম্মান করে চলি। আপনার ভয় নেই।

অপূর্ব বলিল, ভয় আবার কিসের? কিন্তু,—আচ্ছা, আপনার মত শিক্ষিতা মহিলাও বোধ করি আপনাদের দলে আছেন?

আমার মত? এই বলিয়া সে হাসিয়া কহিল, আমাদের প্রেসিডেন্ট যিনি, তাঁর নাম সুমিত্রা, তিনি একলা পৃথিবী ঘুরে এসেছেন,—শুধু ডাক্তার ছাড়া তাঁর মত বিদুষী বোধ হয় এ-দেশে কেউ নেই।

অপূর্ব বিস্ময়াপন্ন হইয়া প্রশ্ন করিল, আর ডাক্তার যাঁকে বলছেন, তিনি?

ডাক্তার? শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে ভারতীর দুই চক্ষু যেন সজল হইয়া উঠিল, কহিল, তাঁর কথা থাক অপূর্ববাবু। পরিচয় দিতে গেলেই হয়ত তাঁকে ছোট করে ফেলবো

অপূর্ব আর কোন প্রশ্ন না করিয়া চুপ করিয়া রহিল। দেশের প্রতি ভালবাসার নেশা তাহার রক্তের মধ্যে—এই দিক দিয়া পথের-দাবীর বিচিত্র নামটা তাহাকে টানিতে লাগিল।

এই সঙ্গীহীন, বন্ধুহীন বিদেশে এতগুলি অসাধারণ শিক্ষিত নর-নারীর আশা ও আকাঙ্ক্ষা, চেষ্টা ও উদ্যম, তাহাদের ইতিহাস, তাহাদের রহস্যময় কর্মজীবনের অপরিজ্ঞাত পদ্ধতি ওই যে অদ্ভুত নামটাকে জড়াইয়া উঠিতে চাহিতেছে তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ মিলনের লোভ সংবরণ করা কঠিন, কিন্তু তবুও কেমন যেন একপ্রকার বিজাতীয়, ধর্মবিহীন, অস্বাস্থ্যকর বাষ্প নীচে হইতে উঠিয়া তাহার মনটাকে ধীরে ধীরে গ্লানিতে ভরিয়া আনিতে লাগিল।

কলরব বাড়িয়া উঠিতেই ছিল, ভারতী কহিল, চলুন যাই।

অপূর্ব সায় দিয়া বলিল, চলুন—

উভয়ে নীচে আসিলে ভারতী তাহাকে একটা বেতের সোফায় বসিতে দিয়া স্থানাভাবে তাহার পার্শ্বেই উপবেশন করিল।

এই আসনটা এমন সঙ্কীর্ণ যে এত লোকের সম্মুখে ভদ্রতা রক্ষা করিয়া দুজনের বসা চলে না। এরূপ অদ্ভুত আচরণ ভারতী কোনদিন করে নাই, অপূর্ব শুধু সঙ্কোচ নয়, অত্যন্ত লজ্জাবোধ করিতে লাগিল, কিন্তু এখানে এই-সকল ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপ করিবারও যেন কাহারও অবসর নাই। সে আর একটা বস্তু লক্ষ্য

করিল যে, তাহার মত অপরিচিত ব্যক্তিকে আসন গ্রহণ করিতে দেখিয়া প্রায় সকলেই চাহিয়া দেখিল, কিন্তু, যে বিতণ্ডা উদ্দাম বেগে বহিতেছিল তাহাতে লেশমাত্র বাধা পড়িল না। কেবল, একটিমাত্র লোক যে পিছন ফিরিয়া কোণের টেবিলে বসিয়া লিখিতেছিল সে লিখিতেই রহিল, তাহার আগমন বোধ হয় জানিতেই পারিল না। অপূর্ব গণিয়া দেখিল ছয়জন রমণী এবং আটজন পুরুষে মিলিয়া এই ভীষণ আলোচনা চলিতেছে। ইহাদের সকলেই অচেনা, কেবল একটি ব্যক্তিকে অপূর্ব চক্ষের পলকে চিনিতে পারিল। বেশভূষার কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু এই মূর্তিকেই সে কিছুকাল পূর্বে মিক্‌থিলা রেলওয়ে স্টেশনে টিকিট না কেনার দায় হইতে পুলিশের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল, এবং টাকাটা যতশীঘ্র সম্ভব ফিরাইয়া দিতে যিনি স্বেচ্ছায় প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। লোকটি চাহিয়া দেখিল, কিন্তু মদের নেশায় যাহার কাছে হাত পাতিয়া উপকার গ্রহণ করিয়াছিলেন, মদ না-খাওয়া অবস্থায় তাহাকে স্মরণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু ইঁহার জন্য নয়, ভারতীকে মনে করিয়া তাহার বুকে ব্যথাটা অতিশয় বাজিল যে এরূপ সংসর্গে সে আসিয়া পড়িল কিরূপে?

সুমুখে কে একজন দাঁড়াইয়াছিল, বসিয়া পড়িতেই অপূর্বর কানের কাছে মুখ আনিয়া ভারতী চুপি চুপি কহিল, উনিই আমাদের প্রেসিডেন্ট, সুমিত্রা।

বলিবার প্রয়োজন ছিল না। অপূর্ব দেখিয়াই চিনিল। কারণ, নারীকে দিয়াই যদি কোন সমিতি পরিচালনা করিতে হয়, এই ত সেই বটে! বয়স বোধ করি ত্রিশের কাছে পৌঁছিয়াছে, কিন্তু যেন রাজরানী! বর্ণ কাঁচা সোনার মত, দাক্ষিণাত্যের ধরনে এলো করিয়া মাথার চুল বাঁধা, হাতে গাছকয়েক করিয়া সোনার চুড়ি, ঘাড়ের কাছে সোনার হারের কিয়দংশ চিকচিক করিতেছে, কানে সবুজ পাথরের তৈরী দুলের উপর আলো পড়িয়া যেন সাপের চোখের মত জ্বলিতেছে,—এই ত চাই!—ললাট, চিবুক, নাক, চোখ, ভ্রু, ওষ্ঠাধর,—কোথাও যেন আর খুঁত নাই,—একি ভয়ানক আশ্চর্য রূপ! কালো বোর্ডের গায়ে একটা হাত

রাখিয়া তিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন, অপূর্বর চোখে আর পলক পড়িল না। সে আঁক কষিয়াই মানুষ হইয়াছে, কাব্যের সহিত পরিচয় তাহার অত্যন্ত বিরল, কিন্তু, কাব্য যাঁহারা লেখেন, কেন যে তাঁহারা এত-কিছু থাকিতে তরুণ লতিকার সঙ্গেই নারীদেহের তুলনা করেন তাহার জানিবার কিছু আর রহিল না। সম্মুখে একটি বিশ-বাইশ বছরের সাধারণ-গোছের মহিলা আনতমুখে বসিয়াছিলেন, ভাবে বোধ হয়, তাঁহাকেই কেন্দ্র করিয়া এক তর্কের ঝড় উঠিয়াছে।

আবার তাঁহারই অনতিদূরে বসিয়া প্রৌঢ়-গোছের একজন ভদ্রলোক। তাঁহার পরনের কাটছাঁট পরিশুদ্ধ বিলাতি পোশাক দেখিয়া অবস্থাপন্ন বলিয়াই মনে হয়। খুব সম্ভব তিনিই প্রতিপক্ষ; কি বলিতেছিলেন অপূর্ব ভাল শুনিতেও পায় নাই, মনোযোগও করে নাই, তাহার সমস্ত চিত্ত সুমিত্রার প্রতিই একেবারে একাগ্র হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার কণ্ঠস্বরে কি জানি কোন্ পরম বিস্ময় ঝড়িয়া পড়িবে এই ছিল তাহার আশা। অনতিকাল পূর্বের ক্ষোভের হেতু তাহার মনেও ছিল না। সাহেবি পোশাক-পরা ভদ্রলোকটির প্রত্যুত্তরে এইবার তিনি কথা কহিলেন।

এই ত! নারীর কণ্ঠস্বর ত একেই বলে! ইহার কণাটুকুও না বাদ যায়, অপূর্ব এমনি করিয়াই কান পাতিয়া রহিল। সুমিত্রা কহিলেন, মনোহরবাবু, আপনি ছেলেমানুষ উকিল নন, আপনার তর্ক অসংলগ্ন হয়ে পড়লে ত মীমাংসা করতে পারব না।

মনোহরবাবু উত্তর দিলেন, অসংলগ্ন তর্ক করা আমার পেশাও নয়।

সুমিত্রা হাসিমুখে কহিলেন, তাই ত আশা করি। বেশ, বক্তব্য আপনার ছোট করে আনলে এইরূপ দাঁড়ায়। আপনি নবতারার স্বামীর বন্ধু। তিনি জোর করে তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান, কিন্তু স্ত্রী স্বামীর ঘর করতে চান না, দেশের কাজ করতে চান, এতে অন্যায় কিছু ত দেখিনে।

মনোহর বলিলেন, কিন্তু স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য আছে ত? দেশের কাজ করব বললেই ত তার উত্তর হয় না।

সুমিত্রা কহিলেন, দেখুন মনোহরবাবু, নবতারা কোন্ কাজ করবেন, না করবেন, সে বিচার তাঁর উপর, কিন্তু তাঁর স্বামীরও স্ত্রীর প্রতি যে কর্তব্য ছিল, তিনি তা কোনদিন করেন নি, এ কথা আপনারা সবাই জানেন। কর্তব্য ত কেবল একদিকে নয়!

মনোহর রাগিয়া কহিলেন, কিন্তু তাই বলে স্ত্রীকেও যে অসতী হয়ে যেতে হবে, সেও ত কোন যুক্তি হতে পারে না! এই বয়সে এই দলের মধ্যে থেকেও উনি সতীত্ব বজায় রেখে যে দেশের সেবা করতে পারবেন,—এ ত কোনমতেই জোর করে বলা চলে না!

সুমিত্রার মুখ ঈষৎ আরক্ত হইয়াই তখনি সহজ হইয়া গেল, বলিলেন, জোর করে কিছু বলাও উচিত নয়। কিন্তু আমরা দেখচি নবতারার হৃদয় আছে, প্রাণ আছে, সাহস আছে, এবং সবচেয়ে বড় যা, সেই ধর্মজ্ঞান আছে। দেশের সেবা করতে এইটুকুই আমরা যথেষ্ট জ্ঞান করি। তবে, আপনি যাকে সতীত্ব বলছেন, সে বজায় রাখবার ওঁর সুবিধে হবে কিনা সে উনিই জানেন।

মনোহর নবতারার আনত মুখের প্রতি একবার কটাক্ষে চাহিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, খাসা ধর্মজ্ঞান ত! দেশের কাজে এই শিক্ষাই বোধ হয় উনি দেশের মেয়েদের দিয়ে বেড়াবেন?

সুমিত্রা বলিলেন, ওঁর দায়িত্ববোধের প্রতি আমাদের বিশ্বাস আছে। ব্যক্তি-বিশেষের চরিত্র আলোচনা করা আমাদের নিয়ম নয়, কিন্তু যে স্বামীকে উনি ভালবাসতে পারেন নি, আর একটা বড় কাজের জন্য যাঁকে ত্যাগ করে আসা উনি অন্যায় মনে করেন নি,সেই শিক্ষাই যদি দেশের মেয়েদের উনি দিতে চান ত আমরা আপত্তি করব না।

মনোহর কহিলেন, আমাদের এই সীতা-সাবিত্রীর দেশে এমনি শিক্ষা উনি গৃহস্থ মেয়েদের দেবেন?

সুমিত্রা সায় দিয়া বলিলেন, দেওয়া ত উচিত। মেয়েদের কাছে শুধু অর্থহীন বুলি উচ্চারণ না করে নবতারা যদি বলেন যে, এই দেশে একদিন সীতা আত্মসম্মান রাখতে স্বামী ত্যাগ করে পাতালে গিয়েছিলেন, এবং রাজকন্যা সাবিত্রী দরিদ্র সত্যবানকে বিবাহের পূর্বে এত ভালবেসেছিলেন যে অত্যন্ত স্বল্পায়ু জেনেও তাঁকে বিবাহ করতে তাঁর বাধেনি,—এবং আমি নিজেও যে দুর্বৃত্ত স্বামীকে ভালবাসতে পারিনি তাকে পরিত্যাগ করে এসেছি, অতএব, আমার মত অবস্থায় তোমরাও তাই করো,—এ শিক্ষায় ত দেশের মেয়েদের ভালই হবে মনোহরবাবু।

মনোহরের ওষ্ঠাধর ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল। প্রথমটা ত তাঁহার মুখ দিয়া কথাই বাহির হইল না, তারপরে বলিয়া উঠিলেন, তাহলে দেশ উচ্ছন্ন যাবে। হঠাৎ হাতজোড় করিয়া কহিলেন, দোহাই আপনাদের, নিজেরা যা ইচ্ছে করুন, কিন্তু অপরকে এ শিক্ষা দেবেন না। ইউরোপের সভ্যতা আমদানি করে যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু মেয়েদের মধ্যে তার প্রচার করে সমস্ত ভারতবর্ষটাকে আর রসাতলে পাঠাবেন না।

সুমিত্রার মুখের উপর বিরক্তি ও ক্লান্তি যেন একই সঙ্গে ফুটিয়া উঠিল, কহিলেন, রসাতল থেকে বাঁচাবার যদি কোন পথ থাকে ত এই। কিন্তু, ইউরোপীয় সভ্যতা সম্বন্ধে আপনার বিশেষ কোন জ্ঞান নেই, সুতরাং, এ নিয়ে তর্ক করলে শুধু সময় নষ্ট হবে। অনেক সময় গেছে,—আমাদের অন্য কাজ আছে।

মনোহরবাবু যথাসাধ্য ক্রোধ দমন করিয়া কহিলেন, সময় আমারও অপর্যাপ্ত নয়। নবতারা তাহলে যাবেন না?

নবতারা এতক্ষণ মুখ তুলিয়াও চাহে নাই, সে মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

মনোহর সুমিত্রাকে প্রশ্ন করিলেন, এঁর দায়িত্ব তাহলে আপনারাই নিলেন?

নবতারাই ইহার জবাব দিল, কহিল, আমার দায়িত্ব আমিই নিতে পারবো, আপনি চিন্তিত হবেন না।

মনোহর বক্রদৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া সুমিত্রাকেই পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, কহিলেন, আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি, স্বামীগৃহে বিবাহিত-জীবনের চেয়ে গৌরবের বস্তু নারীর আর কিছু আছে আপনি বলতে পারেন?

সুমিত্রা কহিলেন, অপরের যাই হোক, অন্ততঃ, নবতারার স্বামীগৃহে তার বিবাহিত জীবনকে আমি গৌরবের জীবন বলতে পারিনে।

এই উত্তরের পরে মনোহর আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। অত্যন্ত কটুকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু এইবার ঘরের বাইরে তার অসতী জীবনটাকে বোধ করি গৌরবের জীবন বলতে পারবেন?

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এত বড় কদর্য বিদ্রূপেও কাহারও মুখে কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইল না। সুমিত্রা শান্তস্বরে বলিলেন, মনোহরবাবু, আমাদের সমিতির মধ্যে সংযতভাবে কথা বলা নিয়ম।

আর এ নিয়ম যদি না মানতে পারি?

আপনাকে বার করে দেওয়া হবে।

মনোহরবাবু যেন ক্ষেপিয়া গেলেন। জ্যা-মুক্ত শরের ন্যায় সোজা দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন, আচ্ছা চললুম! গুডবাই! এই বলিয়া দ্বারের কাছে আসিয়া তাঁহার উন্মত্ত ক্রোধ যেন সহস্রধারে ফাটিয়া পড়িল। হাত-পা ছুঁড়িয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমি সমস্ত খবর তোমাদের জানি। ইংরেজ রাজত্ব তোমরা ঘুচাবে? মনেও করো না! আমি চাষা নই, আমি অ্যাডভোকেট। কোথায় বিচার পেতে হয়, কোথায় তোমাদের হাতে শিকল পরাতে হয় ভালরকম জানি! আচ্ছা,— এই বলিয়া তিনি অন্ধকারে দ্রুতবেগে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

হঠাৎ কি যেন একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। উত্তেজনা কেহই প্রকাশ করিল না, কিন্তু সকলের মুখেই যেন কি-একপ্রকার ছায়া পড়িল। কেবল যে লোকটা

কোণে বসিয়া লিখিতেছিল, সে একবার চোখ তুলিয়াও চাহিল না। অপূর্বর মনে হইল, হয় সে সম্পূর্ণ বধির, না হয়, একেবারে পাষাণের ন্যায় নিরাকুল, নির্বিকার। ভারতীর মুখের চেহারাটা সে দেখিতে চাহিল, কিন্তু সে যেন ইচ্ছা করিয়াই আর একদিকে ঘাড় ফিরাইয়া রহিল। মনোহর ব্যক্তিটি যেই হোন, রাগের মাথায় এই সমিতির বিরুদ্ধে যে-সকল কথা বলিয়া গেলেন তাহা অতিশয় সন্দেহজনক। এতগুলি আশ্চর্য নরনারী কোথা হইতে আসিয়াই বা এখানে সমিতি গঠন করিলেন, কি বা তাহার সত্যকার উদ্দেশ্য, হঠাৎ ভারতীই বা কি করিয়া ইহাদের সন্ধান পাইল?

আর ওই যে লোকটি টিকিটের পরিবর্তে একদিন অনায়াসে মদ কিনিয়া খাইয়া তাহারই চোখের সম্মুখে ধরা পড়িয়াছিল,—আর সকলের বড় এই নবতারা!—স্বামী ত্যাগ করিয়া দেশের কাজ করিতে আসিয়াছে,—সতীত্ব-রক্ষার কথা ভাবিবার এখন যাহার সময় নাই,—অথচ এই লোকগুলা এত বড় অন্যায়কে শুধু সমর্থন নয়, প্রাণপণে প্রশয় দিতেছে। এবং যিনি ইহাদের কর্ত্রী, স্ত্রীলোক হইয়াও তিনি প্রকাশ্য সভায় এতগুলি পুরুষের সমক্ষে সতীধর্মের প্রতি তাঁহার একান্ত অবজ্ঞা অসঙ্কোচে প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধটুকুও করিলেন না।

কিছুক্ষণ অবধি সমস্ত ঘরটা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল; বাহিরে অন্ধকার, অপ্রশস্ত রাজপথ তেমনি জনহীন নীরব, কেমন যেন একপ্রকার উদ্বিগ্ন আশঙ্কায় অপূর্বর মনের ভিতরটা ভার হইয়া উঠিল।

হঠাৎ সুমিত্রার কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়া উঠিল, অপূর্ববাবু!

অপূর্ব চকিত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল।

সুমিত্রা কহিলেন, আপনি আমাদের চেনেন না, কিন্তু ভারতীর কাছ থেকে আমরা সবাই আপনাকে চিনি। শুনলাম আপনি আমাদের সমিতির মেম্বর হতে চান। সত্য?

অপূর্ব না বলিতে পারিল না, ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। যে লোকটি এক মনে লিখিতেছিল, সুমিত্রা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, ডাক্তার, অপূর্ববাবুর নামটা লিখে নেবেন। অপূর্বকে হাসিয়া বলিলেন, আমাদের কোন রকম চাঁদা নেই,—টাকাকড়ি দিতে হয় না এইটে আমাদের সমিতির বিশেষত্ব।

প্রত্যুত্তরে অপূর্ব নিজেও একটু হাসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। একটা মোটা বাঁধানো খাতায় যথার্থই তাহার নাম লেখা হইয়া গেল দেখিয়া মনে মনে সে অস্বস্তিতে ভরিয়া উঠিল এবং চুপ করিয়া থাকিতে আর না পারিয়া বলিয়া ফেলিল, কিন্তু কি উদ্দেশ্য, কি আমাকে করতে হবে কিছুই ত জানতে পারলাম না।!

ভারতী আপনাকে জানান নি?

অপূর্ব ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, কিছু জানিয়েছেন, কিন্তু একটা কথা আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করি, নবতারার আচরণ আপনারা কি সত্যই অন্যায় মনে করেন না?

সুমিত্রা কহিলেন, অন্ততঃ আমি করিনে। কারণ, দেশের বড় আমার কাছে কিছুই নেই।

অপূর্ব শ্রদ্ধাভরে কহিল, দেশকে আমিও প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। এবং দেশের সেবা করবার অধিকার স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই সমান, কিন্তু এঁদের কর্মক্ষেত্র ত এক নয়; আমরা পুরুষে বাইরে এসে কাজ করব, কিন্তু নারী গৃহের মধ্যে, শুদ্ধান্তঃপুরে স্বামী-পুত্রের সেবার মধ্যে দিয়াই সার্থক হবেন। তাঁদের সত্যকার কল্যাণে দেশের যতবড় কাজ হবে বাইরে এসে পুরুষের সঙ্গে ভিড় করে দাঁড়ালে ত সে কাজ কিছুতেই হবে না।

সুমিত্রা হাসিলেন। অপূর্ব লক্ষ্য করিয়া দেখিল সকলেই যেন তাঁহার প্রতি চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসি গোপন করিল। সুমিত্রা কহিলেন, অপূর্ববাবু, এটা অনেক দিনের এবং অনেকের মুখের কথা তা আমরা অস্বীকার করিনে। কিন্তু আপনি ত

জানেন কোন একটা কথা কেবলমাত্র বহুদিন ধরে বহু লোকে বলতে থাকলেই তা সত্য হয়ে ওঠে না। এ ফাঁকির কথা। যারা কোনদিন দেশের কাজ করেনি এ তাদের কথা, দেশের চেয়ে নিজের স্বার্থ যাদের ঢের বড় এ তাদের কথা। এর মধ্যে এতটুকু সত্য নেই। আপনি নিজে যখন কাজে লাগবেন, তখনই এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করবেন যে যাকে আপনি নারীর বাইরে এসে ভিড় করা বলচেন সে যদি কখনো ঘটে, তখনি দেশের কাজ হবে, নইলে কেবলমাত্র পুরুষের ভিড়ে শুকনো বালির মত সমস্ত ঝরে ঝরে পড়বে, কোনদিন জমাট বাঁধবে না।

অপূর্ব মনে মনে লজ্জা পাইয়া কহিল, কিন্তু এতে কি দুর্নীতি বাড়বে না? চরিত্র কলুষিত হবার ভয় থাকবে না?

সুমিত্রা বলিলেন, ভয় কি ভিতরেই কম থাকে নাকি? অপূর্ববাবু, ওটা বাইরে আসার দোষ নয়, দোষ বিধাতার, যিনি নর-নারী সৃষ্টি করেছেন, তাদের মধ্যে অনুরাগের আকর্ষণ দিয়েছেন, তাঁর। অপূর্ববাবু, মনের মধ্যে একটুখানি বিনয় রেখে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের দিকে একবার চেয়ে দেখুন দিকি?

এই মন্তব্য শুনিয়া অপূর্ব খুশী হইতে পারিল না, বরঞ্চ, একটুখানি তীব্রতার সঙ্গেই বলিয়া উঠিল, অন্য দেশের কথা অন্য দেশ ভাবুক, আমি নিজেদের কল্যাণ-চিন্তা করতে পারলেই যথেষ্ট মনে করব। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু এখানে একটা বস্তু আমি লক্ষ্য না করে পারিনি যে, বিবাহিত-জীবনের প্রতি আপনাদের আস্থা নাই, এমন কি নারীত্বের যা চরম উৎকর্ষ, সেই সতীত্ব ও পতিব্রতা-ধর্মকেও আপনারা অবহেলার চক্ষে দেখেন। এর থেকে আসবে দেশের কল্যাণ?

সুমিত্রা ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া সকৌতুক স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, অপূর্ববাবু, আপনি একটু রাগ করে বলচেন, নইলে ঠিক ও-ভাব ত আমি প্রকাশ করিনি। তবে আগাগোড়াই যে আপনি ভুল বুঝেছেন তাও নয়। যে সমাজে কেবলমাত্র পুত্রার্থেই ভার্যা গ্রহণের বিধি আছে, নারী হয়ে তাকে ত আমি

শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারিনে। আপনি সতীত্বের চরম উৎকর্ষের বড়াই করছিলেন, কিন্তু, এই যে-দেশে বিবাহের ব্যবস্থা, সে-দেশে ও-বস্তু বড় হয় না, ছোটই হয়। সতীত্ব ত শুধু দেহেই পর্যবসিত নয়, অপূর্ববাবু, মনেরও ত দরকার? কায়মনে ভালবাসতে না পারলে ত ওর উচ্চস্তরে পৌঁছান যায় না? আপনি কি সত্যই মনে করেন মন্ত্র পড়ে বিয়ে দিলেই যে-কোন বাঙালী মেয়ে যে-কোন বাঙালী পুরুষকে ভালবাসতে পারে? একি পুকুরের জল যে, যে-কোন পাত্রে ঢেলে মুখ বন্ধ করে দিলেই কাজ চলে যাবে?

অপূর্ব হঠাৎ কথা খুঁজিয়া না পাইয়া কহিল, কিন্তু চিরকাল চলেও ত যাচ্ছে?

সুমিত্রা তাহার কথা শুনিয়া হাসিয়া মাথা নাড়িয়া কহিলেন, তা যাচ্ছে। প্রাণাধিক স্বামী বলে পাঠ লিখতেও তার বাধে না, কর্তব্যবোধে শ্রদ্ধাভক্তি করতেও হয়ত তার আটকায় না। বস্তুতঃ, ঘরকন্নার কাজে এর বেশি তার প্রয়োজন হয় না। আপনি ত গল্প পড়েছেন, কোন্ এক ঋষিপুত্রের দুধের বদলে চালের গুঁড়োর জল খেয়েই আরামে দিন কাটতো। কিন্তু, আরাম যেমনই হোক, যা নয় তাকে তাই বলে গর্ব করা ত যায় না।

এই আলোচনা অপূর্বর অত্যন্ত বিশ্রী ঠেকিল, কিন্তু এবারেও সে জবাব দিতে না পারিয়া কহিল, আপনি কি বলতে চান এর অধিক কারও ভাগ্যেই জোটে না?

সুমিত্রা কহিলেন, না, তা আমি বলিতেই পারিনে। কারণ, সংসারে দৈবাৎ বলেও একটা শব্দ আছে।

অপূর্ব কহিল, ওঃ—দৈবাৎ! কিন্তু কথা যদি আপনার সত্যও হয়, তবুও আমি বলি সমাজের মঙ্গলের জন্য, উত্তর-পুরুষের কল্যাণের জন্য আমাদের এই-ই ভাল।

সুমিত্রা তেমনি শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, না অপূর্ববাবু, সমাজ এবং আপনার উত্তর-পুরুষ কোনটারই এতে শেষ পর্যন্ত কল্যাণ হবে না। সমাজ ও বংশের নাম করে ব্যক্তিকে একদিন বলি দেওয়া হতো, কিন্তু ফল তার ভাল হয়নি,—আজ তা অচল। ভালবাসার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন উত্তর-পুরুষের জন্য না হলে এমন ভয়ানক স্নেহের ব্যবস্থা তার মাঝখানে স্থান পেত না। এই ব্যর্থ বিবাহিত-জীবনের মোহ নারীকে কাটাতেই হবে। তাকে বুঝাতেই হবে, এতে তার লজ্জাই আছে গৌরব নেই।

অপূর্ব ব্যাকুল হইয়া কহিল, কিন্তু ভেবে দেখুন আপনাদের এই সকল শিক্ষায় আমাদের সুনিয়ন্ত্রিত সমাজে অশান্তি এবং বিপ্লব এসেই উপস্থিত হবে।

সুমিত্রা বলিলেন, হলই বা। অশান্তি এবং বিপ্লব মানেই ত অকল্যাণ নয় অপূর্ববাবু। যে রুগ্ন, জীর্ণ, জরাগ্রস্ত সেই শুধু উৎকণ্ঠিত সর্তকতায় আপনাকে আগলে রাখেত চায় কোন দিক দিয়ে না তার গায়ে ধাক্কা লাগে। অনুক্ষণ এই ভয়েই সে কাঁটা হয়ে থাকে এতটুকু নাড়াচাড়াতেই তার প্রাণবায়ু চোখের পলকে বেরিয়ে যাবে। আর এমনি অবস্থাই যদি সমাজের হয়ে থাকে ত যাক না একটা হেস্তনেস্ত হয়ে। দুদিন আগে-পাছের জন্য কি-ই বা এমন ক্ষতি হবে?

এ কথার অপূর্ব আর জবাব দিল না, চুপ করিয়া রহিল। সুমিত্রা নিজেও ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, ঋষিপুত্রের উপমা দিয়ে হয়ত আপনাকে আমি ব্যথা দিয়েছি। কিন্তু ব্যথা যে আপনার পাওনা ছিল, তার থেকে আপনাকে আমি বাঁচাতামই বা কি করে?

তাঁহার শেষের কথাটা অপূর্ব বুঝিতে পারিল না, কিন্তু বিরক্তির পাত্র তাহার পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাই প্রত্যুত্তরে বলিয়া ফেলিল, জগন্নাথের পথে দাঁড়িয়ে ক্রীশ্চান মিশনারিরা যাত্রীদের অনেক ব্যথা দেয়। তবুও সেই ঠুঁটো জগন্নাথকে ত্যাগ করে কেউ হাতওয়ালা খ্রীষ্টকেও ভজে না। ঠুঁটো নিয়েই তাদের কাজ চলে যায়, এই আশ্চর্য!

সুমিত্রা রাগ করিলেন না, হাসিয়া বলিলেন, সংসারে আশ্চর্য আছে বলেই ত মানুষের বাঁচা অসম্ভব হয়ে ওঠে না অপূর্ববাবু। গাছের পাতার রঙ যে সবাই সবুজ দেখে না এ তারা জানেও না। তবু যে লোকে তাকে সবুজ বলে, সংসারে এই কি কম আশ্চর্য! সতীত্বের সত্যিকার মূল্য জানলে কি—

সুমিত্রা! যে লোকটি নিঃশব্দে এতক্ষণ লিখিতেছিল সে উঠিয়া দাঁড়াইল। সকলেই সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিল।

অপূর্ব দেখিল, গিরীশ মহাপাত্র!

ভারতী তাহার কানে কানে বলিল, উনিই আমাদের ডাক্তার। উঠে দাঁড়ান।

কলের পুতুলের মত অপূর্ব উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু ক্রুদ্ধ মনোহরের শেষ কথাগুলো তাহার চক্ষের নিমেষে মনে পড়িয়া সমস্ত দেহের রক্ত যেন হিম হইয়া গেল।

গিরীশ কাছে আসিয়া কহিলেন, আমাকে বোধ হয় আপনি ভুলে যাননি? আমাকে এঁরা সবাই ডাক্তার বলেন। এই বলিয়া তিনি হাসিলেন।

অপূর্ব হাসিতে পারিল না, কিন্তু আস্তে আস্তে বলিল, আমার কাকাবাবুর খাতায় কি একটা ভয়ানক নাম লেখা আছে—

গিরীশ সহসা তাহার দুই হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া চুপিচুপি কহিলেন, সব্যসাচী ত? এই বলিয়া পুনশ্চ হাসিয়া বলিলেন, কিন্তু রাত হয়ে গেছে অপূর্ববাবু, চলুন, আপনাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি। পথটা তেমন ভাল নয়,—পাঠান ওয়ার্কমেন-গুলোর মদ খেলে আর যেন কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। চলুন। এই বলিয়া যেন একপ্রকার জোর করিয়াই তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া আনিলেন।

সুমিত্রাকে একটা নমস্কার করা হইল না, ভারতীকে একটা কথা বলা হইল না,—কিন্তু সবচেয়ে যে কথাটা তাহার বুকে ধাক্কা মারিল সে ওই বাঁধানো খাতাটা,—তাহার নাম যাহাতে লেখা রহিল।

বার

কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই অপূর্ব সৌজন্য প্রকাশ করিয়া কহিল, আপনার এই অসুস্থ দুর্বল শরীর নিয়ে আর পথ হেঁটে কাজ নেই। এই ত সোজা রাস্তা বড় রাস্তায় গিয়ে পড়েচে,—আমি অনায়াসে যেতে পারবো।

ডাক্তার চলিতে চলিতেই একটু হাসিয়া বলিলেন, অনায়াসে এলেই কি অনায়াসে যেতে পারা যায় অপূর্ববাবু? তখন সন্ধ্যাবেলা যে পথটা সোজাই ছিল, এখন, এত রাত্রে জেরবাদীপাঠান আর বেকার কাফ্রিতে মিলে হয়ত তাকে রীতিমত বাঁকিয়ে রেখেচে। চলুন, আর দাঁড়াবেন না।

অপূর্ব ইঙ্গিতটা বুঝিতে পারিয়াও জিজ্ঞাসা করিল, কি করে এরা? মারামারি?

তাহার সঙ্গী পুনশ্চ হাসিয়া বলিলেন, করে বৈ কি! মদের খরচটা তারা পরের ঘাড়ে চাপাবার কাজে ও-অনুষ্ঠানটুকু বোধ করি ঠিক বাদ দিয়ে উঠতে পারে না। এই যেমন সোনার ঘড়িটা আপনার। অপরের পকেটে চালান যাবার সময়ে আপত্তি হবারই সম্ভাবনা। তার পরের ব্যাপারটাও অত্যন্ত স্বাভাবিক। ঠিক না?

অপূর্ব সভয়ে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, ঠিক বটে, কিন্তু এ যে আমার বাবার ঘড়ি!

ডাক্তার বলিলেন, এই ত তারা বুঝতে চায় না! কিন্তু, আজ না বুঝলে চলবে না।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ, আজ এর বদলে কারুরই মদ খাবার সুবিধে হবে না।

অপূর্ব ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সন্দিগ্ধকণ্ঠে কহিল, বরঞ্চ চলুন, কোন পথ দিয়ে ঘুরে যাওয়া যাক।

ডাক্তার তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া হাসিয়া উঠিলেন। অনেকটা মেয়েদের মত স্নিগ্ধ সকৌতুক হাসি। কহিলেন, ঘুরে? এই দুপুর রাতে? না না, তার আবশ্যক নেই, চলুন—এই বলিয়া সেই শীর্ণ হাতখানি দিয়া অপূর্বর ডান হাতটি টানিয়া লইয়া একটা চাপ দিতেই অপূর্বর অনেক দিনের অনেক জিম্নাস্টিক, অনেক ক্রিকেট-হকিখেলা হাতের ভিতরের হাড়গুলা পর্যন্ত যেন মড়মড় করিয়া উঠিল।

অপূর্ব হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, চলুন, বুঝেচি। এই বলিয়া সে নিজেও একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, কাকাবাবু সেদিন আপনার কথাতেই রহস্য করে আমাকে বলেছিলেন, সাধে কি বাবাজী মহাপুরুষের সংবর্ধনায় এত লোকজনের আয়োজন করতে হয়? আমাদের গুহ্য কেতাবে লেখা আছে, কৃপা করলে তিনি পাঁচ-সাত-দশজন পুলিশের ভবলীলা শুধু চড় মেরেই সাঙ্গ করে দিতে পারেন! কাকাবাবুর মুখের ভঙ্গীতে সেদিন আমরা খুব হেসেছিলাম, কিন্তু এখন মনে হচ্চে অত হাসা ঠিক সঙ্গত হয়নি—আপনি পারলেও বা পারতে পারেন।

ডাক্তারের মুখের ভাব পরিবর্তিত হইল, কহিলেন, কাকাবাবুর ওটা অতিশয়োক্তি। কিন্তু আমরা কে কে?

অপূর্ব কহিল, আমি এবং তাঁরই দু'চার জন কর্মচারী।

ওঃ—এঁরা! এই বলিয়া তিনি একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেন। অপূর্ব ইহার অর্থ বুঝিল; এবং কিছুক্ষণ অবধি কোন কথা যেন তাহার মুখে আসিল না। সোজা পথটা আজ সোজাই ছিল, কারণ, যে জন্যই হউক, পথিকের টাকাকড়ি কাড়িয়া লইবার আজ কেহ তথায় উপস্থিত ছিল না। নির্জন গলিটা নিঃশব্দে পার হইয়া

তাহারা বড় রাস্তার কাছাকাছি পৌঁছিলে অপূর্ব সহসা বলিয়া উঠিল, এবার বোধ হয় আমি নির্ভয়ে যেতে পারবো। ধন্যবাদ।

প্রত্যুত্তরে ডাক্তার স্বল্পালোকিত সম্মুখের প্রশস্ত রাজপথের বহুদূর পর্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, পারবেন বোধ হয়।

অপূর্ব নমস্কার করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতে গিয়া ভিতরের কৌতূহল কোনমতেই আর সংবরণ করিতে পারিল না, বলিয়া ফেলিল, আচ্ছা, সব্য—

না না, সব্য নয়, সব্য নয়,—ডাক্তারবাবু।

অপূর্ব ঈষৎ লজ্জিত হইয়া কহিল, আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আমাদের সৌভাগ্য যে পথে কেউ ছিল না, কিন্তু ধরুন তারা দলে বেশী থাকলেও কি সত্য সত্যই কোন ভয় ছিল না?

ডাক্তার কহিলেন, দলে তারা দু'দশ জনের বেশী কোন দিনই থাকে না।

অপূর্ব বলিল, দু'দশ জন! অর্থাৎ, দু'জন থাকলেও ভয় ছিল না, দশজন থাকলেও না?

ডাক্তার মুচকিয়া হাসিয়া বলিলেন, না।

বড় রাস্তার মোড়ের উপর আসিয়া অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, বাস্তবিকই কি আপনার পিস্তলের লক্ষ্য কিছুতেই ভুল হয় না?

ডাক্তার তেমনি সহাস্যে ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিলেন, না। কিন্তু কেন বলুন ত? আমার সঙ্গে ত পিস্তল নেই।

অপূর্ব বলিল, ওটা না নিয়েই বেরিয়েছিলেন,—আশ্চর্য! অন্ধকার গভীর রাত্রি ঝাঁঝাঁ করিতেছে, সে জনহীন দীর্ঘপথের প্রতি চাহিয়া কহিল, পথে না আছে লোক, না আছে একটা পুলিশ; আলো ত না থাকার মধ্যেই—আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আমার বাসাটা প্রায় ক্রোশখানেক হবে, না?

ডাক্তার বলিলেন, তা হবে বৈ কি।

অপূর্ব কহিল, আচ্ছা, নমস্কার, আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম। এই বলিয়া সে চলিতে উদ্যত হইয়া কহিল, আচ্ছা, এমন ত হতে পারে, সে ব্যাটারা আজ আর কোন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে?

ডাক্তার সায় দিয়া কহিলেন, বিচিত্র নয়।

অপূর্ব কহিল, নয়ই ত! আছেই!—আচ্ছা, নমস্কার! কিন্তু মজা দেখেছেন, যেখানে আসল দরকার সেখানে পুলিশের ছায়াটি পর্যন্ত দেখবার জো নেই। এই হল তাঁদের কর্তব্যজ্ঞান! আর এর জন্যই আমরা ট্যাক্স জুগিয়ে মরি। সমস্ত বন্ধ করে দেওয়া উচিত, কি বলেন?

তাতে আর সন্দেহ কি! বলিয়া ডাক্তার হাসিয়া ফেলিলেন। কহিলেন, চলুন, কথা কইতে কইতে আর খানিকটে আপনার সঙ্গে এগিয়ে যাই।

অপূর্ব লজ্জায় একেবারে ম্লান হইয়া গেল। একমুহূর্ত মাটির দিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে বলিল, আমি বড্ড ভীতু লোক ডাক্তারবাবু, আমার কিচ্ছু সাহস নেই। আর কেউ হলে অনায়াসে যেতে পারতো, এত রাত্রে আপনাকে কষ্ট দিত না।

তাহার এই বিনয়-নম্র নিরভিমান সত্য-কথায় ডাক্তার নিজের হাসির জন্য নিজেও যেন লজ্জা পাইলেন। সস্নেহে তাহার কাঁধের উপর একটা হাত রাখিয়া কহিলেন, সঙ্গে যাবার জন্যেই আমি এসেচি অপূর্ববাবু, নইলে প্রেসিডেন্ট আমাকে এ জিনিসটা হাতে গুঁজে দিতেন না। এই বলিয়া তিনি বাঁ হাতের মোটা কালো লাঠিটা দেখাইলেন।

অপূর্ব চকিত হইয়া কহিল, সুমিত্রা? তিনি কি আপনাকেও আদেশ করতে পারেন?

ডাক্তার হাসিলেন, বলিলেন, পারেন বৈ কি।

অপূর্ব বলিল, কিন্তু তিনি ত অন্য লোকও সঙ্গে দিতে পারতেন?

ডাক্তার কহিলেন, তার মানে সবাইকে দল বেঁধে পাঠানো। তার চেয়ে এই ব্যবস্থাই সোজা হয়েছে অপূর্ববাবু।

চলিতে চলিতে কথা হইতেছিল। ডাক্তার কহিলেন, সুমিত্রা আমাদের দলের কর্ত্রী, তাঁকে সকল দিক চেয়ে দেখে কাজ করতে হয়। যেখানে ছুরি-ছোরা খুন-জখম লেগেই আছে সেখানে যাকে-তাকে ত পাঠানো যায় না। আমি উপস্থিত না থাকলে আজ আপনাকে থাকতে হতো,—তিনি কোনমতেই আসতে দিতেন না।

এই অন্ধকার জনহীন পথে ছুরি-ছোরার কথায় অপূর্বর সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া গেল। আস্তে আস্তে কহিল, কিন্তু এই পথেই যে আপনাকে একাকী ফিরতে হবে!

ডাক্তার বলিলেন, তা হবে।

অপূর্ব আর প্রশ্ন করিল না। তাহাদের নিভৃত আলাপের গুঞ্জনশব্দ পাছে অবাঞ্ছিত কাহাকেও আকৃষ্ট করিয়া আনে এ খেয়াল তাহার মনের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। সে তাহার চক্ষু কর্ণ ও মনকে একই কালে রাস্তার দক্ষিণে বামে ও সম্মুখে একান্ত নিবিষ্ট করিয়া নিঃশব্দ দ্রুতপথে পথ চলিতে লাগিল। মিনিট-পনের এইভাবে চলিয়া শহরের প্রথম পুলিশ-স্টেশনটা ডানহাতে রাখিয়া লোকালয়ে প্রবেশ করিয়া অপূর্ব আবার কথা কহিল, বলিল, ডাক্তারবাবু, আমার বাসা ত বেশী দূরে নয়, আজ রাত্রিটা ওখানে থাকলে ক্ষতি কি?

ডাক্তার তাহার মনের কথা অনুমান করিয়া সহাস্যে কহিলেন, ক্ষতি ত অনেক জিনিসেই হয় না অপূর্ববাবু, কিন্তু বিনা প্রয়োজনেও কোন কাজ করা আমাদের বারণ। শুধু কেবল প্রয়োজন নেই বলেই আমাকে ফিরে যেতে হবে।

আপনারা কি অপ্রয়োজনে জগতে কিছুই করেন না?

করা বারণ। আমি তাহলে বিদায় হই অপূর্ববাবু?

অপূর্ব কটাক্ষে পশ্চাতের সমস্ত অন্ধকার পথটার প্রতি চাহিয়া এই লোকটিকে একাকী ফিরিয়া যাইতে কল্পনা করিয়া আর একবার কণ্টকিত হইয়া উঠিল। কহিল, ডাক্তারবাবু, মানুষের মর্যাদা রক্ষা করাও কি আপনাদের বারণ?

ডাক্তার আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন, হঠাৎ এ কথা কেন?

অপূর্ব ক্ষুণ্ণ অভিমানের সুরে বলিল, তা ছাড়া আর কি বলুন? আমি ভীতু লোক, দলবদ্ধ গুণ্ডাদের মধ্যে দিয়ে একলা যেতে পারিনে,—আমাকে নিরাপদে পৌঁছে দিয়ে সেই বিপদের ভেতর দিয়ে আপনি যদি আজ একাকী ফিরে যান, আর কি আমি মুখ দেখাতে পারবো?

ডাক্তার চক্ষের নিমিষে তাহার দুই হাত সস্নেহে ধরিয়া ফেলিয়া কহিলেন, আচ্ছা চলুন তবে আজ রাত্রির মত আপনার বাসাতে গিয়েই অতিথি হই গে। কিন্তু এ-সব হাঙ্গামা কি সহজে নিতে আছে ভাই !

কথাটা অপূর্ব ঠিক বুঝিল না, কিন্তু কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই হাতের মধ্যে কেমনতর একপ্রকার টান অনুভব করিয়া ফিরিয়া চাহিয়াই কহিল, আপনার জুতোয় বোধ করি লাগছে ডাক্তারবাবু, আপনি খোঁড়াচ্চেন!

ডাক্তার মৃদু হাসিয়া বলিলেন, ও কিছু না। লোকালয়ে আমার পা-দুটো কেমন আপনিই খুঁড়িয়ে চলে। গিরীশ মহাপাত্রের চলন মনে পড়ে?

অপূর্ব থমকিয়া দাঁড়াইল। কহিল, আপনাকে যেতে হবে না, ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার তেমনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, কিন্তু আপনার মর্যাদা?

অপূর্ব বলিল, আপনার কাছে আবার মর্যাদা কি? পায়ের ধূলোর যোগ্যও ত নই। আপনি ছাড়া পৃথিবীতে কি আর কারও এতবড় সাহস আছে!

এই ডাক্তার-ব্যক্তিটির জীবন-ইতিহাসের সহিত অপূর্বর প্রত্যক্ষ পরিচয় কিছুই ছিল না। থাকিলে সে এই অত্যন্ত ক্ষুদ্র ব্যাপার লইয়া এতখানি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে লজ্জায় মরিয়া যাইত। সমুদ্রের কাছে গোষ্পদের ন্যায় এই পথটুকুতে একাকী হাঁটা এই লোকটির কাছে কি! পুলিশের লোকে যাহাকে

সব্যসাচী বলিয়া জানে, দশ-বারোজন দুর্বৃত্তে মিলিয়া তাহার পথরোধ করিবে কি করিয়া?

ডাক্তার মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিয়া শেষে ভাল মানুষটির মত কহিলেন, আচ্ছা, তার চেয়ে চলুন না কেন দুজনেই আবার একসঙ্গে ফিরে যাই? আমাকে একলা যদি বা কেউ আক্রমণ করতে সাহস করে আপনি কাছে থাকলে ত সে সম্ভাবনা থাকবে না!

অপূর্ব অনিশ্চিতকণ্ঠে বলিল, আবার ফিরে যাবো?

ডাক্তার বলিলেন, দোষ কি? আমার একলা যাবার বিপদের শঙ্কাও থাকবে না।

থাকবো কোথায়?

আমার কাছে।

আফিস হইতে ফিরিয়া আজ অপূর্বর খাওয়া হয় নাই, তাহার অত্যন্ত ক্ষুধাবোধ হইতেছিল, একটু লজ্জিত হইয়া কহিল, দেখুন, আমার কিন্তু এখনো খাওয়া হয়নি,—আচ্ছা, তা না হয় আজ—

ডাক্তার হাসিমুখে বলিলেন, চলুন না, ভাগ্য পরীক্ষা করে আজ দেখাই যাক। কিন্তু একটা কথা, তেওয়ারী বেচারা বড় চিন্তিত হয়ে থাকবে।

তেওয়ারীর উল্লেখে অপূর্বর মনের মধ্যে হঠাৎ একটা হিংস্র প্রতিশোধের বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল, রাগ করিয়া বলিল, মরুক গে ব্যাটা ভেবে,—চলুন যাই। এই বলিয়া সে একরকম জোর করিয়াই তাঁহাকে বাধা দিয়া সেই আলো-আঁধারের জনশূন্য-পথে উভয়ে হাঁটিতে হাঁটিতে আবার ফিরিয়া চলিল। এবার কিন্তু ভয়ের কথা তাহার মনেই হইল না। পুলিশ থানা পার হইয়া সহসা একসময়ে সে প্রশ্ন করিয়া বসিল, আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আপনি কি এ্যানার্কিস্ট?

ডাক্তার অন্ধকারে তাহার মুখের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কাকাবাবু কি বলেন?

অপূর্ব কহিল, তিনি বলেন সব্যসাচী একজন ভয়ানক এ্যানার্কিস্ট।

আমি যে সব্যসাচী এ-সম্বন্ধে আপনার কোন সন্দেহ নেই?

না।

এ্যানার্কিস্ট বলতে আপনি কি বুঝেন?

অপূর্ব এ প্রশ্নের হঠাৎ জবাব দিতে পারিল না। একটু ভাবিয়া কহিল, অর্থাৎ কিনা রাজদ্রোহী—যিনি রাজার শত্রু।

ডাক্তার বলিলেন, আমাদের রাজা এদেশে থাকেন না, থাকেন বিলাতে। লোকে বলে অতিশয় ভদ্রলোক। আমি তাঁকে কখনো চোখে দেখিনি, তিনিও আমার কখনো লেশমাত্র ক্ষতি করেন নি। তাঁর প্রতি বৈরীভাব আসবে আমার কোথা থেকে অপূর্ববাবু!

অপূর্ব কহিল, যাদের আসে, তাদেরই বা কি করে আসে বলুন! তাদেরও ত তিনি কোন অনিষ্ট করেন নি!

ডাক্তার সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, তাই, আপনি যা বলছেন এদেশে তা নেই একেবারে মিছে কথা!

তাঁহার কণ্ঠস্বরের প্রবলতায় ও অস্বীকার করিবার তীব্রতায় অপূর্ব চমকিয়া গেল। অবিশ্বাস করিবার সাহস তাহার হইল না। অথচ, দেশে কিছু যে একটা আছেই, ছেলেবেলা তাহারও গায়ে যে ইহার আঁচ লাগিয়া গেছে, এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবা না থাকিলে কোথাকার জল যে কোথায় গিয়া গড়াইতে পারিত, ইহা সে বড়-বয়সে পদে পদে অনুভব করিয়াছে। একটু ভাবিয়া কহিল, রাজা না হোন রাজকর্মচারীদের বিরুদ্ধে যে একটা ষড়যন্ত্র ছিল এ কথা ত মিথ্যা নয় ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার অনেকক্ষণ কোন উত্তর দিলেন না, তারপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, কর্মচারীরা রাজার ভৃত্য, মাইনে পায়, হুকুম পালন করে। একজন যায় আর একজন আসে। এটা সহজ এবং মোটা কথা। কিন্তু এই সহজকে জটিল এবং

মোটাকে নিরর্থক সূক্ষ্ম করে মানুষে যখন দেখতে চায়, তখনই তার সবচেয়ে বড় ভুল হয়। সেইজন্যে তাদের আঘাত করাকেই রাজশক্তির মূলে আঘাত করা বলে আত্মবঞ্চনা করে। এতবড় মারাত্মক ব্যর্থতা আর নেই।

অপূর্ব একটু চুপ করিয়া কহিল, কিন্তু এই ব্যর্থ কাজ করবার লোক কি ভারতবর্ষে নেই?

ডাক্তার শান্তভাবে কহিলেন, হয়ত থাকতেও পারে।

কিন্তু অপূর্ব সহসা আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা ডাক্তারবাবু, এঁরা সব আজকাল কোথায় থাকেন এবং কি করেন?

তাহার ঔৎসুক্য ও ব্যগ্রতায় ডাক্তার শুধু মুচকিয়া হাসিলেন।

অপূর্ব কহিল, হাসলেন যে?

ডাক্তার তেমনি হাসিমুখে বলিলেন, আপনার সেই কাকাবাবুটি উপস্থিত থাকলে কিন্তু বুঝতেন। আপনার বিশ্বাস আমি একজন এ্যানার্কিস্টদের পাণ্ডা। তার মুখ থেকে কি এর জবাব আশা করতে আছে অপূর্ববাবু?

নিজের বুদ্ধিহীনতার এই সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে অপূর্ব অপ্রতিভ হইল, মনে মনে একটু রাগও করিল, কহিল, আশা করা সম্পূর্ণই অনুচিত হতো আজ যদি না আমাকে দলভুক্ত করে নিতেন। মেম্বরদের এটুকু জানবার অধিকার আছে, এ বোধ করি আপনি অস্বীকার করেন না। এ ত ছেলেখেলা নয়, ভীষণ দায়িত্ব আছে যে!

আছেই ত। বলিয়া ডাক্তারবাবু হাসিলেন। এই সুমিষ্ট হাসি ও নিরাতঙ্ক সহজ উক্তি ঠিক ব্যঙ্গোক্তির মতই অপূর্বর কানে বাজিল। বিদ্রোহী দলের বাঁধানো খাতায় যাহার নাম লেখা হইল তাহার প্রশ্নের এই উত্তর? এর বেশি জানিবার তাহার প্রয়োজন নাই! মনে মনে ভীত ও ক্রুদ্ধ হইয়া এই লোকটিকে আজ সে ভুল বুঝিল, কিন্তু এই ভুল সংশোধন করিয়া পরবর্তীকালে বহুবারই তাহাকে

দেখিতে হইয়াছে কোন অবস্থায় কোন কারণেই ইঁহার মুখের হাসি উদ্বেগে এবং গলার স্বর উত্তেজনায় চঞ্চল হইয়া উঠে না।

নিঃশব্দ গাম্ভীর্যে ডাক্তারের এই সামান্য সংক্ষিপ্ত জবাবটাকে সে প্রতিঘাত করিতে চাহিয়া নিরুত্তরে পথ চলিতে লাগিল, কিন্তু অধিকক্ষণ থাকিতে পারিল না,—ওই ছোট্ট কথাটুকুর নিদারুণ তীক্ষ্নতা তীরের ফলাটুকুর মতই যেন তাহার বুকে বিঁধিতে লাগিল। তিক্তকণ্ঠে কহিল, দলের খাতায় তাড়াতাড়ি নাম লিখে নিলেই ত হয় না, তার ফলাফল বুঝিয়েও দিতে হয়।

কিন্তু সে কি তাঁরা দেননি?

অপূর্ব কহিল, কিছুই না। পথের-দাবী না পথের-দাবী! দাবীর বহর যে এত, তা কে জানতো? আর আপনিও ত ছিলেন, নাম লেখবার পূর্বে আপনারও ত জানা উচিত ছিল আমার যথার্থ মতামত কি!

ডাক্তার একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন, মেয়েরা একটা ব্যাপার করেছেন, তাঁরাই জানেন কাকে মেম্বর করবেন এবং কাকে করবেন না। আমি হঠাৎ জুটে গেছি মাত্র। বাস্তবিকই আমি এঁদের সভার বিশেষ কিছু জানিনে অপূর্ববাবু!

অপূর্ব বুঝিল ইহাও পরিহাস। উৎকণ্ঠায় ও আশঙ্কায় সমস্ত জিনিসটাই তাহার অত্যন্ত বিশ্রী লাগিতেছিল, আপনাকে সে আর সংবরণ করিতে পারিল না, জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, কেন ছলনা করচেন ডাক্তারবাবু, সুমিত্রাকেই প্রেসিডেন্ট করুন, আর যাকেই যা করুন, দল আপনার এবং আপনিই এর সব, তাতে লেশমাত্র সন্দেহ নেই। পুলিশের চোখে ধূলো দিতে পারবেন কিন্তু আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবেন না, এ আপনি নিশ্চয় জানবেন।

তাহার কথা শুনিয়া এইবার এই শীর্ণদেহ রহস্যপ্রিয় লোকটি অকৃত্রিম বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, আমার দল মানে এ্যানার্কিস্টের দল ত? আপনি মিথ্যে শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন অপূর্ববাবু,

আপনার আগাগোড়া ভুল হয়েছে। তাদের হল জীবন-মৃত্যুর খেলা, তারা আপনার মত ভীতু লোককে দলে নেবে কেন? তারা কি পাগল?

অপূর্ব লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেল, কিন্তু তাহার বুকের উপর হইতে গুরুভার পাষাণ নামিয়া গেল। ডাক্তার কহিলেন, পথের-দাবী নাম দিয়ে সুমিত্রা এই ছোট্ট দলটির প্রতিষ্ঠা করেচেন। জীবন-যাত্রায় মানুষের পথ চলবার অধিকার যে কত বড় এবং কত পবিত্র এই মস্ত সত্যটাই মানুষে যেন ভুলে গেছে। আপনারা, অর্থাৎ দলের সভ্য যাঁরা, তাঁরা নিজেদের সমস্ত জীবন দিয়ে এই কথাটাই মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিতে চান। সুমিত্রা অনুরোধ করলেন আমি যে কয়দিন এখানে আছি তাঁর দলটিকে যেন গড়ে দিয়ে যাই। আমি রাজী হয়েছি,—এ ছাড়া আপনাদের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই।

আপনারা হলেন সমাজ-সংস্কারক, কিন্তু আমার সমাজ সংস্কার করে বেড়াবার সময়ও নেই, ধৈর্যও নেই। হয়ত, কিছুদিন আছি, হয়ত, কালই চলে যেতে পারি; সারাজীবনে আর কখনো দেখাও না হতে পারে। বেঁচে আছি কি নেই, এটুকু খবরও হয়ত আপনাদের কানে পৌঁছবে না।

কথাগুলি শান্ত, ধীর,—উচ্ছ্বাস বা আবেগের বাষ্পও নাই। এই ব্যক্তি যেই হউক, কিন্তু সব্যসাচীর যে বিবরণ অপূর্ব কাকাবাবুর মুখে শুনিয়াছে, সেই-সব দপ্ করিয়া মনে পড়িয়া তাহার বুকের কোথায় যেন খোঁচার মত বিঁধিল। কিন্তু তখনি মনে হইল, সে ত পাষাণ,—তাহার জন্য আবার বেদনাবোধ কি? ক্ষণকাল পরে জিজ্ঞাসা করিল, ডাক্তারবাবু, সুমিত্রা কে? আপনি তাঁকে জানলেন কি করে?

প্রত্যুত্তরে ডাক্তার শুধু একটুখানি হাসিলেন। উত্তর না পাইয়া অপূর্ব নিজেই বুঝিল এরূপ কৌতূহল সঙ্গত হয় নাই। এই অল্পকালের মধ্যেই সে এই রহস্যময় বিচিত্র সমাজের আচরণের বিশিষ্টতা লক্ষ্য করিতেছিল, তাই সে ভারতীর সম্বন্ধেও তাহার প্রবল কৌতূহলও সংবরণ করিয়া মৌন হইয়া রহিল।

মিনিট পাঁচ-ছয় এইভাবে নিঃশব্দে কাটিলে ডাক্তার প্রথমে কথা কহিলেন, বলিলেন, আপনার কল্যাণেই বোধ হয় রাস্তা আজ একেবারে নিরাপদ। এমন প্রায় ঘটে না, কিন্তু কি ভাবচেন বলুন ত?

অপূর্ব বলিল, ভাবচি ত অনেক-কিছু, কিন্তু সে যাক। আচ্ছা, আপনি বললেন মানুষের নির্বিঘ্নে পথ চলবার অধিকার। এই যেমন আমরা নির্বিঘ্নে পথ চলচি,—এমনি?

ডাক্তার সহাস্যে কহিলেন, এমনিই কিছু একটা হবে বোধ হয়।

অপূর্ব কহিল, ওই যে মেয়েটি স্বামী পরিত্যাগ করে পথের-দাবীর সভ্য হতে এসেছেন, ওটাও ঠিক বুঝলাম না।

ডাক্তার কহিলেন, আমিও যে ঠিক বুঝেছি তা বলতে পারিনে। ও-সব ব্যাপার সুমিত্রাই বোঝেন ভাল।

অপূর্ব প্রশ্ন করিল, তাঁর বোধ হয় স্বামী নেই?

ডাক্তার চুপ করিয়া রহিলেন। অপূর্বকে লজ্জা ও ক্ষোভের সহিত পুনরায় স্মরণ করিতে হইল তাহার অহেতুক ঔৎসুক্যের তিনি জবাব দিলেন না। এবং এই কথা অলক্ষ্যে যাচাই করিতে সে সঙ্গীর মুখের দিকে কটাক্ষে চাহিয়া কিন্তু একেবারে বিস্মিত হইয়া গেল। তাহার মনে হইল, এই আশ্চর্য মানুষটির অপরিজ্ঞাত জীবনের একটা নিভৃত দিক যেন সে হঠাৎ দেখিতে পাইল। সে ঠিক কি—তাহা বলা কঠিন, কিন্তু এখন পর্যন্ত যাহা কিছু জানিয়াছে সে তাহার অতীত, যেন কোন্ বহুদূরাঞ্চলে তাঁহার চিন্তা সরিয়া গেছে, কাছাকাছি কোথাও আর নাই। অনতিদূরবর্তী ল্যাম্পপোস্ট হইতে কিছুক্ষণ হইতেই একটা ক্ষীণ আলোক ইঁহার মুখের উপরে পড়িয়াছিল, পাশ দিয়া যাইবার সময় অপূর্ব স্পষ্ট দেখিতে পাইল এই ভয়ঙ্কর-সতর্ক লোকটির চোখের উপরে একটা ঝাপসা জাল ভাসিয়া বেড়াইতেছে—এই মুহূর্তের জন্য যেন তিনি সমস্ত ভুলিয়া মনে মনে কি একটা খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন।

অপূর্ব দ্বিতীয় প্রশ্ন করে নাই, নীরবে পথ চলিতেছিল, কিন্তু মিনিট-দু'য়ের বেশী হইবে না, অকস্মাৎ, অকারণেই হাসিয়া উঠিয়া ডাক্তার বলিলেন, দেখুন অপূর্ববাবু, আপনাকে আমি সত্যই বলচি, মেয়েদের এই-সব প্রণয়ঘটিত মান-অভিমানের ব্যাপার আমি কিছুই বুঝিনে। বোঝবার চেষ্টা করতে গেলেও নিরর্থক ভারী সময় নষ্ট হয়। কোথায় পাই এত সময়?

অপূর্বর প্রশ্নের ইহা উত্তর নয়, সে চুপ করিয়া রহিল। ডাক্তার কহিলেন, ভারী মুশকিল, এঁদের বাদ দিয়ে কাজও চলে না, নিলেও গণ্ডগোল বাধে।

এ মন্তব্যও অসংবদ্ধ। অপূর্ব নিরুত্তরেই রহিল।

কি হল? কথা কন না যে বড়?

অপূর্ব কহিল, কি বলব বলুন!

ডাক্তার কহিলেন, যা ইচ্ছে। দেখুন অপূর্ববাবু, এই ভারতীটি বড় ভাল মেয়ে। যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনি কর্মঠ এবং তেমনি ভদ্র।

ইহাও বাজে। কিন্তু প্রত্যুত্তরে এ প্রশ্ন সে ইচ্ছা করিয়াই করিল না যে, আপনি তাহাকে কতদিন হইতে জানিলেন এবং কি করিয়া জানিলেন। শুধু বলিল, হাঁ। কিন্তু শ্রোতার যদি এদিকে কিছুমাত্র খেয়াল থাকিত ত অপূর্বর মুখ হইতে এই এক অক্ষরের জবাবে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া যাইতেন। কিন্তু তিনি যে বিমনা হইয়াই আলাপ করিতেছিলেন, অপূর্বকে তাহা আর নূতন করিয়া বুঝিতে হইল না। বক্তা বোধ করি তাঁহার শেষ-কথারই সূত্র ধরিয়া কহিলেন, আপনাদের প্রসঙ্গেই কথা কইতে তিনি আপনার সম্বন্ধে বলছিলেন, আপনি নাকি ভয়ানক হিন্দু,—একেবারে গোঁড়া। ভারতী বলছিলেন, এতবড় ভয়ঙ্কর হিঁদু বামুনেরও তিনি জাত মেরে দিয়েছেন।

অপূর্ব বলিল, তা হবে। এই একান্ত অন্যমনস্ক লোকটির সহিত তর্ক করিতে তাহার ইচ্ছাই হইল না। বড় রাস্তা প্রায় শেষ হইয়া আসিল, গলির মোড়ে সামনাসামনি আলো-দুইটা সম্মুখেই দেখা দিল, আর মিনিট-দশেকের মধ্যেই

গন্তব্যস্থানে পৌঁছানো যাইবে, এমনি সময়ে ডাক্তার তাঁহার ঘুমন্ত মনটাকে যেন অকস্মাৎ ঝাড়া দিয়া একেবারে সজাগ করিয়া দিলেন, কহিলেন, অপূর্ববাবু!

অপূর্ব তাঁহার কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণতায় নিজেও সচেতন হইয়া উঠিল, কহিল, বলুন।

ডাক্তার বলিলেন, এদেশে আমি থাকা পর্যন্ত কাজ নেই, কিন্তু চলে গেলে আপনি নিঃসঙ্কোচে সুমিত্রাকে সাহায্য করবেন। এমন মানুষ আপনি পৃথিবী ঘুরে বেড়ালেও কখনো পাবেন না। এঁর পথের-দাবী যেন অনাদরে অবহেলায় না মারা পড়ে। এতবড় একটা আইডিয়া কি কেবল এই ক'টি মেয়েমানুষেই সার্থক করে তুলতে পারবে! আপনার একনিষ্ঠ সেবার একান্ত প্রয়োজন।

এই ব্যক্তির ধারণায় সে যে সত্যই এতবড় লোক অপূর্ব তাহা প্রত্যয় করিল না। কহিল, এতবড় একটা আইডিয়াকে তবে আপনিই বা ফেলে যেতে চাচ্চেন কেন?

ডাক্তার কহিলেন, অপূর্ববাবু, যেখানে ফেলে যাওয়াই মঙ্গল, সেখানে আঁকড়ে থাকাতেই অকল্যাণ। আমার সাহায্যে আপনাদের কাজ নেই,—আপনারা নিজেরাই এটা গড়ে তুলুন, হয়ত বা এর ভেতর দিয়েই দেশের সব চেয়ে বড় কাজ হবে।

অপূর্ব কহিল, নবতারার ব্যাপারটা ত আমি বিশ্বাস করতে পারিনে ডাক্তারবাবু!

ডাক্তার বলিলেন, কিন্তু সুমিত্রাকে বিশ্বাস করবেন। বিশ্বাসের এতবড় উঁচু জায়গা আর কোথাও পাবেন না, অপূর্ববাবু। একটুখানি থামিয়া কহিলেন, আপনাকে ত আমি পূর্বেই বলেচি, মেয়েদের ব্যাপার আমি বুঝতে পারিনে; কিন্তু সুমিত্রা যখন বলেন, জীবনযাত্রায় মানবের পথ চলবার বাধাবন্ধহীন স্বাধীন অধিকার, তখন এ দাবীকে ত কোন যুক্তি দিয়েই ঠেকিয়া রাখতে পারিনে। শুধু ত মনোহরের নয়, বহুলোকের নির্দিষ্ট পথে চলায় নবতারার জীবনটা নির্বিঘ্নে

হতো, এ আমি বুঝি, এবং যে পথটা সে নিজে বেছে নিলে সে পথটাও নিরাপদ নয়, কিন্তু নিজে বিপদের মাঝখানে ডুবে থেকে আমিই বা তাকে বিচার করবো কি দিয়ে বলুন ! সুমিত্রা বলেন, এ জীবনটা নির্বিঘ্নে কাটাতে পারাটাই কি মানুষের চরম কল্যাণ? মানুষের চিন্তা এবং প্রবৃত্তিই তার কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে, কিন্তু পরের নির্ধারিত চিন্তা ও প্রবৃত্তিকে দিয়ে সে যখন তার নিজের স্বাধীন চিন্তার মুখ চেপে ধরে তখন তার চেয়ে বড় আত্মহত্যা মানুষের ত আর হতেই পারে না।

এ কথার ত কোন জবাব আমি খুঁজে পাইনে অপূর্ববাবু।

অপূর্ব বলিল, কিন্তু সবাই যদি নিজের চিন্তার মত—

ডাক্তার বাধা দিয়া কহিলেন, অর্থাৎ সবাই যদি নিজের খেয়াল মত কাজ করতে চায়?—বলিয়াই একটু মুচকিয়া হাসিয়া কহিলেন, তাহলে কি কাণ্ড হয় আপনি সুমিত্রাকে একবার জিজ্ঞাসা করবেন।

অপূর্ব তাহার প্রশ্নের ভুলটা বুঝিতে পারিয়া সলজ্জে সংশোধন করিতে যাইতেছিল, কিন্তু সময় হইল না। ডাক্তার পুনশ্চ বাধা দিয়া কহিলেন, কিন্তু তর্ক আর চলবে না, অপূর্ববাবু, আমরা এসে পড়েচি। আর একদিন না হয় এ আলোচনার শেষ করা যাবে।

অপূর্ব সুমুখে চাহিয়া দেখিল, সেই লাল রঙের বিদ্যালয়-গৃহ, এবং তাহার দ্বিতলে ভারতীর ঘর হইতে তখনও আলো দেখা যাইতেছে।

ডাক্তার ডাকিলেন, ভারতী ।

ভারতী জানালায় মুখ বাহির করিয়া ব্যগ্রস্বরে কহিল, বিজয়ের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে ডাক্তারবাবু? আপনাকে সে ডাকতে গিয়েছে।

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, তোমাদের প্রেসিডেন্টের আদেশ ত? কিন্তু কোন হুকুমই এত রাত্রে ও-পথে কাউকে পাঠাতে পারবে না। কিন্তু কাকে ফিরিয়ে এনেছি দেখেচ?

ভারতী ঠাওর করিয়া দেখিয়া অন্ধকারেও চিনিতে পারিল। কহিল, ভাল করেন নি।

আপনি কিন্তু শীঘ্র যান, নরহরি মদ খেয়ে তার হৈমর মাথায় কুড়ুল মেরেচে,—বাঁচে কিনা সন্দেহ। সুমিত্রাদিদি সেখানেই গেছেন।

ডাক্তার কহিলেন, ভালই ত করেচে। মরে ত সে মরুক না। কিন্তু আমার অতিথি?

ভারতী বলিল, মেয়েদের প্রতি আপনার অসীম অনুগ্রহ। এটা কিন্তু হৈম না হয়ে নরহরি হলে আপনি এতক্ষণ ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তেন।

ডাক্তার কহিলেন, না হয় ঊর্ধ্বশ্বাসেই দৌড়চ্চি। কিন্তু অতিথি?

আমি যাচ্চি, বলিয়া ভারতী আলো হাতে পরক্ষণেই নীচে আসিয়া দ্বার খুলিয়া দাঁড়াইল, কহিল, বাস্তবিক আর দেরি করবেন না ডাক্তারবাবু, যান। কিন্তু খ্রীষ্টানের আতিথ্য কি উনি স্বীকার করবেন?

ডাক্তার মনে মনে একটু বিপদগ্রস্ত হইয়া কহিলেন, এঁকে ফেলে আমি যাই কি করে ভারতী? হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করনি কেন?

ভারতী রাগ করিয়া কহিল, যা করতে হয় করুন গে ডাক্তারবাবু, আপনার পায়ে পড়ি আর দেরি করবেন না। আমার অনেক অভ্যাস আছে, ওঁকে আমি সামলাতে পারবো। আপনি দয়া করে একটু শীঘ্র যান।

অপূর্ব এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিল। কিন্তু, তাহার জন্য একটা লোক মারা পড়িবে ইহা ত কোন মতেই হইতে পারে না। সে কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু তাহার পূর্বেই ডাক্তার দ্রুতবেগে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

তের

নীচেকার ঘরের দরজা-জানালা ভারতী বন্ধ করিতে ব্যাপৃত রহিল, অপূর্ব সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া তাহার ঘরে প্রবেশ করিল, এবং ভাল দেখিয়া একটা আরামকেদারা বাছিয়া লইয়া হাত-পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল। চোখ বুজিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আঃ! সে যে কতখানি শ্রান্ত হইয়াছিল তাহা উপলব্ধি করিল।

মিনিট-কয়েক পরে ভারতী উপরে আসিয়া হাতের আলোটা যখন তেপায়ার উপরে রাখিতেছে অপূর্ব তখন টের পাইল, কিন্তু সহসা তাহার এমন লজ্জা করিয়া উঠিল যে, এই ক্ষণকালের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়ার ন্যায় একটা অত্যন্ত অসম্ভব ভান করার অপেক্ষা আর কোন সঙ্গত ছলনাই তাহার মনে আসিল না। অথচ, ইহা নূতন নহে। ইতিপূর্বেও তাহারা একঘরে রাত্রিযাপন করিয়াছে, কিন্তু শরমের বাষ্পও তাহার অন্তরে উদয় হয় নাই। মনে মনে ইহারই কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া তাহার তেওয়ারীকে মনে পড়িল। সে তখন মরণাপন্ন, তাহার জ্ঞান ছিল না, সে যে না থাকার মধ্যেই, তথাপি সেই উপলক্ষ্যটুকুকেই হেতু নির্দেশ করিতে পাইয়া অপূর্ব স্বস্তিবোধ করিল। ভারতী ঘরে ঢুকিয়া তাহার প্রতি একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া যে-সকল হাতের কাজ তখন পর্যন্ত অসম্পূর্ণ ছিল করিতে লাগিল, তাহার কপট নিদ্রা ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিল না, কিন্তু এই পুরাতন বাটীর সুপ্রাচীন দরজা-জানালা বন্ধ করার কাজে যে পরিমাণ শব্দ-সাড়া উত্থিত হইতে লাগিল, তাহা সত্যকার নিদ্রার পক্ষে যে একান্ত বিঘ্নকর তাহা নিজেই উপলব্ধি করিয়া অপূর্ব উঠিয়া বসিল। চোখ রগড়াইয়া হাই তুলিয়া কহিল, উঃ—এই রাত্রে আবার ফিরে আসতে হলো!

ভারতী টানাটানি করিয়া একটা জানালা রুদ্ধ করিতেছিল, বলিল, যাবার সময় এ কথা বলে গেলেন না কেন? সরকার-মশায়কে দিয়ে আপনার খাবারটা একেবারে আনিয়ে রেখে দিতাম!

কথা শুনিয়া অপূর্বর ঘুম-ভাঙ্গা গলার শব্দ একেবারে তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল, কহিল, তার মানে? ফিরে আসবার কথা আমি জানতাম নাকি?

ভারতী লোহার ছিটকিনিটা চাপিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া সহজকণ্ঠে জবাব দিল, আমারই ভুল হয়েছে। খাবার কথাটা তখনি তাঁকে বলে পাঠানো উচিত ছিল। এত রাত্তিরে আর হাঙ্গামা পোয়াতে হতো না। এতক্ষণ কোথায় দুজনে বসে কাটালেন?

অপূর্ব কহিল, তাঁকেই জিজ্ঞেসা করবেন। ক্রোশ-তিনেক পথ হাঁটার নাম বসে কাটানো কি না, আমি ঠিক জানিনে।

ভারতীর জানালা বন্ধ করার কাজ তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, ছিটের পর্দাটা টানিয়া দিতেছিল, সেই কাজেই নিযুক্ত থাকিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, ইস্, গোলকধাঁধার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন বলুন! হাঁটাই সার হল । এই বলিয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া একটু হাসিয়া কহিল, সন্ধ্যা-আহ্নিক করার বালাই এখনো আছে, না গেছে? থাকে ত কাপড় দিচ্চি ওগুলো সব ছেড়ে ফেলুন। এই বলিয়া সে অঞ্চলসুদ্ধ চাবির গোছা হাতে লইয়া একটা আলমারি খুলিতে খুলিতে কহিল, তেওয়ারী বেচারা ভেবে সারা হয়ে যাবে। আজ ত দেখচি আফিস থেকে একবার বাসায় যাবারও সময় পাননি।

অপূর্ব রাগ চাপিয়া বলিল, অবশ্য আপনি এমন অনেক জিনিস দেখতে পান যা আমি পাইনে তা স্বীকার করচি, কিন্তু কাপড় বার করবার দরকার নেই। সন্ধ্যা-আহ্নিকের বালাই আমার যায়নি, এ জন্মে যাবেও তা মনে হয় না, কিন্তু আপনার দেওয়া কাপড়েও তার সুবিধে হবে না। থাক, কষ্ট করবেন না।

ভারতী কহিল, দেখুন আগে কি দিই—

অপূর্ব বলিল, আমি জানি তসর কিংবা গরদ। কিন্তু আমার প্রয়োজন নেই,—আপনি বার করবেন না।

সন্ধ্যা করবেন না?

না।

শোবেন কি পরে? আফিসের ওই কোট-পেন্টুলানসুদ্ধ নাকি?

হাঁ।

খাবেন না?

না।

সত্যি?

অপূর্বর কণ্ঠস্বরে বহুক্ষণ হইতেই তাহার সহজ সুর ছিল না, এবার সে স্পষ্টই রাগ করিয়া কহিল, আপনি কি তামাশা করচেন নাকি?

ভারতী মুখ তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল, বলিল, তামাশা ত আপনিই করচেন। আপনার সাধ্য আছে না খেয়ে উপোস করে থাকেন?

এই বলিয়া সে আলমারির মধ্য হইতে একখানি সুন্দর গরদের শাড়ী বাহির করিয়া কহিল, একেবারে নিভাঁজ পবিত্র। আমিও কোন দিন পরিনি। ওই ছোট ঘরটায় গিয়ে কাপড় ছেড়ে আসুন, নীচে কল আছে, আমি আলো দেখাচ্চি, হাত-মুখ ধুয়ে ওইখানেই মনে মনে সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে নিন। নিরুপায়ে এ ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে,—ভয়ঙ্কর অপরাধ কিছু হবে না।

হঠাৎ তাহার গলার শব্দ ও কথা বলার ভঙ্গী এমন বদলাইয়া গেল যে অপূর্ব থতমত খাইয়া গেল। তাহার দপ করিয়া মনে পড়িল সেদিন ভোরবেলাতেও ঠিক যেন এমনি করিয়াই কথা কহিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। অপূর্ব হাত বাড়াইয়া আস্তে আস্তে বলিল, দিন না কাপড়,—আমি নিজেই আলো নিয়ে নীচে যাচ্চি। আমি কিন্তু যার-তার হাতে ভাত খেতে পারব না তা বলে দিচ্চি।

ভারতী নরম হইয়া কহিল, সরকারমশায় যে ভাল বামুন। গরীব লোক, হোটেল করেছেন, কিন্তু অনাচারী নন। নিজে রাঁধেন, সবাই তাঁর হাতে খায়,—কেউ আপত্তি করে না—আমাদের ডাক্তারবাবুর খাবার পর্যন্ত তাঁর কাছ থেকেই আসে।

তথাপি অপূর্বর কুণ্ঠা ঘুচিল না, বিরসমুখে কহিল, যা-তা খেতে আমার বড় ঘৃণা বোধ হয়।

ভারতী হাসিল, কহিল, যা-তা খেতে কি আমিই আপনাকে দিতে পারি? আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁকে দিয়ে সমস্ত গুছিয়ে আনবো,—তাহলে ত আর আপত্তি হবে না?—এই বলিয়া সে আবার একটু হাসিল।

অপূর্ব আর প্রতিবাদ করিল না, আলো এবং কাপড় লইয়া নীচে চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া ভারতীর বুঝিতে বাকী রহিল না যে সে হোটেলের অন্ন আহার করিতে অত্যন্ত সঙ্কোচ ও বিঘ্ন অনুভব করিতেছে।

কিছুক্ষণ পরে অপূর্ব যখন গরদের শাড়ী পরিয়া নীচের একটা কাঠের বেঞ্চে বসিয়া আহ্নিকে নিযুক্ত, ভারতী দ্বার খুলিয়া একাকী অন্ধকারে বাহির হইয়া গেল, বলিয়া গেল, সরকারমশায়কে লইয়া ফিরিয়া আসিতে তাহার বিলম্ব হইবে না, ততক্ষণ সে যেন নীচেই থাকে। বস্তুতঃ ফিরিতে তাহার দেরি হইল না। সেই মাত্র অপূর্বর আহ্নিক শেষ হইয়াছে, ভারতী আলো হাতে করিয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে প্রবেশ করিল, সঙ্গে তাহার সরকারমশায়, হাতে তাঁহার খাবারের থালা একটা বড় পিতলের গামলা দিয়া ঢাকা, তাঁহার পিছনে আর একজন লোক জলের গ্লাস এবং আসন আনিয়াছে, সে ঘরের একটা কোণ ভারতীর নির্দেশমত জল ছিটাইয়া মুছিয়া লইয়া ঠাঁই করিয়া দিলে ব্রাহ্মণ অন্নপাত্র রক্ষা করিলেন। সকলে প্রস্থান করিলে ভারতী কবাট বন্ধ করিয়া দিয়া গলায় অঞ্চল দিয়া যুক্তকরে সবিনয়ে নিবেদন করিল, এ ম্লেচ্ছের অন্ন নয়, সমস্ত খরচ ডাক্তারবাবুর। আপনি অসঙ্কোচে আতিথ্য স্বীকার করুন।

কিন্তু তাহার এই সকৌতুক পরিহাসটুকু অপূর্ব প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিতে পারিল না। সে জাতি মানে, যে-সে লোকের ছোঁয়া খায় না, হোটেলে প্রস্তুত অন্ন ভক্ষণে কিছুতেই তাহার রুচি হয় না, কিন্তু তাই বলিয়া দামের পয়সাটা আজ ম্লেচ্ছ দিল কি অধ্যাপক ব্রাহ্মণ দিলেন এত গোঁড়ামিও তাহার ছিল না।

বড়ভাইয়েরা তাহার শুদ্ধাচারিণী মাতাকে অনেক দুঃখ দিয়াছে, ভাল হউক মন্দ হউক সেই মায়ের আদেশ ও অন্তরের ইচ্ছাকে তাহার লঙ্ঘন করিতে অত্যন্ত ক্লেশ বোধ হয়। এ কথা ভারতী যে একেবারে জানে না তাহাও নয়, অথচ, যখন-তখন তাহার এই আচার-নিষ্ঠাকেই লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সৃষ্টি করার চেষ্টায় মন তাহার উত্যক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু কোন জবাব না দিয়া সে আসনে আসিয়া বসিল, এবং আচ্ছাদন খুলিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইল। ভারতী সাবধানে সর্বপ্রকার স্পর্শ বাঁচাইয়া দূরে ভূমিতলে বসিয়া ইহাই তদারক করিতে গিয়া মনে মনে কুণ্ঠিত ও অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। সে ক্রীশ্চান বলিয়া হোটেলের রন্ধনশালায় প্রবেশ করিতে পারে নাই, এই গভীর রাত্রে, সকলের আহারান্তে যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহাই যে কোনমতে সংগ্রহ করিয়া সরকারমশায় হাজির করিয়াছিলেন ভারতী তাহা ভাবিয়া দেখে নাই। ঘরে যথেষ্ট আলোক ছিল না, তথাপি আবরণ উন্মোচন করায় অন্ন-ব্যঞ্জনের যে মূর্তি প্রকাশিত হইল তাহাতে মুখে আর তাহার কথা রহিল না। অনেকদিন সে তাহাদের উপরের ঘর হইতে মেঝের ছিদ্রপথে এই লোকটির খাওয়ার ব্যাপার লুকাইয়া লক্ষ্য করিয়াছে, তেওয়ারীর ছোটখাটো সামান্য ত্রুটিতে সেই খুঁতখুঁতে মানুষটির খাওয়া নষ্ট হইতে কতদিন ভারতী নিজের চোখে দেখিয়াছে, সে-ই যখন আজ নিঃশব্দ ম্লানমুখে এই কদন্ন ভোজনে প্রবৃত্ত হইল, তখন কিছুতেই সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, থাক থাক, ও আর খেয়ে কাজ নেই,—এ আপনি খেতে পারবেন না।

অপূর্ব বিস্মিত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল, বলিল, খেতে পারব না? কেন?

ভারতী কেবলমাত্র মাথা নাড়িয়া জবাব দিল, না, পারবেন না।

অপূর্ব প্রতিবাদ করিয়া তেমনি মাথা নাড়িয়া কহিল, না, বেশ পারবো, এই বলিয়া সে ভাত ভাঙ্গিবার উদ্যোগ করিতেই ভারতী উঠিয়া একেবারে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল, আপনি পারলেও আমি পারব না। জোর করে খেয়ে অসুখ হলে এ বিদেশে আমাকেই ভুগে মরতে হবে। উঠুন।

অপূর্ব উঠিয়া দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, কি খাবো তাহলে? আজ আবার তলওয়ারকর পর্যন্ত আফিসে আসেন নি,—যা পারি এই দুটি না হয় খেয়ে নি? কি বলেন? এই বলিয়া সে এমন করিয়া ভারতীর মুখের প্রতি চাহিল যে তাহার অপরিসীম ক্ষুধার কথা অপরের বুঝিতে আর লেশমাত্র বাকী রহিল না।

ভারতী ম্লানমুখে হাসিল; কিন্তু মাথা নাড়িয়া বলিল, এ ছাই-পাঁশ আমি মরে গেলেও ত আপনাকে খেতে দিতে পারব না অপূর্ববাবু,—হাত ধুয়ে উপরে চলুন, আমি বরঞ্চ আর কোন ব্যবস্থা করচি।

অনুরোধ অথবা আদেশমত অপূর্ব শান্ত বালকের মত হাত ধুইয়া উপরে উঠিয়া আসিল। মিনিট-দশেকের মধ্যেই পুনরায় সেই সরকারমশায় এবং তাঁহার হোটেলের সহযোগীটি আসিয়া দেখা দিলেন। এবার ভাতের বদলে একজনের হাতে মুড়ির পাত্র এবং দুধের বাটি, অপরের হাতে সামান্য কিছু ফল ও জলের ঘটি; আয়োজন দেখিয়া অপূর্ব মনে মনে খুশী হইল। এইটুকু সময়ে এতখানি সুব্যবস্থা সে কল্পনাও করে নাই। তাহারা চলিয়া গেলে অপূর্ব হৃষ্টচিত্তে আহারে মন দিল। দ্বারের বাহিরে সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া ভারতী দেখিতেছিল, অপূর্ব কহিল, আপনি ঘরে এসে বসুন। কাঠের মেঝেতে দোষ ধরতে গেলে আর বর্মায় বাস করা চলে না।

ভারতী সেইখান হইতেই সহাস্যে কহিল, বলেন কি? আপনার মত যে একেবারে উদার হয়ে উঠল!

অপূর্ব কহিল, না, এতে সত্যই দোষ নেই।

ডাক্তারবাবু বললেন, চলুন, ফিরে যাই—আমিও ফিরে এলাম। এখানে যে মাতালের কাণ্ডে খুনোখুনি ব্যাপার হয়ে আছে সে কে জানতো?

জানলে কি করতেন?

জানলে? অর্থাৎ,—আমার জন্যে আপনাকে এত কষ্ট পেতে হবে জানলে আমি কখখনো ফিরে আসতে রাজী হতাম না।

ভারতী কহিল, খুব সম্ভব বটে। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম আপনি নিজেই ইচ্ছে করে ফিরে এসেছেন।

অপূর্বর মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। সে মুখের গ্রাস গিলিয়া লইয়া সজোরে প্রতিবাদ করিয়া বলিল, কখখনো না! নিশ্চয় না! কাল বরঞ্চ আপনি ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন!

ভারতী শান্তভাবে কহিল, এত জিজ্ঞাসা-পড়ারই বা দরকার কি? আপনার কথাই কি আর বিশ্বাস করা যায় না!

তাহার কণ্ঠস্বরের কোমলতা সত্ত্বেও অপূর্বর গা জ্বলিয়া গেল। সে ফিরিয়া আসিতেই ভারতী যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়া উত্তাপের সহিত বলিল, আমার মিথ্যে কথা বলা অভ্যাস নয়,—আপনি বিশ্বাস না করতে পারেন।

ভারতী কহিল, আমিই বা বিশ্বাস না করব কেন?

অপূর্ব বলিল, তা জানিনে। যার যেমন স্বভাব । এই বলিয়া সে মুখ নীচু করিয়া আহারে মন দিল।

ভারতী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, আপনি মিথ্যে রাগ করচেন। ডাক্তারের কথায় না এসে নিজের ইচ্ছেয় ফিরে এলেই বা দোষ কি, তাই শুধু আপনাকে আমি বলছিলাম। এই যে তখন আপনি নিজে খুঁজে খুঁজে আমার এখানে এলেন তাতেই কি কোন দোষ হয়েছে?

অপূর্ব খাবার হইতে মুখ তুলিল না, বলিল, বিকেলবেলা সংবাদ নিতে আসা এবং দুপুররাত্রে বিনা কারণে ফিরে আসা ঠিক এক নয়।

ভারতী তৎক্ষণাৎ কহিল, নয়ই ত। তাইত আপনাকে জিজ্ঞেসা করছিলাম, একটু জানিয়ে গেলে ত এতখানি খাবার কষ্ট হতো না।সমস্তই ত ঠিক করে রাখা যেতে পারতো।

অপূর্ব নীরবে খাইতে লাগিল, উত্তর দিল না। খাওয়া যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিল তখন হঠাৎ মুখ তুলিয়া দেখিল, ভারতী স্নিগ্ধ সকৌতুক দৃষ্টে তাহার প্রতি নিঃশব্দে চাহিয়া আছে। কহিল, দেখুন ত খাবার কত কষ্টই হল!

অপূর্ব গম্ভীর হইয়া বলিল, আজ আপনার যে কি হয়েছে জানিনে, খুব সোজা কথাও কিছুতে বুঝতে পারচেন না।

ভারতী বলিল, আর এমনও ত হতে পারে খুব সোজা নয় বলেই বুঝতে পারচি নে? বলিয়াই ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

এই হাসি দেখিয়া সে নিজেও হাসিল, তাহার সন্দেহ হইল, হয়ত ভারতী এতক্ষণ তাহাকে শুধু মিথ্যা জ্বালাতন করিতেছিল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মনে পড়িল, এমনি ধারা সব ছোটখাটো ব্যাপার লইয়া এই খ্রীষ্টান মেয়েটি তাহাকে প্রথম হইতেই কেবল খোঁচা দিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, অথচ, ইহা বিদ্বেষ নয়, কারণ, যে-কোন বিপদের মধ্যে এতবড় নিঃসংশয় নির্ভরের স্থলও যে এই বিদেশে তাহার অন্য কোথাও নাই,—এ সত্যও ঠিক স্বতঃসিদ্ধের মতই হৃদয় তাহার চিরদিনের জন্য একেবারে স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

জলের গ্লাসটায় জল ফুরাইয়াছিল, শূন্য পাত্রটা অপূর্ব হাতে করিয়া তুলিতেই ভারতী ব্যস্ত হইয়া উঠিল, ঐ যাঃ—

আর জল নেই নাকি?

আছে বৈ কি! এই বলিয়া ভারতী রাগ করিয়া কহিল, অত নেশা করলে কি আর মানুষের কিছু মনে থাকে? খাবার জলের ঘটিটা শিবু নীচের টুলটার

ওপর ভুলে রেখে এসেচে,—আমারও পোড়া কপাল চেয়ে দেখিনি। এখন আর ত উপায় নেই, একেবারে আঁচিয়ে উঠেই খাবেন, কি বলেন? কিন্তু রাগ করতে পাবেন না বলে রাখচি।

অপূর্ব হাসিয়া কহিল, এতে আর রাগ করবার কি আছে?

ভারতী আন্তরিক অনুতাপের সহিত বলিল, হয় বৈ কি। খাবার সময় তেষ্টার জল না পেলে ভারী একটা অতৃপ্তি বোধ হয়। মনে হয় যেন পেট ভরলো না। তাই বলে কিন্তু ফেলে রেখেও কিছু উঠলে চলবে না। আচ্ছা, যাবো, চট করে শিবুকে ডেকে আনবো?

অপূর্ব তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া হাসিয়া কহিল, এর জন্যে এই অন্ধকারে যাবেন ডেকে আনতে? আমার কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই মনে করেন?

তাহার খাওয়া শেষ হইয়াছিল, তথাপি সে জোর করিয়া আরও দুই-চারি গ্রাস মুখে পুরিয়া অবশেষে যখন উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার নিজেরই কেমন যেন ভারী লজ্জা করিতে লাগিল। কহিল, বাস্তবিক বলচি আপনাকে, আমার কিছুমাত্র অসুবিধে হয়নি। আমি আঁচিয়ে উঠেই জল খাবো,—আপনি মিথ্যে দুঃখ করবেন না।

ভারতী হাসিয়া জবাব দিল, দুঃখ করতে যাবো? কখখনো না। আমি জানি দুঃখ করবার আমার কিচ্ছু নেই। এই বলিয়া সে আলোটা তুলিয়া ধরিয়া আর একদিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, আমি আলো দেখাচ্চি, যান আপনি নীচে থেকে মুখ ধুয়ে আসুন। জলের ঘটিটা সুমুখেই আছে,—যেন ভুলে আসবেন না।

অপূর্ব নীচে চলিয়া গেল। খানিক পরে মুখ-হাত ধুইয়া উপরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তাহার ভুক্তাবশেষ সরাইয়া উচ্ছিষ্ট স্থানটা ভারতী ইতিমধ্যেই পরিষ্কার করিয়াছে; দুই-একটা চৌকি প্রভৃতি স্থানান্তরিত করিয়া তাহার খাবার জায়গা করা হইয়াছিল, সেগুলো যথাস্থানে আনা হইয়াছে, এবং যে ইজিচেয়ারটায় সে ইতিপূর্বে বসিয়াছিল তাহারই একপাশে ছোট টিপায়ার উপরে রেকাবিতে

করিয়া সুপারি এলাচ প্রভৃতি মশলা রাখা হইয়াছে। ভারতীর হাত হইতে তোয়ালে লইয়া মুখ-হাত মুছিয়া মশলা মুখে দিয়া সে আরামকেদারায় বসিয়া পড়িল, এবং হেলান দিয়া তৃপ্তির গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, আঃ—এতক্ষণে দেহে যেন প্রাণ এল। কি ভয়ঙ্কর ক্ষিদেই না পেয়েছিল!

তাহার চোখের সুমুখ হইতে আলোটা সরাইয়া ভারতী একপাশে রাখিতেছিল, সেই আলোতে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া অপূর্ব হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া বলিল, আপনার খুব সর্দি হয়েছে দেখছি যে!

ভারতী বাতিটা তাড়াতাড়ি রাখিয়া দিয়া বলিল, কৈ, না।

না কেন! গলা ভারী, চোখ ফুলো-ফুলো, দিব্যি ঠাণ্ডা লেগেচে! এতক্ষণ খেয়ালই করিনি।

ভারতী জবাব দিল না। অপূর্ব কহিল, ঠাণ্ডা লাগার অপরাধ কি! এই রাত্তিরে যা ছুটোছুটি করতে হল!

ভারতী ইহারও উত্তর দিল না। অপূর্ব ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বলিল, ফিরে এসে নিরর্থক আপনাকে কষ্ট দিলাম। কিন্তু কে জানতো বলুন, ডাক্তারবাবু ডেকে এনে শেষে আপনাকে বোঝা টানতে দিয়ে নিজে সরে পড়বেন! ভুগতে হল আপনাকে।

ভারতী জানালার কাছে পিছন ফিরিয়া কি একটা করিতেছিল, কহিল, তা ত হলই। কিন্তু ভগবান বোঝা টানতে দিলে আর নালিশ করতে যাবো কার বিরুদ্ধে বলুন?

অপূর্ব আশ্চর্য হইয়া কহিল, তার মানে?

ভারতী তেমনি কাজ করিতে করিতেই বলিল, মানে কি ছাই আমিই জানি? কিন্তু দেখচি ত, বর্মায় আপনি পা দেওয়া পর্যন্ত বোঝা টেনে বেড়াচ্চি শুধু আমিই। বাবার সঙ্গে করলেন ঝগড়া, দণ্ড দিলাম আমি। ঘর পাহারা দিতে রেখে গেলেন তেওয়ারীকে, তার সেবা করে মলুম আমি। ডেকে আনলেন ডাক্তারবাবু, হাঙ্গামা পোহাতে হচ্চে আমাকে। ভয় হয়, সারা জীবনটা না শেষে আমাকেই

আপনার বোঝা বয়ে কাটাতে হয়। কিন্তু রাত ত আর নেই, শোবেন কোথায় বলুন ত?

অপূর্ব বিস্মিত হইয়া বলিল, বাঃ, আমি তার জানি কি?

ভারতী কহিল, হোটেলে ডাক্তারবাবুর ঘরে আপনার বিছানা করতে বলে এসেচি, ব্যবস্থা বোধ হয় হয়েছে।

কে নিয়ে যাবে? আমি ত চিনিনে।

আমিই নিয়ে যাচ্চি, চলুন, ডাকাডাকি করে তাদের তুলি গে।

চলুন, বলিয়া অপূর্ব তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। একটু সঙ্কোচের সহিত কহিল, কিন্তু আপনার বালিশ এবং বিছানার চাদরটা আমি নিয়ে যাবো। অন্ততঃ, এ দুটো আমার চাই-ই, পরের বিছানায় আমি মরে গেলেও শুতে পারবো না। এই বলিয়া সে শয্যা হইতে তুলিতে যাইতেছিল, ভারতী বাধা দিল। এতক্ষণে তাহার মলিন গম্ভীর মুখ স্নিগ্ধ কোমল হাস্যে ভরিয়া উঠিল। কিন্তু সে তাহা গোপন করিতে মুখ ফিরাইয়া আস্তে আস্তে বলিল, এও ত পরের বিছানা অপূর্ববাবু, ঘৃণা বোধ না হওয়াই ত ভারী আশ্চর্য। কিন্তু তাই যদি হয়, আপনার হোটেলে শুতে যাবার প্রয়োজন কি, আপনি এই খাটেতেই শোন। এ কথাটা সে ইচ্ছা করিয়াই বলিল না যে, মাত্র ঘণ্টা-কয়েক পূর্বেই তাহার দেওয়া অশুচি বস্ত্রে ভগবানের উপাসনা করিতেও ঘৃণা বোধ হইয়াছিল।

অপূর্ব অধিকতর সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল, বলিল, কিন্তু আপনি কোথায় শোবেন? আপনার ত কষ্ট হবে!

ভারতী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, একটুও না। আঙুল দিয়া দেখাইয়া কহিল, ওই ছোট ঘরটায় যাহোক একটা কিছু পেতে নিয়ে আমি স্বচ্ছন্দে শুতে পারবো। শুধু কাঠের মেঝের উপরে হাতে মাথা রেখে তেওয়ারীর পাশে কত রাত্রি কাটাতে হয়েছে সে ত আপনি দেখতে পাননি?

অপূর্ব একমাস পূর্বের কথা স্মরণ করিয়া বলিল, একটা রাত্রি আমিও দেখতে পেয়েছি, একেবারে পাইনি তা নয়।

ভারতী হাসিমুখে বলিল, সে কথা আপনার মনে আছে? বেশ, তেমনি ধারাই না হয় আর একটা রাত্রি দেখতে পাবেন।

অপূর্ব ক্ষণকাল অধোমুখে নীরবে থাকিয়া বলিল, তেওয়ারীর তখন ভয়ানক অসুখ,—কিন্তু এখন লোকে কি মনে করবে?

ভারতী জবাব দিল, কিছুই মনে করবে। কারণ পরের কথা নিয়ে নিরর্থক মনে করবার মত ছোট মন এখানে কারও নেই।

অপূর্ব কহিল, নীচের বেঞ্চে বিছানা করেও ত আমি অনায়াসে শুতে পারি?

ভারতী বলিল, আপনি পারলেও আমি তা দেব না। কারণ, তার দরকার নেই। আমি আপনার অস্পৃশ্য, আপনার দ্বারা আমার কোন ক্ষতি হতে পারে এ ভয় আমার নেই।

অপূর্ব আবেগের সহিত কহিল, আমার দ্বারা কখনো আপনার লেশমাত্র অনিষ্ট হতে পারে এ ভয় আমারও নেই। কিন্তু আপনাকে অস্পৃশ্য বললে আমার সবচেয়ে বেশী দুঃখ হয়। অস্পৃশ্য কথার মধ্যে ঘৃণার ভাব আছে, কিন্তু আপনাকে ত আমি ঘৃণা করিনে। আমাদের জাত আলাদা, আপনার ছোঁয়া আমি খেতে পারিনে, কিন্তু তার হেতু কি ঘৃণা? এত বড় মিছে কথা আর হতেই পারে না। বরঞ্চ, এর জন্যে আপনিই আমাকে মনে মনে ঘৃণা করেন। সেদিন ভোরবেলায় যখন আমাকে অকূল সমুদ্রে ফেলে রেখে চলে আসেন, তখনকার মুখের চেহারা আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে, সে আমি জীবনে ভুলব না।

ভারতী বলিল, আমার আর যাই কেন না ভুলুন, সে অপরাধ ভুলবেন না!

কখনও না।

সে মুখে আমার কি ছিল? ঘৃণা?

নিশ্চয়!

ভারতী তাহার মুখের পানে চাহিয়া হাসিল, তারপরে ধীরে ধীরে বলিল, অর্থাৎ মানুষের মন বোঝবার বুদ্ধি আপনার ভয়ানক সূক্ষ্ম,—আছে কি নেই! কিন্তু, আর কাজ নেই আপনি শোন। আমার রাত-জাগার অভ্যাস আছে, কিন্তু আপনি আর বেশী জেগে থাকলে আমারই হয়ত বিপদের অবধি থাকবে না।

এই বলিয়া সে প্রত্যুত্তরের আর অবকাশ না দিয়া র‍্যাকের উপর হইতে গোটা-দুই কম্বল পাড়িয়া লইয়া পাশের ছোট ঘরের ভিতরে গিয়া প্রবেশ করিল।

অনতিকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া মশারি ফেলিয়া চারিদিক ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিয়া ভারতী চলিয়া গেল, কিন্তু অপূর্বর নিমীলিত চোখের কোণে ঘুমের ছায়াপাতটুকুও হইল না। ঘরের এক কোণে আড়াল-করা আলোটা মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে, বাহিরে গভীর অন্ধকার, রাত্রি স্তব্ধ হইয়া আছে,—হয়ত, সে ছাড়া কোথাও কেহ জাগিয়া নাই, কখন যে ঘুম আসিবে তাহার কোন স্থিরতা নেই, তবুও এই জাগরণের মধ্যে নিদ্রাবিহীনতার বিন্দুমাত্র অস্বস্তিও সে অনুভব করিল না। তাহার সকল দেহমন যেন বর্ণে বর্ণে উপলব্ধি করিতে লাগিল, এই ঘরে, এই শয্যায়, এই নীরব নিশীথে ঠিক এমন চুপ করিয়া শুইয়া থাকার মত সুন্দর বস্তু আর ত্রিভুবনে নাই। এমন একান্ত ভাবনাহীন নিশ্চিন্ত বিশ্রামের আনন্দ সে যেন আর কখনও পায় নাই,—তাহার এমনি মনে হইতে লাগিল।

সকালবেলায় তাহার ঘুম ভাঙ্গিল ভারতীর ডাকে। চোখ মেলিয়াই দেখিল সম্মুখে তাহার পায়ের কাছে দাঁড়াইয়া এই মেয়েটি, পূবের জানালা দিয়া প্রভাত-সূর্যের রাঙ্গা আলো তাহার সদ্যোস্নাত ভিজা চুলের উপরে, তাহার পরনের সাদা গরদের রাঙ্গা পাড়টুকুর উপরে, তাহার সুন্দর মুখখানির স্নিগ্ধ শ্যাম রঙের উপরে পড়িয়া একেবারে যেন অপরূপ হইয়া অপূর্বর চোখে ঠেকিল।

ভারতী কহিল, উঠুন, আবার আফিসে যেতে হবে ত!

তা ত হবে, বলিয়া অপূর্ব শয্যাত্যাগ করিল। আপনার ত দেখছি স্নান পর্যন্ত সারা হয়ে গেছে।

ভারতী কহিল, আপনাকেও সমস্ত তাড়াতাড়ি সেরে নিতে হবে। কাল অতিথি-সৎকারে যথেষ্ট ত্রুটি হয়েছে, আজ আমাদের প্রেসিডেন্টের আদেশ, আপনাকে ভাল করে না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়া হবে না।

অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, কালকের সে মেয়েটি বেঁচেছে?

তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে—বাঁচবে বলেই আশা।

মেয়েটিকে অপূর্ব চোখেও দেখে নাই, তথাপি তাহারই সুখবরে মন যেন তাহার পরম লাভ বলিয়া গণ্য করিল। আজ কাহারও কোন অকল্যাণ সে যেন সহিতেই পারিবে না তাহার এমনি জ্ঞান হইল।

সে স্নান-আহ্নিক সারিয়া কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়া যখন উপরে আসিল তখন বেলা প্রায় নয়টা। ইতিমধ্যে ঠাঁই করিয়া সরকারমশায় খাবার রাখিয়া গেছেন, অপূর্ব আসনে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কৈ, আপনাদের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ত দেখা হল না! তাঁর অতিথি-সৎকারের বুঝি এই রীতি?

ভারতী বলিল, আপনার যাবার আগে দেখা হবে বৈ কি। তাঁর আপনার সঙ্গে বোধ করি একটু কাজও আছে।

অপূর্ব কহিল, আর ডাক্তারবাবু? যিনি আমাকে ডেকে এনেছেন? এখনো বোধ হয় তিনি বিছানাতেই পড়ে? এই বলিয়া হাসিল।

ভারতী এ হাসিতে যোগ দিল না, কহিল, বিছানায় পড়বার তাঁর সময়ই হয়নি। এই ত হাসপাতাল থেকে ফিরে এলেন। শোওয়া না-শোওয়া কোনটার কোন মূল্যই তাঁর কাছে নেই।

অপূর্ব আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল, এতে তাঁর অসুখ করে না?

ভারতী বলিল, কখনো দেখিনে ত। সুখ অসুখ দুই-ই বোধ হয় তাঁর কাছে হার মেনে পালিয়েছে। মানুষের সঙ্গেই তাঁর তুলনা হয় না।

অপূর্বর কাল রাত্রের অনেক কথাই স্মরণ হইল, মুগ্ধকণ্ঠে কহিল, আপনারা সকলেই বোধ হয় তাঁকে অতিশয় ভক্তি করেন?

ভক্তি করি? ভক্তি ত অনেকেই অনেককে করে।

বলিতে বলিতেই তাহার কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ গাঢ় হইয়া উঠিল, কহিল, তিনি চলে গেলে মনে হয় পথের ধূলোয় পড়ে থাকি, তিনি বুকের ওপর দিয়ে হেঁটে যান। মনে হয়, তবুও আশ মেটে না অপূর্ববাবু। বলিয়াই সে মুখ ফিরাইয়া চট করিয়া চোখের কোণ-দুটা মুছিয়া ফেলিল।

অপূর্ব আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না, নতমুখে নিঃশব্দে আহার করিতে লাগিল। তাহার এই কথাটাই বার বার মনে হইতে লাগিল, সুমিত্রা ও ভারতীর মত এতবড় শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী নারী-হৃদয়ে যে মানুষ এতখানি উচ্চে সিংহাসন গড়িয়াছে, জানি না ভগবান তাহাকে কোন্ ধাতু দিয়া তৈরি করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন! কোন্ অসাধারণ কার্য তাহাকে দিয়া তিনি সম্পন্ন করাইয়া লইবেন!

দূরে দরজার কাছে ভারতী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, অপূর্ব নিজেও বিশেষ কোন কথা কহিল না, অতঃপর খাওয়াটা তাহার একপ্রকার নিঃশব্দেই সমাধা হইল। অপ্রীতিকর কোন কিছুই ঘটে নাই, তথাপি যে প্রভাতটা আজ তাহার বড় মিষ্ট হইয়া শুরু হইয়াছিল, অকারণে কোথা হইতে যেন তাহার উপরে একটা ছায়া আসিয়া পড়িল।

আফিসের কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়া সে কহিল, চলুন, ডাক্তারবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করে যাই।

চলুন, তিনি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

সরকার-মহাশয়ের জরাজীর্ণ হোটেল-বাড়ির একটা অত্যন্ত ভিতরের দিকের ঘরে ডাক্তারবাবুর বাসা। আলো নাই, বাতাস নাই, আশেপাশে নোংরা জল জমিয়া একটা দুর্গন্ধ উঠিতেছে, অতিশয় পুরাতন তক্তার মেঝে, পা দিতে ভয় হয় পাছে সমস্ত ভাঙ্গিয়া পড়ে, এমনি একটা কদর্য বিশ্রী ঘরে ভারতী যখন তাহাকে পথ দেখাইয়া আনিল, তখন বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। ঘরে ঢুকিয়া অপূর্ব ক্ষণকাল ত ভাল দেখিতেই পাইল না।

ডাক্তারবাবু অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন, আসুন অপূর্ববাবু।

উঃ—কি ভীষণ ঘরই আপনি আবিষ্কার করেছেন ডাক্তারবাবু!

কিন্তু কি রকম সস্তা বলুন ত! মাসে দশ আনা ভাড়া।

অপূর্ব কহিল, বেশি, বেশি, ঢের বেশি। দশ পয়সা হওয়া উচিত।

ডাক্তার কহিলেন, আমরা দুঃখী লোকেরা সব কিরকম থাকি আপনাদের চোখে দেখা উচিত। অনেকের কাছে এই আবার রাজপ্রাসাদ।

অপূর্ব কহিল, তা হলে প্রাসাদ থেকে ভগবান যেন আমাকে চিরদিন বঞ্চিত রাখেন! বাপ রে বাপ!

ডাক্তার বলিলেন, শুনলাম, কাল রাত্রে আপনার বড় কষ্ট হয়েছে অপূর্ববাবু, আমাকে ক্ষমা করতে হবে।

অপূর্ব কহিল, ক্ষমা করব শুধু আপনি এ ঘর ছাড়লে। তার আগে নয়।

প্রত্যুত্তরে ডাক্তার শুধু একটু হাসিলেন, বলিলেন, আচ্ছা, তাই হবে।

এতক্ষণ অপূর্ব নজর করে নাই, হঠাৎ ভয়ানক আশ্চর্য হইয়া দেখিতে পাইল, দেওয়ালের কাছে একটা মোড়ার উপরে বসিয়া সুমিত্রা। আপনি এখানে? আমাকে মাপ করবেন, আমি একেবারে দেখতে পাইনি।

সুমিত্রা কহিলেন, সে অপরাধ আপনার নয় অপূর্ববাবু, অন্ধকারের।

অপূর্বর বিস্ময়ের সীমা রহিল না তাঁহার গলা শুনিয়া। সে কণ্ঠস্বর যেমন করুণ, তেমনি বিষণ্ণ। কি একটা ঘটিয়াছে বলিয়া যেন তাহার ভয় করিতে লাগিল। ভাল করিয়া ঠাহর করিয়া দেখিয়া আস্তে আস্তে কহিল, ডাক্তারবাবু, এ আপনার আজ কি রকম পোশাক? কোথাও কি বার হচ্ছেন?

ডাক্তারের মাথায় পাগড়ি, গায়ে লম্বা কোট, পরনে ঢিলা পায়জামা, পায়ে রাওলপিণ্ডির নাগ্রা, একটা চামড়ার ব্যাগে কি-কতকগুলা বান্ডিল বাঁধা।

কহিলেন, আমি ত এখন চলতি অপূর্ববাবু, এঁরা সব রইলেন, আপনাকে দেখতে হবে। আপনাকে এর বেশী বলার আমি আবশ্যক মনে করিনে।

অপূর্ব অবাক হইয়া কহিল, হঠাৎ চলতি কি রকম? কোথায় চলতি?

এই ডাক্তার লোকটির কণ্ঠস্বরে ত কোন পরিবর্তন হয় না, তেমনি সহজ, শান্ত, স্বাভাবিক গলায় বলিলেন, আমাদের অভিধানে কি 'হঠাৎ' শব্দ থাকে অপূর্ববাবু? চলতি সম্প্রতি ভামোর পথে আরও কিছু উত্তরে। কিছু সাঁচ্চা জরির মাল আছে, সিপাইদের কাছে বেশ দামে বিক্রি হয়। এই বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

সুমিত্রা এতক্ষণ কথা কহে নাই, সহসা বলিয়া উঠিল, তাদের পেশোয়ার থেকে একেবারে ভামোয় সরিয়ে এনেচে, তুমি জানো তাদের ওপর এখন কিরকম কড়া নজর। তোমাকেও অনেকে চেনে কখখনো ভেবো না সকলের চোখেই তুমি ধূলো দিতে পারবে। এখন কিছুদিন কি না গেলেই নয়? শেষের দিকে তাহার গলাটা যেন অদ্ভুত শুনাইল।

ডাক্তার মৃদু হাসিয়া কহিলেন, তুমি ত জানো, না গেলেই নয়।

সুমিত্রা আর কথা কহিলেন না, কিন্তু অপূর্ব ব্যাপারটা একেবারে চক্ষের পলকে বুঝিতে পারিল। তাহার চোখ ও দুই কান গরম হইয়া সর্বাঙ্গ দিয়া যেন আগুন ছুটিতে লাগিল। কোনমতে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল, ধরুন যদি তারা কেউ চিনতেই পারে? যদি ধরে ফেলে?

ডাক্তার কহিলেন, ধরে ফেললে বোধ হয় ফাঁসিই দেবে। কিন্তু দশটার ট্রেনের আর ত সময় নেই অপূর্ববাবু, আমি চললাম। এই বলিয়া তিনি স্ট্র্যাপে-বাঁধা মস্ত বোঝাটা অবলীলাক্রমে পিঠে ফেলিয়া চামড়ার ব্যাগটা হাতে তুলিয়া লইলেন।

ভারতী একটি কথাও কহে নাই, একটি কথাও কহিল না, শুধু পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিল। সুমিত্রাও প্রণাম করিল, কিন্তু সে পায়ের কাছে নয়, একেবারে পায়ের উপরে। হঠাৎ মনে হইল সে বুঝি আর উঠিবে না, এমনি করিয়া পড়িয়াই থাকিবে—বোধ হয় মিনিটখানেক হইবে,—যখন সে নীরবে উঠিয়া

দাঁড়াইল, তখন স্বল্পালোকিত সেই ক্ষুদ্র ঘরের মধ্যে তাহার আনত মুখের চেহারা দেখিতে পাওয়া গেল না।

ডাক্তার ঘরের বাহিরে আসিয়া অপূর্বর হাতখানি গতরাত্রির মত মুঠার মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিলেন, চললাম অপূর্ববাবু,—আমি সব্যসাচী।

অপূর্বর মুখের ভিতরটা শুকাইয়া মরুভূমি হইয়া গিয়াছিল, তাহার গলা দিয়া স্বর ফুটিল না, কিন্তু সে চক্ষের পলকে হাঁটু পাতিয়া তাঁহার পায়ের কাছে মেয়েদের মতই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। ডাক্তার মাথায় তাহার হাত দিলেন, আর একটা হাত ভারতীর মাথায় দিয়া অস্ফুটে কি বলিলেন শোনা গেল না, তাহার পরে একটু দ্রুতপদেই বাহির হইয়া গেলেন।

অপূর্ব উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, ভারতীর পাশে সে একাকী দাঁড়াইয়া আছে, পিছনে সেই ভাঙ্গা ঘরের রুদ্ধদ্বারের অন্তরালে কর্তব্যকঠিন, অশেষ বুদ্ধিশালিনী, পথের-দাবীর ভয়লেশহীনা তেজস্বিনী সভানেত্রী কি যে করিতে লাগিলেন, তাহার কিছুই জানা গেল না।

চোদ্দ

ভারতী ও অপূর্ব দু'জনেই পিছনের বন্ধ দরজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু কেহই কোন কথা কহিল না।অপূর্ব কিছুই না বুঝিয়াও এটুকু বুঝিল যে, এমন করিয়া যে লোক নিজেকে স্বেচ্ছায় বন্দী করিয়া রাখিল তাহার সম্বন্ধে কৌতূহলী হইতে নাই। উভয়ে নীরবে হোটেলের বাহিরে আসিতে ভারতী কহিল, চলুন অপূর্ববাবু, আমরা ঘরে যাই—

কিন্তু, আমার যে আবার আফিসের বেলা—

রবিবারেও আফিস?

রবিবার? তাই ত বটে! অপূর্ব খুশী হইয়া বলিল, এ কথা সকালে মনে হলে নাওয়া-খাওয়ার জন্যে আর ব্যস্ত হতে হতো না। আপনার এত জিনিস মনে থাকে, কিন্তু এটুকু ভুলে গিয়েছিলেন?

ভারতী একটু হাসিয়া বলিল, তা হবে। কিন্তু, কাল রাত্রে আপনার না-খাওয়ার কথাটা ভুলিনি।

অপূর্ব হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমার দেরি করবার জো নেই, তেওয়ারী-বেচারা হয়ত ভেবে সারা হয়ে যাচ্ছে।

ভারতী বলিল, যাচ্ছে না। তার কারণ, আপনি জাগবার পূর্বেই সে খবর পেয়েছে আপনি কুশলে আছেন।

সে জানে আমি আপনার কাছে আছি?

ভারতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, জানে। ভোরবেলাতেই আমি লোক পাঠিয়ে দিয়েছি।

এই সংবাদ শুনিয়া অপূর্ব শুধু নিশ্চিন্ত নয় তাহার মনের উপর হইতে একটা সত্যকার বোঝা নামিয়া গেল। কাল রাত্রে ফিরিবার পথে, ফিরিয়া আসিয়া

খাওয়া শোয়া সকল কাজে সকল কথার মধ্যে এই ভাবনাই বহুবার তাহাকে ধাক্কা মারিয়া গেছে, কি জানি, কাল সকালে তেওয়ারী ব্যাটা তাহার কথা বিশ্বাস করিবে কি না। এই বর্মাদেশের কতপ্রকার জনশ্রুতিই না প্রচলিত আছে,—হয়ত বাড়িতে মায়ের কাছে কি একটা লিখিয়া দিবে, না হয় ত, ফিরিয়া গিয়া গল্প করিবে—পাকা কালির মত, কালি গেলেও যাহার দাগ মুছিবে না—এই তুচ্ছ বস্তুটাই ছোট্ট কাঁটার মত তাহার পায়ে প্রতি পদক্ষেপেই খচখচ করিতেছিল। এতক্ষণ পরে সে যেন নির্ভয়ে পা ফেলিয়া বাঁচিল। তেওয়ারী আর যাহাই করুক, ভারতীর মুখের কথা সে মরিয়া গেলেও অবিশ্বাস করিবে না। যে ছাড়পত্র ভারতী লিখিয়া দিয়াছে, তাহার চেয়ে নিষ্কলঙ্কতার বড় দলিল তেওয়ারীর কাছে যে আর নাই, অপূর্ব তাহা ভাল করিয়াই জানিত। পুলকিতচিত্তে কহিল, আপনার সকল দিকে চোখ আছে। বাড়িতে বৌদিদিদেরও দেখেচি, অন্য-সব মেয়েদেরও দেখেচি, আমার মাকেও দেখেচি, কিন্তু এমন সর্বদিকে দৃষ্টি আমি কাউকে দেখিনি। বাস্তবিক বলচি, আপনি যে বাড়ির গৃহিণী হবেন সে বাড়ির লোকেরা চোখ বুজে দিন কাটিয়ে দেবে, কখনো কাউকে দুঃখ পেতে হবে না।

ভারতীর মুখের উপর দিয়া যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। অপূর্ব ইহার কিছুই দেখিল না, সে পিছনে আসিতেছিল, পিছনে হইতেই পুনরায় কহিল, এই বিদেশে আপনি না থাকলে আমার কি হতো বলুন ত! সমস্ত চুরি যেত, তেওয়ারী হয়ত ঘরেই মরে থাকতো,—বামুনের ছেলেকে মেথর-মুদ্দাফরাসে টানা-হেঁচড়া করত।—এই ভয়ানক সম্ভাবনায় তাহার গায়ে কাঁটা দিয়া গেল। একটু থামিয়া কহিল, আমিই কি আর থাকতে পারতাম? চাকরি ছেড়ে দিয়ে হয়ত চলে যেতে হতো।

ভারতী হাসিল, কহিল, একেবারে কেউ নেই তা কেমন করে বলবেন? নিষ্ঠাবানের ঘরে না থাকলেও হয়ত, আর কোথাও কেউ থাকতে পারে যে

আপনার জন্যে নিজেকে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিতে পারে, কিন্তু তাকে আপনারা খুঁজে পাবেন কোথায়?

অপূর্ব নিজের চিন্তাতেই ছিল, ভারতীর কথায় মন দেয় নাই, কহিল, সে ত বটেই।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কবে বাড়ি যাবেন?

অপূর্ব অন্যমনস্কের মতই জবাব দিল, কি জানি, মা কবে চিঠি লিখে পাঠাবেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া বলিতে লাগিল, বাবার সঙ্গে মতের অমিল নিয়ে মা আমার কোনদিন জীবনে সুখ ভোগ করেন নি। সেই মাকে একলা ফেলে রেখে আসতে আমার কিছুতে মন সরে না। কি জানি, এবার গেলে আর ফিরে আসতে পারবো কি না। হঠাৎ ভারতীর মুখের প্রতি দৃষ্টি স্থির করিয়া কহিল, দেখুন, বাইরে থেকে দেখতে আমাদের সাংসারিক অবস্থা যতই সচ্ছল হোক ভিতরে কিন্তু বড় অনটন! শহরে অধিকাংশ গৃহস্থেরই এমনি দশা! বৌদিদিরা যে-কোন দিন আমাদের পৃথক করে দিতে পারেন। আমি ফিরে যদি না আসতে পারি ত আমাদের কষ্টের হয়ত সীমা থাকবে না।

ভারতী বলিল, আপনাকে আসতেই হবে।

মায়ের কাছ থেকে চিরদিন আলাদা হয়ে থাকবো?

তাঁকে রাজী করে সঙ্গে নিয়ে আসুন। আমি নিশ্চয় জানি, তিনি আসবেন।

অপূর্ব হাসিয়া কহিল, কখখনো না। মাকে আপনি জানেন না। আচ্ছা, ধরুন যদি তিনি আসেন, তাঁকে দেখবে কে এখানে?

ভারতীও হাসিয়া কহিল, আমি দেখবো।

আপনি? আপনি ঘরে ঢুকলেই ত মা হাঁড়ি ফেলে দেবেন।

ভারতী জবাব দিল, কতবার দেবেন? আমি রোজ রোজ ঘরে ঢুকবো। দু'জনেই হাসিয়া উঠিল। ভারতী সহসা গম্ভীর হইয়া কহিল, আপনি নিজেও ত ওই হাঁড়ি-ফেলার দলে, কিন্তু হাঁড়ি ফেলে দিলেই যদি সব ল্যাঠা চুকে যেতো,

পৃথিবীর সমস্যা তাহলে খুব সোজা হয়ে উঠতো। বিশ্বাস না হয় তেওয়ারীকে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন।

অপূর্ব স্বীকার করিয়া কহিল, তা সত্যি। সে বেচারা হাঁড়ি ফেলবে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চোখ দিয়ে তার জলও পড়বে। আপনাকে সে এত ভক্তি করে যে, একটু জপালে হয়ত সে ক্রীশ্চান হতেও রাজী হয়ে পড়ে, বলা যায় না।

ভারতী কহিল, সংসারে কিছুই বলা যায় না। চাকরের কথাও না, মনিবের কথাও না। এই বলিয়া সে হাসি গোপন করিতে যখন মুখ নীচু করিল, তখন অপূর্বর নিজের মুখখানা একেবারে আরক্ত হইয়া উঠিল, কহিল, সংসারে এটুকু-কিন্তু স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে যে চাকর ও মনিবের বুদ্ধির তারতম্য থাকতে পারে।

ভারতী মুখ তুলিয়া কহিল, আছেই ত। সেইজন্য তার রাজী হতে দেরি হতে পারে, কিন্তু আপনার হবে না। তাহার চোখের দৃষ্টি চাপা-হাসির বেগে একেবারে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল । অপূর্ব পরিহাস বুঝিতে পারিয়া খুশি হইয়া কহিল, আচ্ছা তামাশা নয়, বাস্তবিক বলচি, আমি ধর্ম ত্যাগ করতে পারি এ আপনি ভাবতে পারেন?

ভারতী কহিল, পারি।

সত্যি পারেন?

সত্যিই পারি।

অপূর্ব কহিল, অথচ, সত্যিই আমি প্রাণ গেলেও পারিনে।

ভারতী বলিল, প্রাণ যাওয়া যে কি জিনিস সে ত আপনি জানেন না। তেওয়ারী জানে। কিন্তু, এ নিয়ে তর্ক করে আর কি হবে, আপনার মত অন্ধকারের মানুষকে আলোতে আনার চেয়ে ঢের বেশী জরুরী কাজ আমার এখনো বাকী। আপনি বরঞ্চ একটু ঘুমোন।

অপূর্ব বলিল, দিনের বেলায় আমি ঘুমুই নে। কিন্তু জরুরী কাজটা আবার আপনার কি?

ভারতী কহিল, আপনার বেগার খেটে বেড়ানোই আমার একমাত্র জরুরী কাজ নাকি? আমাকেও দুটি রেঁধে খেতে হয়। ঘুমুতে না পারেন আমার সঙ্গে নীচে চলুন। আমি কি কি রাঁধি, কেমন করে রাঁধি দেখবেন। হাতে যখন একদিন খেতেই হবে তখন একেবারে অনভিজ্ঞ থাকা ভাল নয়। এই বলিয়া সে সহসা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

অপূর্ব কহিল, আমি মরে গেলেও আপনার হাতে খাবো না।

ভারতী বলিল, আমি বেঁচে থেকে খাবার কথাই বলচি। এই বলিয়া সে হাসিমুখে নীচে নামিয়া গেল।

অপূর্ব ডাকিয়া কহিল, আমি তাহলে এখন বাসায় যাই,—তেওয়ারী-বেচারা ভেবে সারা হয়ে যাচ্চে। এই বলিয়া সে কিয়ৎকাল জবাবের জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকিয়া অবশেষে হেলান দিয়া শুইয়া পড়িল। হয়ত সে শুনিতে পায় নাই, হয়ত শুনিয়াও উত্তর দেয় নাই; কিন্তু ইহাই বড় সমস্যা নয়। বড় সমস্যা এই যে, তাহার অবিলম্বে বাসায় যাওয়া উচিত। কোন অজুহাতেই আর দেরি করা সাজে না। অথচ, ভিতর হইতে যাওয়ার তাগিদ যতই অনুভব করিতে লাগিল, ততই কিন্তু দেহ যেন তাহার অলস শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। শেষকালে সেই বড় চেয়ারের উপরেই মুখের উপর হাত চাপা দিয়া অপূর্ব ঘুমাইয়া পড়িল।

পনর

বেলা যে যায়! উঠুন!

অপূর্ব চোখ রগড়াইয়া উঠিয়া বসিল। দেয়ালের ঘড়ির প্রতি চাহিয়া কহিল, ইস! তিন-চার ঘণ্টার কম নয়! আমাকে তুলে দেননি কেন? বাঃ—মাথায় একটা বালিশ পর্যন্ত কখন দিয়ে দিয়েছেন। এতে কি আর কারও ঘুম ভাঙ্গে!

ভারতী কহিল, ঘুম ভাঙ্গবার হলে তখনি ভাঙ্গতো। এটা না দিলে মাঝে থেকে ঘাড়ে শুধু একটা ব্যথা হতো। যান, মুখ-হাত ধুয়ে আসুন, সরকারমশায় জলখাবারের থালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন,—তাঁর ঢের কাজ, একটু চটপট করে তাঁকে ছুটি দিন।

দ্বারের বাহিরে যে লোকটি দাঁড়াইয়া ছিল, মুখ বাড়াইয়া সে তাহার ত্বরা নিবেদন করিল।

নীচে হইতে হাত-মুখ ধুইয়া আসিয়া অপূর্ব খাবার খাইয়া সুপারি এলাচ প্রভৃতি মুখে দিয়া হৃষ্টচিত্তে কহিল, এবার আমাকে ছুটি দিন, আমি বাসায় যাই।

ভারতী মাথা নাড়িয়া বলিল, সেটি হবে না। তেওয়ারীকে খবর দিয়েচি যে আফিসের ফেরত কাল বিকালে আপনি বাসায় যাবেন, এবং খবর নিয়েচি যে সে সুস্থদেহে, বহাল তবিয়তে ঘর আগলাচ্চে,—কোন চিন্তা নাই।

কিন্তু কেন?

ভারতী বলিল, কারণ সম্প্রতি আপনি আমাদের অভিভাবক। আজ সুমিত্রাদিদি অসুস্থ, নবতারা গেছেন অতুলবাবুকে সঙ্গে নিয়ে ওপারে, আপনাকে যেতে হবে আমার সঙ্গে। আপনার প্রতি প্রেসিডেন্টের এই আদেশ। ওই ধুতি এনে রেখেচি, প’রে নিয়ে চলুন।

কোথায় যেতে হবে?

মজুরদের লাইনের ঘরে। অর্থাৎ, বড় বড় কারখানার ক্রোড়পতি মালিকেরা ওয়ার্কমেনদের জন্যে লাইনবন্দী যে-সব নরককুণ্ড তৈরি করে দিয়েছে সেইখানে। আজ রবিবারে ছুটির দিনেই সেখানে কাজ।

অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু সেখানে কেন?

ভারতী উওর দিল, নইলে, পথের-দাবীর সত্যিকারের কাজ কি এই ঘরে হতে পারে? একটু হাসিয়া কহিল, আপনি এ সভার মাতব্বর সভ্য, সরজমিনে না গেলে ত কাজের ধারা বুঝতে পারবেন না, অপূর্ববাবু।

চলুন, বলিয়া অপূর্ব আফিসের পোশাক ছাড়িয়া মিনিট-পাঁচেকের মধ্যে প্রস্তুত হইয়া লইল।

ভারতী আলমারি খুলিয়া কি একটা বস্তু লুকাইয়া তাহার জামার পকেটে রাখিতে অপূর্ব দেখিতে পাইয়া কহিল, ওটা আপনি কি নিলেন?

গাদা পিস্তল।

পিস্তল? পিস্তল কেন?

আত্মরক্ষার জন্যে।

ওর পাস আছে?

না।

অপূর্ব বলিল, পুলিশে যদি ধরে ত আত্মরক্ষা দু'জনেরই হবে। ক'বছর দেয়?

দেবে না,—চলুন!

অপূর্ব নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, দুর্গা—শ্রীহরি। চলুন।

বড় রাস্তা ধরিয়া উত্তরে বর্মা ও চীনাপল্লী পার হইয়া বাজারের পাশ দিয়া দু'জনে প্রায় মাইল-খানেক পথ হাঁটিয়া একটা প্রকাণ্ড কারখানার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং বন্ধ-ফটকের কাটা-দরজার ফাঁক দিয়া গলির ভিতরে প্রবেশ করিল। ডানদিকে সারি সারি করোগেট লোহার গুদাম ও তাহারই ও-ধারে

কারিগর ও মজুরদিগের বাস করিবার ভাঙ্গা কাঠ ও ভাঙ্গা টিনের লম্বা লাইনবন্দী বস্তি। সুমুখ দিকে সারি সারি কয়েকটা জলের কল, এবং পিছন দিকে এমনি সারি সারি টিনের পায়খানা। গোড়াতে হয়ত দরজা ছিল, এখন থলে ও চট-ছেঁড়া ঝুলিতেছে। ইহাই ভারতবর্ষীয় কুলী-লাইন। পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, বর্মা, বাঙ্গালী, উড়ে, হিন্দু, মুসলমান, স্ত্রী ও পুরুষে প্রায় হাজার-খানেক জীব এই ব্যবস্থাকে আশ্রয় করিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া চলিয়াছে।

ভারতী কহিল, আজ কাজের দিন নয়, নইলে এই জলের কলেই দু-একটা রক্তারক্তি কাণ্ড দেখতে পেতেন।

অপূর্ব ঘাড় নাড়িয়া বলিল, ছুটির দিনের ভিড় দেখেই তা' অনুভব করতে পারছি।

এই জনতার সম্মুখেই একজন মাদ্রাজী স্ত্রীলোক পর্দা ঠেলিয়া পায়খানায় ঢুকিতেছিল, পর্দার অবস্থা দেখিয়া অপূর্ব লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিয়া বলিল, পথের-দাবী করতে হয় ত আর কোথাও শীঘ্র চলুন, এখানে আমি দাঁড়াতে পারব না।

ভারতী নিজেও তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল, কিন্তু প্রত্যুত্তরে শুধু একটুখানি হাসিল। অর্থাৎ মানুষের ধাপ হইতে নামাইয়া যাহাদের পশু করিয়া তোলা হইয়াছে তাহাদের আবার এ-সকল বালাই কেন?

কয়েকখানা ঘর পরে উভয়ে আসিয়া একজন বাঙালী মিস্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করিল। লোকটার বয়স হইয়াছে, কারখানায় পিতল ঢালাইয়ের কাজ করে, মদ খাইয়া কাঠের মেঝের উপর পড়িয়া অত্যন্ত মুখ খারাপ করিয়া কাহাকে গালি পাড়িতেছিল, ভারতী ডাকিয়া কহিল, মানিক, কার ওপরে রাগ করচ? সুশীল কৈ? সে আজ দু'দিন পড়তে যায় না কেন?

মানিক কোনমতে হাতে-পায়ে ভর দিয়া উঠিয়া বসিল, চোখ চাহিয়া চিনিত পারিয়া বলিল, দিদিমণি! এস, বসো। সুশী কি করে তোমার ইস্কুলে যাবে বল?

রাঁধাবাড়া বাসনমাজা মায় ছেলেটাকে সামলানো পর্যন্ত—বুক ফেটে যাচ্চে দিদিমণি, যোদো শালাকে আমি খুন না করি ত আমি কৈবর্ত থেকে খারিজ! বড়সাহেবকে এমনি দরখাস্ত দেব যে শালার চাকরি খেয়ে দেব।

ভারতী সহাস্যে কহিল, তা দিয়ো। আর বল ত না হয়, সুমিত্রাদিদিকে দিয়ে আমিই তোমার দরখাস্ত লিখে দেব। কিন্তু কাল আমাদের ফয়ার মাঠে মিটিং, তা মনে আছে ত?

এমন সময় বছর দশ-এগারোর একটি মেয়ে আসিয়া প্রবেশ করিল। সে অঞ্চলের ভিতর হইতে এক বোতল মদ বাহির করিয়া সাবধানে মেঝের উপর রাখিয়া কহিল, বাবা, ঘোড়া মার্কা মদ আর নেই, তাই টুপি মার্কা মদ নিয়ে এলুম। চারটে পয়সা বাকী রইল। দেখ বাবা, রাম আইয়া মাতাল হয়ে আমাকে কি বলছিল জানো?

প্রত্যুত্তরে তাহার পিতা রামিয়ার উদ্দেশে একটা কদর্য ভাষা উচ্চারণ করিল। ভারতী কহিল, ও-সব জায়গায় তুমি আর যেয়ো না। তোমার মা কোথায় সুশীলা?

মা? মা ত পরশু রাত্তিরে যদুকাকার সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে লাইনের বাইরে ঘরভাড়া করেচে। মেয়েটা আরও কি বলিতেছিল, কিন্তু বাপ গর্জন করিয়া উঠিল,—করাচ্চি! এ বাবা বিয়ে-করা পরিবার, বেউশ্যে নয়! এই বলিয়া সে অনিশ্চিত কম্পিতহস্তে স্ক্রুর অভাবে ভাঙ্গা খুন্তির ডগা দিয়া নূতন বোতলের ছিপি খুলিতে প্রবৃত্ত হইল।

ভারতী হঠাৎ তাহার অঞ্চলপ্রান্তে একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিয়া পিছন ফিরিয়া দেখিল, অপূর্বর মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হইয়া গেছে। কখনো সে ভারতীকে স্পর্শ করে নাই, কিন্তু এখন সে জ্ঞানই তাহার ছিল না। কহিল, চলুন এখান থেকে।

একটু দাঁড়ান।

না, এক মিনিট না। এই বলিয়া সে একপ্রকার জোর করিয়া তাহাকে বাহিরে আনিল। ঘরের ভিতরে মানিক ছিপি বোতল ও খুন্তির বাঁট লইয়া বীরদর্পে গর্জাইতে লাগিল যে, খুন করিয়া ফাঁসি যাইতে হয় সে ভি আচ্ছা। সে দেশো গুণ্ডার ছেলে, সে জেল বা ফাঁসি কোনটাকেই ভয় করে না।

বাহিরে আসিয়া অপূর্ব যেন অগ্নিকাণ্ডের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল,—হারামজাদা, নচ্ছার, পাজী মাতাল! যেন পিশাচের নরককুণ্ড বানিয়ে রেখেচে। এখানে পা দিতে আপনার ঘৃণা বোধ হল না?

ভারতী তাহার মুখের পানে চাহিয়া আস্তে আস্তে বলিল, না। তার কারণ এ নরককুণ্ড ত এরা বানায় নি। এরা শুধু তার প্রায়শ্চিত্ত করচে।

অপূর্ব কহিল, না এরা বানায় নি আমি বানিয়েচি। মেয়েটার কথা শুনলেন! ওর মা যেন কোন্ তীর্থযাত্রা করেছে! নির্লজ্জ বেহায়া শয়তান! আর কখ্খনো যদি এখানে আসবেন ত টের পাবেন বলে দিচ্চি।

ভারতী একটুখানি হাসিয়া কহিল, আমি ম্লেচ্ছ ক্রীশ্চান, আমার এখানে আসতে দোষ কি?

অপূর্ব রাগ করিয়া বলিল, দোষ নেই? ক্রীশ্চানের জন্যে কি সৎ-অসৎ বস্তু নেই, নিজেদের সমাজের কাছে তাদের জবাবদিহি করতে হয় না?

ভারতী উত্তর দিল, কে আছে আমার যে জবাবদিহি করবো? কার মাথাব্যথা পড়েচে আমার জন্যে, আপনিই বলুন?

অপূর্ব সহসা কোন প্রত্যুত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া শুধু বলিল, এ-সব আপনার চালাকি। আপনি ঘরে ফিরে চলুন।

আমাকে আরও পাঁচ জায়গায় যেতে হবে। আপনার ভাল না লাগে আপনি ফিরে যান।

ফিরে যান বললেই কি আপনাকে এখানে রেখে আমি যেতে পারি?

তাহলে সঙ্গে থাকুন। মানুষের প্রতি মানুষে কত অত্যাচার করচে চোখ মেলে দেখতে শিখুন। কেবল ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে, নিজে সাধু হয়ে থেকে ভেবেচেন পুণ্য সঞ্চয় করে একদিন স্বর্গে যাবেন? মনেও করবেন না। বলিতে বলিতে ভারতীর মুখের চেহারা কঠোর এবং গলার স্বর তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল। এই মূর্তি ও কণ্ঠে অপূর্বর অত্যন্ত পরিচিত। ভারতী কহিল, ওই মেয়েটার মা এবং যদু যে অপরাধ করেছে সে শুধু ওদের দণ্ড দিয়েই শেষ হবে? আপনি তার কেউ নয়? কখখনো না! ডাক্তারবাবুকে না-জানা পর্যন্ত আমিও ঠিক এমনি করেই ভেবে এসেচি। কিন্তু আজ আমি নিশ্চয় জানি, এই নরককুণ্ডে যত পাপ জমা হবে তার ভার আপনাকে পর্যন্ত স্বর্গের দোর থেকে টেনে এনে এই নরককুণ্ডে ডোবাবে। সাধ্য কি আপনার এই দুষ্কৃতির ঋণশোধ না করে পরিত্রাণ পান! আমরা নিজের গরজেই আসি অপূর্ববাবু, এই উপলব্ধিই আমাদের পথের-দাবীর সবচেয়ে বড় সাধনা। চলুন।

অপূর্ব নিরীহ ও নিঃস্পৃহের ন্যায় কহিল, চলুন। ভারতীর কথা কিন্তু সে বুঝিতেও পারিল না, বিশ্বাসও করিল না।

কিছু দূরে একটা সেগুন গাছ ছিল, ভারতী আঙুল দিয়া দেখাইয়া কহিল, ওই সামনে ক' ঘর বাঙালী থাকে,—চলুন।

অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, বাঙালী ভিন্ন অপর জাতের মধ্যে আপনারা কাজ করেন না?

ভারতী বলিল, করি। সকলকেই আমাদের প্রয়োজন, কিন্তু প্রেসিডেন্ট ছাড়া আর ত কেউ সকলের ভাষা জানে না, তিনি সুস্থ থাকলে এ কাজ তাঁরই, আমার নয়।

তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত ভাষা জানেন?

জানেন।

আর ডাক্তারবাবু?

ভারতী হাসিয়া বলিল, ডাক্তারবাবুর সম্বন্ধে আপনার ভারী কৌতূহল। এ কথা আপনি বিশ্বাস করতে পারেন না কেন যে, পৃথিবীতে যা-কিছু জানা যায় তিনি জানেন, যা-কিছু পারা যায় তিনি পারেন। কে তাঁর সব্যসাচী নাম রেখেছিল আমরা কেউ জানিনে, কিন্তু তাঁর অসাধ্য তাঁর অজ্ঞাত সংসারে কিচ্ছু নেই। এই বলিয়া সে নিজের মনে চলিতেই লাগিল, কিন্তু তাহারই পিছনে সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া অপূর্বর মুখ দিয়া গভীর নিঃশ্বাস পড়িল। অকস্মাৎ এই কথাটা তাহার বুকের মধ্যে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল যে, এই হতভাগ্য পরাধীন দেশে এতবড় একটা প্রাণের কোন মূল্য নাই, যে-কোন লোকের হাতে যে-কোন মুহূর্তে তাহা কুকুর-শিয়ালের মতই বিনষ্ট হইতে পারে! সমস্ত জগৎবিধানে এতবড় নিষ্ঠুর অবিচার আর কি আছে? ভগবান মঙ্গলময় এই যদি সত্য, এ তবে কাহার ও কোন্ পাপের দণ্ড?

উভয়ে একটা ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। ভারতী ডাকিল, পাঁচকড়ি কেমন আছ আজ?

অন্ধকার কোণ হইতে সাড়া আসিল, আজ একটু ভাল। এই বলিয়া একজন বুড়াগোছের লোক ডান হাতটা উঁচু করিয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার আগাগোড়া কি কতকগুলা প্রলেপ দেওয়া, কহিল, মা, মেয়েটা রক্ত-আমাশায় বোধ হয় বাঁচবে না, ছেলেটার আবার কাল থেকে বেহুঁশ জ্বর, এমন একটা পয়সা নেই যে এক ফোঁটা ওষুধ কিনে দি, কি এক বাটি সাগু-বার্লি রেঁধে খাওয়াই। তাহার দুই চোখ ছলছল করিয়া আসিল।

অপূর্বর মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হইয়া গেল, পয়সা নেই কেন?

এই অপরিচিত বাবুটিকে লোকটা কয়েক মুহূর্ত নীরবে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, পুলির শেকল পড়ে ডান হাতটাই জখম হয়ে গেছে, মাস-খানেক ধরে কাজে বার হতে পারিনি, পয়সা থাকবে কি করে বাবুমশায়?

অপূর্ব প্রশ্ন করিল, কারখানার ম্যানেজার এর ব্যবস্থা করেন না?

পাঁচকড়ি কপালে একবার বাম হাতটা স্পর্শ করিয়া কহিল, হায়! হায়! দিনমজুরদের আবার ব্যবস্থা! এতেই বলচে কাজ করতে না পার ত ঘর ছেরে দাও, আবার যখন ভাল হবে তখন এসো,—কাজ দেবো। এ অবস্থায় কোথায় যাই বলুন ত মশায়? ছোটসাহেবের হাতে-পায়ে ধরে বড়জোর আর হপ্তাখানেক থাকতে পাবো। বিশ বচ্ছর কাজ করছি মশায়, এরা এমনি নেমকহারাম!

কথা শুনিয়া অপূর্ব রাগে জ্বলিতে লাগিল। তাহার এমনি ইচ্ছা করিতে লাগিল ম্যানেজার লোকটাকে পায় ত কান ধরিয়া টানিয়া আনিয়া দেখায়, সুদিনে যাহারা লক্ষ লক্ষ টাকা-উপার্জন করিয়া দিয়াছে আজ দুর্দিনে তাহারা কি দুঃখই ভোগ করিতেছে! অপূর্বদের বাটীর কাছে গরুর গাড়ির আড্ডা, তাহার মনে পড়িল, এক জোড়া গরু সমস্ত জীবন ধরিয়া বোঝা টানিয়া অবশেষে বৃদ্ধ ও অক্ষম হইয়া পড়িলে লোকটা তাহাদের কসাইখানায় বিক্রি করিয়া দিয়াছিল। এই হৃদয়হীনতা নিবারণ করিবার উপায় নাই, লোকে করে না, কেহ করিতে চাহিলে সবাই তাকে পাগল বলিয়া উড়াইয়া দেয়। সেই পথ দিয়া যখনই সে গিয়াছে, তখনই এই কথা মনে করিয়া তাহার চোখে জল আসিয়াছে। গরুর জন্য নয়, কিন্তু অর্থের পিপাসায় এই বর্বর নিষ্ঠুরতায় মানুষ আপনাকে আপনি কত ছোটই না প্রতিদিন করিয়া আনিতেছে! সহসা ভারতীর কথাটা স্মরণ করিয়া সে মনে মনে কহিল, ঠিক কথাই ত! কে কোথায় করিতেছে আমি ত করি না, অথবা, এমনিই ত হয়, এই ত চিরদিন হইয়া আসিতেছে—এই বলিয়াই ত এতবড় ত্রুটির জবাবদিহি হয় না! গরু-ঘোড়া শুধু উপলক্ষ্য। এই হাত-ভাঙ্গা পাঁচকড়িটাও তাই। আপনাকে যে বাঁচাইতে পারে না তাহার হত্যায়, যে দুর্বল তাহার পীড়নে, যে নিরুপায় তাহার লজ্জাহীন বঞ্চনায় এই যে মানুষে আপনার হৃদয়বৃত্তির জীবন হরণ করিতেছে, সবলের এই যে আত্মহত্যার অহোরাত্রব্যাপী উৎসব চলিয়াছে, ইহার বাতি নিভিবে কবে? এই সর্বনাশা উন্মত্ততার পরিসমাপ্তি ঘটিবে কোন্ পথ দিয়া? মরণের আগে কি আর তাহার চেতনা ফিরিবে না!

ঘরের একধারে মলিন, শতচ্ছিন্ন শয্যায় ছেলেমেয়ে-দুটি মৃতকল্পের ন্যায় পড়িয়া ছিল, ভারতী কাছে গিয়া তাহাদের গায়ে হাত দিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। অপূর্ব ভয়ে সেখানে যাইতে পারিল না, কিন্তু দরিদ্র, পীড়িত শিশু-দুটির নিঃশব্দ বেদনা তাহার বুকের মধ্যে যেন মুগুরের ঘা মারিতে লাগিল। সে সেইখানে দাঁড়াইয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে আপনাকে আপনি বলিতে লাগিল, লোকে বলে, এই ত দুনিয়া! এমনি ভাবেই ত সংসারের সকল কাজ চিরদিন হইয়া আসিয়াছে! কিন্তু এই কি যুক্তি! পৃথিবী কি শুধু অতীতেরই জন্য! মানুষ কি কেবল তাহার পুরাতন সংস্কার লইয়া অচল হইয়া থাকিবে! নূতন কিছু কি সে কল্পনা করিবে না! উন্নতি করা কি তাহার শেষ হইয়া গেছে! যাহা বিগত যাহা মৃত কেবল তাহারই ইচ্ছা, তাহারই বিধান মানুষের সকল ভবিষ্যৎ, সকল জীবন, সকল বড় হওয়ার দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া চিরকাল ধরিয়া প্রভুত্ব করিতে থাকিবে!

চলুন।

অপূর্ব চমকিয়া দেখিল, ভারতী। পাঁচকড়ি নীরবে, ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে উদ্দেশ করিয়া ভারতী স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, ভয় নেই তোমার, এরা সেরে উঠবে। কাল সকালেই আমি ডাক্তার, ওষুধ-পথ্য সব পাঠিয়ে দেব—

তাহার কথা শেষ না হইতেই অপূর্ব পকেটে হাত দিয়া টাকা বাহির করিতেছিল, সেই হাত ভারতী হাত বাড়াইয়া চাপিয়া ধরিয়া নিবারণ করিল।

পাঁচকড়ির দৃষ্টি অন্যত্র ছিল, সে ইহা দেখিতে পাইল না, কিন্তু অপূর্বও ইহার হেতু বুঝিল না। ভারতী তখন নিজের জামার পকেট হইতে চার আনার পয়সা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া কহিল, ছেলেদের চার পয়সার মিছরি, চার পয়সার সাগু, আর বাকী দু’ আনার চাল-ডাল এনে তুমি এ বেলার মত খাও পাঁচকড়ি, কাল তোমার ব্যবস্থা করে দেব। আজ আমরা চললাম। এই বলিয়া অপূর্বকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া আসিল।

পথে আসিয়া অপূর্ব ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, আপনি ভারী কৃপণ। আমাকেও দিতে দিলেন না নিজেও দিলেন না।

ভারতী কহিল, দিয়েই ত এলাম।

একে দিয়ে আসা বলে? তার এই দুঃসময়ে পাই-পয়সার হিসেব করে চার আনা মাত্র হাতে দেওয়া ত শুধু অপমান।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কত দিতে যাচ্ছিলেন?

অপূর্ব ঠিক কিছুই করে নাই, খুব সম্ভব হাতে যাহা উঠিত তাই দিত। কিন্তু এখন ভাবিয়া বলিল, অন্ততঃ গোটা-পাঁচেক টাকা।

ভারতী জিভ কাটিয়া কহিল, ওরে বাপ রে! সর্বনাশ করেছিলেন আর কি। বাপ ত মদ খেয়ে সারারাত বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতো, কিন্তু ছেলেমেয়ে-দুটো মরে যেতো।

মদ খেতো!

খেতো না! হাতে টাকা পেলে মদ খায় না এমন অসাধারণ ব্যক্তি সংসারে কে আছে?

অপূর্ব ক্ষণকাল অভিভূতের ন্যায় স্তব্ধভাবে থাকিয়া বলিল, আপনার সব কথায় তামাশা। রুগ্ন সন্তানের চিকিৎসার টাকায় বাপ মদ কিনে খাবে, এ কি কখনো সত্যি হতে পারে?

ভারতী কহিল, সত্যি না হয় ত আপনি যে ঠাকুরের দিব্যি করতে বলবেন,—মা মনসা, ওলা বিবি—হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়াই কিন্তু আপনাকে তৎক্ষণাৎ সংযত করিয়া লইয়া বলিল, নইলে, দাতার হাত চেপে ধরে দুঃখীকে পেতে দেব না, সত্যি বলুন ত আমি কি এতই ছোট!

অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, এদের মা নেই?

না।

কোথায় কোন আত্মীয়ও নেই বোধ করি?

ভারতী বলিল, থাকলেও কাজে লাগবে না। বছর দশ-বারো পূর্বে পাঁচকড়ি একবার দেশে যায়, কোন এক প্রতিবেশীর বিধবা মেয়েকে ভুলিয়ে সাগর পার করে নিয়ে আসে। ছেলে-মেয়ে দুটি তারই; বছর-দুই হল, গলায় দড়ি দিয়ে সে ভবযন্ত্রণা এড়িয়েছে,—এই ত পাঁচকড়িদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

অপূর্ব নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, নরককুণ্ডই বটে!

ভারতী নিতান্ত সহজকণ্ঠে মাথা নাড়িয়া বলিল, তাতে আর লেশমাত্র মতভেদ নেই। কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই যে, এরা সব ভাই-বোন। রক্তের সম্বন্ধ অস্বীকার করেই রেহাই মিলবে না অপূর্ববাবু, উপরে বসে যে ব্যক্তিটি সমস্ত দেখচেন, তিনি কড়ায়-গণ্ডায় এর কৈফিয়ত নিয়ে তবে ছেড়ে দেবেন।

অপূর্ব গম্ভীর হইয়া বলিল, এখন মনে হচ্ছে যেন একেবারে অসম্ভব নয়। ক্ষণকাল পূর্বে এই পাঁচকড়ির ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়াই যে-সকল চিন্তা তাহার মনে হইয়াছিল, বিদ্যুদ্বেগে সেই সমস্তই আর একবার তাহার মনের মধ্যে বহিয়া গেল। বলিল, আমিও যখন মানুষ তখন দায়িত্ব আছে বৈ কি।

ভারতী সায় দিল। বলিল, আগে আগে আমিও দেখতে পেতাম না, রাগ করে ঝগড়া করতাম। এই-সব অজ্ঞান, দুঃখী, দুর্বল-চিত্ত ভাই-বোনের ঘাড়ে অসহ্য পাপের বোঝা কে অহরহ চাপাচ্ছে এখন স্পষ্ট দেখতে পাই অপূর্ববাবু।

পাশের ঘরে একজন উড়িয়া মিস্ত্রী থাকে, তাহার পাশের ঘর হইতে মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ হাসি ও উচ্চ কোলাহল আসিতেছিল, পাঁচকড়ির ঘরের ভিতর হইতেও অপূর্ব তাহা শুনিতে পাইয়াছিল। সেই ঘরে আসিয়া দুজনে উপস্থিত হইল। ভারতী ইহাদের পরিচিত, সকলে সমস্বরে তাহার অভ্যর্থনা করিল। একজন ছুটিয়া গিয়া একটা টুল ও একটা বেতের মোড়া আনিয়া উভয়কে বসিতে দিল। অনাবৃত কাঠের মেঝেতে বসিয়া ছয়-সাতজন পুরুষ ও আট-দশজন স্ত্রীলোক মিলিয়া মদ খাইতেছিল।

একটা ভাঙ্গা হারমোনিয়াম ও একটা বাঁয়া মাঝখানে, নানা রঙের ও নানা আকারের খালি বোতল চতুর্দিকে গড়াইতেছে, একজন বুড়াগোছের স্ত্রীলোক মাতাল হইয়া ঘুমাইতেছে,—তাহাকে বিবস্ত্রা বলিলেই হয়। ষাট হইতে পঁচিশ-ছাব্বিশ পর্যন্ত সকল বয়সের স্ত্রী-পুরুষই বসিয়া গিয়াছে,—আজ রবিবার, পুরুষদের ছুটির দিন। পিঁয়াজ-রশুনের তরকারির সঙ্গে মিশিয়া সস্তা জারমান মদের অবর্ণনীয় গন্ধ অপূর্বর নাকে লাগিতে তাহার গা বমি-বমি করিয়া আসিল। একজন অল্পবয়সী স্ত্রীলোকের হাতে মদের গেলাস ছিল, সে বোধ হয় তখনও পাকা হইয়া উঠে নাই, হয়ত অল্পদিন পূর্বেই গৃহত্যাগ করিয়াছে, সে বাঁ হাতে সজোরে নিজের নাক টিপিয়া ধরিয়া গেলাসটা মুখে ঢালিয়া দিয়া তক্তার ফাঁক দিয়া অপর্যাপ্ত থুথু ফেলিতে লাগিল। একজন পুরুষ তাড়াতাড়ি তাহার মুখে খানিকটা তরকারি গুঁজিয়া দিল। বাঙালী মেয়েমানুষকে চোখের সুমুখে মদ খাইতে দেখিয়া অপূর্ব যেন একেবারে শীর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু সে আড়চোখে চাহিয়া দেখিল, এতবড় ভয়ঙ্কর বীভৎস দৃশ্যেও ভারতীর মুখের উপরে বিকৃতির চিহ্নমাত্র নাই। এ-সব তাহার সহিয়া গেছে। কিন্তু ক্ষণেক পরে গৃহস্বামীর ফরমাসে টুনি যখন গান ধরিল, এই যমুনা সেই যমুনা—এবং পাশের লোকটা হারমোনিয়াম টানিয়া লইয়া খামকা একটা চাবি টিপিয়া ধরিয়া প্রাণপণে বেলো করিতে শুরু করিল, তখন এত ভার ভারতীর বোধ হয় সহিল না। সে ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, মিস্ত্রীমশাই, কাল আমাদের মিটিং—এর কথা বোধ হয় ভোলনি? যাওয়া কিন্তু চাই-ই।

চাই বৈ কি দিদিমণি! এই বলিয়া কালাচাঁদ একপাত্র মদ গলায় ঢালিয়া দিল।

ভারতী কহিল, ছেলেবেলায় পড়েচ ত খড় পাকিয়ে দড়ি করলে হাতি বাঁধা যায়! এক না হলে তোমরা কখনো কিছু করতে পারবে না। কেবল তোমাদের ভালর জন্যেই সুমিত্রাদিদি কি পরিশ্রম করছেন বল ত!

এ কথায় সকলে একবাক্যে সায় দিল। ভারতী বলিতে লাগিল, তোমরা ছাড়া কি এতবড় কারখানা একদিন চলে? তোমরাই ত এর সত্যিকারের মালিক, এ ত সোজা কথা কালাচাঁদ, এ তোমরা না বুঝতে চাইলে হবে কেন?

সবাই বলিল, এ ঠিক কথা। তাহারা না চালাইলে সমস্ত অন্ধকার ।

ভারতী কহিল, অথচ, তোমাদের কত কষ্ট একবার ভেবে দেখ দিকি। যখন-তখন বিনা দোষে সাহেবরা তোমাদের লাথি জুতো মেরে বার করে দেয়। এই পাশের ঘরেই দেখ কাজ করতে গিয়ে পাঁচকড়ি হাত ভেঙ্গেচে বলে আজ সে খেতে পায় না, তার ছেলেমেয়ে-দুটো ওষুধপথ্যির অভাবে মারা যাচ্চে। ঘর থেকে পর্যন্ত বড়সাহেব তাকে দূর করে দিতে চায়! এই যে ক্রোড় ক্রোড় টাকা এরা লাভ করচে সে কাদের দৌলতে? আর তোমরা পাও কতটুকু? এই যে সেদিন শ্যামললালকে ছোটসাহেব ঠেলে ফেলে দিলে, আজও সে হাসপাতালে, এ তোমরা সহ্য করবে কেন? একবার সবাই এক হয়ে দাঁড়িয়ে জোর করে বলতো, এ নির্যাতন আমরা আর সইব না, কেমন তোমাদের গায়ে হাত দিতে সাহস করে দেখি! কেবল একটিবার তোমাদের সত্যিকার জোরটুকু তোমরা চেয়ে দেখতে শেখো,—আর আমরা তোমাদের কাছে কিছুই চাইনে কালাচাঁদ!

একজন মাতাল এতক্ষণ হাঁ করিয়া শুনিতেছিল, সে কহিল, বাবা! পারিনে কি? এমন একটি বল্টু ঢিল করে রেখে দিতে পারি, যে—কড়্ কড়্ কড়াৎ! ব্যস্! অর্ধেক কারখানাই ফরসা!

ভারতী সভয়ে বলিয়া উঠিল, না না, দুলাল, ও-সব কাজ কখখনো করো না! ওতে তোমাদেরই সর্বনাশ। হয়ত, লোক মারা যাবে, হয়ত—না না, এ-সব কথা স্বপ্নেও ভাবতে যেয়ো না দুলাল। ওর চেয়ে ভয়ানক পাপ আর নেই!

লোকটা মাতালের হাসি হাসিয়া বলিল, নাঃ—তা কি আর জানিনে! ও শুধু কথার কথা বলচি আমরা পারিনে কি?

ভারতী বলিতে লাগিল, তোমাদের সৎপথে, সত্যিকার পথে দাঁড়ানো চাই—তাতেই তোমরা সমস্ত পাবে। ওদের কাছে তোমাদের বহু বহু টাকা পাওনা—তাই কেবল কড়ায়গণ্ডায় আদায় করে নিতে হবে।

মেয়ে-পুরুষে এই লইয়া গণ্ডগোল করিতে লাগিল। ভারতী কহিল, সন্ধ্যা হয়, এখনো আর এক জায়গায় যেতে হবে। আমরা তবে এখন আসি, কিন্তু কালকের কথা যেন কিছুতেই না ভুল হয়। এই বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

এই কালাচাঁদের আড্ডার সমস্ত ব্যাপারই অপূর্বর অত্যন্ত বিশ্রী লাগিয়াছিল, কিন্তু শেষের দিকে যে-সব আলোচনা হইল তাহাতে তাহার বিরক্তির অবধি রহিল না। বাহিরে আসিয়াই ভয়ানক রাগ করিয়া কহিল, তুমি এ-সব কথা এদের বলতে গেলে কেন?

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, কি-সব কথা?

অপূর্ব বলিল, ওই ব্যাটা হারামজাদা মাতাল! দুলাল না কি নাম,—কি বললে শুনলে ত? ধর এ কথা যদি সাহেবদের কানে যায়?

কানে যাবে কি করে?

আরে, এরাই বলে দেবে। এরা কি যুধিষ্ঠির নাকি? মদের ঝোঁকে কখন কি কাণ্ড করে বসবে, তখন, তোমার নামেই দোষ হবে। হয়ত বলবে তুমিই শিখিয়ে দিয়েছ।

কিন্তু সে ত মিছে কথা!

অপূর্ব অধীর হইয়া বলিল, মিছে কথা! আরে, ইংরেজ রাজত্বে মিছে কথায় কখনো কারো জেল হয়নি নাকি? রাজত্বটাই ত মিছের ওপর দাঁড়িয়ে।

ভারতী বলিল, আমারও না হয় জেল হবে।

অপূর্ব কহিল, তুমি ত বলে ফেললে, না হয় জেল হবে! না না, এ-সব হবে না। এখানে আসা তোমার আর কখখনো—কখখনো চলবে না।

কিছুদূরে একজনের কাছে প্রয়োজন ছিল, কিন্তু দ্বারে তাহার তালা দেওয়া দেখিয়া উভয়েই সেই পথেই ফিরিল। কালাচাঁদের ঘরের কাছে আসিয়া দেখিল, সেই যমুনা প্রবাহিণীর গান তখন থামিয়াছে, কিন্তু তৎপরিবর্তে মদ-মত্ত তর্ক একেবারে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। একজন স্ত্রীলোক মাতাল হইয়া তাহার স্বামীর শোকে কান্না শুরু করিয়াছে, আর একজন তাহাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিতেছে যে দেশের কথা বলিয়া আর লাভ নাই,—এইখানেই আবার তোর সব হবে, তুই বরঞ্চ মানত করিয়া পূর্ণিমায় পূর্ণিমায় সত্যনারায়ণের কথা দে। অনেকে এই বলিয়া ঝগড়া করিতেছে যে, এই ক্রীশ্চান মেয়েগুলা কারখানায় ধর্মঘট বাধাইয়া দিতে চায়। তাহা হইলে তাহাদের কষ্টের আর সীমা থাকিবে না, উহাদের লাইনের ঘরে আর আসিতে দেওয়া উচিত নয়। কালাচাঁদ মিস্ত্রী বুঝাইয়া বলিতেছে যে সে বোকা ছেলে নয়। ইহাদের দৌড়টাই কেবল সে দেখিতেছে। একজন অতিসাবধানী মেয়েমানুষ পরামর্শ দিল যে, খোকাসাহেবকে এই বেলা সাবধান করিয়া দেওয়া ভাল।

সেখান হইতে ভারতীকে জোর করিয়া দূরে টানিয়া লইয়া গিয়া অপূর্ব তিক্তকণ্ঠে কহিল, আর করবে এদের ভাল? নেমকহারাম! হারামজাদা! পাজী! নচ্ছার! উঃ—পাশের ঘরে দুটো অনাথ ছেলে-মেয়ে মরে, একজন কেউ চেয়ে দেখে না! নরক আর আছে কোথায়?

ভারতী মুখপানে চাহিয়া বলিল, হঠাৎ হ'ল কি আপনার?

অপূর্ব কহিল, আমার কিছুই হয়নি, আমি জানতাম। কিন্তু তুমি শুনলে কি না, তাই বল!

ভারতী বলিল, নূতন কিছুই নয়, এ-রকম ত আমরা রোজ শুনি।

অপূর্ব গর্জিয়া উঠিয়া কহিল, এমনি শয়তানি? এমনি কৃতঘ্নতা? এদের চাও তুমি দলে আনতে— দলবদ্ধ করতে? এদের চাও তুমি ভাল?

ভারতী কণ্ঠস্বরে কোন উত্তেজনা প্রকাশ পাইল না। বরঞ্চ, সে একটুখানি মলিন হাসি হাসিয়া বলিল, এরা কারা অপূর্ববাবু? এরা ত আমরাই। এই ছোট্ট কথাটুকু যখনি ভুলচেন, তখনি আপনার গোল বাধচে। আর ভাল? ভাল-করা বলে যদি সংসারে কোন কথা থাকে, তার যদি কোন অর্থ থাকে সে ত এইখানে। ভাল ত ডাক্তারবাবুর করা যায় না অপূর্ববাবু।

অপূর্ব এ কথার কোন জবাব দিল না।

দুজনে নিঃশব্দে ফটক পার হইয়া আবার সেই বর্মাপাড়ার ভিতর দিয়া বাজারের পথ ঘুরিয়া বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেছে, গৃহস্থের ঘরে আলো জ্বলিয়াছে, পথের দুধারে ছোট ছোট রাত-দোকান বসিয়া বেচাকেনা আরম্ভ হইয়াছে,—ইহারই মধ্যে দিয়া ভারতী মাথার কাপড় কপালের নীচে পর্যন্ত টানিয়া দিয়া নিঃশব্দে দ্রুতবেগে পথ হাঁটিয়া চলিল। অবশেষে লোকালয় শেষ হইয়া যেখানে জলা ও মাঠ শুরু হইল, সেইখানে তেমাথায় আসিয়া সে পিছনে চাহিয়া কহিল, আপনি বাসায় যান ত শহরে যাবার এই ডান দিকের পথ।

অপূর্ব অন্যমনস্ক হইয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি বলেন?

ভারতী বলিল, এতক্ষণে আপনার মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে। যথাযোগ্য সম্বোধনের ভাষা মনে পড়েছে।

তার মানে?

তার মানে রাগের মাথায় এতক্ষণ আপনি-তুমির ভেদাভেদ ছিল না। এখন ফিরে এল।

অপূর্ব অতিশয় লজ্জিত হইয়া স্বীকার করিয়া কহিল, আপনি রাগ করেন নি?

ভারতী হাসিয়া ফেলিল। বলিল, একটু করলেই বা। চলুন।

আবার যাবো?

যাবেন না ত কি অন্ধকার পথে আমি একলা যাবো?

অপূর্ব আর দ্বিরুক্তি করিল না। আজ মনের মধ্যে তাহার অনেক বিষ, অনেক জ্বালা দাউদাউ করিয়া জ্বলিতেছিল। মাতালগুলার কথা সে কোনমতে ভুলিতে পারিতেছিল না। চলিতে চলিতে হঠাৎ কটুকণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, এ-সব হল সুমিত্রার কাজ, আপনার ওখানে মোড়লি করতে যাবার দরকার কি? কে কোথায় কি করে বসবে, আর আপনাকে নিয়ে টানাটানি পড়বে।

ভারতী বলিল, পড়লই বা।

অপূর্ব বলিল, বা রে পড়লই বা! আসল কথা হচ্চে সর্দারি করাই আপনার স্বভাব। কিন্তু আরো ত ঢের জায়গা আছে।

একটা দেখিয়ে দিন না!

আমার বয়ে গেছে।

খানিকটা খুঁড়িয়া রাস্তার এই স্থানটা মেরামত হইতেছিল। যাইবার সময় দিনের বেলা কষ্ট হয় নাই, কিন্তু দুপাশের কৃষ্ণচূড়ার গাছের নীচে ভাঙ্গা পথটা অন্ধকারে একেবারে দুর্গম হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতী হাত বাড়াইয়া অপূর্বর বাঁ হাতটা শক্ত করিয়া ধরিয়া বলিল, স্বভাব ত আমার যাবে না, অপূর্ববাবু, কিছু একটা করাই চাই। কিন্তু আপনার মত আনাড়ীর ওপরে মোড়লি করতে পাই ত আমি আর সমস্ত ছেড়ে দিতে পারি।

আপনার সঙ্গে কথায় পারবার জো নেই। এই বলিয়া সে সাবধানে ঠাহর করিয়া পথ চলিতে লাগিল।

ষোল

পরদিন অপরাহ্নবেলায় সুমিত্রার নেতৃত্বে ফয়ার মাঠে যে সভা আহূত হইল তাহাতে লোকজন বেশী জমিল না, এবং বক্তৃতা দিতে যাঁহারা প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেই আসিয়া জুটিতে পারিলেন না। নানা কারণে সভার কার্য আরম্ভ করিতে বিলম্ব ঘটিল এবং আলোর বন্দোবস্ত না থাকায় সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে হইল। সুমিত্রার নিজের বক্তৃতা ভিন্ন বোধ করি এই সভায় উল্লেখযোগ্য কিছুই হইতে পাইল না, কিন্তু তাই বলিয়া পথের-দাবীর এই প্রথম উদ্যমটিকে ব্যর্থ বলিয়াও অভিহিত করা যায় না। কারণ মুখে মুখে চারিদিকের মজুরদের মধ্যেও যেমন ব্যাপারটা প্রচারিত হইয়া পড়িতে বাকী রহিল না, তেমনি কারখানার কর্তৃপক্ষদের কানেও কথাটা পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। যেমন করিয়া হউক, ইহাই সর্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়িল যে, কে একজন বাঙালী স্ত্রীলোক সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়া অবশেষে বর্মায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহার যেমন রূপ তেমনি শক্তি। তাঁহাকে বাধা দেয় কার সাধ্য! কেমন করিয়া তিনি সাহেবদের কানে ধরিয়া মজুরদের সর্বপ্রকার সুখ-সুবিধা আদায় করিয়া লইবেন, এবং তাহাদের মজুরির হার দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিবেন, নিজের মুখেই সে-সকল কথা তিনি প্রকাশ্যে বিবৃত করিয়াছেন। যাহারা খবর না পাওয়ার জন্য সেদিন উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিজের মুখ হইতে সকল কথা শুনিতে পায় নাই তাহারা আগামী শনিবারে গিয়া যেন মাঠে উপস্থিত হয়।

বিশ-পঁচিশ ক্রোশের মধ্যে যতগুলা কল-কারখানা ছিল, এই সংবাদ দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়িল। সুমিত্রাকে কয়টা লোকেই বা চোখে দেখিয়াছে, কিন্তু তাঁহার রূপ ও শক্তির খ্যাতি অতিরঞ্জিত, এমন কি অমানুষিক হইয়াই যখন লোকের কানে গেল, তখন এই অশিক্ষিত মজুরদের মধ্যে সহসা যেন একটা

সাড়া পড়িয়া গেল। চিরদিন সংসারে অত্যাচারিত, পীড়িত, দুর্বল বলিয়া মানুষের সহজ অধিকার হইতে যাহারা সবলের দ্বারা প্রবঞ্চিত, নিজের উপরে বিশ্বাস করিবার কোন কারণ যাহারা দুনিয়ায় খুঁজিয়া পায় না, দেবতা ও দৈবের প্রতি তাহাদেরই বিশ্বাস সব চেয়ে বেশী। সুমিত্রার সম্বন্ধে জনশ্রুতি তাহাদের কাছে কিছুই অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না,—এটা প্রায় একপ্রকার স্থির হইয়া গেল যে, একটা রোজ কামাই করিয়া শনিবার দিন ফয়ার মাঠে হাজির হইতেই হইবে। তাঁহার কথা ও উপদেশের মধ্যে এমন পরশ-পাথর যদি-বা কিছু থাকে যাহা দিয়া দিনমজুরদের দুঃখের কপাল রাতারাতি একেবারে ভোজবাজির মত সৌভাগ্যের দীপ্তিতে রাঙ্গা হইয়া উঠিবে তা হইলে যেমন করিয়া হউক সে দুর্লভ বস্তু তাহাদের সংগ্রহ করিয়া আনিতেই হইবে।

সেদিন বৈকালের সভায় বক্তার অভাবে অপূর্বর মত আনাড়ীকেও সনির্বন্ধ উপরোধের তাড়নায় বাধ্য হইয়া দুই-চারিটা কথা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিতে হইয়াছিল। বলার অভ্যাস তাহার কোনকালে ছিল না, বলিয়াও ছিল সে অতিশয় বিশ্রী এবং এজন্য মনে মনে সে যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হইয়াই ছিল, কিন্তু আজ হঠাৎ যখন খবর পাইল তাহাদের সেদিনকার বক্তৃতা বৃথা ত হয়ই নাই, বরঞ্চ ফল এতদূরে গড়াইয়াছে যে তাহাদের আগামী সভায় সমস্ত কল-কারখানার কাজ বন্ধ করিয়া কারিকরের দল উপস্থিত হইবার সঙ্কল্প করিয়াছে, তখন শ্লাঘায় ও আত্মপ্রসাদের আনন্দে বুকের মধ্যেটা তাহার ফুলিয়া উঠিল। সেদিন নিজের বক্তব্যকে সে পরিস্ফুট করিতে পারে নাই, কিন্তু তাহার ভয় ভাঙ্গিয়াছিল।

বহুলোকের মাঝখানে উঠিয়া জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলার মধ্যে যে নেশা আছে, সেদিন সে তাহার স্বাদ পাইয়াছিল, আজ আফিসে আসিয়াই সুমিত্রার চিঠির মধ্যে বহুবিধ প্রশংসার সঙ্গে আগামী সভার জন্যও পুনরায় বক্তার নিমন্ত্রণ পাইয়া সে উত্তেজনায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। আফিসের কাজে মন দিতে পারিল না, এবং কি করিয়া আরও বিশদ, আরও সতেজ ও আরও সুন্দর করিয়া বলা

যায় তখন হইতে মনে মনে তাহার ইহারই মহলা চলিতে লাগিল। দুপুরবেলা টিফিন খাইতে বসিয়া আজ সে হঠাৎ রামদাসের কাছে এই কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিল। একদিন তাহারই জন্য সে ভারতীকে অপমান করিয়াছিল, সেই অবধি তাহার লেশমাত্র সংস্রবের কথাও এই লোকটির কাছে বলিতে অপূর্বর অত্যন্ত লজ্জা করিত। আদালতে সেই জরিমানার দিন হইতে গণনার হিসাবে কত দিনই বা গত হইয়াছে! ইহার মধ্যে সেই দুর্দান্ত বর্বর সাহেবটা মরিয়াছে, তাহার বাঙালী স্ত্রী মরিয়াছে এবং তাহাদের সেই শয়তান ক্রীশ্চান মেয়েটাও ঘর ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেছে—এইটুকুই শুধু রামদাস জানিত। কিন্তু এই অবসরটুকুর মধ্যেই যে সেই ঘরছাড়া মেয়েটির সহিত নিঃশব্দ গোপনে তাহার বন্ধুর জীবনে কতবড় কাব্য ও কতবড় দুঃখের ইতিহাস দুঃসহ দ্রুতবেগে রচিত হইয়া উঠিতেছিল সে তাহার কোন খবরই পায় নাই। আজ পুলকের আতিশয্যে সকল কথাই যখন অপূর্ব ব্যক্ত করিয়া কহিতে লাগিল, তখন রামদাস তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ভারতী, সুমিত্রা, ডাক্তারবাবু, নবতারা, এমন কি সেই মাতালটার পর্যন্ত উল্লেখ করিয়া সে তাহাদের পথের-দাবীর কর্ম ও লক্ষ্য বিবৃত করিয়া সেদিনকার লাইনের ঘরে অভিযানের বিবরণ যখন একটি একটি করিয়া দিতে লাগিল তখন পর্যন্তও রামদাস একটা প্রশ্ন করিল না। একদিন দেশের জন্য এই লোকটি জেল খাটিয়াছে, বেত খাইয়াছে, হয়ত আরও কত-কি নির্যাতন ভোগ করিয়াছে, কেবল একটি দিন ছাড়া যাহার কোন বিবরণ কোনদিন সে রামদাসের কাছে শুনিতে পাই নাই, তথাপি তাহাকেই কল্পনায় বাড়াইয়া লইয়া অপূর্ব আফিসের মধ্যে বড় হইয়াও আপনাকে সর্বদাই ছোট না ভাবিয়া পারিত না। ক্ষুদ্রতা তাহার ছিল না, রামদাস তাহার বন্ধু—বন্ধুর প্রতি তাহার বিদ্বেষ ছিল না, কিন্তু বড় ও ছোটর ভাবটাও সে মন হইতে তাড়াইতে পারিত না। এমনি করিয়াই এই দুটি বন্ধুর ঘনিষ্ঠতার মাঝখানেও ব্যবধানের প্রাচীর গড়িয়া উঠিতেছিল। আজ সুমিত্রার পত্রখানি সে রামদাসের চোখের সম্মুখে রাখিয়া দিয়া নিজেকে পথের-

দাবীর একজন বিশিষ্ট সভ্য, এবং দেশের কাজে নিয়োজিত-প্রাণ বলিয়া আপনাকে ব্যক্ত করিয়া একদণ্ডেই যেন সে বন্ধুর সমকক্ষ হইয়া উঠিল।

চিঠিখানি ইংরাজিতে লিখা, তলওয়ারকর আদ্যোপান্ত বার-দুই তাহা নিঃশব্দে পাঠ করিয়া মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবুজী, এ-সকল কথা আমাকে আপনি একদিনও বলেন নি কেন?

অপূর্ব কহিল, বললেও কি এখন আর আপনি আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারতেন?

তলওয়ারকর বলিল, এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করচেন? আমাকে ত আপনি যোগ দিতে ডাকেন নি।

তাহার কণ্ঠস্বরে একটা অভিমানের সুর অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়াই অপূর্বর কানে বাজিল, সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, তার কারণ আছে রামদাসবাবু। আপনি ত জানেন, এ-সব কাজের কতবড় দায়িত্ব, কতবড় শঙ্কা। আপনি বিবাহ করেছেন, আপনার মেয়ে আছে, স্ত্রী আছেন, আপনি গৃহস্থ,—তাই আপনাকে এই ঝড়ের মধ্যে আর ডাকতে চাইনি।

তলওয়ারকর বিস্মিত হইয়া বলিল, গৃহস্থের কি দেশের সেবার অধিকার নেই? জন্মভূমি কি শুধু আপনাদের, আমাদের নয়?

অপূর্ব লজ্জা পাইয়া কহিল, সে ইঙ্গিত আমি করিনি তলওয়ারকর, আমি শুধু এই কথাই বলেছি যে আপনি বিবাহিত, আপনি গৃহস্থ। অন্যত্র আপনার অনেক দায়িত্ব, তাই এ বিদেশে এতবড় বিপদের মধ্যে যাওয়া বোধ করি আপনার ঠিক নয়।

তলওয়ারকর কহিল, বোধ হয়! তা হতে পারে। কিন্তু বিজিত, পরাধীন দেশের সেবা করার নামই ত বিপদ অপূর্ববাবু। তার যে আর কোন নাম নেই এ কথা আমি চিরদিন জানি। আমাদের হিন্দুর ঘরে বিবাহটা ধর্ম, মাতৃভূমির সেবা

তার চেয়ে বড় ধর্ম। এক ধর্ম আর এক ধর্মাচরণে বাধা দেবে এ যদি আমি একটা দিনও মনে করতাম বাবুজী, আমি কখনো বিবাহ করতাম না।

তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া অপূর্ব আর প্রতিবাদ করিল না, চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু এই যুক্তিকে সে মনে মনে সমর্থন করিল না। একদিন স্বদেশের কাজে এই লোকটি বহু দুঃখ পাইয়াছে, আজও তাহার অন্তরের তেজ একেবারে নিবিয়া যায় নাই, সামান্য প্রসঙ্গেই সহসা তাহা স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, এই কথা মনে করিয়া অপূর্ব শ্রদ্ধায় বিগলিত হইল, কিন্তু তাহার অধিক আর কিছু সে সত্য সত্যই প্রত্যাশা করিল না। আহ্বান করিলেই সে যে স্ত্রী-পুত্রের মায়া কাটাইয়া, তাহাদের প্রতিপালনের পথ কণ্টকাকীর্ণ করিয়া পথের-দাবীর সভ্য হইতে ছুটিয়া যাইবে ইহা সে বিশ্বাসও করিল না, ইচ্ছাও করিল না। স্বদেশ সেবার অধিকারের স্পর্ধা এই কয়দিনেই তাহার এতখানি উঁচু হইয়া গিয়াছিল। সহসা এ প্রসঙ্গ সে বন্ধ করিয়া আগামী সভার হেতু ও উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বন্ধুর কাছে কিন্তু এখন সরলকণ্ঠেই ব্যক্ত করিল যে, সেই একটি দিন ভিন্ন জীবনে কখনো সে বক্তৃতা করে নাই; সুমিত্রার নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিবে না, কিন্তু একের কথা বহুজনকে শুনাইবার মত ভাষা বা অভিজ্ঞতা কোনটাই তাহার আয়ত্ত নয়।

তলওয়ারকর জিজ্ঞাসা করিল, কি করবেন তাহলে?

অপূর্ব বলিল, বক্তৃতা করার মত কেবল একটি দিনই জীবনে আমার কারখানা দেখবার সুযোগ ঘটেছে। তাদের কুলী-মজুরেরা যে অধিকাংশই পশুর জীবন যাপন করে এ আমি অসংশয়ে অনুভব করে এসেছি, কিন্তু কেন, কিসের জন্য তার ত কিছুই জানিনে।

রামদাস হাসিয়া কহিল, তবুও আপনাকে বলতে হবে? নাই-ই বললেন।

অপূর্ব চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা গেল, এতবড় মর্যাদা ত্যাগ করা তাহার পক্ষে কঠিন।

রামদাস নিজেই তখন বলিল, আমি কিন্তু এদের কথা কিছু কিছু জানি।

কেমন করে জানলেন?

বহুদিন এদের মধ্যে ছিলাম অপূর্ববাবু। আমার চাকরির সার্টিফিকেটগুলো একবার চেয়ে দেখলেই দেখতে পাবেন দেশে আমি কলকারখানা, কুলী-মজুর নিয়েই কাল কাটিয়েছি। যদি হুকুম করেন ত অনেক দুঃখের কাহিনীই আপনাকে শোনাতে পারি। বাস্তবিক, এদের না দেখলে যে দেশের সত্যকার ব্যথার জায়গাটাই বাদ পড়ে যায় বাবুজী।

অপূর্ব কহিল, সুমিত্রাও ঠিক এই কথাই বলেন।

রামদাস কহিল, না বলে ত উপায় নেই। এবং জানেন বলেই ত পথের-দাবীর কর্ত্রী তিনি। বাবুজী, আত্মত্যাগের উৎসই ঐখানে। দেশের সেবার বনেদ ওর পরে, ওর নাগাল না পেলে যে আপনার সকল উদ্যম, সকল ইচ্ছা মরুভূমির মত দুদিনে শুকিয়ে উঠবে!

কথাগুলা অপূর্ব এই নূতন শুনিল না, কিন্তু রামদাসের বুকের মধ্যে হইতে যেন তাহারা সশব্দে উঠিয়া আজ তাহার বুকের উপর তীক্ষ্ণ আঘাত করিল। রামদাস আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু অকস্মাৎ পর্দা সরাইয়া সাহেব প্রবেশ করিতে দুজনেই চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সাহেব অপূর্বকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, আমি চললাম। তোমার টেবিলের উপরে একটা চিঠি রেখে এসেচি, কালই তার জবাব দেওয়া প্রয়োজন, এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেলেন। উভয়েই ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সবিস্ময়ে দেখিল বেলা চারিটা বাজিয়া গেছে।

সতর

সাহেব চলিয়া গেলে আজ একটুখানি সকাল-সকাল আফিসের ছুটি দিয়া উভয়ে ফয়ার মাঠের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল। পাঁচটায় মিটিং শুরু হইবার কথা, তাহার আর বিলম্ব নাই। এই দিকটায় গাড়ি মিলে না, সুতরাং একটু দ্রুত না গেলে সময়ে পৌঁছানো যাইবে কিনা সন্দেহ। পথের মধ্যে অপূর্ব কথাবার্তা প্রায় কিছুই বলিল না। তাহার জীবনের আজ একটা বিশেষ দিন। আশঙ্কা ও আনন্দের উত্তেজনায় তাহার মনের মধ্যে ঝড় বহিতেছিল। কারিকর ও কুলী-মজুরদের সম্বন্ধে কতক একখানা পুস্তক হইতে, এবং কতক রামদাসের নিকট সে যোগাড় করিয়া লইয়াছিল, সেই-সমস্ত মনে মনে সাজাইয়া গুছাইয়া অপূর্ব নিঃশব্দে মহলা দিতে দিতে চলিতে লাগিল। ১৮৬৩ সালে বোম্বাইয়ের কোন্‌খানে সর্বপ্রথমে তুলার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তারপরে সেইগুলা বাড়িয়া বাড়িয়া আজ তাহাদের সংখ্যা কত দাঁড়াইয়াছে, তখন কুলী-মজুরদের কিরূপ শোচনীয় অবস্থা ছিল, কিরূপ দিনরাত্রি মেহন্নত করিতে হইত, এবং এই লইয়া কবে বিলাতের তূলার কলের মালিকদের সহিত ভারতবর্ষীয় মালিকদের প্রথম বিবাদের সূত্রপাত হয়, এবং কারখানা-আইন কোন্‌ সনের কোন্‌ তারিখে কি কি বাধা অতিক্রম করিয়া পাস হইয়া এদেশে প্রথম প্রচলিত হয় এবং শর্ত তাহাতে কি ছিল, এবং এখনই বা সেই আইন পরিবর্তিত হইয়া কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তখনকার ও এখনকার বিলাতের ও ভারতবর্ষের মজুরির হারে পার্থক্য কতখানি, ইহাদের সঙ্ঘবদ্ধ করিবার কল্পনা কবে এবং কে উদ্ভাবন করিয়াছিল, তাহার ফল কি দাঁড়াইয়াছে, সে-দেশের ও এ-দেশের শ্রমিকগণের মধ্যে সুনীতি ও দুর্নীতির তুলনামূলক আলোচনা করিলে কি দেখা যায় এবং সংসারে লাভ-ক্ষতির পরিমাণ তাহাতে কোথায় নিদিষ্ট হইয়াছে ইত্যাদি সংগ্রহমালার কোথাও না খেই হারাইয়া

যায় এই ভয়ে সে আপনাকে আপনি বার বার সর্তক করিল। তাহার স্মরণশক্তি তীক্ষ্ণ ছিল, বক্তৃতার মাঝখানে হঠাৎ সে ভুলিয়া যাইবে না, অনেকগুলা একজামিন ভাল করিয়া পাস করার ফলে এ ভরসা তাহার ছিল। সুতরাং মুখ দিয়া তাহার এই-সকল নিরতিশয় সারগর্ভ বাক্যধারা কখনো বা উচ্চ-সপ্তকে, কখনো বা গম্ভীর খাদে, কখনো বা হুঙ্কার-শব্দে গর্জিয়া গর্জিয়া এক সময়ে যখন সমাপ্ত হইবে তখন বিপুল শ্রোতৃমণ্ডলীর করতালি-ধ্বনি হয়ত বা সহজে থামিতেই চাহিবে না। সুমিত্রার প্রসন্ন দৃষ্টি সে স্পষ্ট দেখিতে লাগিল। আর ভারতী! এইটুকু সময়ে এতখানি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সে যে কি করিয়া আয়ত্ত করিল ইহারই আনন্দিত বিস্ময়ে মুখ তাহার সমুজ্জ্বল ও চোখের দৃষ্টি সজল হইয়া একমাত্র তাহারই মুখের পরে নিপতিত হইয়াছে, কল্পনায় প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পাইয়া অপূর্বর শিরার রক্ত সবেগে বহিতে লাগিল। তাহার দ্রুত পদক্ষেপের সমান তালে পা ফেলিয়া চলা তলওয়ারকরের পক্ষে আজ যেন দুরূহ হইয়া পড়িল। তাহারা মাঠে পৌঁছিয়া দেখিল তথায় তিল ধারণের স্থান নাই, লোক জমিয়াছে যে কত তাহার সংখ্যা হয় না। সেদিনকার বক্তা হিসাবে অপূর্বকে যাহারা চিনিতে পারিল তাহারা পথ ছাড়িয়া দিল, যাহারা চিনিত না তাহারাও দেখাদেখি সরিয়া দাঁড়াইল। বিপুল জনতার মাঝখানে মাচা বাঁধা। ডাক্তার আজিও ফিরেন নাই, তাই শুধু তিনি ছাড়া পথের-দাবীর সকল সভ্যই উপনীত। বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া কোনমতে ভিড় ঠেলিয়া অপূর্ব তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

মাচার উপরে একখানা বেঞ্চ তখনও খালি ছিল, চোখের ইঙ্গিতে নির্দেশ করিয়া সুমিত্রা সেইখানে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। মাচার পুরোভাগে দাঁড়াইয়া পাঞ্জাবী একজন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বক্তৃতা দিতেছিল, বোধ করি সে জবাব-পাওয়া মিস্ত্রী কিংবা এমনি কিছু একটা হইবে, অপূর্বদের অভ্যাগমে ক্ষণকালমাত্র বাধা পাইয়া পুনশ্চ দ্বিগুণ তেজে চীৎকার করিতে লাগিল। ভাল বক্তার কাছে জনতা যুক্তিতর্ক চাহে না, যাহা মন্দ তাহা কেন মন্দ এ খবরে তাহাদের আবশ্যক হয়

না, শুধু মন্দ যে কত মন্দ অসংখ্য বিশেষণ যোগে ইহাই শুনিয়া তাহারা চরিতার্থ হইয়া যায়। পাঞ্জাবী মিস্ত্রীর প্রচণ্ড বলার মধ্যে বোধ করি এই গুণটাই পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান থাকায় শ্রোতার দল যে কিরূপ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল তাহাদের মুখ দেখিয়াই তাহা বুঝা যাইতেছিল। অকস্মাৎ কি যেন একটা ভয়ানক বিঘ্ন ঘটিল। মাঠের কোন্ এক প্রান্ত হইতে অগণিত চাপাকণ্ঠে সত্রাস কলরব উঠিল, এবং পরক্ষণেই দেখা গেল বহু লোক ঠেলাঠেলি করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছে। এবং তাহাকেই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া পিষিয়া মাড়াইয়া প্রকাণ্ড বড় বড় ঘোড়ায় চড়িয়া বিশ-পঁচিশ জন গোরা পুলিশ কর্মচারী দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। তাহাদের একহাতে লাগাম এবং অন্য হাতে চাবুক,—কোমরবন্ধে পিস্তল ঝুলিতেছে। তাহাদের কাঁধের লোহার জাল ঝকঝক করিতেছে, এবং রাঙ্গা মুখ ক্রোধে ও অস্তমান সূর্যকিরণে একেবারে সিঁদুরের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে। যে ব্যক্তি বক্তৃতা দিতেছিল তাহার বজ্রকণ্ঠ হঠাৎ কখন নীরব হইল, এবং মঞ্চ হইতে নীচের ভিড়ের মধ্যে চক্ষের পলকে সে যে কি করিয়া কোথায় অদৃশ্য হইল জানা গেল না।

সর্দার গোরা মঞ্চের ধারে ঘেঁষিয়া আসিয়া কর্কশকণ্ঠে কহিল, মিটিং বন্ধ করিতে হইবে।

সুমিত্রা এখনও আরোগ্য লাভ করিতে পারে নাই, তাহার উপবাসক্লিষ্ট মুখের পরে পাণ্ডুর ছায়া পড়িল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

সে কহিল, হুকুম।

কার হুকুম?

গবর্নমেন্টের।

কিসের জন্য?

স্ট্রাইক করার জন্য মজুরদের ক্ষ্যাপাইয়া তোলা নিষেধ।

সুমিত্রা বলিল, বৃথা ক্ষেপিয়ে দিয়ে তামাশা দেখবার আমাদের সময় নেই। ইউরোপ প্রভৃতি দেশের মত এদের দলবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দেওয়াই এই মিটিং-এর উদ্দেশ্য।

সাহেব চমকিয়া কহিল, দলবদ্ধ করা? ফার্মের বিরুদ্ধে? সে ত এদেশে ভয়ানক বে-আইনি। তাতে নিশ্চয় শান্তিভঙ্গ হতে পারে।

সুমিত্রা কহিল, নিশ্চয়, পারে বৈ কি! যে দেশে গবর্নমেন্ট মানেই ইংরাজ ব্যবসায়ী, এবং সমস্ত দেশের রক্ত শোষণের জন্যই যে দেশে এই বিরাট যন্ত্র খাড়া করা—

বক্তব্য তাহার শেষ হইতে পাইল না, গোরার রক্তচক্ষু আগুন হইয়া উঠিল। ধমক দিয়া বলিল, দ্বিতীয়বার এ কথা উচ্চারণ করলে আমি অ্যারেস্ট করতে বাধ্য হব।

সুমিত্রার আচরণে এতটুকু চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইল না, শুধু ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া মুচকিয়া একটু হাসিল। কহিল, সাহেব, আমি অসুস্থ এবং অতিশয় দুর্বল। না হলে শুধু দ্বিতীয়বার কেন, এ কথা একশ'বার চীৎকার করে এই লোকগুলিকে শুনিয়ে দিতাম। কিন্তু আজ আমার শক্তি নেই। এই বলিয়া সে আবার একটু হাসিল।

এই পীড়িত রমণীর সহজ শান্ত হাসিটুকুর কাছে সাহেব মনে মনে বোধ হয় লজ্জা পাইল, অল্রাইট্! আপনাকে সাবধান করে দিলাম। ঘড়ি খুলিয়া কহিল, মিটিং বন্ধ করবার আমার হুকুম আছে, কিন্তু ভেঙ্গে দেবার নেই। দশ মিনিট সময় দিলাম, দু'চার কথায় এদের শান্তভাবে যেতে বলে দিন। আর কখনো যেন এরূপ না হয়।

কিছুদিন হইতে প্রায় উপবাসেই সুমিত্রার দিন কাটিতেছিল। সকলের নিষেধ সত্ত্বেও সে আজ সামান্য একটু জ্বর লইয়াই সভায় উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু এখন শ্রান্তি ও অবসাদ তাহাকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ধরিল। চৌকির পিঠে

মাথা হেলান দিয়া সে অস্ফুটে ডাকিয়া কহিল, অপূর্ববাবু, দশ মিনিট মাত্র সময় আছে,—হয়ত তাও নেই। চীৎকার করে সকলকে জানিয়ে দিন সঙ্ঘবদ্ধ না হলে এদের আর উপায় নেই। কারখানার মালিকেরা আজ আমাদের যে অপমান করলে মানুষ হলে এরা যেন তার শোধ নেয়। বলিতে বলিতে তাহার দুর্বল কণ্ঠ ভাঙ্গিয়া পড়িল, কিন্তু সভানেত্রীর এই আদেশ শুনিয়া অপূর্বর সমস্ত মুখ ফ্যাকাশে হইয়া উঠিল। বিহ্বলনেত্রে সুমিত্রার প্রতি চাহিয়া কহিল, উত্তেজিত করা কি বে-আইনী হবে না?

সুমিত্রা বিস্মিত মৃদুকণ্ঠে বলিল, পিস্তলের জোরে সভা ভেঙ্গে দেওয়াই কি আইনসঙ্গত? বৃথা রক্তপাত আমি চাইনে, কিন্তু এই কথাটা সকল শক্তি দিয়ে আপনি শুনিয়ে দিন আজকের অপমান শ্রমিকেরা যেন কিছুতেই না ভোলে।

পথের-দাবীর অন্য চার-পাঁচজন পুরুষ সভ্য যাহারা মঞ্চের পরে আসীন ছিল, চেহারা দেখিয়াই মনে হয় তাহারা সামান্য এবং তুচ্ছ ব্যক্তি। হয়ত, কারিগর কিংবা এমনি কিছু হইবে। অপূর্ব নূতন হইলেও সমিতির শিক্ষিত এবং বিশিষ্ট সভ্য। এত বড় জনতাকে সম্বোধন করিবার ভার তাই তাহার প্রতি পড়িয়াছে। অপূর্ব শুষ্ককণ্ঠে কহিল, আমি ত হিন্দি ভাল জানিনে।

সুমিত্রা কথা কহিতে পারিতেছিল না, তথাপি কহিল, যা জানেন তাতেই দু'কথা বলে দিন অপূর্ববাবু, সময় নষ্ট করবেন না।

অপূর্ব সকলের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। ভারতী মুখ ফিরাইয়া ছিল, তাহার অভিমত জানা গেল না, কিন্তু জানা গেল সর্দার-গোরার মনের ভাব। তাহার সহিত অত্যন্ত কাছে, অত্যন্ত স্পষ্ট এবং অত্যন্ত কঠিন চোখাচোখি হইল। বলিবার জন্য অপূর্ব উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার ঠোঁট নড়িতে লাগিল, কিন্তু সেই দুটি কম্পিত ওষ্ঠাধর হইতে বাংলা ইংরাজি হিন্দি কোন ভাষাই ব্যক্ত হইল না। কেবল একান্ত পাণ্ডুর মুখের পরে ব্যক্ত যাহা হইল, তাহা আর যাহারই হউক পথের-দাবীর সভ্যদের জন্য নহে।

তলওয়ারকর উঠিয়া দাঁড়াইল। সুমিত্রাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, আমি বাবুজীর বন্ধু। আমি হিন্দি জানি। আদেশ পাই ত ওঁর বক্তব্য আমি চেঁচিয়ে সকলকে শুনিয়ে দিই। ভারতী মুখ ফিরাইয়া চাহিল, সুমিত্রা বিস্মিত তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলিয়া স্থির হইয়া রহিল এবং এই দুটি নারীর উন্নদ্ধ চোখের সম্মুখে লজ্জিত, অভিভূত, বাক্যহীন অপূর্ব স্তব্ধ নতমুখে জড়বস্তুর মত বসিয়া পড়িল।

রামদাস ফিরিয়া দাঁড়াইল। এবং, তাহার দক্ষিণে বামে ও সম্মুখে বিক্ষুব্ধ, ভীত, চঞ্চল জনসমষ্টিকে সম্বোধন করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিল, ভাই সব! আমার অনেক কথা বলবার ছিল, কিন্তু এরা গায়ের জোরে আমাদের মুখ বন্ধ করেছে। এই বলিয়া সে আঙুল দিয়া সুমুখের পুলিশ সওয়ারগণকে দেখাইয়া বলিল, এই ডালকুত্তাদের যারা আমাদের বিরুদ্ধে, তোমাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে, তারা তোমাদেরই কারখানার মালিকেরা। তারা কিছুতেই চায় না যে কেউ তোমাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা তোমাদের জানায়। তোমরা তাদের কল চালাবার, বোঝা বইবার জানোয়ার! অথচ, তোমরাও যে তাদেরি মত মানুষ, তেমনি পেট ভরে খাবার, তেমনি প্রাণ খুলে আনন্দ করবার জন্মগত অধিকার তোমরাও যে ভগবানের কাছ থেকে পেয়েচ, এই সত্যটাই এরা সকল শক্তি, সকল শঠতা দিয়ে তোমাদের কাছ থেকে গোপন রাখতে চায়।

শুধু একবার যদি তোমাদের ঘুম ভাঙ্গে, কেবল একটিবার মাত্র যদি এই সত্য কথাটা বুঝতে পারো যে তোমরাও মানুষ, তোমরা যত দুঃখী, যত দরিদ্র, যত অশিক্ষিতই হও তবুও মানুষ, তোমাদের মানুষের দাবী কোন ওজুহাতে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না, তা হলে, এই গোটাকতক কারখানার মালিক তোমাদের কাছে কতটুকু? এই সত্য কি তোমরা বুঝবে না? এ যে কেবল ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের আত্মরক্ষার লড়াই! এতে দেশ নেই, জাত নেই, ধর্ম নেই, মতবাদ নেই—হিন্দু নেই, মুসলমান নেই,—জৈন, শিখ কোন কিছুই নেই,—আছে শুধু ধনোন্মত্ত মালিক আর তার অশেষ প্রবঞ্চিত অভুক্ত শ্রমিক! তোমাদের গায়ের জোরকে

তারা ভয় করে, তোমাদের শিক্ষার শক্তিকে তারা অত্যন্ত সংশয়ের চোখে দেখে, তোমাদের জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষায় তাদের রক্ত শুকিয়ে যায়! অক্ষম, দুর্বল, মূর্খ, দুর্নীতিপরায়ণ তোমরাই যে তাদের বিলাস-ব্যসনের একমাত্র পাদপীঠ! তাই, মাত্র তোমাদের জীবনধারণটুকুর বেশী তিলার্ধ যে তারা স্বেচ্ছায় কোন দিন দেবে না—এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করা কি তোমাদের এতই কঠিন! আর সেই কথা মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করার অপরাধেই কি আজ এই গোরাগুলোর কাছে আমার লাঞ্ছনাই সার হবে! দরিদ্রের এই বাঁচবার লড়াইয়ে তোমরা কি সকল শক্তি দিয়ে যোগ দিতে পারবে না?

সর্দার-গোরা এদেশে যেটুকু হিন্দি-ভাষা জ্ঞানলাভ করিয়াছিল তাহাতে বক্তৃতার মর্ম প্রায় কিছুই বুঝিল না, কিন্তু সমবেত শ্রোতৃবর্গের মুখে-চোখে উত্তেজনার চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া নিজেও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহার রিস্টওয়াচের প্রতি বক্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিল, আর পাঁচ মিনিট মাত্র সময় আছে, আপনি শেষ করুন।

তলওয়ারকর কহিল, শুধু পাঁচ মিনিট! তার বেশী এক মুহূর্তও নয়! তবুও এই অমূল্য ক'টি মিনিট আমি কিছুতেই ব্যর্থ হতে দেব না। ভাই বঞ্চিতের দল! তোমাদের কাছে আমার মিনতি—আমাদের তোমরা অবিশ্বাস করো না। শিক্ষিত বলে, ভদ্রবংশের বলে, কারখানায় দিনমজুরি করিনে বলে আমাদের সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখে নিজেদের সর্বনাশ তোমরা নিজেরাই করো না। তোমাদের ঘুম ভাঙ্গাবার প্রথম শঙ্খধ্বনি সর্বদেশে সর্বকালে আমরাই করে এসেছি। আজ হয়ত না বুঝতেও পারো, কিন্তু নিশ্চয় জেনো, এই পথের-দাবীর চেয়ে বড় বন্ধু এ-দেশে তোমাদের আর কেউ নেই। তাহার কণ্ঠ শুষ্ক ও কঠিন হইয়া আসিতেছিল, তথাপি প্রাণপণে চিৎকার করিয়া কহিতে লাগিল, আমি বহুদিন তোমাদের মধ্যে কাজ করে এসেছি, আমাদের তোমরা চেনো না, কিন্তু আমি তোমাদের চিনি। যাদের তোমরা মনিব বলে জানো, একদিন আমি তাদেরই একজন ছিলাম,।

তারা কিছুতেই তোমাদের মানুষ হ'তে দেবে না। কেবল পশুর মত করে রেখেই তোমাদের মনুষ্যত্বের অধিকার তারা আটকে রাখতে পারে, আর কোন মতেই না—এই কথাটা আজ তোমাদের না বুঝলেই নয়। তোমরা অসাধু, তোমরা উচ্ছৃঙ্খল, তোমরা ইন্দ্রিয়াসক্ত—তাদের মুখ থেকে এই-সকল অপবাদই তোমরা চিরদিন শুনে এসেছ। তাই, যখনই তোমরা তোমাদের দাবী জানিয়েছ, তখনই তোমাদের সকল দুঃখ-কষ্টের মূলে তোমাদের অসংযত চরিত্রকেই দায়ী করে তারা তোমাদের সর্বপ্রকার উন্নতিকে নিবারিত করে এসেছে,—কেবল এই মিথ্যেই তোমাদের তারা অনুক্ষণ বুঝিয়ে এসেছে,—ভাল না হলে কারও উন্নতিই কোন দিন হতে পারে না। কিন্তু, আজ আমি তোমাদের অসঙ্কোচে এবং একান্ত অকপটে জানাতে চাই ঐ উক্তি তাদের কখনই সম্পূর্ণ সত্য নয়। তোমাদের চরিত্রই শুধু তোমাদের অবস্থার জন্য দায়ী নয়; তোমাদের এই প্রবঞ্চিত হীন অবস্থাও তোমাদের চরিত্রের জন্য দায়ী।

তাদের অসত্যকে আজ তোমাদের নির্ভয়ে প্রতিবাদ করতেই হবে। প্রবলকণ্ঠে তোমাদের ঘোষণা করতেই হবে কেবল টাকাই সবটুকু নয়। বলিতে বলিতে তাহার নীরস কণ্ঠ অত্যন্ত প্রখর হইয়া উঠিল, কহিল, বিনাশ্রমে সংসারে কিছুই উৎপন্ন হয় না—তাই, শ্রমিকও ঠিক তোমাদেরই মত মালিক,—ঠিক তোমাদের মতই সকল বস্তু, সকল কারখানার অধিকারী। এমনি সময়ে কে একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক সর্দার-গোরার কানে কানে কি একটা কথা বলিতেই তাহার রক্তচক্ষু জ্বলন্ত অঙ্গারের মত উগ্র হইয়া উঠিল। সে গর্জন করিয়া বলিল, স্টপ্! এ চলবে না। এতে শান্তি ভঙ্গ হবে।

অপূর্ব চমকিয়া উঠিল। রামদাসের জামার খুঁট ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল,—থামো, রামদাস থামো। এই নিঃসহায় নির্বান্ধব বিদেশে যে তোমার স্ত্রী আছে,—তোমার ছোট্ট একফোঁটা মেয়ে আছে!

রামদাস কর্ণপাতও করিল না। চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিল—এরা অন্যায়কারী! এরা ভীরু! সত্যকে এরা কোনমতেই তোমাদের শুনতে দিতে চায় না! কিন্তু এরা জানে না সত্যকে গলা টিপে মারা যাবে না। সে চিরজীবী! সে অমর! গোরা ইহার অর্থ বুঝিল না। কিন্তু অকস্মাৎ সহস্র লোকের সর্বাঙ্গ হইতে ঠিকরিয়া আসিয়া যেন তীক্ষ্ণ উত্তাপের ঝাঁজ তাহার মুখে লাগিল। সে হুঙ্কার দিয়া উঠিল, এ চলবে না। এ রাজদ্রোহ!

চক্ষের পলকে পাঁচ-ছয়জন ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া রামদাসের দুই হাত ধরিয়া তাহাকে সবলে টানিয়া নীচে নামাইল। তাহার দীর্ঘদেহ ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ারের মাঝখানে এক মুহূর্তে অন্তর্হিত হইল কিন্তু তীক্ষ্ণ তীব্র কণ্ঠস্বর তাহার কিছুতেই চাপা পড়িল না, এই বিক্ষুব্ধ বিপুল জনতার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত হইতে লাগিল,—ভাই সকল, কখনো হয়ত আর আমাকে দেখবে না, কিন্তু মানুষ হয়ে জন্মাবার মর্যাদা যদি না মনিবের পায়ে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে থাকো ত এতবড় উৎপীড়ন, এতবড় অপমান তোমরা সহ্য করো না!

কিন্তু কথা তাহার শেষ না হইতেই যেন দক্ষযজ্ঞ বাধিয়া গেল।ঘোড়া ছুটিল, চাবুক চলিল, এবং অবমানিত অভিভূত উত্রস্ত শ্রমিকের দল ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিতে কে যে কাহার ঘাড়ে পড়িল এবং কে যে কাহার পদতলে গড়াইতে লাগিল তাহার ঠিকানা রহিল না।

জন-কয়েক দলিত পিষ্ট আহত লোক ছাড়া সমস্ত মাঠ জনশূন্য হইতে বিলম্ব ঘটিল না। কোনমতে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে যাহারা তখনও চলিয়াছিল তাহাদেরই প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া সুমিত্রা স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, এবং তাহারই অনতিদূরে বসিয়া অপূর্ব ও আর একজন নির্বাক নতমুখে তেমনি বিমূঢ়ের ন্যায় স্থির হইয়া রহিল।

যে ব্যক্তি গাড়ি ডাকিতে গিয়াছিল, মিনিট-দশেক পরে গাড়ি লইয়া আসিলে সুমিত্রা নিঃশব্দে ভারতীর হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে গিয়া তাহাতে উপবেশন করিলেন। নিজে হইতে কথা না কহিলে তাঁহার চিন্তার ব্যাঘাত করিতে কেহ তাঁহাকে ব্যর্থ প্রশ্ন করিত না। বিশেষতঃ, আজ তিনি অসুস্থ, শ্রান্ত ও উৎপীড়িত। ভারতী ফিরিয়া আসিয়া কহিল, চলুন।

অপূর্ব মুখ তুলিয়া চাহিল, ক্ষণকাল কি যেন চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় আমাকে যেতে বলেন?

ভারতী কহিল, আমার বাড়িতে।

অপূর্ব কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিল। শেষে আস্তে আস্তে বলিল, আপনারা ত জানেন সমিতির আমি অযোগ্য।ওখানে আর ত আমার ঠাঁই হতে পারে না।

ভারতী প্রশ্ন করিল, তা হলে কোথায় এখন যাবেন? বাসায়?

বাসায়? একবার যেতে হবে,—এই বলিয়াই অপূর্বর চক্ষু সজল হইয়া আসিল; তাহা কোনমতে সংবরণ করিয়া বলিল, কিন্তু এই বিদেশে আর একটা জায়গায় যে কি করে যাব আমি ভেবে পাইনে ভারতী!

সুমিত্রা গাড়ির মধ্যে হইতে ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিয়া কহিলেন, তোমরা এস।

ভারতী পুনশ্চ কহিল, চলুন।

অপূর্ব ঘাড় নাড়িয়া বলিল, পথের-দাবীতে আর আমার স্থান নেই।

ভারতী হঠাৎ যেন তাহার হাত ধরিতে গেল, কিন্তু সামলাইয়া লইয়া একমুহূর্ত তাহার মুখের পরে দুই চক্ষের সমগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চুপি চুপি কহিল, পথের-দাবীতে স্থান নাও থাকতে পারে, কিন্তু আর একটা দাবী থেকে আপনাকে স্থানচ্যুত করতে পারে সংসারে এমন ত কিছুই নেই, অপূর্ববাবু!

গাড়ি হইতে সুমিত্রা পুনশ্চ অসহিষ্ণুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তোমাদের আসতে কি দেরি হবে ভারতী?

ভারতী হাত নাড়িয়া গাড়োয়ানকে যাইতে ইঙ্গিত করিয়া দিয়া কহিল, আপনি যান, এটুকু আমরা হেঁটেই যাবো।

পথে চলিতে চলিতে অপূর্ব হঠাৎ বলিয়া উঠিল, তুমি আমার সঙ্গে চল ভারতী!

ভারতী কহিল, সঙ্গেই ত যাচ্ছি।

অপূর্ব বলিল, সে নয়। তলওয়ারকরের স্ত্রীর কাছে আমি কি করে যাবো, কি গিয়ে তাঁকে বলব, কি তাঁর উপায় করব আমি ত কোন মতেই ভেবে পাইনে। রামদাসকে এখানে সঙ্গে করে আনবার দুর্বুদ্ধি আমার কেন হল?

ভারতী চুপ করিয়া রহিল। অপূর্ব কহিতে লাগিল, এই বিদেশে হঠাৎ কি সর্বনাশই হয়ে গেল! আমি ত কূলকিনারা দেখতে পাইনে।

ভারতী কোন মন্তব্যই প্রকাশ করিল না। উভয়ে কিছুক্ষণ নীরবে পথ চলিবার পরে অপূর্ব উপায়হীন দুশ্চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া সহসা গর্জিয়া উঠিল, আমার দোষ কি? বারবার সাবধান করে দিলেও কেউ যদি গলায় দড়ি দিয়ে ঝোলে তাকে বাঁচাবো আমি কি করে? আমি কি বলেছিলাম যা-তা বক্তৃতা দিতে! স্ত্রী আছে, মেয়ে আছে, ঘর-সংসার আছে এ হুঁশ যার নেই—সে মরবে না তো মরবে কে? খাটুক আবার দু'বছর জেল!

ভারতী বলিল, আপনি কি তাঁর স্ত্রীর কাছে এখন যাবেন না?

অপূর্ব তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, যেতে হবে বৈ কি! কিন্তু, সাহেবকেই বা কাল কি জবাব দেব? তোমাকে কিন্তু বলে রাখছি ভারতী, সাহেব একটা কথা বললেই আমি চাকরি ছেড়ে দেব।

দিয়ে কি করবেন?

বাড়ি চলে যাবো। এদেশে মানুষ থাকে?

ভারতী বলিল, তাঁর উদ্ধারের চেষ্টাও করবেন না?

অপূর্ব থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, চল না একজন ভাল ব্যারিস্টারের কাছে যাই ভারতী। আমার প্রায় এক হাজার টাকা আছে,—এতে হবে না? আমার ঘড়িটড়িগুলো বিক্রি করলে হয়ত, আরও পাঁচ-ছ'শ টাকা হবে। চল না যাই।

ভারতী বলিল, কিন্তু তাঁর স্ত্রীর কাছে যাওয়া যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন অপূর্ববাবু! আমার সঙ্গে আর যাবেন না, এইখান থেকেই একটা গাড়ি নিয়ে স্টেশনে চলে যান। তাঁর কি চাই, কি অভাব, অন্ততঃ একটা খবর দেওয়াও যে বড় দরকার।

অপূর্ব ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল, কিন্তু তথাপি সঙ্গে সঙ্গেই চলিতে লাগিল। ভারতী বলিল, এটুকু আমি একাই যেতে পারবো, আপনি ফিরুন।

জবাব দিতে বোধ হয় অপূর্বর বাধিতেছিল, কিন্তু ক্ষণেকমাত্র। তাহার পরেই কহিল, আমি একলা যেতে পারব না।

ভারতী বলিল, বাসা থেকে তেওয়ারীকে না হয় সঙ্গে নেবেন।

না, তুমি সঙ্গে চল।

আমার যে জরুরি কাজ আছে!

তা হোক, চল।

কিন্তু কেন আমাকে এত করে জড়াচ্চেন অপূর্ববাবু?

অপূর্ব চুপ করিয়া রহিল।

ভারতী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটুখানি হাসিল, কহিল, আচ্ছা, চলুন আমার সঙ্গে। নিজের কাজটুকু আগে সেরে নিই।

পথের মধ্যে ভারতী সহসা এক সময়ে কহিল, যে আপনাকে চাকরি করতে বিদেশে পাঠিয়েছে সে আপনাকে চেনে না। তিনি মা হলেও, না। তেওয়ারী দেশে যাচ্চে, আমি নিজে গিয়ে উদ্যোগ করে তার সঙ্গে আপনাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেব।

অপূর্ব মৌন হইয়া রহিল। ভারতী বলিল, কৈ, উত্তর দিলেন না যে বড়?

অপূর্ব কহিল, উত্তর দেবার কিছু ত নেই। মা বেঁচে না থাকলে আমি সন্ন্যাসী হতুম।

ভারতী আশ্চর্য হইয়া বলিল, সন্ন্যাসী? কিন্তু মা ত বেঁচে আছেন?

অপূর্ব কহিল, হাঁ। দেশের পল্লীগ্রামে আমাদের একটা ছোট বাড়ি আছে, মাকে আমি সেইখানে নিয়ে যাবো।

তারপরে?

আমার যে এক হাজার টাকা আছে তাই দিয়ে একটা ছোট্ট মুদির দোকান খুলবো। আমাদের দুজনের চলে যাবে।

ভারতী কহিল, তা যেতে পারে। কিন্তু হঠাৎ এর দরকার হ'ল কিসে?

অপূর্ব বলিল, আজ আমি নিজেকে চিনতে পেরেছি। শুধু মা ছাড়া সংসারে আমার দাম নেই। ভগবান করুন এর বেশী যেন না আমি কারো কাছে কিছু চাই।

ভারতী পলকমাত্র তাহার মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মা আপনাকে বুঝি বড্ড ভালবাসেন?

অপূর্ব কহিল, হাঁ। চিরকাল মা'র দুঃখে-দুঃখেই কাটলো, কেবল ভয় হয় তা আর যেন না বাড়ে। আমার সকল কাজেকর্মে আমার আধখানা যেন মা হয়ে আমার আর আধখানাকে দিবারাত্র আঁকড়ে ধরে থাকে। এ থেকে আমি একমুহূর্ত ছাড়া পাইনে, ভারতী, তাই আমি ভীতু, তাই আমি সকলের অশ্রদ্ধার পাত্র। এই বলিয়া তাহার মুখ দিয়া সহসা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল।

ইহার জবাব ভারতী দিল না, কেবল হাতখানি তাহার ধীরে ধীরে অপূর্বর হাতের মধ্যে ধরা দিয়া নীরবে পথ চলিতে লাগিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিতেছিল, অপূর্ব উদ্বিগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, রামদাসের পরিবারের কি উপায় করবে ভারতী? শুধু দাসী ছাড়া এদেশে

তাদের দেশের লোক বোধ করি কেউ নেই। থাকলেই বা কেউ কি তাদের ভার নেবে?

ভারতী নিজেও কিছু ভাবিয়া পায় নাই, শুধু সাহস দিবার জন্যই কহিল, চলুন ত গিয়ে দেখি। উপায় একটা হবেই।

অপূর্ব বুঝিল ইহা ফাঁকা কথা। তাহার মন কোন সান্ত্বনাই মানিল না । কহিল, তোমাকে হয়ত সেখানে থাকতে হবে।

কিন্তু আমি ত ক্রীশ্চান, তাঁদের কি কাজেই বা লাগবো?

তা বটে। কথাটা নূতন করিয়া অপূর্বর বিঁধিল।

উভয়ে বাসায় আসিয়া যখন পৌঁছিল তখন সন্ধ্যা বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গেছে। এই রাত্রে কেমন করিয়া যে কি হইবে চিন্তা করিয়া মনে মনে তাহাদের ভয় ও উদ্বেগের সীমা ছিল না। নীচের ঘর খোলা ছিল, ভিতরে পা দিয়াই ভারতী দেখিতে পাইল ওদিকের খোলা জানালার ধারে ইজিচেয়ারে কে একজন শুইয়া আছে। সে মুখ তুলিয়া চাহিতেই ভারতী চিনিতে পারিয়া উল্লাসে কলরব করিয়া উঠিল, ডাক্তারবাবু, কখন এলেন আপনি? সুমিত্রাদিদির সঙ্গে দেখা হয়েছে?

না।

অপূর্ব কহিল, ভয়ানক কাণ্ড হয়ে গেছে ডাক্তারবাবু, আমাদের একাউন্টেন্ট রামদাস তলওয়ারকরকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে।

ভারতী বলিল, ইন্সিনে তাঁর বাসা। সেখানে স্ত্রী আছে, মেয়ে আছে, তাঁরা এখনো কিছুই জানেন না।

অপূর্ব বলিল, অত দূরে এই অন্ধকার রাতে—কি ভয়ানক বিপদই ঘটলো ডাক্তারবাবু!

ডাক্তার হাই তুলিয়া সোজা হইয়া বসিয়া হাসিলেন, ভারতীকে কহিলেন, আমি বড় শ্রান্ত, আমাকে একটু চা তৈরি করে খাওয়াতে পারো ভাই?

ভারতী বলিল, পারি, কিন্তু আমাদের যে এখুনি বেরোতে হবে ডাক্তারবাবু।

কোথায়?

ইন্সিনে। তলওয়ারকরবাবুর বাসায়।

কোন প্রয়োজন নেই।

অপূর্ব সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, প্রয়োজন নেই কিরকম ডাক্তারবাবু? তাঁর বিপন্ন পরিবারের ব্যবস্থা করা, অন্ততঃ একটা খোঁজখবর নেওয়া ত প্রয়োজন বলেই মনে হয়।

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু সে ভার আমার; আপনারা বড় জোর এই অন্ধকারে সারারাত্রি ধরে ইন্সিনে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে পারবেন,—শেষ পর্যন্ত হয়ত বাড়িটাও চিনে বার করতে পারবেন না।

এই বলিয়া তিনি পুনরায় হাস্য করিয়া কহিলেন, তার চেয়ে বরঞ্চ আপনি বসুন, এবং ভারতী চা তৈরি করে আনুক। কিন্তু আপনার বুঝি চলে না? তা বেশ, হোটেলের বামুনঠাকুর পবিত্রভাবে কিছু খাবার তৈরি করে দিয়ে যাক, আহারাদি করে বিশ্রাম করুন।

ভারতী নিশ্চিন্ত ও প্রফুল্লচিত্তে চা তৈরি করিতে উপরে যাইতেছিল, কিন্তু অপূর্ব কিছুই বিশ্বাস করিল না। ডাক্তারের সমস্ত কথাবার্তাই তাহার কাছে হেঁয়ালির মত ঠেকিয়া অতিশয় খারাপ বোধ হইল। ভারতীকে উদ্দেশ করিয়া ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বলিল, এই রাত্রে কষ্ট করা থেকে তুমি হয়ত বেঁচে গেলে, কিন্তু আমার দায়িত্ব ঢের বেশী। যত রাত্রিই হক আমাকে সেখানে যেতেই হবে।

তাহার মন্তব্য শুনিয়া ভারতী থমকিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু তখনই ডাক্তারের চোখের দিকে চাহিয়া আবার স্বচ্ছন্দমনে কাজে চলিয়া গেল।

ডাক্তারবাবু একখণ্ড মোমবাতি জ্বালাইয়া পকেট হইতে কয়েকখানা চিঠি বাহির করিয়া জবাব লিখিতে বসিলেন। মিনিট-দশেক নীরবে অপেক্ষা করিয়া

অপূর্ব বিরক্ত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, চিঠিগুলো কি অত্যন্ত জরুরী?

ডাক্তার মুখ না তুলিয়াই কহিলেন, হাঁ।

অপূর্ব বলিল, ওদিকের একটা ব্যবস্থা হওয়াও ত কম জরুরী নয়। আপনি কি তাঁর বাসায় কাউকে পাঠাবেন না?

ডাক্তার কহিলেন, এত রাত্রে? কাল সকালের পূর্বে বোধ হয় আর লোক পাওয়া যাবে না।

অপূর্ব বলিল, তাহলে তার জন্য আর আপনি চিন্তিত হবেন না, সকালে আমি নিজেই যেতে পারবো। ভারতীকে নিষেধ না করলে আমরা আজই যেতে পারতাম, এবং আমার মনে হয় সেইটেই সবচেয়ে ভাল হতো।

ডাক্তারের চিঠি লেখায় বাধা পড়িল না, কারণ তিনি মুখ তুলিবারও অবকাশ পাইলেন না, শুধু বলিলেন, আবশ্যক ছিল না।

অপূর্ব অন্তরের উষ্মা যথাসাধ্য চাপিয়া কহিল, আবশ্যকতার ধারণা এ ক্ষেত্রে আপনার এবং আমার এক নয়। আমার সে বন্ধু।

ভারতী চায়ের সরঞ্জাম লইয়া নীচে আসিল এবং পেয়ালা-দুই চা তৈরি করিয়া দিয়া কাছে বসিল। ডাক্তারের চিঠি লেখা এবং চা খাওয়া দুই কাজই একসঙ্গে চলিতে লাগিল। মিনিট দুই-তিন নিঃশব্দে কাটিবার পরে সহসা ভারতী অভিমানের সুরে বলিয়া উঠিল, আপনি সদাই ব্যস্ত। দু'দণ্ড যে আপনার কাছে বসে কথা শুনবো সে সময়টুকুও আমরা পাইনে।

ডাক্তারের অন্যমনস্ক কানের মধ্যে গিয়া রমণীর এই অভিমানের সুর বাজিল, তিনি চায়ের পেয়ালা হইতে মুখ সরাইয়া হাসিমুখে কহিলেন, করি কি ভাই, এই দুটোর ট্রেনেই আবার রওনা হতে হবে।

সংবাদ শুনিয়া ভারতী চকিত হইল, এবং অপূর্ব্বর মনের সংশয় তাহার বন্ধুর সম্বন্ধে একেবারে ঘনীভূত হইয়া উঠিল। ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, একটা রাতও কি আপনি বিশ্রামের অবকাশ পাবেন না ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার চায়ের পেয়ালা নিঃশেষ করিয়া কহিলেন, আমার শুধু একটি দিনের অবসর আছে ভাই ভারতী, সে কিন্তু আজও আসেনি।

ভারতী বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সে কবে আসবে?

ডাক্তার ইহার উত্তর দিলেন না।

অপূর্ব্বর মনের মধ্যে কেবল একটা কথা তোলাপাড়া করিতেছিল, সে তাহারই সূত্র ধরিয়া বলিল, সমিতির সভ্য না হয়েও রামদাস যে শাস্তি ভোগ করতে যাচ্চে তা অসাধারণ।

ডাক্তার কহিলেন, শাস্তি নাও হতে পারে।

অপূর্ব কহিল, না হয় ত সে তার ভাগ্য। কিন্তু যদি হয় সমস্ত অপরাধ আমার। আমিই তাকে এনেছিলাম।

প্রত্যুত্তরে ডাক্তার শুধু মুচকিয়া হাসিয়া চুপ করিলেন।

অপূর্ব কহিতে লাগিল, দেশের জন্য যে ব্যক্তি দু'বছর জেল খেটেচে, অসংখ্য বেতের দাগ যার পিঠ থেকে আজও মোছেনি, এই বিদেশে স্ত্রী-পুত্র যার শুধু তারই মুখ চেয়ে আছে, তার এতবড় সাহস অসামান্য! এর আর তুলনা নেই।

তাহার বন্ধুর প্রতি উচ্ছ্বসিত এই অকৃত্রিম প্রশংসা-বাক্যের মধ্যেও একটা গোপন আঘাত ছিল, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল। ডাক্তার মুখ উজ্জ্বল করিয়া কহিলেন, তাতে আর সন্দেহ কি অপূর্ব্ববাবু! পরাধীনতার আগুনে বুকের মধ্যে যার অহোরাত্র জ্বলে যাচ্চে এ ছাড়া তার ত উপায় নেই! সাহেবের দোকানের বড় চাকরি বা ইন্সিনের বাসায় স্ত্রী-পুত্র-পরিবার কিছুই তাকে ঠেকাতে পারে না,—এই তার একটিমাত্র পথ।

দুশ্চিন্তা ও তীব্র সংশয়ে অপূর্বর বুদ্ধি ও জ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়া না থাকিলে সে এত বড় ভুল করিতে পারিত না। ডাক্তারের উক্তিকে সে শ্লেষ কল্পনা করিয়া হঠাৎ যেন ক্ষেপিয়া গেল। কহিল, আপনি তাঁর মহত্ত্ব অনুভব না করতে পারেন, কিন্তু সাহেবের দোকানের চাকরি তলওয়ারকরের মত মানুষকে ছোট করে দিতে পারে না। আমাকে আপনি যত ইচ্ছে ব্যঙ্গ করুন, কিন্তু রামদাস কোন অংশেই আপনার ছোট নয়! এ আপনি নিশ্চিত জানবেন।

ডাক্তার আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, আমি নিশ্চিতই জানি। তাঁকে ত আমি ছোট বলিনি অপূর্ববাবু!

অপূর্ব কহিল, বলেছেন। তাঁকে এবং আমাকে আপনি পরিহাস করেছেন। কিন্তু আমি জানি জন্মভূমি তার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। সে নির্ভীক! সে বীর! আপনার মত সে লুকিয়ে বেড়ায় না। আপনার মত পুলিশের ভয়ে ছদ্মবেশে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে না! আপনি ত ভীরু।

প্রচণ্ড বিস্ময়ে ভারতী অবাক হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু আর সে সহিতে পারিল না। দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আপনি কাকে কি বলচেন অপূর্ববাবু? হঠাৎ পাগল হয়ে গেলেন কি?

অপূর্ব কহিল, না পাগল হইনি। উনি যেই হোন, রামদাস তলওয়ারকরের পদধূলির যোগ্য নন, এ কথা আমি মুক্তকণ্ঠে বলব। তার তেজ, তার বাগ্মিতা, তার নির্ভীকতাকে ইনি মনে মনে ঈর্ষা করেন। তাই তোমাকে যেতে দিলেন না, তাই আমাকে কৌশলে বাধা দিলেন।

ভারতী উঠিয়া দাঁড়াইল। আপনাকে অপরিসীম যত্নে সংযত করিয়া সহজকণ্ঠে কহিল, আপনাকে আমি অপমান করতে পারব না, কিন্তু এখান থেকে আপনি যান অপূর্ববাবু। আপনাকে আমরা ভুল বুঝেছিলাম। ভয়ে যার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না সে উন্মাদের এখানে ঠাঁই নেই। আপনার কথাই সত্য, পথের-

দাবীতে আপনার স্থান হবে না। এর পরে আর কোন ছলে, কোন দিন আমার বাসায় ঢোকবার চেষ্টা করবেন না।

অপূর্ব নিরুত্তরে উঠিয়া দাঁড়াইতেই ডাক্তার তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, আর একটু বসুন অপূর্ববাবু, এই অন্ধকারে একলা যাবেন না। আমি স্টেশনে যাবার পথে আপনাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে যাবো।

অপূর্বর চেতনা ফিরিয়া আসিতেছিল, সে পুনরায় অধোমুখে বসিয়া পড়িল।

ভুক্তাবশিষ্ট বিস্কুটগুলি ডাক্তার পকেটে পুরিতেছিলেন দেখিয়া ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, ওকি হচ্চে আপনার?

রসদ সংগ্রহ করে রাখচি ভাই।

সত্য সত্যই আজ রাত্রে যাবেন নাকি?

নইলে কি মিথ্যামিথ্যিই অপূর্ববাবুকে ধরে রাখলাম? সবাই মিলে এমন অবিশ্বাস করলে আমি বাঁচি কি করে বল ত?

এই বলিয়া তিনি কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিতে ভারতী অভিমান করিয়া কহিল, না, আজ আপনার যাওয়া হবে না, আপনি বড় ক্লান্ত। তা ছাড়া সুমিত্রাদিদি অসুস্থ, আপনি কেবলি কোথায় চলে যাবেন,— একটা কথা শুনতে পাইনে, একটা উপদেশ নিতে পাইনে, পথের-দাবী একলা চালাই কি করে বলুন ত? আমিও তাহলে যেখানে খুশি চলে যাবো।

লেখা চিঠিগুলি ডাক্তার তাহার হাতে দিয়া হাসিয়া কহিলেন, একখানি তোমার, একখানি সুমিত্রার, অন্যখানি তোমাদের পথের-দাবীর। আমার উপদেশ বল, আদেশ বল, সবই এর মধ্যে পাবে।

চিঠিগুলি মুঠার মধ্যে লইয়া ভারতী মুখ মলিন করিয়া বলিল, এবার কি আপনি বেশী দিনের জন্যে যাচ্চেন?

দেবা ন জানন্তি,—বলিয়া ডাক্তার মুচকিয়া হাসিলেন।

ভারতী কহিল, আমাদের মুশকিল হয়েছে, না মুখ দেখে, না কথা শুনে আপনার মনের কথা জানবার জো আছে। ঠিক করে বলে যান কবে ফিরবেন?

ঐ যে বললাম, দেবা ন জানন্তি—

না তা হবে না, সত্যি করে বলুন কবে ফিরবেন?

এত তাগাদা কেন বল ত?

ভারতী কহিল, কি জানি এবার যেন ভয় করচে। মনে হচ্চে যেন সব ভেঙ্গেচুরে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। বলিতে বলিতে সহসা তাহার চক্ষু অশ্রুপরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

তাহার মাথার উপর হাত রাখিয়া ডাক্তার রহস্যভরে কহিলেন, হবে না গো, হবে না,—সব ঠিক হয়ে যাবে। বলিয়াই হঠাৎ ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন, কিন্তু এই মানুষটির সঙ্গে এমন মিছেমিছি ঝগড়া করলে কিন্তু সত্যিই কাঁদতে হবে তা' বলে রাখচি। অপূর্ববাবু রাগ করেন বটে কিন্তু ভাল যাকে বাসেন তাকে ভালবাসতেও জানেন। মানুষের মধ্যে যে হৃদয় বস্তুটি আছে সে আমাদের সংসর্গে এখনো শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়নি। ফুটন্ত পদ্মটির মত ঠিক তাজা আছে।

ভারতী কি একটা জবাব দিতে যাইতেছিল কিন্তু অপূর্ব হঠাৎ মুখ তুলিতেই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার নিজের মুখ বন্ধ হইয়া গেল।

এমনি সময়ে দ্বারের কাছে আসিয়া একখানা ঘোড়ার গাড়ি থামিল, এবং অনতিকাল মধ্যেই দুইজন লোক ভিতরে প্রবেশ করিল। একজনের পরিধানে আগাগোড়া সাহেবি পোশাক, ডাক্তার ভিন্ন বোধ করি সকলেরই অপরিচিত; আর একজন রামদাস তলওয়ারকর। অপূর্বর মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু কলরব করিয়া সে বন্ধুকে সংবর্ধনা করিতে গেল না। রামদাস অগ্রসর হইয়া ডাক্তারের পদধূলি গ্রহণ করিল। অপূর্বর কাছে ইহা অদ্ভুত ঠেকিল। কিন্তু ডাক্তারের মুখের প্রতি সে শুধু নীরবে নেত্রপাত করিয়া নীরব হইয়াই রহিল।

ইংরাজি পোশাক-পরা লোকটি ইংরাজিতেই কথা কহিলেন, বলিলেন, জামিনের জন্যই এত বিলম্ব ঘটিল। কেস্ বোধ হয় গবর্নমেন্ট চালাবে না।

ডাক্তার মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তার মানে গবর্নমেন্টকে তুমি আজও চেনোনি কৃষ্ণ আইয়ার।

এই কথায় রামদাস সহাস্যে যোগ দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মাঠ থেকে থানা পর্যন্ত আপনাকে সকল সময়েই সঙ্গে দেখেছিলাম, কিন্তু হঠাৎ কখন যে অন্তর্হিত হয়েছিলেন সেইটাই জানতে পারিনি!

ডাক্তার হাসিমুখে বলিলেন, অন্তর্ধানের গভীর কারণ ঘটেছিল রামদাসবাবু। এমন কি রাতারাতি এখান থেকেও অন্তর্হিত হ'তে হ'ল।

রামদাস কহিল, সেদিন রেলওয়ে স্টেশনে আপনাকে চিনতে পেরেছিলাম।

ডাক্তার ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, জানি। কিন্তু সোজা বাসায় না গিয়ে এত রাত্রে এখানে কেন?

রামদাস কহিল, আপনাকে প্রণাম করতে। পুনার সেন্ট্রাল জেলে আমি যাবার পরেই আপনি চলে গেলেন। তখন সুযোগ পাইনি। নীলকান্ত যোশীর কি হ'ল জানেন? সে ত আপনার সঙ্গেই ছিল।

ডাক্তার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, হাঁ। ব্যারাকের পাঁচিল টপকাতে পারলে না বলে সিঙ্গাপুরে তার ফাঁসি হ'ল।

অপূর্বর কাছে এই সকল অচিন্তনীয়, অত্যদ্ভুত দুঃস্বপ্নের মত বোধ হইতে লাগিল। সে আর থাকিতে না পারিয়া অকস্মাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, ডাক্তারবাবু, আপনারও কি তাহলে ফাঁসি হতো?

ডাক্তার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। এই হাসি দেখিয়া অপূর্বর মাথার চুল পর্যন্ত শিহরিয়া উঠিল।

রামদাস উৎসুক হইয়া কহিল, তার পরে?

ডাক্তার বলিলেন, একবার এই সিঙ্গাপুরেই আমাকে বছর-তিনেক আটকে থাকতে হয়েছিল, কর্তৃপক্ষরা আমাকে চেনেন। তাই সোজা রাস্তাটা এড়িয়ে ব্যাঙ্ককের পথে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে টেভয়ে এসে পৌঁছুলাম। জোর কপাল! হঠাৎ বনের মধ্যে একটা হাতির বাচ্চাও ভগবান পাইয়ে দিলেন। সেটা সঙ্গে থাকায় বরাবর ভারী সুবিধে হয়ে গেল। শেষে হাতির বাচ্চা বিক্রি করে দিশি জাহাজে নারকেল চালানের সঙ্গে নিজেকে চালান দিয়ে মাসতিনেকের মধ্যে একেবারে আরাকানে এসে পাড়ি জমালাম। খাসা থাকা গিয়েছিল রামদাসবাবু, হঠাৎ থানার মধ্যে আজ এক পরম বন্ধুর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা-সাক্ষাৎ। ভি. এ. চেলিয়া তাঁর নাম, বড়্ড স্নেহ করেন আমাকে। বহুদিনের অদর্শনে খুঁজতে খুঁজতে একেবারে সিঙ্গাপুর থেকে বর্মা মুলুকে এসে উপস্থিত হয়েছেন। ভাবে বোধ হয় খোঁজ পেয়েছেন। তবে, ভিড়ের মধ্যে তেমন নজর দিতে পারেন নি, নইলে পৈতৃক গলাটার,—এই বলিয়া তিনি হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে গিয়া অকস্মাৎ অপূর্বর মুখের দিকে চাহিয়া একেবারে চমকিয়া উঠিলেন,—ও কি অপূর্ববাবু? কি হল আপনার?

অপূর্ব দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া আপনাকে সামলাইবার চেষ্টা করিতেছিল, তাঁহার কথা শেষ না হইতেই সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সবেগে ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

আঠার

অপূর্বর এমন করিয়া বাহির হইয়া যাওয়াটা সকলকেই বিস্মিত করিল। ঘরে আলো বেশী ছিল না, কিন্তু তাহার অস্বাভাবিক মুখের ভাব ও অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠস্বর যেন অতিশয় বে-মানান দেখাইল। ব্যারিস্টার কৃষ্ণ আইয়ার ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনি কে ডাক্তার? অত্যন্ত সেন্টিমেন্টাল! তাঁহার শেষ কথাটার উপরে স্পষ্ট একটা অভিযোগের খোঁচা ছিল। অর্থাৎ, এ-সকল লোক এখানে কেন?

ডাক্তার শুধু একটুখানি হাসিলেন, কিন্তু তাড়াতাড়ি এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন তলওয়ারকর। কহিলেন, ইনি মিস্টার হালদার—অপূর্ব হালদার। এক আফিসে আমরা কাজ করি, আমার সুপিরিয়র অফিসর। একটু থামিয়া সশ্রদ্ধ স্নেহের সহিত বলিলেন, কিন্তু আমার একান্ত অন্তরঙ্গ,—আমার পরম বন্ধু। সেন্টিমেন্টাল? ই—য়েস্। ডাক্তারবাবু আপনি বোধ করি হালদারের রেঙ্গুনের প্রথম অভিজ্ঞতার গল্প শোনেন নি? সে এক—

সহসা ভারতীর প্রতি চোখ পড়িতেই তিনি সলজ্জে থামিয়া গিয়া কহিলেন, সে যাই হোক, প্রথম পরিচয়ের দিন থেকেই কিন্তু আমরা বন্ধু,—বাস্তবিক পরম বন্ধু।

তলওয়ারকরের ব্যগ্রতায় ও বিশেষ করিয়া তাঁহার পরম বন্ধু শব্দটার পুনঃ পুনঃ প্রয়োগে সেন্টিমেন্টালিস্মের প্রতি খোঁচা দিতে ব্যারিস্টার সাহেব আর সাহস করিলেন না, কিন্তু তাঁহার মুখের চেহারাটা যেন সন্দিগ্ধ এবং অপ্রসন্ন হইয়া রহিল।

ডাক্তার হাসিমুখে বলিলেন, সেন্টিমেন্ট জিনিসটা নিছক মন্দ নয় কৃষ্ণ আইয়ার। এবং সবাই তোমার মত শক্ত পাথর না হলেই চলবে না মনে করাও ঠিক নয়।

কৃষ্ণ আইয়ার খুশী হইলেন না, বলিলেন, তা আমি মনেও করিনে, কিন্তু এটুকু মনে করাও বোধ হয় দোষের নয় ডাক্তার, এই ঘরটা ছাড়াও তাঁদের চলে বেড়াবার যথেষ্ট প্রশস্ত জায়গা পৃথিবীতে খোলা আছে।

তলওয়ারকর মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেন। যাঁহাকে তিনি পরম বন্ধু বলিয়া বারংবার অভিহিত করিতেছেন, তাঁহাকে তাঁহারই সম্মুখে অবাঞ্ছিত প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টায় নিজেকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া কহিলেন, মিস্টার আইয়ার, অপূর্ববাবুকে আমি চিনি। আমাদের মন্ত্রে দীক্ষা তাঁর বেশী দিনের নয় সত্য, কিন্তু বন্ধুর অভাবিত মুক্তিতে সামান্য বিচলিত হওয়া আমাদের পক্ষেও মারাত্মক অপরাধ নয়। সংসারে চলে বেড়াবার স্থান অপূর্ববাবুর যথেষ্টই আছে, এবং আশা করি এ ঘরেও স্থান তাঁর কোনদিন সঙ্কীর্ণ হবে না।

কৃষ্ণ আইয়ার ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া আজ অপূর্বকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তিনি চুপ করিয়া রহিলেন, কিন্তু ডাক্তার তাঁহার স্বাভাবিক শান্তির সহিত কহিলেন, নিশ্চয় হবে না তলওয়ারকর, নিশ্চয় হবে না। এই বলিয়া তিনি উপস্থিত সকলের মুখের প্রতি ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে ভারতীকেই যেন বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়া হঠাৎ গম্ভীর হইয়া কহিলেন, কিন্তু এই বন্ধুত্ব জিনিসটা সংসারে কতই না ক্ষণভঙ্গুর ভারতী! একদিন যার সম্বন্ধে মনে করাও যায় না, আর একদিন কতটুকু ছোট্ট কারণেই না তার সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ হয়ে যায়! সেটাও দুনিয়ার অস্বাভাবিক নয় তলওয়ারকর, তার জন্যেও প্রস্তুত থাকা ভাল। মানুষ বড় দুর্বল কৃষ্ণ আইয়ার, বড় দুর্বল! তখন এই সেন্টিমেন্টের দরকার হয় তার ধাক্কা সামলাতে।

এই-সকল কথার উত্তর দিবারও কিছু নাই, প্রতিবাদ করাও চলে না; উভয়েই মৌন হইয়া রহিল, কিন্তু ভারতীর মুখ ম্লান হইয়া উঠিল। ডাক্তারের প্রতি তাহাদের অবিচলিত ও অসীম শ্রদ্ধা, অহেতুক একটি বাক্যও উচ্চারণ করা তাঁহার স্বভাব নয়, এ সত্য ভারতী ভাল করিয়াই জানে, কিন্তু কি এবং কাহাকে ইঙ্গিত করিয়া যে এ কথা তিনি কহিলেন, এবং ঠিক কি ইহার তাৎপর্য তাহা ধরিতে না পারিয়া মনের মধ্যেটা তাহার শুধু উদ্বেগ ও আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

ডাক্তার সম্মুখের ঘড়ির দিকে চাহিয়া কহিলেন, আমার ত ক্রমশঃ যাবার সময় হ’য়ে এল ভারতী, আজ রাত্রের গাড়িতে আমি চললাম তলওয়ারকর।

কোথায় এবং কি জন্য, নিজে হইতে না বলিলে এরূপ অনাবশ্যক কৌতূহল প্রকাশের বিধি ইহাদের নাই। একমুহূর্ত জিজ্ঞাসুমুখে চাহিয়া থাকিয়া তলওয়ারকর প্রশ্ন করিল, আমার প্রতি আপনার কি আদেশ?

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, আদেশই বটে! কিন্তু একটা কথা। বর্মায় স্থানাভাব যদি হয়ও, নিজের দেশে হবে না তা নিশ্চয়। শ্রমিকের দিকে একটু দৃষ্টি রেখো।

তলওয়ারকর ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আচ্ছা। আবার কবে দেখা হবে?

ডাক্তার কহিলেন, নীলকান্ত যোশীর শিষ্য তুমি, এ আবার কি প্রশ্ন তলওয়ারকর?

তলওয়ারকর চুপ করিয়া রহিল। ডাক্তার পুনশ্চ কহিলেন, আর দেরি করো না যাও,— বাসায় পৌঁছতে প্রায় ভোর হয়ে যাবে। প্র্যাক্টিস তা’হলে এখানেই স্থির ক’রলে কৃষ্ণ আইয়ার?

কৃষ্ণ আইয়ার মাথা নাড়িয়া সায় দিলেন। ভাড়াটে গাড়ি বাহিরে অপেক্ষা করিয়া ছিল, দুজনে বাহির হইবার সময়ে তলওয়ারকর কেবল একবার কহিল, অন্ধকারে অপূর্ববাবু কোথায় চলে গেলেন একবার দেখা হ’ল না—

কিন্তু এ কথার উত্তর দেওয়া বোধ করি কেহ প্রয়োজন মনে করিলেন না। কিছুক্ষণেই বাহিরে গাড়ির শব্দে বুঝা গেল তাঁহারা চলিয়া গেলেন। তখন ডাক্তার বলিলেন, তোমার কি মনে হয় অপূর্ব বাসায় চলে গেছে?

ভারতী মাথা নাড়িয়া বলিল, না, খুব সম্ভব আশেপাশে কোথাও আছেন, একটু খুঁজে দেখলেই পাওয়া যাবে। আপনার সঙ্গে আর একবার দেখা না ক'রে তিনি কখনো যাবেন না।

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, তা হ'লে দশ-পনর মিনিটের মধ্যেই এ কাজটা তার সেরে নেওয়া আবশ্যক। তার বেশী ত আমি সময় দিতে পারবো না ভাই!

না, এর মধ্যেই তিনি এসে পড়বেন, এই বলিয়া ভারতী শুধু যে কেবল উপস্থিত ডাক্তারের কথার একটা জবাব দিল তাই নয়, সে আপনাকে আপনি ভরসা দিল। একাকী এই অন্ধকারে অপূর্ব কিছুতেই যাইবে না, অতএব কোথাও নিকটেই আছে এ বিষয়ে সে যেমন নিশ্চিত ছিল, তাহাদের অশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধাভাজন এই অতিমানবের বিদায়ের পূর্বক্ষণে আর একবার সর্বান্তঃকরণে তাঁহার ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া লওয়ারও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও সে তেমনি নিঃসংশয় ছিল। নানাদিক দিয়া নানাকারণে আজ অপূর্ব বহু অপরাধ জমা করিয়াছে, সময় থাকিতে তাহাকে দিয়াই সেগুলার ক্ষালন করিয়া না লইয়াই বা ভারতী বাঁচে কি করিয়া? কিন্তু, সেই অমূল্য স্বল্পকালটুকু বৃথায় শেষ হইয়া আসিতে লাগিল,—অপূর্বর দেখা নাই! আঁধার দ্বারপথে ভারতীর চঞ্চল চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হইয়া আসিল এবং উৎকর্ণ চিত্ত বাহিরে পরিচিত পদশব্দের প্রতীক্ষায় একেবারে অধীর হইয়া উঠিল।

কোথাও সে হাতের কাছেই আছে, একবার ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া সে একমুহূর্তে খুঁজিয়া আনে, কিন্তু এতখানি ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে আজ তাহার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হইল। ডাক্তার তাঁহার স্ট্র্যাপ-বাঁধা বোঁচকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হাই তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ভারতী দেয়ালের ঘড়ির দিকে চাহিয়া

দেখিল আর মিনিট পাঁচ-ছয়ের অধিক সময় নাই, কহিল, আপনি কি হেঁটেই যাবেন?

ডাক্তার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না। দুটো কুড়ি মিনিটে সদর রাস্তার উপর দিয়ে খুব সম্ভব একটা ঘোড়ার গাড়ি ফিরে যাবে, চলতি গাড়ি—গণ্ডা-ছয়েক পয়সা ভাড়া দিলেই স্টেশনে পৌঁছে দেবে।

ভারতী বলিল, পয়সা না দিলেও দেবে। কিন্তু যাবার পূর্বে সুমিত্রাদিদিকে একবার দেখা দিয়ে যাবেন না? তিনি সত্যই পীড়িত।

ডাক্তার কহিলেন, আমি ত বলিনি তিনি অসুস্থ নন। কিন্তু ডাক্তার না দেখালেই বা সারবে কি করে?

ভারতী বলিল, কিন্তু তাই যদি হয় ত আপনার চেয়ে বড় ডাক্তারই বা পৃথিবীতে আছে কে?

ডাক্তার রহস্যভরে জবাব দিলেন, তাহলেই হয়েছে! দীর্ঘ অনভ্যাসে ও-বিদ্যে ত মন থেকে ধুয়ে মুছে গেছেই, তা ছাড়া বসে বসে কারও চিকিৎসা করি সে সময়ই বা কৈ?

কথা তাঁহার শেষ না হইতেই ভারতী বলিয়া উঠিল, সময় কৈ! সময় কৈ! কেউ মরে গেলেও সময় হবে না— এমনিই দেশের কাজ? দেখুন ডাক্তারবাবু, বিদ্যে মুছে যাবার মন ও নয়; মুছে সত্যিই কিছু গিয়ে থাকে ত সে দয়া-মায়া!

ডাক্তারের হাসিমুখ কেবল মুহূর্তের তরে গম্ভীর হইয়াই পুনরায় পূর্বশ্রী ধারণ করিল। কিন্তু তীক্ষ্ণদৃষ্টি ভারতী সেই একমুহূর্তেই নিজের ভুল বুঝিতে পারিল। তাহাদের ঘনিষ্ঠতা বহুদূর পর্যন্ত গিয়াছে সত্য, কিন্তু এদিকে অঙ্গুলি-সঙ্কেত করিবার অধিকার আজও তাহার ছিল না। বস্তুতঃ, সুমিত্রা কে, ডাক্তারের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ, এবং কবে কি করিয়া সে যে এই দলভুক্ত হইয়া পড়িল অদ্যাবধি ভারতী তাহার কিছুই জানিত না। তাহাদের সম্প্রদায়ে ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে কৌতূহলী হওয়া একান্ত নিষিদ্ধ। সুতরাং, অনুমান ভিন্ন সঠিক কিছুই

জানিবার তাহার উপায় ছিল না। শুধু মেয়েমানুষ বলিয়াই সে সুমিত্রার মনোভাব উপলব্ধি করিয়াছিল। কিন্তু নিজের সেই অনুভূতিমাত্রটুকু ভিত্তি করিয়া অকস্মাৎ এতবড় ইঙ্গিত ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়া সে শুধু সঙ্কুচিত নয়, ভয়ও পাইল। ভয় ডাক্তারকে নয়,—সুমিত্রাকে। এ কথা কোন মতেই তাঁহার কানে উঠিলে চলিবে না! তাঁহার অন্য পরিচয় জানা না থাকলেও প্রথম হইতেই সেই নিস্তব্ধ তীক্ষ্ণ-বিদ্যা-বুদ্ধিশালিনী রমণীর দুর্ভেদ্য নিবিড়তার পরিচয় কাহারও অবিদিত ছিল না। তাঁহার স্বল্পভাষণে, তাঁহার প্রখর সৌন্দর্যে প্রতি পদক্ষেপে, তাঁহার অবহিত বাক্যালাপে, তাঁহার অচঞ্চল আচরণের গাম্ভীর্যে ও গভীরতায় এই দলের মধ্যে থাকিয়াও তাঁহার অপরিসীম দূরত্ব স্বতঃসিদ্ধের মতই যেন সকলে অনুভব করিত। এমন কি তাঁহার অসুস্থতা লইয়াও গায়ে পড়িয়া আলোচনা করিতেও কাহারো সাহস হইত না। কিন্তু একদিন সেই দুর্লঙ্ঘ্য কঠোরতা ভেদ করিয়া তাঁহার অত্যন্ত গোপন দুর্বলতা যেদিন অপূর্ব ও ভারতীর সম্মুখে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল, যেদিন একজনের বিদায়ের ক্ষণে সুমিত্রা নিজেকে সংবরণ করিতে পারে নাই, সেদিন হইতেই সে যেন সকলের হইতে আরও বহু দূরে আপনাকে আপনি সরাইয়া লইয়া গেছে। সেই দীর্ঘায়ত ব্যবধান অপরের অযাচিত সহানুভূতির আকর্ষণে সঙ্কুচিত হইবার আভাসমাত্রেই যে তাহার সেই আত্মাশ্রয়ী অন্তর্গূঢ় বেদনা একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে এই কথা নিঃসংশয়ে অনুভব করিয়া ভারতীর ক্ষুব্ধ চিত্ত শঙ্কায় পূর্ণ হইয়া যাইত।

ডাক্তার আরামকেদারায় ভাল করিয়া হেলান দিয়া শুইয়া সুদীর্ঘ পদদ্বয় সুমুখের টেবিলের উপর প্রসারিত করিয়া দিয়া সহসা মহা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আঃ—

ভারতী বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, শুলেন যে বড়?

ডাক্তার রাগ করিয়া বলিলেন, কেন, আমি কি ঘোড়া যে একটু শুলেই বেতো হয়ে যাবো? আমার ঘুম পাচ্চে,— তোমাদের মত আমি দাঁড়িয়ে ঘুমোতে পারিনে।

ভারতী বলিল, দাঁড়িয়ে ঘুমোতে আমরাও পারিনে। কিন্তু কেউ যদি এসে বলে আপনি দৌড়তে দৌড়তে ঘুমোতে পারেন, আমি তাতেও আশ্চর্য হইনে। আপনার ওই দেহটা দিয়ে সংসারে কি যে না হ'তে পারে তা কেউ জানে না। কিন্তু সময় হল যে; এখনি না বেরুলে গাড়ি চলে যাবে যে!

যাক গে।

যাক গে কিরকম?

উঃ—ভয়ানক ঘুম পাচ্চে ভারতী, চোখ চাইতে পারচি নে। এই বলিয়া ডাক্তার দুই চক্ষু মুদিত করিলেন।

কথা শুনিয়া ভারতী পুলকিতচিত্তে অনুভব করিল, কেবল তাহারই অনুরোধে আজ তাঁহার যাওয়া স্থগিত রহিল। না হইলে শুধু ঘুম কেন বজ্রাঘাতের দোহাই দিয়াও তাঁহার সঙ্কল্পে বাধা দেওয়া যায় না। কহিল, আর ঘুমই যদি সত্যি পেয়ে থাকে ওপরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন না!

ডাক্তার চোখ মুদিয়াই প্রশ্ন করিলেন, তোমার নিজের উপায় হবে কি? অপূর্বর পথ চেয়ে সারারাত বসে কাটাবে?

ভারতী বলিল, আমার বয়ে গেছে। পাশের ছোট ঘরে বিছানা করে এখনি গিয়ে শুয়ে ঘুমবো।

ডাক্তার কহিলেন, রাগ করে শোওয়া যেতে পারে, কিন্তু রাগ করে ঘুমোনো যায় না। বিছানায় পড়ে ছটফট করার মত শাস্তি আর নেই। তার চেয়ে খুঁজে আনো গে,—আমি কারও কাছে প্রকাশ করব না।

ভারতীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু সে লজ্জা ধরা পড়িল না। কারণ, ডাক্তার চোখ বুজিয়াই ছিলেন। তাঁহার নিমীলিত চোখের প্রতি চোখ রাখিয়া ভারতী

মুহূর্ত-কয়েক মৌন থাকিয়া আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা ডাক্তারবাবু, বিছানায় পড়ে ছটফট করার মত শাস্তি আর নেই এ আপনি জানলেন কি করে?

ডাক্তার উত্তর দিলেন, লোকে বলে তাই শুনি।

নিজে থেকে কিছুই জানেন না?

ডাক্তার চোখ মেলিয়া কহিলেন, আরে ভাই, আমাদের মত দুর্ভাগাদের শুতে বিছানাই মেলে না, তায় আবার ছটফট করা! এতখানি বাবুয়ানার কি ফুরসত আছে? এই বলিয়া তিনি মুচকিয়া হাসিলেন।

ভারতী হঠাৎ প্রশ্ন করিল, আচ্ছা ডাক্তারবাবু, সবাই যে বলে আপনার দেহের মধ্যে রাগ নেই, এ কি কখনো সত্যি হতে পারে?

ডাক্তার বলিলেন, সত্যি? কখনো না, কখনো না! লোকে মিথ্যে করে আমার বিরুদ্ধে গুজব রটায়,—তারা আমাকে দেখতে পারে না।

ভারতী হাসিয়া কহিল, কিংবা অত্যন্ত বেশী ভালবাসে বলেই হয়ত গুজ রটায়। তারা আরও বলে আপনার মান-অভিমান নেই, দয়া-মায়া নেই, বুকের ভেতরটা আগাগোড়া একেবারে পাষাণ দিয়ে গড়া।

ডাক্তার কহিলেন, এও অত্যন্ত ভালবাসার কথা। তারপর?

ভারতী কহিল, তারপর সেই পাষাণ-স্তূপের মধ্যে আছে শুধু একটি বস্তু,—জননী জন্মভূমি! তার আদি নেই, অন্ত নেই, ক্ষয় নেই, ব্যয় নেই—তার ভয়ানক চেহারা আমাদের চোখে পড়ে না বলেই আপনার কাছে-কাছে থাকতে পারি, নইলে,—বলিতে বলিতে সে অকস্মাৎ একমুহূর্ত থামিয়া কহিল, কিরকম জানেন ডাক্তারবাবু, সুমিত্রাদিদিকে নিয়ে আমি সেদিন বর্মা অয়েল কোম্পানির কারখানা ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম; সেদিন তাদের নতুন বয়লারের পরীক্ষা হচ্ছিল।

অনেক লোক ভিড় করে তামাশা দেখছিল। কালো পাহাড়ের মত একটা প্রকাণ্ড জড়পিণ্ড,—কিন্তু, জড়পিণ্ডের বেশী সে আর কিছুই নয়। হঠাৎ তার একটা

দরজা খুলে যেতে মনে হল যেন গর্ভেতে তার অগ্নির প্লাবন বয়ে যাচ্ছে। সেখানে এই পৃথিবীটাকেও তাল করে ফেলে দিলে যেন নিমিষে ভস্মসাৎ করে দেবে। শুনলাম সে একাই নাকি এই বিরাট কারখানা চালিয়ে দিতে পারে। দরজা বন্ধ হল, আবার সেই শান্ত জড়পিণ্ড, ভিতরের কোন প্রকাশই বাহিরে নেই। সুমিত্রাদিদির মুখ দিয়ে গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেসা করলাম, কি দিদি? সুমিত্রা বললেন, এই ভয়ানক যন্ত্রটাকে মনে রেখো ভারতী, তোমাদের ডাক্তারবাবুকে চিনতে পারবে। এই তাঁর সত্যিকার প্রতিমূর্তি। এই বলিয়া সে ক্ষণকাল তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

ডাক্তার অন্যমনস্কের মত একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, সবাই কি ভালই আমাকে বাসে! কিন্তু ঘুমে যে আর চোখ চাইতে পারিনে ভারতী, কিছু একটা কর! কিন্তু তার আগে সে লোকটা গেল কোথায় একবার খোঁজ করবে না?

আপনি কিন্তু কারও কাছে গল্প করতে পারবেন না।

না। কিন্তু আমাকে বুঝি লজ্জা করবার দরকারই নেই?

ভারতী মাথা নাড়িয়া বলিল, না। মানুষের কাছেই শুধু মানুষের লজ্জা করে! এই বলিয়া সে হ্যারিকেন লণ্ঠনটা হাতে তুলিয়া লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

মিনিট দশ-পনেরো পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, অপূর্ববাবু চলে গেছেন।

ডাক্তার বিস্ময়ে উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, এই অন্ধকারে? একা?

তাই ত দেখছি।

আশ্চর্য।

ভারতী বলিল, আমার বিছানা করা আছে, শুতে চলুন।

তুমি?

আমি মেঝেতে একটা কম্বল-টম্বল কিছু পেতে নেব। চলুন।

ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, তাই চল। লজ্জা-সঙ্কোচ মানুষে মানুষকেই করে,—আমি পাষাণ বৈ ত নয়।

উপরের ঘরে গিয়া ডাক্তার শয্যায় শয়ন করিলে ভারতী মশারি ফেলিয়া দিয়া সযত্নে চারিদিক গুঁজিয়া দিল, এবং তাহারই অনতিদূরে নীচে মেঝের উপর আপনার বিছানা পাতিল। ডাক্তার সেই দিকে চাহিয়া ক্ষুণ্ণকণ্ঠে কহিলেন, সকলে মিলে আমাকে এমন করে অগ্রাহ্য করলে আমার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে।

ভারতী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, আমরা সকলে মিলে আপনাকে মানুষের দল থেকে বার করে পাথরের দেবতা বানিয়ে রেখেচি।

তার মানে আমাকে ভয়ই নেই?

ভারতী অসঙ্কোচে জবাব দিল, একবিন্দু না। আপনার থেকে কারও লেশমাত্র অকল্যাণ ঘটতে পারে এ আমরা ভাবতেই পারিনে।

প্রত্যুত্তরে ডাক্তার হাসিয়া শুধু বলিলেন, আচ্ছা, টের পাবে একদিন।

শয্যা গ্রহণ করিয়া ভারতী হঠাৎ প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, কে আপনাকে সব্যসাচী নাম দিলে ডাক্তারবাবু? এ ত আপনার আসল নাম নয়। ডাক্তার হাসিতে লাগিলেন। কহিলেন, আসল যাই হোক, নকল নামটি দিয়েছিলেন আমাদের পাঠশালার পণ্ডিতমশাই। তাঁর মস্ত উঁচু একটা আমগাছ ছিল, কেবল আমিই তার ঢিল মেরে আম পাড়তে পারতাম। একবার ছাত থেকে লাফাতে গিয়ে ডানহাতটা আমার মচকে গেল। ডাক্তার এসে ব্যান্ডেজ বেঁধে গলার সঙ্গে ঝুলিয়ে দিলেন। সবাই আহা আহা করতে লাগলো, শুধু পণ্ডিতমশাই খুশী হয়ে বললেন, যাক, আম ক'টা আমার ঢিলের ঘা থেকে বাঁচলো। পাকলে দুটো-একটা হয়ত মুখে দিতেও পারবো।

ভারতী বলিল, বড্ড দুষ্টু ছিলেন ত!

ডাক্তার বলিলেন, হাঁ, দুর্নাম একটু ছিল বটে। যাই হোক পরের দিন থেকেই আবার তেমনি আম পাড়ায় লেগে গেলাম, কিন্তু পণ্ডিতমশাই কি করে খবর পেয়ে সেদিন হাতেনাতে একেবারে ধরে ফেললেন। খানিকক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বললেন, ঘাট হয়েছে বাবা সব্যসাচী, আমের আশা আর করিনে।

ডানটা ভেঙ্গেছে, বাঁ-হাত চলছে, বাঁ-টা ভাঙ্গলে বোধ হয় পা-দুটো চলবে। থাক বাবা, আর কষ্ট করো না, যে ক'টা কাঁচা আম বাকী আছে লোক দিয়ে পাড়িয়ে দিচ্ছি।

ভারতী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, পণ্ডিতমশায়ের অনেক দুঃখের দেওয়া নাম।

ডাক্তার নিজেও হাসিয়া বলিলেন, হাঁ, আমার অনেক দুঃখের নাম। কিন্তু সেই থেকে আমার আসল নামটা লোকে যেন ভুলেই গেল।

ভারতী ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা সকলে যে বলে দেশ আর আপনি, আপনি আর দেশ—এই দুই-ই আপনাতে একেবারে এক হয়ে গেছে,—এ কি করে হল?

ডাক্তার কহিলেন, সে-ও এক ছেলেবেলার ঘটনা ভারতী। এ জীবনে কত কি এলো, কত কি গেলো, কিন্তু সেদিনটা এ জীবনে একেবারে অক্ষয় হয়ে রইল। আমাদের গ্রামের প্রান্তে বৈষ্ণবদের একটা মঠ ছিল, একদিন রাত্রে সেখানে ডাকাত পড়লো। চেঁচাচেঁচি কান্নাকাটিতে গ্রামের বহুলোক চারিদিকে জমা হল, কিন্তু ডাকাতদের সঙ্গে একটা গাদা বন্দুক ছিল, তারা তাই ছুঁড়তে লাগলো দেখে কোন লোক তাদের কাছে ঘেঁষতে পারলে না। আমার জাটতুতো একজন বড়ভাই ছিলেন, তিনি অত্যন্ত সাহসী এবং পরোপকারী, যাবার জন্যে তিনি ছটফট করতে লাগলেন, কিন্তু গেলে নিশ্চয় মৃত্যু জেনে সবাই তাঁকে ধরে রেখে দিলে। নিজেকে কোনমতে ছাড়াতে না পেরে তিনি সেইখান থেকে শুধু নিষ্ফল আস্ফালন, এবং ডাকাতদের গালাগালি দিতে লাগলেন। কিন্তু কোন ফলই তাতে হল না, তারা ওই একটিমাত্র বন্দুকের জোরে দু'তিন শ লোকের সুমুখে মোহন্ত বাবাজীকে খুঁটিতে বেঁধে তিল তিল করে পুড়িয়ে মারলে। ভারতী, আমি তখন ছেলেমানুষ ছিলাম, কিন্তু আজও তার কাকুতি-মিনতি, আজও তার মরণ চীৎকার যেন মাঝে মাঝে কানে শুনতে পাই। উঃ—সে কি ভয়ানক বুক-ফাটা আর্তনাদ!

ভারতী নিরুদ্ধশ্বাসে কহিল, তার পর?

ডাক্তার কহিলেন, তারপর বাবাজীর জীবন-ভিক্ষার শেষ অনুনয় সমস্ত গ্রামের সম্মুখে ধীরে ধীরে সাঙ্গ হল, তাদের লুটপাটের কাজও নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে পরিসমাপ্ত হল,—চলে যাবার সময় সর্দার বড়দাদার উদ্দেশে পিতৃ উচ্চারণ করে শপথ করে গেল যে আজ তারা শ্রান্ত, কিন্তু মাস-খানেক পরে ফিরে এসে এর শোধ দেবে। বড়দা জেলার সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে কেঁদে কেটে পড়লেন একটা বন্দুক চাই। কিন্তু পুলিশ বললে, না। বছর-দুই পূর্বে একজন অত্যন্ত অত্যাচারী পুলিশ সাব-ইন্সেপক্টরের কান মলে দেবার অপরাধে তাঁর দু'মাস জেল হয়েছিল। এবং এই অপরাধেই সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, কোন মতেই না। দাদা বললেন, সাহেব, আমরা কি তবে মারা যাবো? সাহেব হেসে বললেন, এত যার ভয় সে যেন ঘর-বাড়ি বেচে আমার জেলা থেকে অন্য জেলায় চলে যায়।

ভারতী উত্তেজনায় বিছানায় উঠিয়া বসিয়া কহিল, দিলে না? এতবড় সর্বনাশ আসন্ন জেনেও দিলে না?

ডাক্তার কহিলেন, না। এবং কেবল তাই নয়, বড়দা ব্যাকুল হয়ে যখন তীর-ধনুক ও বর্শা তৈরি করালেন, পুলিশের লোক খবর পেয়ে সেগুলো পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে গেল।

কি হল তার পর?

ডাক্তার বলিলেন, তার পরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। সেই মাসের মধ্যেই সর্দার তার প্রতিজ্ঞা পালন করলে। এবারে বোধ করি আরও একটা বেশী বন্দুক ছিল। বাড়ির আর সকলেই পালালেন, শুধু বড়দাকে কেউ নড়াতে পারলে না। কাজেই ডাকাতের গুলিতে প্রাণ দিলেন।

ভারতী রক্তহীন পাংশুমুখে বলিয়া উঠিল, প্রাণ দিলেন?

ডাক্তার কহিলেন, হাঁ। ঘণ্টা-চারেক সজ্ঞানে বেঁচে ছিলেন। গ্রামসুদ্ধ জড় হয়ে হৈচৈ করতে লাগলো, কেউ ডাকাতদের, কেউ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে গাল পাড়তে লাগলো, শুধু দাদাই কেবল চুপ করে রইলেন। পাড়াগাঁ, হাসপাতাল দশ-বার ক্রোশ দূরে, রাত্রিকাল, গ্রামের ডাক্তার ব্যান্ডেজ বেঁধে দিতে এলে তাঁর হাতটা দাদা সরিয়ে দিয়ে কেবল বললেন, থাক, আমি বাঁচতে চাইনে। বলিতে বলিতে সেই পাষাণ দেবতার কণ্ঠস্বর হঠাৎ একটুখানি যেন কাঁপিয়া গেল। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, বড়দা আমাকে বড় ভালবাসতেন। কাঁদতে দেখে একটিবার মাত্র চোখ মেলে চাইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, ছিঃ! মেয়েদের মত এই-সব গরু ভেড়া ছাগলদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তুই আর কাঁদিস নে শৈল। কিন্তু রাজত্ব করার লোভে যারা সমস্ত দেশটার মধ্যে মানুষ বলতে আর একটা প্রাণীও রাখেনি তাদের তুই জীবনে কখনো ক্ষমা করিস নে। এই ক'টা কথা, এর বেশি আর একটা কথাও তিনি বলেন নি। ঘৃণায় একটা উঃ আঃ পর্যন্ত তাঁর মুখ দিয়ে শেষ পর্যন্ত বার হল না, এই অভিশপ্ত পরাধীন দেশ চিরদিনের জন্য ছেড়ে চলে গেলেন। কেবল আমিই জানি ভারতী, কত মস্তবড় প্রাণ সেদিন বার হয়ে গেল।

ভারতী নীরবে স্থির হইয়া রহিল। কবে কোন্ পল্লী-অঞ্চলের এক দুর্ঘটনার কাহিনী। ডাকাতি উপলক্ষে গোটা-দুই অজ্ঞাত অখ্যাত লোকের প্রাণ গিয়াছে। এই ত! জগতের বড় বড় বিরোধের দুঃসহ দুঃখের পাশে ইহা কি-ই বা! অথচ এই পাষাণে কি গভীর ক্ষতই না করিয়াছে! তুলনা ও গণনার দিক দিয়া দুর্বলের দুঃখের ইতিহাসে এই হত্যার নিষ্ঠুরতা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। এই বাঙলা দেশেই ত নিত্য কত লোকে চোর-ডাকাতের হাতে মরিতেছে! কিন্তু একি শুধু তাই? ও পাথর কি এতটুকু আঘাতেই দীর্ণ হইয়াছে? ভারতী অলক্ষ্যে চাহিয়া দেখিল। এবং বিদ্যুৎশিখা অকস্মাৎ অন্ধকার চিরিয়া যেমন করিয়া অদৃশ্য বস্তু টানিয়া বাহির করে, ঠিক তেমনি করিয়া ওই পাথরের মুখের পরেই সে যেন

সমস্ত অজ্ঞাত রহস্য চক্ষের পলকে প্রত্যক্ষ করিল। সে দেখিল, এই বেদনার ইতিহাসে মৃত্যু কিছুই নয়,—মরণ উহাকে আঘাত করে নাই, কিন্তু মর্মভেদী আঘাত করিয়াছে ওই দুটো লোকের মৃত্যুর মধ্য দিয়া শৃঙ্খলিত পদানত সমস্ত ভারতীয়ের উপায়বিহীন অক্ষমতা! আপন ভাইয়ের আসন্ন হত্যা নিবারণ করিবার অধিকারটুকু হইতে সে বঞ্চিত—অধিকার আছে, শুধু চোখ মেলিয়া নিঃশব্দে চাহিয়া দেখিবার। ভারতীর সহসা মনে হইল, সমস্ত জাতির এই সুদুঃসহ লাঞ্ছনা ও অপমানের গ্লানি ওই পাষাণের মুখের পরে যেন নিবিড় নিচ্ছিদ্র কালি লেপিয়া দিয়াছে।

বেদনায় সমস্ত বুকের ভিতরটা ভারতীর আলোড়িত হইয়া উঠিল, কহিল, দাদা!

ডাক্তার সবিস্ময়ে ঘাড় তুলিয়া কহিলেন, দাদা বলে কি তুমি আমাকে ডাকচো?

ভারতী বলিল, হাঁ, তোমাকে। আচ্ছা, ইংরাজের সঙ্গে কি তোমার কখনো সন্ধি হতে পারে না?

না। আমার চেয়ে বড় শত্রু তাদের আর নেই।

ভারতী মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, কারও শত্রুতা, কারও অকল্যাণ তুমি কামনা করতে পারো এ আমি ভাবতে পারিনে দাদা।

ডাক্তার কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া ভারতীর মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া মৃদু হাসিয়া কহিলেন, ভারতী, এ কথা তোমার মুখেই সাজে এবং এর জন্যে আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি, তুমি সুখী হও। এই বলিয়া তিনি পুনরায় একটুখানি হাসিলেন। কিন্তু, এ কথা ভারতী জানিত যে এ হাসির মূল্য নাই, হয়ত ইহা আর-কিছু,—ইহার অর্থ নিরূপণ করিতে যাওয়া বৃথা। তাই সে মৌন হইয়া রহিল। ডাক্তার আস্তে আস্তে বলিলেন, এই কথাটা আমার তুমি চিরদিন মনে রেখ ভারতী, আমার দেশ গেছে বলেই আমি এদের শত্রু নই। একদিন মুসলমানের

হাতেও এ দেশ গিয়েছিল। কিন্তু সমস্ত মনুষ্যত্বের এতবড় পরম শত্রু জগতে আর নেই। স্বার্থের দায়ে ধীরে ধীরে মানুষকে অমানুষ করে তোলাই এদের মজ্জাগত সংস্কার। এই এদের ব্যবসা, এই এদের মূলধন। যদি পারো দেশের নর-নারীকে শুধু এই সত্যটাই শিখিয়ে দিও।

নীচের ঘড়িতে টং-টং করিয়া চারিটা বাজিল। সম্মুখের খোলা জানালার বাহিরে রাত্রিশেষের অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া আসিল, সেইদিকে নির্নিমেষচক্ষে চাহিয়া ভারতী স্তব্ধ, স্থির হইয়া বসিয়া কত কি যে ভাবিতে লাগিল তাহার স্থিরতা নাই, কিন্তু একটা সমস্ত জাতির বিরুদ্ধে এতবড় অভিযোগ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে কিছুতেই তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

উনিশ

কাল সারারাত্রি ভারতী ঘুমাইতে পায় নাই। দিনের বেলায় তাহার শরীর ও মন দুই-ই খারাপ ছিল, তাই ইচ্ছা করিয়াছিল, আজ একটু সকাল-সকাল খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া শয্যাগ্রহণ করিবে। এইজন্য সন্ধ্যার প্রাক্কালেই সে রাঁধাবাড়ায় মন দিয়াছিল। এমন সময়ে দলের একজন আসিয়া তাহার হাতে একখানা পত্র দিল। সুমিত্রার লেখা, তিনি একটি ছত্রে শুধু এই বলিয়া আহ্বান করিয়াছেন যে, যে-কোন অবস্থায়, যে-কোন কাজ ফেলিয়া রাখিয়াও সে যেন এই পত্রবাহকের সঙ্গে চলিয়া আসে।

সুমিত্রার আদেশ লঙ্ঘন করিবার জো নাই, কিন্তু ভারতী অত্যন্ত বিস্মিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, তাঁর কি হঠাৎ কোন অসুখ করেছে? উত্তরে পত্রবাহক জানাইল, না। নীচে নামিয়া দেখিল দরজায় দাঁড়াইয়া তাহাদের অত্যন্ত সুপরিচিত ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি, কিন্তু গাড়োয়ান বদল হইয়াছে। ইহাকে দেখিয়া মনে হয় না গাড়ি চালানো ইহার পেশা। তা ছাড়া গাড়ি কেন? সুমিত্রার বাসায় যাইতে ত মিনিট-তিনেকের অধিক সময় লাগে না। অধিকতর বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, ব্যাপার কি হীরা সিং? সুমিত্রা কোথায়?

এই হীরা সিং লোকটি তাহাদের পথের-দাবীর সভ্য না হইলেও অতিশয় বিশ্বাসী। জাতিতে পাঞ্জাবী শিখ, পূর্বে হংকঙে পুলিশে চাকরি করিত, এখন রেঙ্গুনে টেলিগ্রাফ আফিসে পিয়নের কাজ করে। সে চুপি চুপি কহিল যে, মাইল চার-পাঁচ দূরে অত্যন্ত গোপন এবং অত্যন্ত জরুরি সভা বসিয়াছে, তাঁহার না যাইলেই নয়। ভারতী আর কোন প্রশ্ন না করিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে গাড়ির সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া যাত্রা করিল। এবং হীরা সিং সরকারী পিয়নের পোশাকে সরকারী দু–চাকার গাড়িতে অন্য পথে প্রস্থান করিল। পথে ভারতীর অনেকবার

মনে হইল সে গাড়ি ফিরাইয়া তাহার রিভলভার সঙ্গে লইয়া আসে, কিন্তু দেরি হইবার ভয়ে আর ফিরিতে পারিল না, অস্ত্রহীন অরক্ষিতভাবেই তাহাকে অনিশ্চিত স্থানের উদ্দেশে অগ্রসর হইয়া যাইতে হইল। গাড়ি যে অত্যন্ত ঘুর-পথে চলিয়াছে তাহা ভিতরে থাকিয়াও ভারতী বুঝিল, এবং কিছুক্ষণেই পথের অসমতলতা ও অসংস্কৃত দুরবস্থা অনুভব করিয়া বুঝিতে পারিল তাহারা শহর ছাড়াইয়া গেছে, কিন্তু ঠিক কোথায় তাহা জানা কঠিন। সঙ্গে ঘড়ি ছিল না কিন্তু অনুমান রাত্রি দশটার কাছাকাছি গাড়ি গিয়া একটা বাগানে প্রবেশ করিয়া থামিল। হীরা সিং পূর্বেই পৌঁছিয়াছিল, সে গাড়ির দরজা খুলিয়া দিল। মাথার উপরে বড় বড় গাছ মিলিয়া অন্ধকার এমনি দুর্ভেদ্য করিয়াছে যে নিজের হাত পর্যন্ত দেখা যায় না, নীচে দীর্ঘ ও অত্যন্ত ঘন ঘাসের মধ্যে পায়ে-হাঁটা পথের একটা চিহ্নমাত্র আছে, এই ভয়ানক পথে হীরা সিং তাহার দু-চাকার গাড়ির ক্ষুদ্র লণ্ঠনের আলোকে পথ দেখাইয়া আগে আগে চলিতে লাগিল। পথে চলিতে ভারতীর সহস্রবার মনে হইতে লাগিল—সে ভাল করে নাই, ভাল করে নাই। এই ভীষণ স্থানে আসিয়া সে ভাল করে নাই। অনতিকাল পরে তাহারা একটা জীর্ণ ভগ্ন অট্টালিকায় আসিয়া পৌঁছিল, অন্ধকারে তাহার আভাসমাত্র দেখিয়াই ভারতী বুঝিল ইহা বহুদিন-পরিত্যক্ত একটা চাউঙ্। কোন্ সুদূর অতীতে বৌদ্ধ-শ্রমণগণ এখানে বাস করিতেন সম্ভবতঃ, কোথাও একটা লোকালয় পর্যন্ত ইহার কাছাকাছি নাই।

এতবড় ভাঙ্গা বাড়ি, এতটুকু আলো নাই, মানুষ নাই, মানুষের চিহ্ন পর্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে—দরজা-জানালা চোরে চুরি করিয়া লইয়া গেছে,—সুমুখের ঘরে ঢুকিতেই বাদুড় ও চামচিকার ভয়ানক গন্ধে ভারতীর দম আটকাইয়া আসিল,—তাহারই মধ্যে দিয়া পথ, বোধ করি কত যে বিষধর সর্প তথায় আশ্রয় লইয়া আছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

মস্ত হল-ঘরের এককোণে উপরে উঠিবার সিঁড়ি। কাঠের সিঁড়ির মাঝে মাঝে কাঠ নাই, এই দিয়া ভারতী হীরার হাত ধরিয়া দ্বিতলে উঠিয়া সুমুখের

বারান্দা পার হইয়া এতক্ষণে এত দুঃখের পরে নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘরের মধ্যে চাটাই পাতা, একধারে গোটা-দুই মোমবাতি জ্বলিতেছে, এবং তাহারই পার্শ্বে সভানেত্রীর আসনে বসিয়া সুমিত্রা। অপর প্রান্তে ডাক্তার বসিয়া ছিলেন, তিনিই সস্নেহ-কণ্ঠে ডাকিয়া কহিলেন, এস ভারতী, আমার কাছে এসে ব'স।

অজানা শঙ্কায় ভারতীর বুকের মধ্যে গুরগুর করিয়া উঠিল, মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, কিন্তু একটুখানি যেন দ্রুতপদেই সে কাছে গিয়া ডাক্তারের বুক ঘেঁষিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার কাঁধের উপর বাঁ হাতখানি রাখিয়া যেন তিনি নিঃশব্দে তাহাকে ভরসা দিলেন। হীরা সিং ঘরে ঢুকিল না; দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। ভারতী চাহিয়া দেখিল, যাহারা বসিয়া আছে পাঁচ-ছয়জনকে সে একেবারেই চেনে না। পরিচিতের মধ্যে ডাক্তার ও সুমিত্রা ব্যতীত রামদাস তলওয়ারকর ও কৃষ্ণ আইয়ার। একজন ভীষণাকৃতি লোককে সর্বাগ্রেই চোখে পড়ে—পরনে তাহার গেরুয়া রঙের আলখাল্লা এবং মাথায় সুবৃহৎ পাগড়ি। মুখখানা বড় হাঁড়ির মত গোলাকার এবং দেহ গণ্ডারের মত স্থূল, মাংসল ও কর্কশ। ভাঁটার মত চোখের উপর ভ্রূর চিহ্নমাত্র নাই, কঠিন শলার মত গোঁফের রোম বোধ করি দূর হইতে গণিয়া বলা যায়, রঙ তামার মত, লোকটা যে অনার্য মোঙ্গল-জাতীয় দৃষ্টিপাতমাত্র তাহাতে সংশয় থাকে না। এই বীভৎস ভয়ানক লোকটার প্রতি ভারতী চোখ তুলিয়া চাহিতেই পারিল না। মিনিট-দুই সমস্ত ঘরটা একেবারে স্তব্ধ হইয়া রহিল, তখন সুমিত্রা ডাকিয়া কহিলেন, ভারতী, তোমার মনের ভাব আমি জানি, তাই তোমাকে ডেকে এনে দুঃখ দেবার আমার ইচ্ছাই ছিল না, কিন্তু ডাক্তার কিছুতেই হতে দিলেন না। অপূর্ববাবু কি করেছেন জানো?

ভারতীর নিভৃত হৃদয়ে এমনিই কি যেন একটা তাহাকে সারাদিন ধরিয়া বলিতেছিল। তাহার কণ্ঠ শুষ্ক ও মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল, শুধু সে নীরবে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

সুমিত্রা কহিলেন, বোথা কোম্পানী রামদাসকে আজ ডিস্মিস্ করেছে। অপূর্বরও সেই দশা হতো শুধু পুলিশ কমিশনারের কাছে আমাদের সমস্ত কথা অকপটে ব্যক্ত করেই তাঁর চাকরিটা বেঁচেছে। মাইনে ত কম নয়, বোধ হয় পাঁচ শ।

রামদাস ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

সুমিত্রা কহিলেন, শুধু এই নয়। পথের-দাবী যে বিদ্রোহীর দল, এবং আমরা যে লুকিয়ে পিস্তল রিভলভার রাখি সে সংবাদও তিনি গোপন করেন নি। এর শাস্তি কি ভারতী?

সেই ভীষণাকৃতি লোকটা গর্জন করিয়া উঠিল, ডেথ্!

এতক্ষণে ভারতী নির্নিমেষ দুই চক্ষু তাহার মুখের প্রতি তুলিয়া স্থির হইয়া রহিল।

রামদাস কহিল, সব্যসাচীই যে ডাক্তার এ খবর তারা জানে। হোটেলের ঘরের মধ্যেই তাঁকে ধরা যেতে পারে অপূর্ববাবু এ কথা জানাতেও ত্রুটি করেন নি। এমন কি, আমি ইতিপূর্বে যে পোলিটিক্যাল অপরাধে বছর-দুই জেল খেটেছি,—তাও।

সুমিত্রা কহিলেন, ভারতী, ডাক্তার ধরা পড়লে তার ফল কি জানো? ফাঁসি। তা যদি না হয়, ট্রান্সপোর্টেশন্! জেন্টেলমেন্! এ অপরাধের কি শাস্তি আপনারা অনুমোদন করেন?

সকলে সমস্বরে কহিল, ডেথ্!

ভারতী তোমার কিছু বলবার আছে?

ভারতী কথা কহিতে পারিল না, শুধু মাথা নাড়িয়া জানাইল তাহার বলিবার কিছু নাই।

সেই ভয়ঙ্কর লোকটা এবার বাংলায় কথা কহিল।

উচ্চারণ শুনিয়া বুঝা গেল সে চট্টগ্রাম অঞ্চলের মগ। বলিল, এক্সিকিউশনের ভার আমি নিলাম। আমি কিন্তু গুলিগোলা, ছুরি-ছোরা বুঝিনে। এই আমার গুলি এবং এই আমার গোলা! এই বলিয়া সে বাঘের মত দুই থাবা মুঠা করিয়া শূন্যে উত্থিত করিল।

কৃষ্ণ আইয়ার দ্বারের দিকে চাহিয়া হীরা সিংকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, বাগানের উত্তর কোণে একটা শুকনো কুয়া আছে—একটু বেশী মাটি চাপা দিয়ে কিছু শুকনো ডালপালা ফেলে দেওয়া চাই। গন্ধ না বার হয়।

হীরা সিং মাথা নাড়িয়া জানাইল যে, কোনরূপ ত্রুটি হইবে না।

তলওয়ারকর কহিল, বাবুজীকে তাঁর দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়ে দেওয়া হোক।

সমবেত জুরির সাহায্যে অপূর্বর অপরাধের বিচার মিনিট-পাঁচেকের মধ্যেই সমাধা হইয়া গেল। বিচারকের রায় যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি স্পষ্ট। না বুঝিবার মত জটিলতা কোথাও নাই। ভারতী সমস্তই শুনিল, কিন্তু তাহার কান ও বুদ্ধির মাঝখানে কোথায় একটা দুর্ভেদ্য প্রাকার দাঁড়াইয়া ছিল, বাহিরের বস্তু যেন কিছুতেই সেটা ভেদ করিয়া আর ভিতরে পৌঁছাইতে পারিতেছিল না। তাই, গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত যে-কেহ কথা কহিতেছিল তাহারই মুখের প্রতি ভারতী ব্যাকুল জিজ্ঞাসু চোখে নির্বোধের মত চাহিয়া দেখিতেছিল। এইটুকু মাত্র সে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল, অপূর্ব গুরুতর অপরাধ করিয়াছে, এবং এই লোকগুলি তাহাকে বধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। এদেশে জীবন তাহার সঙ্কটাপন্ন। কিন্তু এ সঙ্কট যে কিরূপ আসন্ন হইয়াছে, সে তাহার কিছুই বুঝে নাই। সুমিত্রার ইঙ্গিতে একজন উঠিয়া বাহির হইয়া গেল এবং মিনিট-দুই পরে যে দৃশ্য ভারতীর চোখে পড়িল তাহা অতি-বড় দুঃস্বপ্নেরও অতীত। সেই লোকটা অপূর্বকে লইয়া ঘরে ঢুকিল। তাহার দুই হাত পিঠের দিকে শক্ত করিয়া দড়ি দিয়া বাঁধা, এবং কোমর হইতে মস্ত ভারী একখণ্ড পাথর ঝুলিতেছে। মুহূর্তের জন্য চৈতন্য হারাইয়া ভারতী

ডাক্তারের দেহের উপর ঢলিয়া পড়িল। কিন্তু সকলের দৃষ্টি তখন অপূর্বর প্রতি নিবদ্ধ ছিল বলিয়াই শুধু একজন ভিন্ন এ খবর আর কেহ জানিতে পারিল না।

ভারতী এখানে আসিবার পূর্বেই অপূর্বর এজাহার লওয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল। সে অস্বীকার কিছুই করে নাই। আফিসের বড়সাহেব ও পুলিশের বড়সাহেব, এই দুই সাহেবে মিলিয়া তাহার নিকট হইতে সমস্ত তথ্যই জানিয়া লইয়াছে তাহা সে বলিয়াছে, কিন্তু কিসের জন্য যে দলের এবং দেশের এতবড় শত্রুতা সাধন করিল, তাহা সে এখনও জানে না।

আজ বেলা বারোটার মধ্যেই রামদাস এ সংবাদ সুমিত্রার কর্ণগোচর করে। দণ্ড স্থির হইয়া যায়, এবং যে উপায়ে অপূর্বকে হস্তগত করা হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে এইরূপ—

আফিসের ছুটির পরে আজ অপূর্ব হাঁটিয়া বাসায় যাইতে সাহস করিবে না তাহা নিশ্চয় অনুমান করিয়া তাহাদের ভাড়াটে গাড়িখানা হীরার সাহায্যে আফিসের গেটের কাছে রাখা হয়। এই ফাঁদে অপূর্ব সহজেই পা দেয়। কিছুদূর আসিয়া গাড়োয়ান জানায় যে, মস্ত একটা রোলার ভাঙ্গিয়া গলির মোড় বন্ধ হইয়া আছে, ঘুরিয়া যাইতে হইবে। অপূর্ব স্বীকার করে। ইহার পরেই বোধ হয় সে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু ঘণ্টা-খানেক পরে যখন চৈতন্য হয়, তখন হীরা সিং গাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া পিস্তল দেখাইয়া তাহাকে অনায়াসে এখানে লইয়া আসে।

সুমিত্রা ডাকিয়া কহিলেন, অপূর্ববাবু, আমরা আপনাকে ডেথ্ সেন্টেন্স দিলাম। আর কিছু আপনার বলার আছে?

অপূর্ব ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না। কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল সে কিছুই বুঝে নাই।

ডাক্তার এতক্ষণ কোন কথায় প্রায় বলেন নাই, পিছনে চাহিয়া কহিলেন, হীরা, তোমার পিস্তলটা কৈ?

হীরা সিং ইঙ্গিতে সুমিত্রাকে দেখাইয়া দিল, ডাক্তার হাত বাড়াইয়া বলিলেন, পিস্তলটা দেখি সুমিত্রা!

সুমিত্রা বেল্ট হইতে খুলিয়া ডাক্তারের হাতে দিলেন। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, আর কারও কাছে পিস্তল কিংবা রিভলভার আছে?

আর কাহারও কাছে ছিল না তাহা সকলেই জানাইল। তখন সুমিত্রার পিস্তল নিজের পকেটের মধ্যে রাখিয়া ডাক্তার একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, সুমিত্রা, তুমি বললে ডেথ্ সেন্টেন্স আমরা দিলাম। কিন্তু ভারতী ত দেয়নি!

সুমিত্রা একমুহূর্ত ভারতীর মুখের প্রতি চাহিয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, ভারতী দিতে পারে না।

ডাক্তার বলিলেন, পারা উচিতও নয়। তাই না ভারতী?

ভারতী কথা কহিল না, এই কঠিনতম প্রশ্নের উত্তরে সে শুধু উপুড় হইয়া পড়িয়া ডাক্তারের ক্রোড়ের মধ্যে মুখ লুকাইল।

ডাক্তার তাহার মাথার উপর একটা হাত রাখিয়া কহিলেন, অপূর্ববাবু যা করে ফেলেছেন সে আর ফিরবে না—তার ফলাফল আমাদের নিতেই হবে। শাস্তি দিলেও হবে, না দিলেও হবে। কিন্তু আমি বলি তাতে কাজ নেই—ভারতী এঁর ভার নিন। এই দুর্বল মানুষটিকে একটু মজবুত করে গড়ে তুলুন। কি বল সুমিত্রা?

সুমিত্রা কহিলেন, না।

সকলে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, না।

সেই কুদর্শন লোকটাই সর্বাপেক্ষা অধিক আস্ফালন করিল। সে তাহার থাবা-যুগল শূন্যে তুলিয়া ভারতীকে ইঙ্গিত করিয়াই কি একটা বলিয়া ফেলিল।

সুমিত্রা কঠিনকণ্ঠে কহিলেন, আমরা সকলে একমত। এতবড় অন্যায় প্রশ্রয়ে আমাদের সমস্ত ভেঙ্গে-চুরে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে।

ডাক্তার বলিলেন, যদি যায় ত উপায় কি?

সুমিত্রার সঙ্গে সঙ্গেই পাঁচ-সাতজন গর্জিয়া উঠিল, উপায় কি? দেশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য, আমরা কিছুই মানবো না। আপনার একার কথায় কিছুই হতে পারবে না।

গর্জন থামিলে ডাক্তার উত্তর দিলেন। এবার তাঁহার কণ্ঠস্বর আশ্চর্য রকমের শান্ত ও মৃদু শুনাইল। তাহাতে উৎসাহ বা উত্তেজনার বাষ্পও ছিল না, বলিলেন, সুমিত্রা, বিদ্রোহে প্রশ্রয় দিয়ো না। তোমরা ত জানো, আমার একার মত তোমাদের এক শ' জনের চেয়েও বেশী কঠিন। সেই ভয়ঙ্কর লোকটাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ব্রজেন্দ্র তোমার ঔদ্ধত্যের জন্য বাটাভিয়াতে একবার আমাকে তুমি শাস্তি দিতে বাধ্য করেছিলে। দ্বিতীয়বার বাধ্য করো না।

ভারতী মুখ তুলে নাই, তখনও তেমনি পড়িয়া ছিল। কিন্তু তাহার সর্বদেহ থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। পিঠের উপর স্নেহস্পর্শ বুলাইয়া তেমনি সহজ গলায় কহিলেন, ভয় নেই ভারতী, অপূর্বকে আমি অভয় দিলাম।

ভারতী মুখ তুলিল না, ভরসাও পাইল না। তাঁহার দক্ষিণ হস্তের সুদীর্ঘ সরু সরু আঙুলগুলা নিজের মুঠার মধ্যে টানিয়া লইয়া চুপি চুপি বলিল, কিন্তু ওঁরা ত অভয় দিলেন না।

ডাক্তার কহিলেন, সহজে দেবেও না। কিন্তু এ কথা ওরা বোঝে যে, আমি যাকে অভয় দিলাম, তাকে স্পর্শ করা যায় না। একটু হাসিয়া বলিলেন, ভাল খেতে পাইনে ভারতী, আধপেটা খেয়েই প্রায় দিন কাটে,—তবুও ওরা জানে এই ক'টা সরু আঙুলের চাপে আজও ব্রজেন্দ্রের অতবড় বাঘের থাবা গুঁড়ো হয়ে যাবে! কি বল ব্রজেন্দ্র?

চট্টগ্রামী মগ মুখ কালো করিয়া নীরব হইয়া রহিল। ডাক্তার কহিলেন, কিন্তু অপূর্ব যেন না আর এখানে থাকে। ও দেশে যাক। অপূর্ব ট্রেটর নয়, স্বদেশকে ও সমস্ত হৃদয় দিয়েই ভালবাসে, কিন্তু অধিকাংশ,—থাক, স্বজাতির নিন্দা আর করব না,—কিন্তু বড় দুর্বল। ওকে মজবুত করবার ভার তোমাকে

দিলাম সত্য, কিন্তু আমার ভরসা নেই ভারতী। বাড়ি ফিরে গিয়ে ওর আজকের কথা, তোমার কথা, কোনটা ভুলতেই বেশী সময় লাগবে না। যাক সে পরের কথা।

আপাততঃ, আমরা সভানেত্রীকে অনুরোধ করতে পারি আজকের মত সভা ভঙ্গ করা হোক। এই বলিয়া তিনি সুমিত্রার প্রতি চাহিলেন।

সুমিত্রা তাঁহাকে কখনো তুমি, কখনো আপনি বলিয়া সসম্মানে কথা কহিত, এখন সেইভাবেই কহিল, অধিকাংশের মত যেখানে ব্যক্তিবিশেষের গায়ের জোরে পরাভূত হয়, তাকে আর যাই বলুক সভা বলে না। কিন্তু এই নাটক অভিনয় করাবারই যদি আপনার সঙ্কল্প ছিল পূর্বাহ্ণে জানান নি কেন?

ডাক্তার কহিলেন, না হলেই ছিল ভাল, কিন্তু অবস্থাবিশেষে নাটক যদি হয়েও থাকে সুমিত্রা, অভিনয়টা যে ভাল হয়েছে তা তোমাদের স্বীকার করতে হবে।

রামদাস কহিল, এরকম যে হতে পারে আমার ধারণা ছিল না।

ডাক্তার বলিলেন, বন্ধুত্ব জিনিসটা যে এমনি ক্ষণভঙ্গুর সে ধারণাই কি তোমার ছিল তলওয়ারকর? অথচ, এমন সত্যও জগতে দুর্লভ।

কৃষ্ণ আইয়ার কহিল, বর্মার এ্যাক্টিভিটি আমাদের উঠলো। এখন পালাতে হবে।

ডাক্তার বলিলেন, হবে। কিন্তু সময়মত স্থান ত্যাগ করা এবং এ্যাক্টিভিটি ত্যাগ করা এক বস্তু নয় আইয়ার। দীর্ঘকাল কোথাও নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে যদি না পাই, তার জন্যে নালিশ করা আমাদের সাজে না। এই বলিয়া তিনি ভারতীকে ইঙ্গিত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, হীরা সিং, অপূর্ববাবুর বাঁধন খুলে দাও, চল ভারতী, তোমাদের একটু নিরাপদে পৌঁছে দিয়ে আসি।

হীরা সিং আদেশ পালন করিতে অগ্রসর হইলে সুমিত্রা কঠিনকণ্ঠে কহিলেন, অভিনয়ের শেষ অঙ্কে আনন্দে হাততালি দিতে ইচ্ছে করে, কিন্তু এ

নতুন নয়। ছেলেবেলায় কোথায় একটা উপন্যাসে যেন পড়েছিলাম। কিন্তু একটুখানি যেন বাদ রইল। যুগল-মিলন আমাদের সম্মুখে হয়ে গেলে অভিনয়ে আর কোথাও খুঁত থাকতো না। কি বল ভারতী?

ভারতী লজ্জায় মরিয়া গেল। ডাক্তার কহিলেন, লজ্জা পাবার এতে কিছুই নেই ভারতী। বরঞ্চ আমি কামনা করি অভিনয় সমাপ্ত করবার মালিক যিনি তিনি যেন একদিন কোথাও এর খুঁত না রাখেন। পকেট হইতে সুমিত্রার পিস্তলটা বাহির করিয়া তাহার কাছে রাখিয়া দিয়া বলিলেন, আমি এদের পৌঁছে দিতে চললাম, কিন্তু ভয় নেই, আমার কাছে আর একটা গাদা পিস্তল রইল। ব্রজেন্দ্রের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া সহাস্যে কহিলেন, তোমরা ত সবাই তামাশা করে বলতে, অন্ধকারে আমি প্যাঁচার মত দেখতে পাই—আজ যেন কেউ সে কথা ভুলো না। এই বলিয়া তিনি একটা প্রচ্ছন্ন ভয়ঙ্কর ইঙ্গিত করিয়া ভারতী ও অপূর্বকে লইয়া বাহির হইতে উদ্যত হইলেন।

সুমিত্রা অকস্মাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন, ফাঁসির দড়িটা কি নিজের হাতে গলায় না পরলেই হত না ?

ডাক্তার হাসিয়া কহিলেন, সামান্য একটা দড়িকে ভয় করলে চলবে কেন সুমিত্রা?

কোন একটা কার্যের পূর্বে এই মানুষটিকে মৃত্যুর ভয় দেখাইতে যাওয়া যে কত বড় বাহুল্য ব্যাপার তা স্মরণ করিয়া সুমিত্রা নিজেই লজ্জিত হইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, সমস্ত ত ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, কিন্তু আবার কখন দেখা হবে ?

ডাক্তার বলিলেন, প্রয়োজন হলেই হবে।

সে প্রয়োজন কি হয়নি ?

হয়ে থাকলে নিশ্চয়ই দেখা হবে। এই বলিয়া তিনি অপূর্ব-ভারতীকে সঙ্গে করিয়া সাবধানে নীচে নামিয়া গেলেন।

যে গাড়ি ভারতীকে আনিয়াছিল তাহা অপেক্ষা করিতেছিল। সুনিদ্রা হইতে গাড়োয়ান প্রভুকে তুলিয়া ইহাতেই তিনজনে যাত্রা করিলেন। বহুক্ষণের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া এইবার ভারতী কথা কহিল। জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, আমরা কোথায় যাচ্চি?

অপূর্ববাবুর বাসায়,—এই বলিয়া ডাক্তার গাড়ি হইতে মুখ বাড়াইয়া অন্ধকারে যতদূর দৃষ্টি যায় দেখিয়া লইয়া স্থির হইয়া বসিলেন। মাইল-দুই নিঃশব্দে চলার পরে গাড়ি থামাইয়া ডাক্তার নামিতে উদ্যত হইলে ভারতী আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এখানে কেন?

ডাক্তার বলিলেন, এইবার ফিরি। ওঁরা অপেক্ষা করে আছেন, একটা বোঝাপড়া হওয়া ত চাই!

বোঝাপড়া? ভারতী আকুল হইয়া তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, সে কিছুতেই হতে পারবে না। তুমি সঙ্গে চল। কিন্তু কথাটা উচ্চারণ করিয়া সে সুমিত্রার মতই অপ্রতিভ হইল। কারণ, ইঁহার বলা মানেই স্থির করিয়া বলা। এবং সংসারের কোন ভয়ই তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিবে না। তথাপি ভারতী হাত ছাড়িয়াও দিল না, ধীরে ধীরে কহিল, কিন্তু তোমাকে যে আমার বড় দরকার দাদা!

সে আমি জানি। অপূর্ববাবু, আপনি কি পরশুর জাহাজে বাড়ি যেতে পারবেন না?

অপূর্ব কহিল, পারবো।

ভারতী হঠাৎ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল, কহিল, দাদা, এখনই আমাকে বাসায় যেতে হবে।

ডাক্তার ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিলেন, না। তোমার কাগজপত্র, তোমার পথের-দাবীর খাতা, তোমার পিস্তল-টোটা সমস্তই এতক্ষণে নবতারা সরিয়ে নিয়ে গেছে। ভোর নাগাদ খানাতল্লাশী হবে, -আর্টিস্ট স্বয়ং সশরীরে,—তার ধেনো-

মদের বোতল, আর তার সেই ভাঙ্গা বেহালাখানা—অপূর্ববাবু, আপনার সে বেহালাটার ওপর একটু দাবী আছে, না? এই বলিয়া একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, এ ছাড়া ভয়ানক কিছু আর পুলিশ সাহেবের হাতে পড়বে না। কাল নটা-দশটা আন্দাজ বাসায় ফিরে রাঁধাবাড়া খাওয়া-দাওয়া সেরে বোধ করি একটুখানি ঘুম দেবারও সময় পাবে ভারতী। রাত্রি দুটো-তিনটে নাগাদ দেখা পাবে—কিছু খাবার-দাবার রেখো।

ভারতী অবাক হইয়া রহিল। মনে মনে বলিল, এমন একান্ত সজাগ না হইলে কি এই মরণ-যজ্ঞে কেহ সঙ্গে আসিতে চাহিত? মুখে কহিল, তোমার চোখে কিছু এড়ায় না, তুমি সকলের ভাল-মন্দই চিন্তা কর। সংসারে আমার আপনার কেউ নেই, তোমার পথের-দাবী থেকে আমাকে বিদায় দিও না দাদা।

অন্ধকারের মধ্যেই ডাক্তার বারংবার মাথা নাড়িয়া কহিলেন, ভগবানের কাজ থেকে বিদায় দেবার অধিকার কারও নেই, কিন্তু এর ধারা তোমাকে বদলে নিতে হবে।

ভারতী কহিল, তুমিই বদলে দিয়ো।

ডাক্তার এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না, সহসা ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, ভারতী, আর আমার সময় নেই, আমি চললাম। এই বলিয়া অন্ধকার পথে মুহূর্তে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

কুড়ি

গাড়ি চলিবার উপক্রম করিতেই ভারতী অপূর্বর বাসার ঠিকানা বলিয়া দিতে মুখ বাড়াইয়া কহিল, দেখো গাড়োয়ান, ত্রিশ নম্বর—

তাহার কথা শেষ না হইতেই গাড়োয়ান বলিয়া উঠিল, আই নো—আই নো।

গাড়ির পরিসর ছোট বলিয়া দুজনে ঘেঁষাঘেঁষি বসিয়াছিল, গাড়োয়ানের মুখের ইংরাজী কথায় অপূর্বর সমস্ত দেহ যে শিহরিয়া উঠিল ভারতী তাহা স্পষ্ট অনুভব করিল। ইহার পরে প্রায় ঘণ্টা-খানেক ধরিয়া ঘড়র্-ঘড়র্ ছড়র্-ছড়র্ করিয়া ভাড়াটে গাড়ি চলিতেই লাগিল, কিন্তু উভয়ের মধ্যে কোন কথাই হইল না। অন্ধকার নিঃশব্দ নিশীথে গাড়ির চাকা ও পথের পাথরের সংঘর্ষে যে কঠোর শব্দ উঠিতে লাগিল, তাহাতে অপূর্বর সর্বাঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে কাঁটা দিয়া কেবলই ভয় হইতে লাগিল, পাড়ার কাহারও ঘুম ভাঙ্গিতে আর বাকী থাকিবে না, এবং শহরের সমস্ত পুলিশ ছুটিয়া আসিল বলিয়া। কিন্তু কোন দুর্ঘটনা ঘটিল না, গাড়ি আসিয়া বাসার দরজায় থামিল। ভারতী ভিতরে হইতে গাড়ির দরজা খুলিয়া দিয়া অপূর্বকে নামিতে ইঙ্গিত করিয়া নিজেও তাহার পিছনে পিছনে নামিয়া আসিয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কত ভাড়া?

গাড়োয়ান একটুখানি হাসিয়া কহিল, নট্ এ পাইস। পরক্ষণেই বার-দুই মাথা নাড়িয়া বলিল, গুড নাইট্ টু ইউ! এই বলিয়া গাড়ি হাঁকাইয়া দিয়া সোজা বাহির হইয়া গেল।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, তেওয়ারী আছে ত?

আছে।

উপরে উঠিয়া দ্বারে করাঘাত করিয়া অপূর্ব তেওয়ারীর ঘুম ভাঙ্গাইল। কবাট খুলিয়া তেওয়ারী দীপালোকে প্রথমেই দেখিতে পাইল ভারতীকে। কাল অপূর্ব বাসায় ফিরিয়াছিল প্রায় ভোরবেলায়, আজ ফিরিয়াছে রাত্রি শেষ করিয়া। সঙ্গে আছে ভারতী। তাই বুঝিতে তেওয়ারীর বাকী কিছুই রহিল না; ক্রোধে সর্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল এবং একটা কথাও না কহিয়া সে দ্রুতবেগে নিজের বিছানায় গিয়া চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল। এই মেয়েটিকে তেওয়ারী ভালবাসিত। একদিন তাহাকে আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিল বলিয়া খ্রীষ্টান হওয়া সত্ত্বেও মনে মনে শ্রদ্ধা করিত। কিন্তু, কিছুদিন হইতে ব্যাপার যেরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে অপূর্বর সম্বন্ধে নানাপ্রকার অসম্ভব দুশ্চিন্তা তেওয়ারীর মনে উঠিতেছিল,—এমন কি জাতিনাশ পর্যন্তও। সেই সর্বনাশের প্রকট মূর্তি আজ যেন তেওয়ারীর মানসপটে একেবারে মুদ্রিত হইয়া গেল। তাহাকে এমন করিয়া শুইয়া পড়িতে দেখিয়া কেবল অভ্যাসবশতঃই অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, দোর দিলিনি তেওয়ারী?

তাহার মূর্ছাহত উদ্ভ্রান্ত চিত্ত লক্ষ্য কিছুই করে নাই, কিন্তু লক্ষ্য করিয়াছিল ভারতী। সে-ই তাড়াতাড়ি জবাব দিল, আমি বন্ধ করে দিচ্ছি।

অপূর্ব শোবার ঘরে আসিয়া দেখিল, খাটের উপর শয্যা তেমনি গুটানো রহিয়াছে, পাতা হয় নাই। বস্তুতঃ বারান্দায় বসিয়া পথ চাহিয়া থাকিতেই আজ তেওয়ারীর সমস্ত সন্ধ্যাটা গিয়াছে, বিছানা করার কথা মনেও পড়ে নাই। কিন্তু সে উত্তর দিবার পূর্বেই ভারতী ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, আপনি আরামকেদারাটায় একটুখানি বসুন, আমি এক মিনিটে সব ঠিক করে দিচ্চি।

চেয়ারে হেলান দিয়া পড়িয়া অপূর্ব পুনশ্চ ডাকিল, এক গেলাস জল দে তো তেওয়ারী।

তাহার পাশের টুলের উপরেই খাবার জলের কুঁজা ও গেলাস ছিল, বিছানা পাতিতে পাতিতে তাহা দেখাইয়া দিয়া ভারতী বলিল, ঘুমন্ত মানুষকে আর কেন তুলবেন অপূর্ববাবু, আপনি নিজেই একটু ঢেলে নিন।

অপূর্ব হাত বাড়াইয়া কুঁজাটা তুলিতে গিয়া তুলিতে পারিল না; তখন উঠিয়া আসিয়া কোন মতে জল গড়াইয়া লইয়া এক নিঃশ্বাসে তাহা পান করিয়া পুনরায় বসিতে যাইতেছিল, ভারতী মানা করিয়া কহিল, আর ওখানে না, একেবারে বিছানায় শুয়ে পড়ুন।

অপূর্ব শান্ত বালকের ন্যায় নিঃশব্দে আসিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল। ভারতী মশারি ফেলিয়া ধারগুলা ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিতেছিল, অপূর্ব হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোথায় শোবে?

আমি? ভারতী কিছু আশ্চর্য হইল। কারণ, এরূপ ঘটনা নূতনও নয়, এবং এ ঘরের কোথায় কি আছে তাহাও তাহার অবিদিত নয়। এই অনাবশ্যক প্রশ্নের উত্তরে সে শুধু আরামচৌকিটা দেখাইয়া দিয়া বলিল, সকাল হতে আর ঘণ্টা-দুই মাত্র দেরি আছে। ঘুমোন।

অপূর্ব হাত বাড়াইয়া তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, না ওখানে নয়, তুমি আমার কাছে বস।

আপনার কাছে? বাস্তবিকই ভারতীর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। অপূর্ব আর যাহাই হউক, এ-সকল ব্যাপারে কখনও আত্মবিস্মৃত হইত না। এমন কতদিন কত উপলক্ষেই ত তাহারা একঘরে রাত্রি যাপন করিয়াছে, কিন্তু মর্যাদাহানিকর একটা কথা একটা ইঙ্গিতও কোন দিন তাহার আচরণে প্রকাশ পায় নাই।

অপূর্ব কহিল, এই দেখ এরা আমার হাত ভেঙ্গে দিয়েচে। কেন তুমি এদের মধ্যে আমাকে টেনে আনলে? তাহার কথার শেষ দিকটা অকস্মাৎ কান্নায় রুদ্ধ হইয়া গেল। ভারতী মশারির একটা দিক তুলিয়া দিয়া তাহার কাছে বসিল,

পরীক্ষা করিয়া দেখিল, বহুক্ষণ ধরিয়া শক্ত বাঁধনের ফলে হাতের স্থানে স্থানে কালশিরা পড়িয়া ফুলিয়া আছে। চোখ দিয়া তাহার জল পড়িতেছিল, ভারতী আঁচল দিয়া তাহা মুছাইয়া লইয়া সাহস দিয়া বলিল, কিচ্ছু ভয় নেই, তোয়ালে ভিজিয়ে আমি ভাল করে জড়িয়ে দিচ্চি, দু-একদিনেই সমস্ত ভাল হয়ে যাবে। এই বলিয়া সে উঠিয়া গিয়া স্নানের ঘর হইতে একটা গামছা ভিজাইয়া আনিল, এবং সমস্ত নীচের হাতটা বাঁধিয়া দিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন, আমি আপনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্চি। এই বলিয়া সে ধীরে ধীরে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

অপূর্ব অশ্রুবিকৃতস্বরে বলিল, কাল জাহাজ থাকলে আমি কালই চলে যেতুম।

ভারতী কহিল, বেশ ত, পরশুই যাবেন। একটা দিনের মধ্যে আপনার কোন অমঙ্গল হবে না।

অপূর্ব ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিতে লাগিল, গুরুজনের কথা না শুনলেই এই-সব ঘটে। মা আমাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করেছিলেন।

মা বুঝি আপনাকে আসতে দিতে চাননি?

না, এক শ’ বার মানা করেছিলেন, কিন্তু আমি শুনিনি। তার ফল হল এই যে, কতকগুলো ভয়ানক লোকের একেবারে চিরকালের জন্য বিষদৃষ্টিতে পড়ে রইলুম। সে যা হবার হবে, দুর্গা দুর্গা বলে পরশু একবার জাহাজে উঠতে পারলে হয়। এই বলিয়া সে সহসা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল। কিন্তু সেই সঙ্গে যে ইহা অপেক্ষাও শতগুণ গভীর নিঃশ্বাস আর একজনের হৃদয়ের মূল পর্যন্ত নিঃশব্দে তরঙ্গিত হইয়া উঠিল, তাহা সে জানিতেও পারিল না। আর একটা দিনও যেন না অপূর্বর বিলম্ব ঘটে, দুর্গা দুর্গা বলিয়া একবার সে জাহাজে উঠিতে পারিলে হয়! বর্মায় আসা তাহার সর্বাংশেই বিফল হইয়াছে, বাড়ি গিয়া এ দেশের জন-কয়েকের বিষদৃষ্টির কথাই শুধু তাহার চিরদিন স্মরণে থাকিবে, কিন্তু সকল চক্ষুর

অন্তরালে একজনের কুণ্ঠিত দৃষ্টির প্রতিবিন্দু হইতেই যে নীরবে অমৃত ঝরিয়াছে, একটা দিনও হয়ত সে কথা তাহার মনে পড়িবে না।

অপূর্ব কহিতে লাগিল, এ বাড়িতে পা দিয়েই তোমার বাবার সঙ্গে ঝগড়া হল, কোর্টে জরিমানা পর্যন্ত হয়ে গেল যা জন্মে কখনো আমার হয়নি। এর থেকেই আমার চৈতন্য হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হল না।

ভারতী চুপ করিয়া ছিল, চুপ করিয়াই রহিল। অপূর্ব নিজেও একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া তাহার দুরদৃষ্টের সুত্র ধরিয়া বলিল, তেওয়ারী আমাকে বার বার সাবধান করেছিল,—বাবু, ওরা এক জাত, আমরা এক জাত, এ-সব করবেন না।

কিন্তু কপালে দুর্ভোগ থাকলে কে খণ্ডাবে বল? চাকরি সেই গেল,—পাঁচ শ' টাকা মাইনে এ বয়সে কটা লোকে পায়? তাছাড়া এ হাত আমি লোকের সুমুখে বার করব কি করে?

ভারতী আস্তে আস্তে বলিল, ততদিনে হাতের দাগ ভাল হয়ে যাবে। ইহার বেশী কথা মুখ দিয়া তাহার বাহির হইল না। মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিল, সে হাত আর চলিতে চাহিল না, এবং এই অত্যন্ত সাধারণ তুচ্ছ লোকটাকে সে মনে মনে ভালবাসিয়াছে মনে করিয়া নিজের কাছেই যেন সে লজ্জায় মরিয়া গেল। এ কথা দলের অনেকেই জানিয়াছে আজ অপূর্বর প্রাণ বাঁচাইতে গিয়া তাহাদের কাছে অপরাধী এবং সুমিত্রার চক্ষে সে ছোট হইয়া গেছে, কিন্তু এই অতি তুচ্ছ মানুষটাকে হত্যা করিবার অসম্মান ও ক্ষুদ্রতা হইতে সে যে তাহাদের রক্ষা করিতে পারিয়াছে ইহাই মনে করিয়া এখন তাহার গর্ব বোধ হইল।

অপূর্ব বলিল, দাগ সহজে যাবে না। কেউ জিজ্ঞাসা করলে যে কি জবাব দেব জানিনে। কিন্তু শ্রোতার নিকট হইতে সায় না পাইয়া আপনিই কহিতে লাগিল, সকলে ভাববে কাজ চালাতে আমি পারলুম না। তাইত লোকে বলে, বাঙালীর ছেলেরা বি. এ. এম. এ পাশ করে বটে, কিন্তু বড় চাকরি পেলে রাখতে

পারে না। আমার কলেজের ছেলেরা আমাকে ছি ছি করতে থাকবে, আমি উত্তর দিতে পারব না।

যাহোক কিছু একটা বানিয়ে বলে দেবেন। আচ্ছা, আপনি ঘুমোন। এই বলিয়া ভারতী উঠিয়া দাঁড়াইল।

আর একটু মাথায় হাত বুলিয়ে দাও না ভারতী!

না, আমি বড় ক্লান্ত।

তবে থাক, থাক। রাতও আর নেই।

ভারতী পাশের ঘরে আসিয়া দেখিল, আলোটা তখনও মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে, এবং তেওয়ারী তেমনি চাদর মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছে। অদূরে ভাঙাগোছের একখানা ডেকচেয়ার পড়িয়া ছিল, তাহাতেই আসিয়া সে উপবেশন করিল। অপূর্বর ঘরে ভাল আরামচৌকি ছিল কিন্তু ওই লোকটিকে সুমুখে রাখিয়া একই ঘরের মধ্যে রাত্রিযাপন করিতে আজ তাহার অত্যন্ত ঘৃণা বোধ হইল। ডেকচেয়ারটায় কোনমতে একটু হেলান দিয়া পড়িয়া মনের মধ্যে যে তাহার কি করিতে লাগিল তাহার সীমা নাই। ইতিপূর্বে এই ঘরের মধ্যেই সে একাধিক বার কঠিন ধাক্কা-খাইয়াছে, কিন্তু আজিকার সহিত তাহার তুলনাই হয় না। ভারতীর প্রথমেই মনে হইল, কি করিয়া এবং কাহার অপরিসীম করুণায় অপূর্ব সুনিশ্চিত ও প্রত্যাসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে আজ রক্ষা পাইল, অথচ রাত্রিটাও প্রভাত হইল না, এতবড় কথাটা সে ভুলিয়াই গেল। তাহার পরম বন্ধু তলওয়ারকরের প্রতি, দলের প্রতি এবং বিশেষ করিয়া ওই ডাক্তার লোকটির প্রতি যে কি অপরিসীম অপরাধ করিয়াছে সে কথাই তাহার মনে নাই। সেখানে বড় চাকরি ও হাতের দাগটাই তাহার সমস্ত স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে। সেইখানে বসিয়া হঠাৎ ভারতীর চোখে পড়িল, সুমুখের খোলা জানালার ফাঁক দিয়া ভোরের আলো দেখা দিয়াছে। সে মুহূর্তে উঠিয়া নিঃশব্দে দ্বার খুলিল, এবং কদর্য, অস্বাভাবিক ও অপ্রত্যাশিত

স্থানে মাতালের নেশা কাটিয়া গেলে সে যেমন করিয়া মুখ ঢাকিয়া পলায়ন করে, ঠিক তেমনি করিয়া সে দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

একুশ

পরদিন অপরাহ্নবেলায় সকল কথা, সমস্ত ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত করিয়া ভারতী পরিশেষে কহিল, অপূর্ববাবু যে মস্ত লোক এ ভুল আমি একদিনও করিনি, কিন্তু তিনি যে এত সামান্য, এত তুচ্ছ,— এ ধারণাও আমার ছিল না।

ভারতীর ঘরে খাটের উপর বসিয়া সব্যসাচী ডাক্তার একখানা বইয়ের পাতা উলটাইতেছিলেন, তাহার প্রতি চাহিয়া গম্ভীরমুখে কহিলেন, কিন্তু আমি জানতাম। লোকটা এত তুচ্ছ না হলে কি এতবড় ভালবাসা তোমার এত তুচ্ছ কারণেই যায়? যাক, বাঁচা গেল ভাই, কাকে কি ভেবে মিথ্যে দুঃখ পাচ্ছিলে বৈ ত নয়!

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জিনিসপত্র, বিশেষ করিয়া মেঝের উপর ছড়ানো পুস্তকের রাশি চাহিয়া দেখিলেই বুঝা যায় এ ঘরে ইতিপূর্বে পুলিশ-তদন্ত হইয়া গেছে। সেইগুলা সব গুছাইতে গুছাইতে ভারতী কথা কহিতেছিল। সে হাতের কাজ বন্ধ করিয়া সবিস্ময়ে চোখ তুলিয়া বলিল, তুমি তামাশা করচ দাদা?

না।

নিশ্চয়।

ডাক্তার কহিলেন, আমার মত ভয়ানক লোক, যে বোমা-পিস্তল কেবল মানুষ খুন করে বেড়ায়, তার মুখে তামাশা?

ভারতী কহিল, আমি ত বলিনে তুমি মানুষ খুন করে বেড়াও! ও-কাজ তুমি পারোই না। কিন্তু তামাশা ছাড়া এ কি হতে পারে বলত? ঘণ্টা দুই-তিনের মধ্যেই যে সব ভুলে গিয়ে মনে রাখলে শুধু হাতের দাগ আর পাঁচ শ’ টাকার চাকরি, তার চেয়ে অধম, ক্ষুদ্র ব্যক্তি আর ত আমি দেখতে পাইনে। তুমি বলছিলে এ আমার মোহ। ভাল, তাই যদি হয়, তুমি আশীর্বাদ কর, এ মোহ আমার

চিরদিনের মত কেটে যাক, আমি সমস্ত দেহ-মন দিয়ে তোমার দেশের কাজে লেগে যাই।

ডাক্তারের ওষ্ঠাধর চাপা হাসিতে বিকশিত হইয়া উঠিল, কহিলেন, তোমার মুখের ভাষাটা যে মোহ কাটার মতই তাতে আমার সন্দেহ নেই, কিন্তু মুশকিল এই যে কণ্ঠস্বরে তার আভাসটুকু পর্যন্ত নেই। তা সে যাই হোক, ভারতী, তোমাকে দিয়ে আমার দেশের কাজ কিন্তু এক তিলও হবে না। তার চেয়ে তোমার অপূর্ববাবুই ঢের ভাল। দেনাপাওনার চুলচেরা বিচার করতে করতে বোঝাপড়া একদিন তোমাদের হয়ে যেতেও পারে। বরঞ্চ, তাই কর গে।

ভারতী কহিল, তার মানে দেশকে আমি ভালবাসতে পারব না?

ডাক্তার হাসিমুখে কহিলেন, অনেক পরীক্ষা না দিলে কিন্তু ঠিক করে কিছুই বলা যায় না ভাই।

ভারতী ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া সহসা জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, এই তোমাকে আজ বলে রাখলাম দাদা, সমস্ত পরীক্ষাতেই আমি উত্তীর্ণ হতে পারবো। তোমার কাজের মধ্যে এত স্বার্থ, এত সংশয়, এতবড় ক্ষুদ্রতার স্থান নেই।

তাহার উত্তেজনায় ডাক্তার হাসিলেন, পরে ক্রীড়াচ্ছলে নিজের ললাটে করাঘাত করিয়া বলিলেন, হা আমার পোড়া কপাল! দেশ মানে কি বুঝে রেখেচ খানিকটা মস্তবড় মাটি, নদ-নদী আর পাহাড়? একটিমাত্র অপূর্বকে নিয়েই জীবনে ধিক্কার জন্মে গেল, বৈরাগী হতে চাও, আর সেখানে কেবল শত-সহস্র অপূর্বই নয়, তার দাদারাও বিচরণ করেন। আরে পরাধীন দেশের সব চেয়ে বড় অভিসম্পাতই তো হলো কৃতঘ্নতা! যাদের সেবা করবে তারাই তোমাকে সন্দেহের চোখে দেখবে, প্রাণ যাদের বাঁচাবে, তারাই তোমাকে বিক্রি করে দিতে চাইবে! মূঢ়তা আর অকৃতজ্ঞতা প্রতি পদক্ষেপে তোমায় ছুঁচের মত বিঁধবে। শ্রদ্ধা নেই,

স্নেহ নেই, সহানুভূতিই নেই, কেউ কাছে ডাকবে না, কেউ সাহায্য করতে আসবে না, বিষধর সাপের মত তোমাকে দেখে লোকে দূরে সরে যাবে।

দেশকে ভালবাসার এই আমাদের পুরস্কার, ভারতী, এর বেশী দাবী করবার কিছু যদি থাকে, ত সে শুধু পরলোকে। এতবড় ভয়ানক পরীক্ষা তুমি কিসের জন্যে দিতে যাবে, বোন? বরঞ্চ, আশীর্বাদ করি অপূর্বকে নিয়ে তুমি সুখী হও,—আমি নিশ্চয় জানি, তার সকল দ্বিধা, সকল সংস্কার ছাপিয়ে তোমার মূল্য একদিন তার চোখে পড়বেই পড়বে।

ভারতীর দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত নীরবে নতমুখে থাকিয়া প্রবল চেষ্টায় তাহা নিবারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করতে পার না বলেই কোনমতে আমাকে বিদায় করে দিতে চাও দাদা?

তাহার এই একান্ত সরল নিঃসঙ্কোচ প্রশ্নের এমনি সোজা উত্তর বোধ হয় ডাক্তারের মুখে আসিল না, হাসিয়া বলিলেন, তোমার মত লক্ষ্মী মেয়ের মায়া কি সহজে কেউ কাটাতে পারে বোন? কিন্তু, কাল স্বচক্ষেই ত দেখতে পেলে এর মধ্যে কত লুকোচুরি, কত হিংসে, কত মর্মান্তিক ক্রোধ জরিয়ে রয়েছে। তোমার পানে চাইলেই মনে হয় এ-সবের জন্যে তুমি নও, এর মধ্যে টেনে এনে তোমাকে ভাল কাজ হয়নি। শুধু তোমার কাছে কাজ আদায়ের আমার একটা দিন আছে, যেদিন ছুটি নেবার আমার তলব এসে পৌঁছবে।

ভারতী এবার আর তাহার চোখের জল বারণ করিতে পারিল না। কিন্তু তখনই হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, তুমিও আর এদের মধ্যে থেকো না দাদা।

তাহার কথা শুনিয়া ডাক্তার হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, এবার কিন্তু বড় বোকার মত কথা হয়ে গেল ভারতী।

ভারতী অপ্রতিভ হইল না, কহিল, তা জানি, কিন্তু এরা সবাই যে ভয়ঙ্কর নির্দয়।

আর আমি?

তুমিও ভারী নিষ্ঠুর।

সুমিত্রাকে কি রকম মনে হল ভারতী?

এই প্রশ্ন শুনিয়া ভারতীর মাথা হেঁট হইয়া গেল। লজ্জায় উত্তর দিতে সে পারিল না, কিন্তু উত্তরের জন্য তাগিদও আসিল না। কিছুক্ষণের জন্য উভয়েই নীরব হইয়া রহিল। বেশীক্ষণ নয়, কিন্তু এইটুকু মাত্র মৌনতার অবকাশ-পথ দিয়া এই অত্যাশ্চর্য মানুষটির ততোধিক আশ্চর্য হৃদয়ের রহস্যাবৃত তলদেশে অকস্মাৎ বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল।

কিন্তু পরক্ষণেই ডাক্তার সমস্ত ব্যাপারটাকে চাপা দিয়া ফেলিলেন। সহসা ছেলেমানুষের মত মাথা নাড়িয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন, অপূর্বকে তুমি অবিচার করেছ ভারতী। এতবড় মারাত্মক কাণ্ড এর ভেতরে আছে সে বেচারা বোধ করি কল্পনাও করেনি। বাস্তবিক বলচি তোমাকে, এত ছোট, এত হীন সে কখনো নয়। চাকরি করতে বিদেশে এসেছে, বাড়িতে মা আছে, ভাই আছে, দেশে বন্ধু-বান্ধব আছে, সাংসারিক উন্নতির জন্য দশজনের একজন হবে এই তার আশা। লেখাপড়া শিখেচে, ভদ্রলোকের ছেলে পরাধীনতার লজ্জা সে অনুভব করে। আরো দশজন বাঙালীর ছেলের মত সত্য সত্যই সে স্বদেশের কল্যাণ প্রার্থনা করে। তাই তুমি বললে যখন পথের-দাবীর সভ্য হও, দেশের কাজ করো, সে বললে, বহুৎ আচ্ছা! তোমার কথা শুনলে যে তার কখনো মন্দ হবে না এইটুকুই কেবল সে নিঃসংশয়ে বোঝে। এই বিদেশে সকল আপদে-বিপদে তুমিই তার একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু সেই তুমিই যে হঠাৎ তাকে মরণের মধ্যে ঠেলে দেবে সে তার কি জানত, বল?

ভারতী অশ্রু গোপন করিতে মুখ নীচু করিয়া কহিল, কেন তুমি তাঁর জন্যে এত ওকালতি করচ দাদা, তিনি তার যোগ্য নন। যে-সব কথা তাঁর মুখ থেকে কাল শুনেচি, তারপরেও তাঁকে শ্রদ্ধা করা আর উচিত নয়।

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, অনুচিত কাজই না হয় জীবনে একটা করলে। এই বলিয়া একটুখানি স্থির থাকিয়া কহিতে লাগিলেন, তুমি ত চোখে দেখনি, ভারতী, কিন্তু আমি দেখেচি। তারা যখন তাকে দড়ি দিয়ে বাঁধলে সে অবাক হয়ে রইল।

তারা জিজ্ঞাসা করলে, তুমি এই সমস্ত বলেছ? সে ঘাড় নেড়ে বললে, হাঁ। তারা বললে, এর শাস্তি—তোমাকে মরতে হবে। প্রত্যুত্তরে সে কেবল ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। আমি ত জানি তার বিহ্বল দৃষ্টি তখন কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। তাই ত তোমাকে আনতে পাঠিয়েছিলাম বোন। এখন যাই কেননা তোমাকে সে বলে থাক, ভারতী, এ ধাক্কা বোধ হয় আজও অপূর্ব কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

ভারতী আর আপনাকে সংবরণ করিতে পারিল না, ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, কেন আমাকে তুমি এই-সব শোনাচ্চ দাদা? তোমার চেয়ে কারও আশঙ্কা বেশী নয়, তাঁর আচরণে বেশী বিপদে তোমার চেয়ে কেউ পড়েনি। তবুও কেবল আমার মুখ চেয়ে তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে তুমি ঘরে-বাইরে শত্রু তৈরি করলে!

ইস্! তাই বৈ কি!

তবে কিসের জন্যে তাঁকে বাঁচাতে গেলে বলত?

বাঁচাতে গেলাম অপূর্বকে? আরে ছিঃ! আমি বাঁচাতে গেলাম ভগবানের এই অমূল্য সৃষ্টিটিকে। যে বস্তু তোমাদের মত এই দুটি সামান্য নর-নারীকে উপলক্ষ করে গড়ে উঠেছে তার কি দাম নেই নাকি যে, ব্রজেন্দ্রের মত বর্বরগুলোকে দেব তাই নষ্ট করে ফেলতে?—শুধু এই ভারতী, শুধু এই! নইলে মানুষের প্রাণের মূল্য আছে নাকি আমাদের কাছে? একটা কানাকড়িও না! এই বলিয়া ডাক্তার হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

ভারতী চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, কি হাসো দাদা, তোমার হাসি দেখলে আমার গা জ্বলে যায়। আমার এমন ইচ্ছে করে যে তোমাকে আঁচল-চাপা দিয়ে কোন বনে-জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে চিরকাল লুকিয়ে রেখে দি। যারা ধরে তোমাকে ফাঁসি দেবে তারাই কি তোমার দাম জানে? তারা কি টের পাবে জগতের কি সর্বনাশ তারা করলে? নিজের দেশের লোকই তোমাকে খুনে, ডাকাত, রক্তপিপাসু,—কত কথাই না বলে! কিন্তু আমি ভাবি, বুকের মধ্যে এত স্নেহ, এত করুণা নিয়ে তুমি কেমন করে এর মধ্যে আছ!

এইবার ডাক্তার আর একদিকে চাহিয়া রহিলেন, সহসা জবাব দিতে পারিলেন না। তারপরে মুখ ফিরাইয়া হাসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু এখন সেই স্বচ্ছন্দ সুন্দর হাসিটি মুখে ফুটিল না। কথা কহিলেন, কিন্তু সেই সহজ কণ্ঠস্বরে কোথা হইতে একটা অপরিচিত ভার চাপিয়া আসিল, কহিলেন, নিষ্ঠুরতা দিয়ে কি কখনো,—আচ্ছা থাক সে কথা। তোমাকে একটা গল্প বলি। নীলকান্ত যোশী বলে একটি মারহাট্টা ছেলেকে তুমি দেখোনি, কিন্তু তোমাকে দেখে পর্যন্ত কেবলি আমার তাকেই মনে পড়ে। রাস্তা দিয়ে মড়া নিয়ে যেতে দেখলে তার চোখ দিয়ে জল পড়তো। একদিন রাত্রে কলম্বোর একটা পার্কের মধ্যে আমরা দুজনে বেড়া ডিঙিয়ে আশ্রয় নিই। গাছতলার একটা বেঞ্চের উপরে শুতে গিয়ে দেখি আর একজন শুয়ে আছে। মানুষের সাড়া পেয়ে সে জল জল করতে লাগলো, চারিদিকে ভয়ানক দুর্গন্ধ বেরিয়েছে,—দেশলাই জ্বেলে তার মুখের পানে তাকিয়েই বোঝা গেল, কলেরা। নীলকান্ত তার শুশ্রূষায় লেগে গেল। ফর্সা হয়ে আসে, বললাম, যোশী, লোকটা সন্ধ্যার অন্ধকারে যেমন করেই হোক পেয়াদাদের দৃষ্টি এড়িয়ে এই বাগানটায় রয়ে গেছে, কিন্তু সকালে তা হবে না। ওয়ারেন্টের আসামী আমরা,—এ ত মরবেই, সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও যে যেতে হবে। চল, সরি! নীলকান্ত কাঁদতে লাগলো, বললে, এ অবস্থায় একে কি করে ফেলে যাবো ভাই,—

তার চেয়ে বরঞ্চ তুমি যাও, আমি থাকি। অনেক বুঝালাম, কিন্তু যোশীকে নড়াতে পারলাম না।

ভারতী সভয়ে কহিল, কি হল তার পরে?

ডাক্তার কহিলেন, লোকটা বিবেচক ছিল, ভোর হবার পূর্বেই চোখ বুজলে। তাই সে-যাত্রায় নীলকান্তকে নড়াতে পারলাম।

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, সিঙ্গাপুরে যোশীর ফাঁসি হয়। পল্টনের সিপাইদের নাম বলে দিলে ফাঁসিটা তার মাপ হতো,—গবর্নমেন্ট থেকে অনেক প্রকার চেষ্টাই হয়েছিল, কিন্তু যোশী সেই যে ঘাড় নেড়ে বললে আমি জানিনে, তার আর বদল হল না। অতএব, রাজার আইনে তার ফাঁসি হল। অথচ, যাদের জন্য সে প্রাণ দিলে, তাদের সে ভাল করে চিনতও না। এখনও এই-সব ছেলে এদেশেই জন্মায় ভারতী, তা নইলে বাকী জীবনটা তোমার আঁচলের তলায় লুকিয়ে থাকতেই হয়ত রাজী হয়ে পড়তাম।

প্রত্যুত্তরে ভারতী শুধু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। ডাক্তার কহিলেন, নরহত্যা আমার ব্রত নয়, ভাই, তোমাকে সত্যই বলচি, ও আমি চাইনে।

চাইতে না পারো, কিন্তু প্রয়োজন হলে?

প্রয়োজন হলে? কিন্তু, ব্রজেন্দ্রের প্রয়োজন এবং সব্যসাচীর প্রয়োজন ত এক নয় ভারতী।

ভারতী বলিল, সে আমি জানি। আমি তোমার প্রয়োজনের কথাই জিজ্ঞাসা করচি দাদা।

প্রশ্ন শুনিয়া ডাক্তার ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। মনে হইল যেন উত্তর দিতে তিনি দ্বিধা বোধ করিতেছেন। তাহার পরে কতকটা যেন অন্যমনস্কের মত ধীরে ধীরে বলিলেন, কে জানে কবে আমার সেই পরম প্রয়োজনের দিন আসবে। কিন্তু, থাক, ভারতী, এ তুমি জানতে চেয়ো না। তার চেহারা তুমি কল্পনাতেও সইতে পারবে না, বোন।

ভারতী এ ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া মনে মনে শিহরিয়া উঠিল, কহিল, এ ছাড়া কি আর পথ নেই?

না।

তাঁহার মুখের এই সংশয়লেশহীন অকুণ্ঠিত উওর শুনিয়া ভারতী হতবুদ্ধি হইয়া গেল, কিন্তু এই ভয়ঙ্কর 'না' সে সত্যই সহ্য করিতে পারিল না। ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, এ ছাড়া আর পথ নেই, এমন কিন্তু হতেই পারে না দাদা।

ডাক্তার মুচকিয়া হাসিয়া কহিলেন, না, পথ আছে বৈ কি! আপনাকে ভোলাবার অনেক রাস্তা খোলা আছে, ভারতী, কিন্তু সত্যে পৌঁছাবার আর দ্বিতীয় পথ নেই।

ভারতী স্বীকার করিতে পারিল না। শান্ত, মৃদুকণ্ঠে কহিল, দাদা, তুমি অশেষ জ্ঞানী। এই একটিমাত্র লক্ষ্য স্থির রেখে তুমি পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েচ, তোমার অভিজ্ঞতার অন্ত নেই। তোমার মত এতবড় মানুষ আমি আর কখনো দেখিনি। আমার মনে হয়, কেবল তোমার সেবা করেই আমি সমস্ত জীবন কাটিয়ে দিতে পারি। তোমার সঙ্গে তর্ক সাজে না, কিন্তু বল, আমার অপরাধ নেবে না?

ডাক্তার হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন, কি বিপদ! অপরাধ নেব কিসের জন্যে?

ভারতী তেমনি স্নিগ্ধ সবিনয়ে কহিতে লাগিল, আমি ক্রীশ্চান, শিশুকাল থেকে ইংরাজকেই আত্মীয় জেনে, বন্ধু জেনে বড় হয়ে উঠেছি, আজ তাদের প্রতি মন ঘৃণায় পূর্ণ করে তুলতে আমার ভারী কষ্ট হয়। কিন্তু তুমি ছাড়া এ কথা আমি কারও সুমুখে বলতে পারিনে। অথচ, তোমাদের মতই আমি ভারতবর্ষের,—বাঙলা দেশের মেয়ে। আমাকে তুমি অবিশ্বাস করো না।

তাহার কথা শুনিয়া ডাক্তার আশ্চর্য হইলেন।

সস্নেহে ডান হাতখানি তাহার মাথার উপরে রাখিয়া কহিলেন, এ আশঙ্কা কেন ভারতী? তুমি ত জানো তোমাকে আমি কত স্নেহ, কত বিশ্বাস করি।

ভারতী বলিল, জানি। আর তুমিও কি আমার ঠিক এই কথাই জান না দাদা? তোমার ভয় নেই, ভয় তোমাকে দেখানো যায় না, শুধু সেইজন্যেই কেবল তোমাকে বলতে পারিনি, এ বাড়িতে আর তুমি এসো না। কিন্তু এও জানি, আজকে রাত্রির পরে আর কখনো,—না না, তা নয়, হয়ত, অনেকদিন আর দেখা হবে না। সেদিন যখন তুমি সমস্ত ইংরাজ জাতির বিরুদ্ধে ভীষণ অভিযোগ করলে তখন প্রতিবাদ আমি করিনি, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে নিরন্তর এই প্রার্থনাই করেচি, এতবড় বিদ্বেষ যেন না তোমার অন্তরের সমস্ত সত্য আচ্ছন্ন করে রাখে। দাদা, তবুও আমি তোমাদেরই।

ডাক্তার হাসিমুখে বলিলেন, হাঁ আমি জানি, তুমি আমাদেরই।

তা হলে এ পথ তুমি ছাড়।

ডাক্তার চমকিয়া উঠিলেন, কোন্ পথ?

বিপ্লবীদের এই নির্মম পথ।

কেন ছাড়তে বল?

ভারতী কহিল, তোমাকে মরতে দিতে আমি পারব না। সুমিত্রা পারে, কিন্তু আমি পারিনে। ভারতের মুক্তি আমরা চাই—অকপটে, অসঙ্কোচে, মুক্তকণ্ঠে চাই। দুর্বল, পীড়িত, ক্ষুধিত ভারতবাসীর অন্নবস্ত্র চাই। মনুষ্য-জন্ম নিয়ে মানুষের একমাত্র কাম্য স্বাধীনতার আনন্দ উপলব্ধি করতে চাই। ভগবানের এতবড় সত্যে উপস্থিত হবার এই নিষ্ঠুর পথ ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই এ আমি কোন মতেই ভাবতে পারিনে। পৃথিবী ঘুরে তুমি শুধু এই পথের খবরটাই জেনে এসেছ, সৃষ্টির দিন থেকে স্বাধীনতার তীর্থযাত্রী শত-সহস্র লোকের পায়ে পায়ে এই পথের চিহ্নটাই হয়ত তোমার চোখে স্পষ্ট হয়ে পড়েচে, কিন্তু বিশ্বমানবের একান্ত শুভবুদ্ধি, তার অনন্ত বুদ্ধির ধারা কি এমনিই নিঃশেষ হয়ে গেছে যে এই রক্তরেখা ছাড়া আর কোন পথের সন্ধানই কোন দিন তার চোখে পড়বে না? এমন বিধান কিছুতেই সত্য হতে পারে না। দাদা, মনুষ্যত্বের এতবড় পরিপূর্ণতা তুমি ছাড়া

আর কোথাও আমি দেখিনি,—নিষ্ঠুরতার এই বারংবার চলা-পথে তুমি আর চলো না। দুয়ার হয়ত আজও রুদ্ধ আছে, তাই তুমি আমাদের জন্যে খুলে দাও—এ জগতের সবাইকে ভালবেসে আমরা তোমাকে অনুসরণ করে চলি।

ডাক্তার ম্লানমুখে একটুখানি হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর ভারতীর মাথার পরে হাত রাখিয়া বার-দুই ধীরে ধীরে চাপড়াইয়া কহিলেন, আমার আর সময় নেই ভাই, আমি চললাম।

কোন উত্তর দিয়ে গেলে না, দাদা?

প্রত্যুত্তরে ডাক্তার শুধু কহিলেন, ভগবান যেন তোমার ভাল করেন।—এই বলিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেলেন।

বাইশ

জলপথে শত্রুপক্ষীয় জাহাজের গতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে নদীর ধারে, শহরের শেষ প্রান্তে একটি ছোটরকমের মাটির কেল্লা আছে, এখানে সিপাহি-সান্ত্রী অধিক থাকে না, শুধু ব্যাটারি চালনা করিবার জন্য কিছু গোরা-গোলন্দাজ ব্যারাকে বাস করে। ইংরেজের এই নির্বিঘ্ন শান্তির দিনে বিশেষ কড়াকড়ি এখানে ছিল না। নিষেধ আছে, অন্যমনস্ক পথিক কেহ তাহার সীমানার মধ্যে গিয়া পড়িলে তাড়া করিয়াও আসে, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ইহারই একধারে গাছপালার মধ্যে পাথরে বাঁধানো একটা ঘাটের মত আছে, হয়ত কোন উচ্চ রাজকর্মচারীর আগমন উপলক্ষে ইহার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে, কিন্তু এখন ইহার কাজও নাই, প্রয়োজনও নাই। ভারতী মাঝে মাঝে একাকী আসিয়া এখানে বসিত। কেল্লার রক্ষণাবেক্ষণের ভার যাহাদের প্রতি ছিল তাহাদের কেহ যে দেখে নাই তাহা নহে, সম্ভবত স্ত্রীলোক বলিয়া, এবং ভদ্র স্ত্রীলোক বলিয়াই তাহারা আপত্তি করিত না। বোধ করি এইমাত্র সূর্যাস্ত হইয়া থাকিবে, কিন্তু অন্ধকার হইতে তখনও কিছু বিলম্ব ছিল। নদীর কতক অংশে, এবং পরপারবর্তী গাছপালার উপরে শেষ স্বর্ণাভা ছড়াইয়া পড়িয়াছে; দলে দলে পাখির সারি এদিক হইতে ওদিকে উড়িয়া চলিয়াছে,—কাকের কালো দেহে, বকের সাদা পালকে, ঘুঘুর বিচিত্র পাণ্ডুর সর্বাঙ্গে আকাশের রাঙ্গা আলো মিশিয়া হঠাৎ যেন তাহাদিগকে কোন্ অজানা দেশের জীব করিয়া তুলিয়াছে। তাহাদের অবাধ স্বচ্ছন্দ গতি অনুসরণ করিয়া ভারতী নির্নিমেষচক্ষে চাহিয়া রহিল। কি জানি, কোথায় ইহাদের বাসা, কিন্তু সে অলক্ষ্য আকর্ষণ কাহারও এড়াইয়া যাইবার জো নাই। এই কথা মনে করিয়া দুই চক্ষু তাহার জলে ভরিয়া উঠিল। হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া চাহিয়া দেখিল, দূর বৃক্ষশ্রেণীর সোনার দীপ্তি নিবিয়া আসিতেছে এবং মাথার উপরে গাছপালা নদীতে দীর্ঘতর ছায়াপাত

করিয়া জল কালো করিয়া আনিয়াছে এবং তাহারই মধ্যে হইতে অন্ধকার যেন সুদীর্ঘ জিহ্বা মেলিয়া সম্মুখের সমস্ত আলোক নিঃশব্দে লেহন করিয়া লইতেছে।

সহসা নদীর ডানদিকের বাঁক হইতে একখানি ক্ষুদ্র শাম্পান নৌকা সুমুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। নৌকায় মাঝি ভিন্ন অন্য আরোহী ছিল না। সে চট্টগ্রামী মুসলমান। ক্ষণকাল ভারতীর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার চট্টগ্রামের দুর্বোধ্য মুসলমানী বাংলায় কহিল, আম্মা, ওপারে যাবে? একআনা পয়সা দিলেই পার করে দিই।

ভারতী হাত নাড়িয়া কহিল, না, ওপারে আমি যাবো না।

মাঝি বলিল, আচ্ছা দুটো পয়সা দাও, চল।

ভারতী কহিল, না বাপ্ তুমি যাও। বাড়ি আমার এপারে, ওপারে যাবার আমার দরকার নেই।

মাঝি গেল না, একটু হাসিয়া কহিল, পয়সা না হয় নাই দেবে, চল তোমাকে একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসি। এই বলিয়া সে ঘাটের একধারে নৌকা ভিড়াইতে উদ্যত হইল। ভারতী ভয় পাইল। গাছপালার মধ্যে স্থানটা অন্ধকার এবং নির্জন। দীর্ঘদিন এদেশে থাকার জন্য ইহাদের ভাষা বলিতে না পারিলেও ভারতী বুঝিত। এবং ইহাও জানিত, চট্টগ্রামের এই মুসলমান মাঝি-সম্প্রদায় অতিশয় দুর্বৃত্ত। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধস্বরে কহিল, তুমি যাও বলচি এখান থেকে, নইলে পুলিশ ডাকবো।

তাহার উচ্চকণ্ঠ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাতে বোধ হয় চট্টগ্রামী মুসলমান এবার ভয় পাইয়া থামিল। ভারতী চাহিয়া দেখিল লোকটার বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ পার হইয়াছে, কিন্তু শখ যায় নাই। পরনে লতাপাতা-ফুল-কাটা লুঙ্গি, কিন্তু তেলে ও ময়লায় অত্যন্ত মলিন। গায়ে মূল্যবান মিলিটারি ফ্রক-কোট, জরির পাড়, কিন্তু যেমন নোংরা তেমনি জীর্ণ। বোধ হয় কোন পুরাতন জামা-কাপড়ের দোকান হইতে কেনা। মাথায় বেলদার ন্যাকড়ার টুপি, কপাল পর্যন্ত টানা। এই মূর্তির

প্রতি রোষদৃপ্তচক্ষে চাহিয়া ভারতী কয়েক মুহূর্ত পরেই হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, দাদা, চেহারা যাই হোক, কিন্তু গলার আওয়াজটাকে পর্যন্ত বদলে মুসলমান করে ফেলেচ!

মাঝি কহিল, যাবো, না পুলিশ ডাকবে?

ভারতী বলিল, পুলিশ ডেকে তোমাকে ধরিয়ে দেওয়াই উচিত। অপূর্ববাবুর ইচ্ছেটা আর অপূর্ণ রাখি কেন!

মাঝি কহিল, তার কথাই বলচি! এসো। জোয়ার আর বেশী নেই, এখনো কোশ-দুই যেতে হবে।

ভারতী নৌকায় উঠিলে, ঠেলিয়া দিয়া ডাক্তার পাকা মাঝির মতই দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন। যেন দুইহাতে দুখানা দাঁড় টানাই তাঁহার পেশা। কহিলেন, লামা জাহাজ চলে গেল দেখলে?

ভারতী কহিল, হাঁ।

ডাক্তার কহিলেন, অপূর্ব এই দিকের ফার্স্ট ক্লাস ডেকে দাঁড়িয়েছিল দেখতে পেলে?

ভারতী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

ডাক্তার কহিলেন, তার বাসায় কিংবা আফিসে আমার যাবার জো ছিল না, তাই জেটির একধারে শাম্পান বেঁধে আমি ওপরে দাঁড়িয়ে ছিলাম, হাত তুলে সেলাম করতেই—

ভারতী ব্যাকুল হইয়া কহিল, কার জন্যে কিসের জন্যে এতবড় ভয়ানক কাজ তুমি করতে গেলে দাদা? প্রাণটা কি তোমার একেবারেই ছেলেখেলা?

ডাক্তার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না, একেবারেই না। আর গেলাম কিসের জন্যে? ঠিক সেই জন্যেই, যে জন্যে তুমি চুপটি করে এখানে একলা বসে আছো, বোন।

ভারতী উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন কিছুতেই চাপিতে পারিল না। কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, কখখনো না। এখানে আমি এমনি এসেছি—প্রায় আসি। কারও জন্যে আমি কখখনো আসিনি। তোমাকে চিনতে পারলেন?

ডাক্তার সহাস্যে বলিলেন, না, একেবারেই না। এ বিদ্যে আমার খুব ভাল করেই শেখা,—এ দাড়ি-গোঁফ ধরা সহজ কর্ম নয়, কিন্তু আমার ভারী ইচ্ছে ছিল অপূর্ববাবু যেন আমাকে চিনতে পারেন। কিন্তু এত ব্যস্ত যে তার সময় ছিল কৈ?

ভারতী নীরবে চাহিয়া ছিল, সেই অত্যন্ত উৎসুক মুখের প্রতি চাহিয়া ক্ষণকালের জন্য ডাক্তার নির্বাক হইয়া গেলেন।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, তার পরে কি হল?

ডাক্তার বলিলেন, বিশেষ কিছুই না।

ভারতী চেষ্টা করিয়া একটুখানি হাসিয়া কহিল, বিশেষ কিছু যে হয়নি সে শুধু আমার ভাগ্য। চিনতে পারলেই তোমাকে ধরিয়ে দিতেন, আর সে অপমান এড়াবার জন্যে আমাকে আত্মহত্যা করতে হতো। চাকরি যাক, কিন্তু প্রাণটা বাঁচলো! এই বলিয়া সে দূর পরপারে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া নিঃশ্বাস মোচন করিল।

ডাক্তার নীরবে নৌকা বাহিয়া চলিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া ভারতী সহসা মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, কি ভাবচ দাদা?

বল ত দেখি?

বলব? তুমি ভাবচো এই ভারতী মেয়েটা আমার চেয়ে ঢের বেশী মানুষ চিনতে পারে। নিজের প্রাণ বাঁচাতে কোন শিক্ষিত লোকই যে এতবড় হীনতা স্বীকার করতে পারে,—লজ্জা নেই, কৃতজ্ঞতা নেই, মায়া-দয়া নেই,—খবর দিলে না, খবর নেবার এতটুকু চেষ্টা করলে না,—ভয়ের তাড়নায় একেবারে জন্তুর মত ছুটে পালিয়ে গেল, এ কথা আমি কল্পনা করতেও পারিনি, কিন্তু ভারতী একেবারে নিঃসংশয়ে জেনেছিল! ঠিক এই না? সত্যি বোলো?

ডাক্তার ঘাড় ফিরাইয়া নিরুত্তরে দাঁড় টানিয়া চলিতে লাগিলেন, কিছুই বলিলেন না।

আমার দিকে একবার চাও না, দাদা।

ডাক্তার মুখ ফিরাইয়া চাহিতেই ভারতীর দুই ঠোঁট থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, কহিল, মানুষ হয়ে মনুষ্য-জন্মের কোথাও কোন বালাই নেই এমন কি করে হয় দাদা? এই বলিয়া সে দাঁত দিয়া জোর করিয়া তাহার ওষ্ঠাধরের কম্পন নিবারণ করিল, কিন্তু দুই চোখের কোণ বাহিয়া ঝরঝর করিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

ডাক্তার সায় দিলেন না, প্রতিবাদ করিলেন না, সান্ত্বনার একটি বাক্যও তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। কেবল পলকের জন্য যেন মনে হইল তাঁহার সুর্মাটানা চোখের দীপ্তি ঈষৎ স্তিমিত হইয়া আসিল।

ইরাবতীর এই ক্ষুদ্র শাখানদী অগভীর ও অপ্রশস্ত বলিয়া স্টীমার বা বড় নৌকা সচরাচর চলিত না। জেলেদের মাছ ধরার পানসি কিনারায় বাঁধা মাঝে মাঝে দেখা গেল, কিন্তু লোকজন কেহ ছিল না। মাথার উপরে তারা দেখা দিয়াছে, নদীর জল কালো হইয়া উঠিয়াছে, নির্জন ও পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতার মধ্যে ডাক্তারের সতর্কচালিত দাঁড়ের সামান্য একটুখানি শব্দ ভিন্ন আর কোন শব্দ কোথাও ছিল না। উভয় তীরের বৃক্ষশ্রেণী যেন সম্মুখে এক হইয়া মিশিয়াছে। তাহারই ঘনবিন্যস্ত শাখা-পল্লবের অন্ধকার-অভ্যন্তরে সজল দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ভারতী নীরবে স্থির হইয়া বসিয়া ছিল। তাহাদের শাম্পান যে কোন্ ঠিকানায় চলিয়াছিল ভারতী জানিত না, জানিবার মত উৎসুক সচেতন মনের অবস্থাও তাহার ছিল না, কিন্তু সহসা প্রকাণ্ড একটা গাছের অন্তরালে গুল্ম-লতা-পাতা-সমাচ্ছন্ন অতি সঙ্কীর্ণ খাদের মধ্যে তাহাদের ক্ষুদ্র তরী প্রবেশ করিল দেখিয়া সে চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্চো?

ডাক্তার কহিলেন, আমার বাসায়।

সেখানে আর কে থাকে?

কেউ না।

কখন আমাকে বাসায় পৌঁছে দেবে?

পৌঁছে দেব? আজ রাত্রির মধ্যে যদি না দিতে পারি কাল সকালে যেয়ো।

ভারতী মাথা নাড়িয়া কহিল, না দাদা, সে হবে না। তুমি আমাকে যেখান থেকে এনেছ সেখানে ফিরে রেখে এস।

কিন্তু আমার যে অনেক কথা আছে ভারতী !

ভারতী ইহার জবাব দিল না, তেমনি মাথা নাড়িয়া আপত্তি জানাইয়া বলিল, না, তুমি আমাকে ফিরে রেখে এস।

কিন্তু কিসের জন্য ভারতী? আমাকে কি তোমার বিশ্বাস হয় না?

ভারতী অধোমুখে নিরুত্তর হইয়া রহিল।

ডাক্তার কহিলেন, এমন কত রাত্রি ত তুমি একাকী অপূর্বর সঙ্গে কাটিয়েছ, সে কি আমার চেয়েও তোমার বেশী বিশ্বাসের পাত্র?

ভারতী তেমনি নির্বাক হইয়াই রহিল, হাঁ না কোন কথাই কহিল না। খালের এই স্থানটা যেমন অন্ধকার তেমনি অপ্রশস্ত। দু'ধারের গাছের ডাল মাঝে মাঝে তাহার গায়ে আসিয়া ঠেকিতে লাগিল। এদিকে নদীতে ভাটার উলটা টান শুরু হইয়া গেছে,—ডাক্তার খোলের মধ্যে হইতে লণ্ঠন বাহির করিয়া জ্বালিয়া সম্মুখে রাখিলেন, এবং দাঁড় রাখিয়া দিয়া একটা সরু বাঁশ হাতে লইয়া ঠেলিতে ঠেলিতে বলিলেন, আজ যেখানে তোমাকে নিয়ে যাচ্চি ভারতী, দুনিয়ার কেউ নেই সেখান থেকে তোমাকে উদ্ধার করতে পারে। কিন্তু আমার মনের কথা বুঝতে বোধ হয় তোমার আর বাকী নেই? এই বলিয়া তিনি হাঃ হাঃ করিয়া যেন জোর করিয়া হাসিতে লাগিলেন। অন্ধকারে তাঁহার মুখের চেহারা ভারতী দেখিতে পাইল না, কিন্তু তাঁহার হাসির স্বরে কে যেন অকস্মাৎ তাহার ভিতর হইতে তাহাকে ধিক্কার দিয়া উঠিল। মুখ তুলিয়া নিঃশঙ্ককণ্ঠে কহিল, তোমার মনের কথা বুঝতে

পারি এত বুদ্ধি আমার নেই। কিন্তু, তোমার চরিত্রকে আমি চিনি। একলা থাকা আমার উচিত নয় বলেই ও-কথা বলেচি দাদা, আমাকে তুমি ক্ষমা কর।

ডাক্তার ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া স্বাভাবিক শান্তকণ্ঠে কহিলেন, ভারতী, তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার কষ্ট হয়। তুমি আমার বোন, আমার দিদি, আমার মা,—এ বিশ্বাস নিজের পরে না থাকলে এ পথে আমি আসতাম না। কিন্তু তোমার মূল্য দিতে পারে এ সংসারে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। এর শতাংশের এক অংশও অপূর্ব যদি কোনদিন বোঝে ত জীবনটা তার সার্থক হয়ে যাবে। দিদি, সংসারের মধ্যে তুমি ফিরে যাও,—আমাদের ভেতরে আর তুমি থেকো না। কেবল তোমার কথাটাই বলবার জন্যে আজ অপূর্বর সঙ্গে আমি দেখা করতে গিয়েছিলাম।

ভারতী চুপ করিয়া রহিল। আজ একটা কথাও না বলিয়া অপূর্ব চলিয়া গেছে। চাকরি করিতে বর্মায় আসিয়াছিল, মাঝে ক'টা দিনেরই বা পরিচয়!

সে ব্রাহ্মণের ছেলে, ধর্ম ও হিন্দু-আচারের প্রতি তাহার অগাধ নিষ্ঠা, তাহার দেশ আছে, সমাজ আছে, বাড়ি-ঘর, আত্মীয়-স্বজন কত কি! আর অস্পৃশ্য ক্রীশ্চানের মেয়ে ভারতী!

দেশ নাই, গৃহ নাই, মা-বাপ নাই, আপনার বলিতে কোথাও কেহ নাই। এ পরিচয় যদি সাঙ্গ হইয়াই থাকে ত অভিযোগের কি-ই বা আছে! ভারতী তেমনি নিঃশব্দেই স্থির হইয়া বসিয়া রহিল, কেবল অন্ধকার দুই চক্ষু বাহিয়া তাহার অবিরল জল পড়িতে লাগিল।

অনতিদূরে গাছপালার মধ্যে হইতে সামান্য একটু আলো দেখা গেল। ডাক্তার দেখাইয়া কহিলেন, ওই আমার বাসা। এই বাঁকটা পেরোলেই তার দোরগোড়ায় গিয়ে উঠবো। খুব ফ্রি ছিলাম, কি-একরকম মায়ায় জড়িয়ে গেলাম, ভারতী, তোমার জন্যেই আমার ভাবনা। কোন একটা নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছ শুধু এইটুকুই যদি যাবার আগে দেখে যেতে পারতাম!

ভারতী অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া ফেলিল। বলিল, আমি ত ভালই আছি, দাদা।

ডাক্তারের মুখ দিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। এ বস্তুটা এতই অসাধারণ যে, ভারতীর কানে গিয়া তাহা বিঁধিল। কহিলেন, কোথায় ভাল আছ ভাই? আমার লোক এসে বললে তুমি ঘরে নেই।

ভাবলাম, জেটির উপরে কোথাও এক জায়গায় তোমাকে পাবো, পেলাম না বটে, কিন্তু তখনি নিশ্চয় মনে হল এই নদীর ধারে কোথাও-না-কোথাও দেখা তোমার মিলবেই। দুর্ভাগা তোমার আনন্দই শুধু চুরি করে পালায় নি, ভারতী, তোমার সাহসটুকু পর্যন্ত নষ্ট করে দিয়ে গেছে।

এ কথার সম্পূর্ণ তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া ভারতী নীরব হইয়া রহিল। ডাক্তার কহিতে লাগিলেন, সেদিন রাত্রে নিশ্চিন্ত মনে আমাকে বিছানা ছেড়ে দিয়ে তুমি নীচে শুলে। হেসে বললে, দাদা, তুমি কি আবার মানুষ যে তোমাকে আমার লজ্জা বা ভয়? তুমি ঘুমোও। কিন্তু আজ আর সে সাহস নেই। বিশেষ নির্ভর করবার লোক অপূর্ব নয়, তবু সে কাছেই ছিল বলে কালও হয়ত এ আশঙ্কা তোমার মনেও হতো না। আশ্চর্য এই যে তোমার মত মেয়েরও নির্ভয় স্বাধীনতাকে তার মত একটা অক্ষম লোকেও না কত সহজেই ভেঙ্গে দিয়ে যেতে পারে।

ভারতী মৃদুকণ্ঠে কহিল, কিন্তু উপায় কি দাদা?

ডাক্তার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, উপায় হয়ত নেই। কিন্তু আমি ভাবচি বোন, চরিত্রকে তোমার সন্দেহ করতে আজ কেউ কাছে নেই বলে, তোমার নিজের মনটাই যদি অহরহ তোমাকে সন্দেহ করে বেড়ায় তুমি বাঁচবে কি করে? এমন করে ত কারও প্রাণ বাঁচে না ভারতী।

এমন করিয়া ভারতী আপনাকে আপনি বিশ্লেষণ করিয়া দেখে নাই। তাহার সময় ছিলই বা কৈ! তাহার শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের অবধি রহিল না, কিন্তু সে নির্বাক হইয়া রহিল।

ডাক্তার বলিতে লাগিলেন, আমি আর একটি মেয়েকে জানি, সে জাতে রুশ। কিন্তু তার কথা থাক। কবে তোমাদের আবার দেখা হবে আমি জানিনে, কিন্তু মনে হয় যেন একদিন হবে। বিধাতা করুন, হোক। তোমার ভালবাসার তুলনা নেই, সেখান থেকে অপূর্বকে কেউ সরাতে পারবে না, কিন্তু নিজেকে তার গ্রহণযোগ্য করে রাখবার আজ থেকে এই যে জীবনব্যাপী অতি-সতর্ক সাধনা শুরু হবে, তার প্রতিদিনের অসম্মানের গ্লানি মনুষ্যত্বকে যে তোমার একেবারে খর্ব করে দেবে ভারতী! হায় রে! এমন চির-শুদ্ধ হৃদয়ের মূল্য যেখানে নেই, সেখানে এমনি করেই বোঝাতে হয়! পদ্মফুল চিবিয়ে না খেয়ে যারা তৃপ্তি মানে না, দেহের শুদ্ধতা দিয়ে এমনি করেই কান মলে তার কাছে দাম আদায় হয়! হবেও হয়ত। কি জানি, কপালে বাঁচবার মিয়াদ ততদিন আমার আছে কি না, কিন্তু যদি থাকে দিদি, বোন বলে গর্ব করবার তখন আর সব্যসাচীর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে তাহলে কি করতে বল? তুমিই ত আমাকে বারংবার বলেছ সংসারের মধ্যে ফিরে যেতে।

কিন্তু মাথা হেঁট করে যেতে ত বলিনি।

ভারতী বলিল, কিন্তু মেয়েমানুষের উঁচু মাথা ত সবাই পছন্দ করে না দাদা।

ডাক্তার বলিলেন, তবে যেয়ো না।

ভারতী ম্লানমুখে হাসিয়া বলিল, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো দাদা, যাওয়া আমার হবে না। সমস্ত পথ নিজের হাতে বন্ধ করে কেবল একটি পথ খুলে রেখেছিলাম, সেও আজ বন্ধ হয়ে গেছে এ ত তুমি নিজের চোখেই দেখে এসেছ। এখন, যে পথ আমাকে দেখিয়ে দেবে সেই পথেই চলবো; কেবল এইটুকু মিনতি আমার রেখো, তোমাদের ভয়ঙ্কর পথে আমাকে তুমি ডেকো না।

ভগবানের মত দুষ্প্রাপ্য বস্তু পাবারও এত রাস্তা বেরিয়েছে, শুধু তোমার লক্ষ্যে পৌঁছবারই রক্তপাত ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নেই? আমার একান্ত মনের বিশ্বাস মানুষের বুদ্ধি একেবারে শেষ হয়ে যায়নি, কোথাও-না-কোথাও অন্য পথ আছেই আছে! এখন থেকে তারই সন্ধানে আমি পথে বার হবো। ভয়ানক দুঃখ যে কি সে রাত্রে আমি টের পেয়েছি, যেদিন তোমরা তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলে।

ডাক্তার হাসিলেন, কহিলেন, এই আমার বাসা। এই বলিয়া ক্ষুদ্র নৌকা জোর করিয়া ডাঙ্গায় ঠেলিয়া দিয়া অবতরণ করিলেন, এবং লণ্ঠন হাতে তুলিয়া পথ দেখাইয়া কহিলেন, জুতো খুলে নেবে এসো। পায়ে একটু কাদা লাগবে।

ভারতী নিঃশব্দে নামিয়া আসিল। গোটা-চারেক মোটা মোটা সেগুন কাঠের খুঁটির উপর পুরাতন ও প্রায় অব্যবহার্য তক্তা মারিয়া একটা কাঠের বাড়ি খাড়া করা হইয়াছে। জোয়ারের জল সরিয়া গিয়া সমস্ত তলাটা একহাঁটু পাঁক পড়িয়াছে, লতাপাতা, গাছপালা পচার দুর্গন্ধে বাতাস পর্যন্ত ভারী হইয়া উঠিয়াছে, সুমুখের হাত-দুই পরিসর পথটুকু ছাড়া চারিদিক কেয়া ও দেনো গাছের এমনি দুর্ভেদ্য জঙ্গলে ঘেরিয়া আছে, যে, শুধু সাপখোপ বাঘ-ভালুক নয়, একপাল হাতি লুকাইয়া থাকিলেও দেখিবার জো নাই। ইহার ভিতরে যে মানুষ বাস করিতে পারে তাহা চোখে না দেখিলে কল্পনা করা অসম্ভব। কিন্তু এই লোকটির কাছে সকলই সম্ভব। ভাঙ্গা কাঠের সিঁড়ি ও দড়ি ধরিয়া উপরে উঠিতে একটি সাত-আট বছরের ছেলে আসিয়া যখন দ্বার খুলিয়া দিল, তখন ভারতী বিস্ময়ে বাক্যহীন হইয়া রহিল। ভিতরে পা বাড়াইতেই দেখিতে পাইল মেঝের উপর চাটাই পাতিয়া শুইয়া একজন অল্পবয়স্কা বর্মা স্ত্রীলোক, তিন-চারটি ছেলেমেয়ে যে যেখানে পড়িয়া, ইহাদেরই একজন ঘরের মধ্যে বোধ হয় একটা অপকর্ম করিয়া রাখিয়াছে,—খুব সম্ভব অনাবশ্যক বোধেই তাহা পরিষ্কৃত হয় নাই—একটা দুঃসহ দুর্গন্ধে গৃহের বায়ুমণ্ডল বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে, মেঝের সর্বত্র ছড়ানো ভাত, মাছে

কাঁটা এবং পিঁয়াজ-রসুনের খোলা, নিকটেই গোটা দুই-তিন কালি-মাখা ছোট-বড় মাটির হাঁড়ি, ছেলেগুলা হাত ডুবাইয়া খাবলাইয়া ভাত-তরকারি খাইয়াছে তাহা চাহিলেই বুঝা যায়; ইহারই পাশ দিয়া ভারতী ডাক্তারের পিছু পিছু আর একটা ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। কোথাও কোন আসবাবের বালাই নাই, মেঝের উপর চাটাই পাতা, একধারে একটা শতরঞ্চি গুটান ছিল, ডাক্তার স্বহস্তে ঝাড়িয়া তাহা পাতিয়া দিয়া ভারতীকে বসিতে দিলেন। ভারতী নিঃশব্দে উপবেশন করিয়া চাহিয়া দেখিল, সেই পরিচিত প্রকাণ্ড বোঁচকাটি ডাক্তারের একপাশে রহিয়াছে। অর্থাৎ, সত্যসত্যই ইঁহার এই ঘরটিই বর্তমান বাসস্থান। ও-ঘর হইতে বর্মা স্ত্রীলোকটি কি একটা জিজ্ঞাসা করিল, ডাক্তার বর্মা ভাষাতেই তাহার জবাব দিলেন। অনতিকাল পরেই সেই ছেলেটা সানকিতে করিয়া দু' চাঙড় ভাত, পেয়ালার ঝোল এবং পাতায় করিয়া সেই ছেলেটা খানিকটা মাছ-পোড়া আনিয়া একধারে রাখিয়া দিয়া গেল। নৌকার লণ্ঠনটি ডাক্তারের সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন তাহারই আলোকে এই-সকল খাদ্যবস্তুর প্রতি চাহিবামাত্রই ভারতীয় গা বমি-বমি করিয়া উঠিল।

ডাক্তার কহিলেন, তোমারও বোধ হয় ক্ষিদে পেয়েছে, কিন্তু এ-সব—

ভারতীর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, কিন্তু সে প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া জানাইল, না, না, কিছুতে না। সে ক্রীশ্চানের মেয়ে, জাতিভেদে মানে না, কিন্তু যেখান হইতে যেভাবে এই-সকল আনীত হইল তাহা ত সে আসিবার পথেই চোখে দেখিয়া আসিয়াছে!

ডাক্তার কহিলেন, আমার কিন্তু ভারী ক্ষিদে পেয়েছে ভাই, আগে পেটটা ভরিয়ে নিই। এই বলিয়া তিনি হাত ধুইয়া স্মিতমুখে আহারে বসিয়া গেলেন। ভারতী চাহিয়া দেখিতেও পারিল না, ঘৃণায় ও অপরিসীম ব্যথায় মুখ ফিরাইয়া রহিল। তাহার বুকের ভিতর হইতে কান্না যেন সহস্রধারে ফাটিয়া পড়িতে চাহিল। হায় রে দেশ! হায় রে মুক্তির পিপাসা! জগতে কিছুই ইহারা আর আপনার বলিয়া

অবশিষ্ট রাখে নাই? এই গৃহ, এই খাদ্য, এই ঘৃণিত সংস্রব, এমনি করিয়া এই বন্য-পশুর জীবনযাপন, ক্ষণকালের জন্য মৃত্যুও ভারতীয় কাছে অনেক সুসহ বলিয়া মনে হইল। সে হয়ত অনেকেই পারে, কিন্তু এই যে দেহ-মনের অবিশ্রাম নির্যাতন, আপনাকে আপনি স্বেচ্ছায় পলে পলে এই যে হত্যা করিয়া চলার দুঃসহ সহিষ্ণুতা, স্বর্গে-মর্ত্যে কোথাও কি ইহার তুলনা আছে! অধীনতার বেদনা কি ইহাদের এ জীবনের আর সমস্ত বেদনাবোধেই একেবারে ধুইয়া মুছিয়া দিয়াছে! কিছুই কোথাও বাকী নাই! তাহার অপূর্বকে মনে পড়িল। তাহার চাকরির শোক, তাহার বন্ধুমহলে হাতের কালশিরার লজ্জা,—ইহারাই ত মাতার সহস্রকোটি সন্তান! ইহারাই ত দেশের মেরুমজ্জা, খাইয়া-পরিয়া পাস করিয়া চাকরিতে কৃতকার্য হইয়া যাহাদের একটানা জীবন জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত পরম নিরাপদে কাটিতেছে! আর ওই যে লোকটি একান্ত তৃপ্তিতে নির্বিকারচিত্তে বসিয়া ভাত গিলিতেছে,—ভারতীয় মুহূর্তের জন্য মনে হইল, হিমাচলের কাছে সহস্রখণ্ড উপলের তিলার্ধ বেশী তাহারা নয়! আর তাহাদের একজনকে ভালবাসিয়া, তাহারই ঘরের গৃহিণীপনার বঞ্চিত দুঃখে আজ সে বুক ফাটিয়া মরিতেছে। অকস্মাৎ ভারতী জোর করিয়া বলিয়া উঠিল, দাদা, তোমার নির্দিষ্ট ওই রক্তারক্তির পথ কিছুতেই ভাল নয়। অতীতের যত নজিরই তুমি দাও—যা অতীত, যা বিগত, সে-ই চিরদিন শুধু অনাগতের বুক চেপে তাকে নিয়ন্ত্রিত করবে, মানব-জীবনে এ বিধান কিছুতেই সত্য নয়! তোমার পথ নয়, কিন্তু তোমার এই সকল-বিসর্জন-দেওয়া দেশের সেবাই আমি আজ থেকে মাথায় তুলে নিলাম। অপূর্ববাবু সুখে থাকুন, তাঁর জন্যে আর আমি শোক করিনে, আমার বাঁচবার মন্ত্র আজ আমি চোখে দেখতে পেয়েছি।

ডাক্তার সবিস্ময়ে মুখ তুলিয়া ভাতের ডেলার মধ্যে হইতে অস্ফুটকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হল ভারতী?

তেইশ

হাত-মুখ ধুইয়া আসিয়া ডাক্তার তাঁহার বোঁচকার উপরে চাপিয়া বসিলেন। পূর্বোক্ত ছেলেটি মস্ত মোটা একটা বর্মা সেলাই টানিতে টানিতে ঘরে ঢুকিল, এবং কয়েক মুহূর্ত ধরিয়া নাক-মুখ দিয়া অপর্যাপ্ত ধুম উদ্গিরণ করিয়া চুরুটটি ডাক্তারের হাতে দিয়া প্রস্থান করিল। ভারতীর মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন অনুভব করিয়া ডাক্তার সহাস্যে কহিলেন, অমনি পেলে আমি সংসারে কিছুই বাদ দিতে ভালবাসি নে ভারতী। অপূর্বর কাকাবাবু আমাকে যখন রেঙ্গুনের জেটিতে প্রথম গ্রেপ্তার করেন, তখন পকেট থেকে আমার গাঁজার কলকে বার হয়ে পড়েছিল। নইলে, বোধ হয় ছুটি পেতাম না। এই বলিয়া তিনি মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

ভারতী এ ঘটনা শুনিয়াছিল, কহিল, সে আমি জানি, এবং হাজার ছুটি পেলেও যে ওটা তুমি খাও না তা-ও জানি। কিন্তু এ বাড়িটি কার দাদা?

আমার।

আর এই বর্মি মেয়েটি, এবং শিশুগুলি?

ডাক্তার হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন, না, ওঁরা আমার একটি মুসলমান বন্ধুর সম্পত্তি। আমারি মত ফাঁসিকাঠের আসামী, কিন্তু সে অন্য বাবদে। সম্প্রতি স্থানান্তরে গেছেন, পরিচয় ঘটবার সুযোগ হবে না।

ভারতী কহিল, পরিচয়ের জন্যে আমি ব্যাকুল নই; কিন্তু সর্বদিক থেকে তুমি যে স্বর্গপুরীতে এসে আশ্রয় নিয়েছ, তার থেকে আমাকে বাসায় রেখে এসো দাদা, এখানে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

ডাক্তার হাসিমুখে জবাব দিলেন, এ স্বর্গপুরী যে তোমার সইবে না, সে তোমাকে আনবার পূর্বেই আমি জানতাম। কিন্তু, তোমাকে বলবার আমার যত

কথা ছিল, সে ত এই স্বর্গপুরী ছাড়া প্রকাশ করবারও আর দ্বিতীয় স্থান নেই ভারতী। আজ তোমাকে একটুখানি কষ্ট পেতেই হবে।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি শীঘ্রই আর কোথাও যাবে?

ডাক্তার কহিলেন, হাঁ। উত্তর এবং পূর্বের দেশগুলো আর একবার ঘুরে আসতে হবে। ফিরতে হয়ত বছর-দুই লাগবে। কিন্তু, আজ তুমি নানারকমে এত ব্যথা পেয়েছ বোন, যে সকল কথা বলতে আমার লজ্জা হয়। কিন্তু আজকের রাত্রির পরে আর যে সহজে তোমাকে দেখা দিতে পারবো সে ভরসাও করিনে।

কথা শুনিয়া ভারতী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল, কহিল, তুমি কি তাহলে কালই চলে যাচ্ছো?

ডাক্তার মৌন হইয়া রহিলেন। ভারতী মনে মনে বুঝিল ইহার আর পরিবর্তন নাই। তারপরে এই রাত্রিটুকু অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই এ দুনিয়ায় সে একেবারে একাকী। খোঁজ করিবারও কেহ থাকিবে না!

ডাক্তার কহিতে লাগিলেন, হাঁটা-পথে আমাকে দক্ষিণ চীনের ক্যান্টনের ভিতর দিয়ে এগোতে হবে। আর ও-পথে কর্মসূত্রে যদি না অ্যামেরিকায় গিয়ে পড়ি ত প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলো ঘুরে আবার এই দেশেতেই এসে আশ্রয় নেব।

তারপরে আগুন যতদিন না জ্বলে, আমি এইখানেই রইলাম ভারতী। একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আর ফিরতে যদি না-ই পারি বোন, বোধ হয় খবর একটা পাবেই।

এই মানুষটির শান্তকণ্ঠের সহজ কথাগুলি কতই সামান্য, কিন্তু ইহার ভয়ঙ্কর চেহারা ভারতীর চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। সে কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া কহিল, হাঁটা-পথে চীনদেশে যাওয়া যে কত ভয়ানক সে আমি শুনেছি। কিন্তু তুমি মনে মনে হেসো না দাদা, আমি তোমাকে ভয় দেখাতে চাইনি, অতটুকু

তোমাকে আমি চিনি। কিন্তু, বেরিয়েই যদি যাও এইখানেই আবার কেন ফিরে আসতে চাও? তোমার নিজের জন্মভূমিতে কি তোমার কাজ নেই?

ডাক্তার কহিলেন, তাঁরই কাজের জন্যে আমি এদেশ ছেড়ে সহজে যাবো না। মেয়েরা এ দেশের স্বাধীন, স্বাধীনতার মর্ম তারা বুঝবে। তাদের আমার বড় প্রয়োজন। আগুন যদি কখনো এদেশে জ্বলছে দেখতে পাও, যেখানেই থাকো, ভারতী, এই কথাটা আমার তখন স্মরণ করো, এ আগুন মেয়েরাই জ্বেলেচে। কথাটা আমার মনে থাকবে ত?

এই ইঙ্গিত ভারতী বুঝিল, কহিল, কিন্তু তোমার পথের পথিক ত আমি নই!

ডাক্তার কহিলেন, তা আমি জানি। কিন্তু পথ তোমার যাই কেন না হোক, বড়ভাইয়ের কথাটা স্মরণ করতে ত দোষ নেই, তবু ত দাদাকে মাঝে মাঝে মনে পড়বে!

ভারতী কহিল, বড়ভাইকে মনে পড়বার আমার অনেক জিনিস আছে। কিন্তু এমনি করেই বুঝি তোমার বিপথে মানুষকে তুমি টেনে আনো দাদা? আমাকে কিন্তু তা পারবে না। এই বলিয়া সহসা সে উঠিয়া পড়িল, এবং গুটানো শতরঞ্চিটা ঝাড়িয়া পাতিয়া দিয়া বাঁশের আলনা হইতে কম্বল বালিশ প্রভৃতি পাড়িয়া লইয়া স্বহস্তে শয্যা রচনা করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়া আস্তে আস্তে বলিল, অপূর্ববাবুর জাহাজের চাকা আজ আমাকে যে পথের সন্ধান দিয়া গেছে, এ জীবনে সেই আমার একটিমাত্র পথ। আবার যেদিন দেখা হবে, এ কথা তুমিও সেদিন স্বীকার করবে।

ডাক্তার ব্যগ্র হইয়া বলিয়া উঠিলেন, হঠাৎ এ আবার কি শুরু করে দিলে ভারতী? ঐ ছেঁড়া কম্বলটুকু কি আমি নিজে পেতে নিতে পারতাম না? এর ত কোন দরকার ছিল না।

ভারতী কহিল, তোমার ছিল না বটে, কিন্তু আমার ছিল। যার জন্যে যখনই বিছানা পাতি দাদা, তোমার এই ছেঁড়া কম্বলটুকু আর কখনো ভুলব না। মেয়েমানুষের জীবনে এরও যদি না দরকার থাকে ত কিসের আছে বলে দিতে পারো?

ডাক্তার হাসিয়া কহিলেন, এর জবাব আমি দিতে পারলাম না, বোন, তোমার কাছে আমি হার মানছি। কিন্তু তুমি ছাড়া নিজের পরাজয় আমাকে কোনদিন কোন মেয়েমানুষের কাছেই স্বীকার করতে হয়নি।

ভারতী হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল, সুমিত্রাদিদির কাছেও না?

ডাক্তার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না।

শয্যা প্রস্তুত হইলে ডাক্তার তাঁহার বোঁচকার আসন ছাড়িয়া বিছানায় আসিয়া উপবেশন করিলেন। ভারতী অদূরে মেঝের উপর বসিয়া ক্ষণকাল অধোমুখে নীরবে থাকিয়া কহিল, যাবার পূর্বে আর একটি কথা যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, ছোটবোনের অপরাধ মাপ করবে?

করব।

তবে বল সুমিত্রাদিদি তোমার কে? কোথায় তাঁকে তুমি পেলে?

তাহার প্রশ্ন শুনিয়া ডাক্তার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পরে মৃদু হাসিয়া বলিলেন, ও যে আমার কে এ জবাব সে নিজে না দিলে আর জানবার উপায় নেই। কিন্তু, যেদিন ওকে চিনতাম না বললেও চলে, সেদিন নিজেই আমি স্ত্রী বলে ওর পরিচয় দিয়েছিলাম। সুমিত্রা নাম আমারই দেওয়া,—আজ সেইটেই বোধ করি ওর নজির।

ভারতী গভীর কৌতূহলে স্থির হইয়া চাহিয়া রহিল। ডাক্তার কহিলেন, শুনেচি, ওর মা ছিল নাকি ইহুদি মেয়ে, কিন্তু বাপ ছিলেন বাঙালী ব্রাহ্মণ। প্রথমে সার্কাসের দলের সঙ্গে জাভায় যান, পরে সুরভায়া রেলওয়ে স্টেশনে চাকরি করতেন। যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন সুমিত্রা মিশনারিদের ইস্কুলে লেখাপড়া

শিখতো, তিনি মারা যাবার পরে বছর পাঁচ-ছয়ের ইতিহাস আর তোমার শুনে কাজ নেই।

ভারতী মাথা নাড়িয়া কহিল, না দাদা, সে হবে না, তুমি সমস্ত বল।

ডাক্তার কহিলেন, আমিও সমস্ত জানিনে ভারতী, শুধু এইটুকু জানি যে, মা, মেয়ে, দুই মামা, একটি চীনে, এবং জন-দুই মাদ্রাজী মুসলমানে মিলে এঁরা জাভায় লুকানো আফিং গাঁজা আমদানি-রপ্তানির ব্যবসা করতেন। তখনও কিছুই জানিনে কি করেন, শুধু দেখতে পেতাম বাটাভিয়া থেকে সুরভায়ার পথে রেলগাড়িতে সুমিত্রাকে প্রায়ই যাওয়া-আসা করতে। অতিশয় সুশ্রী বলে অনেকের মত আমারও দৃষ্টি পড়েছিল। এই পর্যন্তই। কিন্তু হঠাৎ একদিন পরিচয় হয়ে গেল তেগ স্টেশনের ওয়েটিং-রুমে। বাঙ্গালীর মেয়ে বলে তখনই কেবল প্রথম খবর পেলাম।

ভারতী বলিল, সুন্দরী বলে আর সুমিত্রাদিদিকে ভুলতে পারলে না,—না দাদা?

ডাক্তার কহিলেন, সে যাই হোক, একদিন জাভা ছেড়ে কোথায় চলে গেলাম ভারতী,—বোধ হয় ভুলেও গিয়েছিলাম,—কিন্তু বছর-খানেক পরে অকস্মাৎ বেঙ্কুলান শহরের জেটিতে দেখা-সাক্ষাৎ। এক তোরঙ্গ আফিং, চারিদিকে পুলিশ, আর তার মাঝে সুমিত্রা। আমাকে দেখে চোখ দিয়ে তার জল পড়তে লাগলো, এ সন্দেহ আর রইল না যে আমাকে তাকে বাঁচাতেই হবে। আফিঙের সিন্দুকটাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে একেবারে স্ত্রী বলে তার পরিচয় দিলাম। এতটা সে ভাবেনি, সুমিত্রা চমকে গেল। সুমাত্রার ঘটনা বলে সুমিত্রা নামটাও আমারই দেওয়া। নইলে, তার সাবেক নাম ছিল—রোজ দাউদ। তখন বেঙ্কুলানের মামলা-মকদ্দমা পাদাঙ শহরে হতো, আমার একজন পরম বন্ধু ছিলেন পল ক্রুগার, তাঁর বাড়িতে সুমিত্রাকে নিয়ে এলাম।

মামলায় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সুমিত্রাকে খালাস দিলেন বটে, কিন্তু, সুমিত্রা আর আমাকে খালাস দিতে চাইলে না।

ভারতী হাসিয়া কহিল, খালাস কোনদিন পাবেও না দাদা।

ডাক্তার কহিতে লাগিলেন, ক্রমশঃ তাঁদের দলের লোক খবর পেয়ে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগলো, বন্ধু ক্রুগারও দেখতে পেলাম সৌন্দর্যে চঞ্চল হয়ে উঠছেন, অতএব তাঁর জিম্মাতে রেখেই একদিন চুপি চুপি সুমিত্রা ছেড়ে সরে পড়লাম।

ভারতী আশ্চর্য হইয়া বলিল, এদের মাঝে তাঁকে একলা ফেলে রেখে? উঃ—তুমি কি নিষ্ঠুর দাদা!

ডাক্তার বলিলেন, হাঁ অনেকটা অপূর্বর মত। আবার বছর-খানেক কেটে গেল। তখন সেলিবিস দ্বীপের ম্যাকেসার শহরে একটি ছোট্ট অখ্যাত হোটেলে বাস করছিলাম, একদিন সন্ধ্যার সময় ঘরে ঢুকে দেখি সুমিত্রা বসে। তার পরনে হিন্দু মেয়েদের মত তসরের শাড়ি, আর এই প্রথম আজ আমাকে সে হিন্দু মেয়ের মতই হেঁট হয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। বললে, আমি সমস্ত ছেড়ে চলে এসেছি, সমস্ত অতীত মুছে ফেলে দিয়েছি, আমাকে তোমার কাজে ভর্তি করে নাও, আমার চেয়ে বিশ্বস্ত অনুচর তুমি আর পাবে না।

ভারতী নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া প্রশ্ন করিল, তার পরে?

ডাক্তার কহিলেন, পরের ঘটনা শুধু এইটুকুই বলতে পারি, ভারতী, সুমিত্রার বিরুদ্ধে নালিশ করবার আমি আজও কোন হেতু পাইনি। যে একুশ বছরের সমস্ত সংস্কার একদিনে মুছে ফেলে আসতে পারে, তাকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু, বড় নিষ্ঠুর।

ভারতী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার কেবলই ইচ্ছা করিতে লাগিল জিজ্ঞাসা করে, হোক নিষ্ঠুর, কিন্তু, তাঁকে তুমি কতখানি ভালবাসো? কিন্তু, লজ্জায় এ কথা সে কিছুতেই মুখ দিয়া উচ্চারণ করিতে পারিল না। অথচ ওই আশ্চর্য

রমণীর গোপন অন্তরের অনেক ইতিহাসেরই আজ সে সন্ধান পাইল। তাঁহার নির্ম্মম মৌনতা, কঠোর ঔদাসীন্য—কিছুরই অর্থ বুঝিতে যেন আর তাহার বাকী রহিল না।

হঠাৎ একটা অতর্কিত দীর্ঘশ্বাস ডাক্তারের মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়ায় মুহূর্তকালের জন্য যেন তিনি লজ্জায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু, ওই মুহূর্তের জন্যই। সুদীর্ঘ সাধনায় দেহ ও মনের প্রতিবিন্দুটির উপরেই অসামান্য অধিকার এতদিন তিনি বৃথায় অর্জন করেন নাই। পরক্ষণেই তাঁহার শান্তকণ্ঠ ও সহজ-হাস্যমুখ ফিরিয়া আসিল, বলিলেন, তারপরে সুমিত্রাকে নিয়ে আমাকে ক্যান্টনে চলে আসতে হ'ল।

ভারতী হাসি গোপন করিয়া ভালমানুষের মত মুখ করিয়া কহিল, চলে না-ই আসতে দাদা, কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়েছিল বল? আমরা ত কেউ দিইনি!

ডাক্তার হাসিমুখে ক্ষণকাল নীরব হইয়া থাকিয়া বলিলেন, মাথার দিব্যি যে ছিল না তা নয়, কিন্তু ভেবেছিলাম সে কথা আর কেউ জানবে না, কিন্তু, তোমাদের দোষ এই যে শেষ পর্যন্ত না শুনলে আর কৌতূহল মেটে না। আবার না বললে এমন-সব কথা অনুমান করতে থাকবে যে তার চেয়ে বরঞ্চ বলাই ভাল।

ভারতী কহিল, আমিও ত তাই বলচি দাদা। ঐটুকু তুমি বলে ফেল।

ডাক্তার কহিলেন, ব্যাপারটা এই যে সুমিত্রা আমার হোটেলেই একটা দোতলার ঘর ভাড়া নিলে। আমি অনেক নিষেধ করলাম, কিন্তু, কিছুতেই শুনলে না। যখন বললাম, আমাকে তাহলে অন্যত্র যেতে হবে, তখন তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। বললে, আমাকে আপনি আশ্রয় দিন। পরদিনই ব্যাপারটা বোঝা গেল। সেই দাউদের দল দেখা দিলেন। জন-দশেক লোক, একজন অর্ধেক

আরবি অর্ধেক নিগ্রো, ছোটখাটো একটা হাতীর মত, অনায়াসে সুমিত্রাকে স্ত্রী বলে দাবী করে বসলো।

ভারতী কহিল, আবার তোমারই সাক্ষাতে! তোমাদের দুজনের বোধ করি খুব ঝগড়া বেধে গেল?

ডাক্তার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, হাঁ। সুমিত্রা অস্বীকার করে বারবার বলতে লাগলো সমস্ত মিথ্যা, সমস্তই একটা প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্র! অর্থাৎ, তারা তাকে চোরাই আফিং বেচার কাজে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। প্রশান্ত মহাসাগরের সমস্ত দ্বীপগুলোতেই এদের ঘাঁটি আছে,—এদের একটা প্রকাণ্ড দুর্বৃত্তের দল। এরা না পারে এমন কাজ নেই। বুঝলাম সুমিত্রা কেন আমার কাছ থেকে যেতে চায়নি, এবং তার চেয়েও বেশী বুঝলাম যে এ সমস্যার সহজে মীমাংসা হবে না। তাদের কিন্তু বিলম্ব সয় না, সদ্যসদ্যই একটা রফা করে সুমিত্রাকে টেনে নিয়ে যেতে চায়। বাধা দিলাম, পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেব ভয় দেখালাম, তারা চলে গেল, কিন্তু রীতিমত শাসিয়ে গেল যে তাদের হাত থেকে আজও কেউ নিস্তার পায়নি। কথাটা নেহাত তারা মিথ্যে বলে যায়নি।

ভারতী শঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া কহিল, তার পরে?

ডাক্তার কহিলেন, রাত্রিটা সাবধান হয়ে রইলাম। তারা যে সদলবলে ফিরে এসে আক্রমণ করবে তা জানতাম।

ভারতী ব্যগ্র হইয়া কহিল, তখনি তোমরা পালিয়ে গেলে না কেন? পুলিশে খবর দিলে না কেন? ডচ্ গবর্নমেন্টের পুলিশ-পাহারা বলে কি কিছু নেই নাকি?

ডাক্তার কহিলেন, না থাকার মধ্যেই। তা ছাড়া থানা-পুলিশ করা আমার নিজেরও খুব নিরাপদ নয়। যাই হোক, রাত্রিটা কিন্তু নিরাপদেই কাটলো। এখানে সমুদ্রের কিনারা বয়ে যাবার অনেক ব্যবসা-বাণিজ্যের নৌকা পাওয়া যায়, পরদিন সকালেই একটা ঠিক করে এলাম, কিন্তু সুমিত্রার হল জ্বর,—সে উঠতে পারলে না। অনেক রাত্রে দোর খোলার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল, জানালা দিয়ে উঁকি মেরে

দেখলাম হোটেলওয়ালা কপাট খুলে দিয়েচে, এবং জন দশ-বারো লোক বাড়িতে ঢুকচে। তাদের ইচ্ছে ছিল আমার দরজাটা কোনমতে আটকে রেখে তারা পাশের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে সুমিত্রার ঘরে গিয়ে ঢোকে।

ভারতী নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া কহিল, তার পরে? তোমরা পালালে কোথা দিয়ে?

ডাক্তার বলিলেন, তার আর সময় হল কৈ? কিন্তু তাদের আগেই আমি দোর খুলে উপরে যাবার সিঁড়িটা আটকে ফেললাম।

ভারতী পাংশুমুখে জিজ্ঞাসা করিল, একলা? তারপরে?

ডাক্তার বলিলেন, তার পরের ঘটনাটা অন্ধকারে ঘটলো, সঠিক বিবরণ দিতে পারব না। তবে নিজেরটা জানি। একটা গুলি এসে বাঁ কাঁধে বিঁধলো, আর একটা লাগলো ঠিক হাঁটুর নীচে। সকাল হলে পুলিশ এলো, পাহারা এলো, গাড়ি এলো, ডুলি এলো, জন-ছয়েক লোককে তুলে নিয়ে গেল,—হোটেলওয়ালা এজাহার দিলে—ডাকাত পড়েছিল। ইংরাজ রাজত্ব হলে কতদূর কি হত বলা যায় না, কিন্তু সেলিবিসের আইন-কানুন বোধ হয় আলাদা, লোকগুলোর নিশানদিহি যখন হল না, তখন পুঁতেটুঁতে ফেললে বোধ হয়।

বিবরণ শুনিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে ক্ষণকাল ভারতীর বাক্রোধ হইয়া রহিল, পরে শুষ্ক বিবর্ণমুখে অস্ফুটকণ্ঠে কহিল, পুঁতেটুঁতে ফেললে কি? তোমার হাতে কি তবে এতগুলো মানুষ মারা গেল নাকি?

ডাক্তার কহিলেন, আমি উপলক্ষ মাত্র। নইলে নিজেদের হাতেই তারা মারা গেল ধরতে হবে।

আর ভারতী কথা কহিল না, শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ডাক্তার নিজেও কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বলিলেন, তারপরে কতক নৌকোয়, কতক ঘোড়ার গাড়িতে, কতক স্টীমারে মিনাডো শহরে এসে পৌঁছলাম, এবং সেখান থাকে নামধাম ভাঁড়িয়ে একটা চীনা জাহাজে চড়ে

কোনমতে দুজনে ক্যান্টনে এসে উপস্থিত হলাম। কিন্তু আর বোধ হয় তোমার শুনতে ইচ্ছে করচে না? ঠিক না ভারতী? কেবলি মনে হচ্ছে দাদার হাতেও মানুষের রক্ত মাখানো?

অন্যমনস্ক ভারতী তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, আমাকে বাসায় পৌঁছে দেবে না দাদা?

এখনি যাবে?

হাঁ, আমাকে তুমি দিয়ে এসো।

তবে চল। এই বলিয়া তিনি মেঝের একখানা তক্তা সরাইয়া কি একটা বস্তু লুকাইয়া পকেটে লইলেন। ভারতী বুঝিল তাহা গাদাপিস্তল। পিস্তল তাহারও আছে, এবং সুমিত্রার উপদেশমত সে-ও ইতিপূর্বে গোপনে সঙ্গে লইয়া পথে বাহির হইয়াছে, কিন্তু, ইহা যে মানুষ মারিবার যন্ত্র, এ চৈতন্য আজ যেন তাহার প্রথম হইল। আর ঐ যেটা ডাক্তারের পকেটে রহিল, হয়ত, কত নরহত্যাই উহা করিয়াছে এই কথা মনে করিয়া তাহার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল।

নৌকায় উঠিয়া ভারতী ধীরে ধীরে বলিল, তুমি যাই কেন না কর, তুমি ছাড়া আমার আর পৃথিবীতে দ্বিতীয় আশ্রয় নেই। যতদিন না আমার মন ভাল হয় আমাকে তুমি ফেলে যেতে পারবে না দাদা। বল যাবে না!

ডাক্তার মৃদু হাসিয়া কহিলেন, আচ্ছা তাই হবে বোন, তোমার কাছে ছুটি নিয়েই আমি যাবো।

চব্বিশ

নদীপথে সমস্তক্ষণ ভারতীর মন কত-কি ভাবনাই যে ভাবিতে লাগিল তাহার নির্দেশ নাই। অধিকাংশই এলোমেলো,—শুধু যে চিন্তাটা মাঝে মাঝে আসিয়া তাহাকে সব চেয়ে বেশী ধাক্কা দিয়া গেল সে সুমিত্রার ইতিবৃত্ত। তাহার প্রথম যৌবনের দুর্ভাগ্যময় অপরূপ কাহিনী। সুমিত্রাকে বন্ধু বলিয়া ভাবিবার দুঃসাহস কোন মেয়ের পক্ষেই সহজ নয়, তাহাকে ভালবাসিতে ভারতী পারে নাই, কিন্তু সর্ব-বিষয়ে তাহার অসাধারণ শ্রেষ্ঠতার জন্য হৃদয়ের গভীর ভক্তি তাহাকে অর্পণ করিয়াছিল। কিন্তু সেদিন যত অপরাধই অপূর্ব করিয়া থাক, নারী হইয়া অবলীলাক্রমে তাহাকে হত্যা করার আদেশ দেওয়ায় ভক্তি তাহার অপরিসীম ভয়ে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল,—বলির পশু রক্ত-মাখা খড়্গের সম্মুখে যেমন করিয়া অভিভূত হইয়া পড়ে,—তেমনি। অপূর্বকে ভারতী যে কত ভালবাসিত সুমিত্রার তাহা অপরিজ্ঞাত ছিল না, ভালবাসা যে কি বস্তু সেও তাহার অবিদিত নয়, তথাপি আর একজনের প্রাণাধিকের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিতে নারী হইয়া নারীর তিলার্ধ বাধে নাই। বেদনার আগুনে বুকের ভিতরটা যখন তাহার এমনি করিয়া হুহু করিয়া জ্বলিতে থাকিত, তখন সে আপনাকে আপনি এই বলিয়া বুঝাইত যে কর্তব্যের প্রতি এতবড় নির্মম নিষ্ঠা না থাকিলে পথের-দাবীর কর্ত্রী করিত তাহাকে কে? যাহাদের নিজের জীবনের মূল্য নাই, রাজদ্বারে রাজার আইনে যে-সকল প্রাণ বাজেয়াপ্ত হইয়া গেছে, তাহারা নির্ভর করিত তবে কিসে? তাহার জন্ম, তাহার শিক্ষা, তাহার কৈশোর ও যৌবনের বিচিত্র ইতিহাস, তাহার আসক্তির অনতিবর্তনীয় দৃঢ় সংসক্তি, তাহার কর্তব্যবোধ, তাহার পাষাণ-হৃদয় সকলের সঙ্গেই আজ ভারতী সঙ্গতি দেখিতে লাগিল। নারী বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে যে প্রচণ্ড অভিমান ভারতীর ছিল, আজ সে যেন আপনা-আপনিই একেবারে

বাহুল্য হইয়া গেল। আর তাহাকে সে নিজের স্বজাতি বলিয়া ভাবিতেই পারিল না। আজ তাহার মনে হইল, স্নেহের দিক দিয়া, করুণার দিক দিয়া সুমিত্রার কাছে দাবী করিবার, ভিক্ষা জানাইবার মত পরিহাস পৃথিবীতে যেন আর দ্বিতীয় নাই।

নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিতেই একজন গাছের আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিল। ডাক্তারের হাত ধরিয়া ভারতী নীচের সিঁড়িতে পা দিতে যাইতেছিল, হঠাৎ লোকটার প্রতি চোখ পড়িতেই সে সভয়ে পা তুলিয়া লইল।

ডাক্তার মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, ও আমাদের হীরা সিং তোমাকে পৌঁছে দেবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। কেয়া সিংজী, খবর সব ভালো?

হীরা সিং বলিল, সব্ আচ্ছা।

আমিও যেতে পারি নাকি?

হীরা কহিল, আপ্‌কো কঁহি যানা দুনিয়ামে কোই রোক সক্তা? এই বলিয়া সে একটু হাসিল।

বুঝা গেল পুলিশের লোক ভারতীর বাসার প্রতি নজর রাখিয়াছে, ডাক্তারের যাওয়া নিরাপদ নয়।

ভারতী হাত ছাড়িল না, চুপি চুপি কহিল, আমি যাবো না দাদা।

কিন্তু তোমার ত পালিয়ে থাকবার দরকার নেই ভারতী।

ভারতী তেমনি আস্তে আস্তে বলিল, দরকার থাকলেও আমি পালাতে পারব না। কিন্তু এর সঙ্গে যাবো না।

ডাক্তার আপত্তির কারণ বুঝিলেন। অপূর্বর বিচারের দিন এই হীরা সিংই তাহাকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল। একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, কিন্তু তুমি ত জানো ভারতী পাড়াটা কত খারাপ, এত রাত্রে একলা যাওয়া ত তোমার চলে না। আর আমি যে—

ভারতী ব্যাকুলকণ্ঠে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, না দাদা, তুমি আমাকে পৌঁছে দেবে, আমি ত এখনও পাগল হইনি যে—

এই বলিয়া সে অসম্পূর্ণ কথার মাঝখানেই থামিয়া গেল। কিন্তু, এতরাত্রে ও-পাড়ায় একাকী যাওয়াও যে অসম্ভব, এ সত্যই বা তাহার চেয়ে বেশী কে জানিত? হাত ছাড়িয়া নৌকা হইতে নামিবার কিছুমাত্র লক্ষণ না দেখিয়া ডাক্তার স্নেহার্দ্রস্বরে আস্তে আস্তে বলিলেন, আমার ওখানে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে তোমাকে আমার নিজেরই লজ্জা করে। কিন্তু যাবে দিদি আর এক জায়গায়? আমাদের কবির ওখানে? সে নদীর ঠিক আর-পারেই থাকে। যাবে?

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, কবি কে দাদা?

ডাক্তার কহিলেন, আমাদের ওস্তাদজী, বেহালা-বাজিয়ে,—

ভারতী খুশী হইয়া কহিল, তাঁকে কি ঘরে পাওয়া যাবে? আর মদ জুটে থাকে ত অজ্ঞান হয়েই হয়ত আছেন।

ডাক্তার কহিলেন, আশ্চর্য নয়। কিন্তু আমার গলা শুনলেই তার নেশা কেটে যায়। তা ছাড়া কাছেই নবতারা থাকেন—হয়ত তোমাকে দুটো খাইয়ে দিতেও পারব।

ভারতী ব্যস্ত হইয়া বলিল, রক্ষে কর দাদা, এই শেষ-রাত্তিরে আর আমাকে খাওয়াবার চেষ্টা করো না,

কিন্তু তাই চল যাই, সকাল হলেই আমরা ফিরে আসবো।

ডাক্তার পুনরায় নৌকা ভাসাইয়া দিলে হীরা সিং অন্ধকারে পুনরায় যেন মিলাইয়া গেল। ভারতী কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিল, দাদা, এই লোকটিকে পুলিশে এখনও সন্দেহ করেনি?

ডাক্তার কহিলেন, না। ও টেলিগ্রাফ আফিসের পিয়ন, মানুষের জরুরী তার বিলি করে বেড়ায়, তাই ওকে দিনরাত্রির কোন সময়ে কোনখানেই বেমানান দেখায় না।

সেইমাত্র জোয়ার শুরু হইয়াছে, খাঁড়ি হইতে বাহির হইয়া বড় নদীতে কতকটা উজাইয়া না গেলে ও-পারের যথাস্থানে নৌকা ভিড়ানো শক্ত, এইজন্য কিনারা ঘেঁষিয়া ধীরে ধীরে অত্যন্ত সাবধানে লগি ঠেলিয়া যাওয়ার পরিশ্রম অনুভব করিয়া ভারতী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, থাক গে, কাজ নেই দাদা আমাদের ওখানে গিয়ে। তার চেয়ে বরঞ্চ চল, তোমার বাড়িতেই ফিরে যাই। জোয়ারের টানে আধঘণ্টাও লাগবে না।

ডাক্তার কহিলেন, কেবল সেজন্য নয়, ভারতী, ওর সঙ্গে দেখা করাও আমার বিশেষ প্রয়োজন।

প্রত্যুত্তরে ভারতী উপহাসভরে হাসিয়া বলিল, ওঁর সঙ্গে কোন মানুষের কোন প্রয়োজন থাকতে পারে এ ত আমার সহজে বিশ্বাস হয় না, দাদা।

ডাক্তার ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, তোমরা কেউ ওকে জানো না, ভারতী, ওর মত সত্যকার গুণী সহসা কোথাও তুমি পাবে না। ওই ভাঙ্গা বেহালাটি মাত্র পুঁজি করে ও যায়নি এমন জায়গা নেই। তাছাড়া ও ভারী পণ্ডিত। কোথায় কোন্ বইয়ে কি আছে ও ছাড়া জেনে নেবার আমার আর দ্বিতীয় লোক নেই। ওকে আমি যথার্থ ভালবাসি।

ভারতী মনে মনে অপ্রতিভ হইয়া কহিল, তাহলে ওঁকে তুমি মদ ছাড়াবার চেষ্টা করো না কেন?

ডাক্তার কহিলেন, আমি কাউকে কোন-কিছু ছাড়াবারই ত চেষ্টা করিনে ভারতী। একটুখানি চুপ করিয়া বলিলেন, তাছাড়া, ও কবি, ও গুণী, ওদের জাত আলাদা। ওদের ভাল-মন্দ ঠিক আমাদের সঙ্গে মেলে না। কিন্তু তাই বলে দুনিয়ার ভাল-মন্দের বাঁধা আইন ওকে মাপ করে চলে না। ওর গুণের ফল তারা সবাই মিলে ভোগ করে শুধু দোষের শাস্তিটুকু সহ্য করে ও নিজে। তাই মাঝে মাঝে ও বেচারা যখন ভারী দুঃখ পায়, তখন, আর একটি লোক যে মনে মনে তার অংশ নেয়, সে আমি।

ভারতী কহিল, তুমি সকলের জন্যেই দুঃখ বোধ কর দাদা, তোমার মন মেয়েদের চেয়েও কোমল। কিন্তু, তোমার গুণীকে তুমি বিশ্বাস কর কি করে? উনি মাতাল হয়ে ত সমস্তই বলে ফেলতে পারেন।

ডাক্তার কহিলেন, ওই জ্ঞানটুকুই ওর বাকী থাকে। আর একটা সুবিধা এই যে, ওর কথায় বিশেষ কেউ বিশ্বাসও করে না।

ভারতী কহিল, ওঁর নাম কি দাদা?

ডাক্তার কহিলেন, অতুল, সুরেন, ধীরেন,—যখন যা মনে আসে। আসল নাম শশিপদ ভৌমিক।

আমার মনে হয় উনি নবতারার বড় বাধ্য।

ডাক্তার মুচকিয়া হাসিলেন, বলিলেন, আমারও মনে হয়। এই বলিয়া তিনি পর-পারের জন্য নৌকার মুখ ফিরাইলেন। স্রোত ও দাঁড়ের প্রবল আকর্ষণে ক্ষুদ্র তরণী অত্যন্ত দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল, এবং দেখিতে দেখিতে এপারে আসিয়া ঠেকিল। চারিদিকেই সাহেব কোম্পানির বড় বড় কাঠের মাড় স্তূপাকার করা, তাহারই ফাঁকে ফাঁকে জোয়ারের জল ঢুকিয়া দূরবর্তী জাহাজের তীব্র আলোকে ঝিকঝিক করিতেছে, ইহারই একটা ফাঁকের মধ্যে ডিঙ্গি প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া ডাক্তার ভারতীর হাত ধরিয়া নামিয়া পড়িলেন। পিচ্ছিল কাঠের উপর দিয়া সাবধানে পা টিপিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটা সঙ্কীর্ণ পথ পাওয়া গেল, আশে পাশে ছোট-বড় ডোবা, লতা-গুল্ম ও কাঁটাগাছে পরিপূর্ণ হইয়া আছে, তাহারই একধার দিয়া এই পথ অন্ধকার বনের মধ্যে যে কোথায় গিয়াছে তাহার নির্দেশ নাই। ভারতী সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, ও-পারের এমনি একটা ভয়ঙ্কর স্থান থেকে আর একটা তেমনি ভয়ানক জায়গায় নিয়ে এলে। বাঘ-ভালুকের মত এ ছাড়া কি তোমরা আর কোথাও থাকতে জানো না? আর কিছু ভয় না কর সাপের ভয়টা ত করতে হয়?

ডাক্তার হাসিয়া কহিলেন, সাপ বিলাত থেকে আসেনি দিদি, তাদের ধর্মজ্ঞান আছে, বিনা অপরাধে কামড়ায় না।

মন্তব্য শুনিয়া ভারতীর আর এক দিনের কথা মনে পড়িল। সেদিনও তাঁহার এমনি সহাস্য কণ্ঠস্বরে ইউরোপের বিরুদ্ধে কি অপরিসীম ঘৃণাই প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি পুনশ্চ কহিলেন, আর বাঘ-ভালুক বোন? কতদিনই ভাবি, এই ভারতবর্ষে মানুষ না থেকে যদি কেবল বাঘ-ভালুকই থাকত! হয়ত, বিদেশ থেকে শিকার করতে এরা আসতো, কিন্তু এমন অহর্নিশি রক্তশোষণের জন্য কামড়ে পড়ে থাকত না।

ভারতী চুপ করিয়া রহিল। সমস্ত জাতি-নির্বিশেষে কাহারও এতখানি বিদ্বেষ তাহাকে অত্যন্ত ব্যথিত করিত। বিশেষ করিয়া এই মানুষটির এতবড় বিশাল বক্ষতল হইতে যখন গরল উছলিয়া উঠিত, তখন দুই চক্ষু তাহার জলে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। নিজের মনে প্রাণপণে বলিতে থাকিত, ইহা কখনও সত্য নয়, কিছুতে সত্য নয়। এমন হইতেই পারে না।

কিছুক্ষণ হইতে একটা অপূর্ব সুস্বর মাঝে মাঝে আসিয়া তাহাদের কানে লাগিতেছিল, সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া ডাক্তার বলিলেন, ওস্তাদজী আমাদের জেগে আছেন এবং সজ্ঞানে আছেন,—এমন বেহালা তুমি কখনো শোননি ভারতী।

আরও কয়েক পা অগ্রসর হইয়া ভারতী স্তব্ধ হইয়া থামিল। কোথায় কোন্ অন্ধকারের বুক চিরিয়া কত কান্নাই যেন ভাসিয়া আসিতেছে। তাহার আদি-অন্ত নাই, এ সংসারে তাহার তুলনা হয় না। মিনিট-দুয়ের জন্য ভারতীর যেন সংজ্ঞা রহিল না। ডাক্তার তাহার হাতের উপর একটুখানি চাপ দিয়া কহিলেন, চল।

ভারতী চকিত হইয়া কহিল, চল। আমি কখনো এমন ভাবিনি। কখনো এমন শুনিনি।

ডাক্তার আস্তে আস্তে বলিলেন, পৃথিবীতে আমার অগম্য ত স্থান নেই, এর চেয়ে ভাল আমিও কখনো শুনেচি মনে হয় না। একটু হাসিয়া কহিলেন, কিন্তু পাগলার হাতে পড়ে ঐ বেহালা বেচারার দুর্দশার অবধি নেই। আমিই বোধহয় ওকে দশবার উদ্ধার করে দিয়েচি। এখনো শুনেচি অপূর্বর কাছে পাঁচ টাকায় বাঁধা আছে।

ভারতী কহিল, আছে। ওঁর নাম করে টাকাটা আমি তাঁকে পাঠিয়ে দেব।

গাছপালার আড়ালে একখানা দোতলা কাঠের বাড়ি। একতলাটা পাঁক, জোয়ারের জল এবং দেনো গাছে দখল করিয়াছে, সুমুখে একটা কাঠের সিঁড়ি এবং তাহারই সর্বোচ্চ ধাপে একটা তোরণের মত করিয়া তাহাতে মস্তবড় একটা রঙ্গীন চীনালণ্ঠন ঝুলিতেছে। ভিতরের আলোকে স্পষ্ট পড়া গেল তাহার গায়ে বড় বড় কালো অক্ষরে ইংরাজিতে লেখা,—শশিতারা লজ্।

ভারতী বলিল, বাড়ির নাম রাখা হয়েছে শশিতারা লজ্? লজ্ ত বুঝলাম, শশিতারাটা কি?

ডাক্তার মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিলেন, বোধ হয় শশিপদর শশী এবং নবতারার তারা এক করে শশিতারা লজ্ হয়েছে।

ভারতীর মুখ গম্ভীর হইল, কহিল, এ ভারী অন্যায়। এ-সব তুমি প্রশ্রয় দাও কি করে?

ডাক্তার হাসিয়া ফেলিলেন, কহিলেন, তোমার দাদাটিকে তুমি কি সর্বশক্তিমান মনে কর? কে কার লজের নাম শশিতারা রাখবে, কে কার প্যালেসের নাম অপূর্ব-ভারতী রাখবে, সে আমি ঠেকাব কি করে?

ভারতী রাগ করিয়া বলিল, না দাদা, এ-সব নোংরা কাণ্ড তুমি বারণ করে দাও। নইলে আমি ওঁর ঘরে যাবো না।

ডাক্তার কহিলেন, শুনচি ওদের শীঘ্র বিয়ে হবে।

ভারতী ব্যাকুল হইয়া বলিল, বিয়ে হবে কি করে, ওর যে স্বামী বেঁচে আছে?

ডাক্তার কহিলেন, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে মরতে কতক্ষণ দিদি? শুনেচি ব্যাটা মরেচে দিন-পনর হল।

ভারতী অতিশয় বিরক্তিসত্ত্বেও হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, ও হয়ত মিছে কথা। তাছাড়া, এক বছর অন্ততঃ ওদের ত থামতেই হবে, নইলে সে যে ভারী বিশ্রী দেখাবে!

তাহার উৎকণ্ঠা দেখিয়া ডাক্তার মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলেন, বেশ, বলে দেখবো। তবে, থামলে বিশ্রী দেখাবে কি না-থামলে বিশ্রী দেখাবে সেইটেই চিন্তার কথা।

এই ইঙ্গিতের পরে ভারতী লজ্জায় নীরব হইয়া রহিল। সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে ডাক্তার চাপা-গলায় বলিতে লাগিলেন, পাগলাটার জন্যেই কষ্ট হয়, শুনেচি ঐ স্ত্রীলোকটিকে নাকি ও যথার্থই ভালবাসে। আর কাউকে যদি বাসত! সহসা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, কিন্তু সংসারের ভাল-মন্দের ফরমাশ, বন্ধুগণের অভিরুচি,—এ-সব অতি তুচ্ছ কথা ভারতী! কেবল এইটুকু কামনা করি ওর ভালবাসার মধ্যে সত্য যদি থাকে ত সেই সত্যই যেন ওকে উদ্ধার করে দেয়।

ভারতী চমকিয়া উঠিল। এবং তেমনি চাপাকণ্ঠে সহসা প্রশ্ন করিয়া ফেলিল, সংসারে তা কি হয় দাদা?

ডাক্তার অন্ধকারেই একবার মুখ ফিরিয়া চাহিলেন। তাহার পরে নিঃশব্দপদে উঠিয়া গুণীর বন্ধ-দরজার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন।

ডাক শুনিয়া বেহালা থামিল। খানিক পরে ভিতর হইতে দ্বার খুলিয়া শশিপদ বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তারকে সে সহজেই চিনিল, কিন্তু আঁধারে ঠাহর করিয়া ভারতীকে চিনিতে পারিয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিল,—অ্যাঁ আপনি? ভারতী? আসুন, আসুন, আমার ঘরে আসুন। এই বলিয়া সে দুই হাত ধরিয়া

তাহাকে ভিতরে লইয়া গেল। তাহার আনন্দদীপ্ত মুখের অকপট আবাহনে, তাহার অকৃত্রিম উচ্ছ্বসিত সমাদরে ভারতীর সমস্ত ক্রোধ জল হইয়া গেল। শশী বিছানার কোন এক নিভৃত স্থান হইতে বড় একটা খাম বাহির করিয়া ভারতীর হাতে দিয়া কহিল, খুলে পড়ুন। পরশু দশ হাজার টাকার ড্রাফট্ আসছে,—নট্ এ পাই লেস্! বলতাম না? আমি জোচ্চোর! আমি মিথ্যাবাদী! আমি মাতাল! কেমন হল ত? দশ হাজার! নট্ এ পাই লেস্।

এই দশ হাজার টাকার ড্রাফ্ট সম্বন্ধে একটা পুরাতন ইতিহাস আছে, তাহা এইখানে বলা প্রয়োজন। তাহার বন্ধু-বান্ধব, শত্রু-মিত্র, পরিচিত-অপরিচিত এমন কেহ ছিল না যে অচিরভবিষ্যতে একটা মোটা টাকা প্রাপ্তির সম্ভাবনা শশীর মুখ হইতেই শুনে নাই। কেহ বড় বিশ্বাস করিত না, বরঞ্চ ঠাট্টা-তামাশাই করিত, কিন্তু ইহার ছিল ওস্তাদজীর মূলধন।

ইহারই উল্লেখ করিয়া সে একান্ত অসঙ্কোচে লোকের কাছে ধার চাহিত। এবং শীঘ্রই একদিন সুদে-আসলে পরিশোধ করিয়া দিবে তাহা শপথ করিয়া বলিত। এই অত্যন্ত অনিশ্চিত অর্থাগমের উপর তাহার কত আশা-ভরসাই না জড়াইয়া ছিল! বছর পাঁচ-সাত পূর্বে তাহার বিত্তশালী মাতামহ যখন মারা যান তখন সে মাসতুত ভায়েদের সঙ্গে সম্পত্তির একটা অংশ পাইয়াছিল। এতদিন এইটাই তাহাদের কাছে বিক্রি করিবার কথাবার্তা চলিতেছিল, মাসখানেক পূর্বে তাহা শেষ হইয়াছে। খামের মধ্যে কলিকাতার এক বড় এটর্নির চিঠি ছিল, টাকাটা দুই-এক দিনেই পাওয়া যাইবে তিনি লিখিয়া জানাইয়াছেন।

ভারতী চিঠি পড়িয়া শেষ করিলে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, বিশ হাজার টাকার না কথা ছিল, শশি?

শশী হাত নাড়িয়া বলিল, আহা, দশ হাজার টাকাই কি সোজা নাকি? তাছাড়া নিজের মাসতুত ভাই,—সম্পত্তি ত একরকম আপনার ঘরেই রইল, ডাক্তারবাবু, আর ঠিক সেই কথাই ত মেজদা লিখে জানিয়েছেন। কিরকম

লিখেছেন একবার—এই বলিয়া মেজদার চিঠির জন্য উঠিবার উপক্রম করিতে ডাক্তার বাধা দিয়া বলিলেন, থাক থাক, মেজদার চিঠির জন্যে আমাদের কৌতূহল নেই। ভারতীকে বলিলেন, এইরকম একটা ক্ষ্যাপা মাসতুত ভাই আমাদের থাকলে—এই বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

শশী খুশী হইল না, সে প্রাণপণে প্রমাণ করিতে লাগিল যে, সম্পত্তিটা একপ্রকার বিক্রি না করিয়াই এতগুলা টাকা পাওয়া গেল, এবং সে কেবল তাহার মেজদার মত আদর্শপুরুষ সংসারে ছিল বলিয়া।

ভারতী মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, সে ঠিক কথা অতুলবাবু, মেজদাকে না দেখেই তাঁর দেবচরিত্র আমার হৃদয়ঙ্গম হয়েছে। ও আর সপ্রমাণ করবার প্রয়োজন নেই।

শশী তৎক্ষণাৎ কহিল, কাল কিন্তু আমাকে আর দশটা টাকা দিতে হবে। তাহলে সেদিনের দশ, কালকের দশ আর অপূর্ববাবুর দরুন সাড়ে আট টাকা,—পুরোপুরি ত্রিশ টাকাই পরশু-তরশু দিয়ে দেব। নিতে হবে, না বলতে পারবেন না কিন্তু।

ভারতী হাসিতে লাগিল। শশী কহিতে লাগিল, ড্রাফ্টটা এলেই ব্যাঙ্কে জমা করে দেব। মাতাল, জোচ্চোর, স্পেণ্ডথ্রিফ্ট যা মুখে এসেছে লোকে বলেছে, কিন্তু এবার দেখাবো। আসলে হাত পড়বে না, কেবল সুদের টাকাতেই সংসার চালিয়ে দেবো, বরঞ্চ বাঁচবে দেখবেন, পোস্ট-অফিসেও একটা অ্যাকাউন্ট খুলেত হবে,—ঘরে কিছু রাখা চলবে না। চাই কি বছর-পাঁচেকের মধ্যে একটা বাড়ি কিনতেও পারবো। আর কিনতেই ত হবে,—সংসার ঘাড়ে পড়ল কিনা! সহজ নয়ত আজকালকার বাজারে!

ভারতীর মুখের দিকে চাহিয়া ডাক্তার হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠলেন, কিন্তু সে মুখ গম্ভীর করিয়া আর-একদিকে চাহিয়া রহিল।

শশী কহিল, মদ ছেড়ে দিয়েছি শুনেচেন বোধ হয়?

ডাক্তার কহিলেন, না।

শশী কহিল, হাঁ একেবারে। নবতারা প্রতিজ্ঞে করিয়ে নিয়েছেন।

এই লইয়া উভয়ের আলোচনা দীর্ঘ হইতে পারিত, কিন্তু একজনের সকৌতুক প্রশ্নমালায় ও অপরের উৎসাহদীপ্ত উত্তর-দানের ঘটায় ভারতী বিপন্ন হইয়া উঠিল। সে কোনটাতেই যোগ দিতে পারিতেছে না দেখিয়া ডাক্তার অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া আসল কথা পাড়িলেন। কহিলেন, শশি, তুমি ত তাহলে এখান থেকে আর শীঘ্র নড়তে পারচ না।

শশী বলিল, নড়া? অসম্ভব।

ডাক্তার কহিলেন, বেশ, আমাদের তাহলে এখানে একটা স্থায়ী আড্ডা রইল।

শশী তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, সে কি করে হতে পারে? আপনাদের সঙ্গে ত আর আমি সম্বন্ধ রাখতে পারব না। লাইফ আমার রিস্ক করা যায় না।

ডাক্তার ভারতীকে লক্ষ্য করিয়া হাসিমুখে বলিলেন, আমাদের ওস্তাদের আর যা দোষই থাক, চক্ষুলজ্জা আছে এ অপবাদ অতিবড় শত্রুতেও দেবে না। পারো যদি এই বিদ্যেটা ওর কাছে শিখে নাও ভারতী।

প্রত্যুত্তরে শশীর পক্ষ লইয়া ভারতী অত্যন্ত ভালমানুষের মত বলিল, কিন্তু মিথ্যে আশা দেওয়ার চেয়ে স্পষ্ট বলাই ত ভাল। আমি পারিনে, কিন্তু অতুলবাবুর কাছে এ বিদ্যে শিখে নিতে পারলে আজ ত আমার ছুটি হয়ে যেতো দাদা।

তাহার কণ্ঠস্বরের শেষ দিকটা হঠাৎ যেন কেমন ভারী হইয়া গেল। শশী মনোনিবেশ করিল না, করিলেও হয়ত তাৎপর্য বোধ করিত না, কিন্তু ইহার নিহিত অর্থ যাঁহার, বুঝিবার তাঁহার বিলম্ব হইল না।

মিনিট-দুই সকলেই মৌন হইয়া রহিলেন। প্রথমে কথা কহিলেন ডাক্তার, বলিলেন, শশি, দিন-দুয়ের মধ্যে আমি যাচ্চি। হাঁটা-পথে চীনের মধ্যে দিয়ে প্যাসিফিকের সব আইল্যান্ডগুলোই আর একবার ঘুরব। বোধ হয় জাপান থেকে

অ্যামেরিকাতেও যাবো। কবে ফিরবো জানিনে, ফিরবই কি না তাই বা কে জানে,—কিন্তু, হঠাৎ যদি কখনো ফিরি শশি, তোমার বাড়িতে বোধ হয় আমার স্থান হবে না?

শশী ক্ষণকাল তাঁহার মুখের প্রতি নির্নিমেষচক্ষে চাহিয়া রহিল, তাহার পরে তাহার নিজের মুখ ও কণ্ঠশব্দ আশ্চর্যরূপে পরিবর্তিত হইয়া গেল। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হবে। আমার বাড়িতে আপনার স্থান চিরকাল হবে।

ডাক্তার কৌতুকভরে কহিলেন, সেকি কথা শশি, আমাকে স্থান দেওয়ার চেয়ে বড় বিপদ মানুষের আর আছে কি?

শশী মুহূর্ত চিন্তা না করিয়া বলিল, সে জানি, আমার জেল হবে। তা হোক গে। এই বলিয়া সে চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে ভারতীকে উদ্দেশ করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, এমন বন্ধু আর নেই। ১৯১১ সালে জাপানের টোকিয়ো শহরে বোমা ফেলার জন্যে যখন কোটোকুর সমস্ত দলবলের প্রাণদণ্ড হল, ডাক্তার তখন তার খবরের কাগজের ইংলিশ সাব্‌এডিটার। বাসার সুমুখের দিকটা পুলিশে ঘিরেচে, আমি কাঁদতে লাগলাম, উনি বললেন, মরলে চলবে না শশি, আমাদের পালাতে হবে। পিছনের জানালা থেকে দড়ি বেঁধে আমাকে নামিয়ে দিয়ে নিজেও নেমে পড়লেন,—ডাক্তারবাবু, উঃ—মনে আছে আপনার? এই বলিয়া সে বিগত স্মৃতির তাড়নায় কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, আছে বৈ কি।

শশী কহিল, থাকার ত কথা। কিন্তু আ-কিম সাহায্য না করলে সেবার ভবলীলা আমাদের সাঙ্গ হত ডাক্তারবাবু। সাংহাই বোটে আর পা দিতে হত না। উঃ—ঐ বেঁটে ব্যাটাদের মত বজ্জাত আর ভূ-ভারতে নেই। আমি ত আর সত্যিই আপনাদের বোমার দলে ছিলাম না—বাসায় থাকতাম, বেহালা শেখাতাম। কিন্তু সে কথা কি শুনতো? শয়তান ব্যাটাদের না আছে আইন, না আছে আদালত! ধরতে পারলেই আমাকে ঠিক জবাই করে ছাড়ত। আজ যে কথা কইচি, চলে

ফিরে বেড়াচ্চি সে কেবল ওঁরই কৃপায়। এই বলিয়া সে চোখের ইঙ্গিতে তাঁহাকে দেখাইয়া দিল। কহিল, এমন বন্ধুও দুনিয়ায় নেই ভারতী, এমন দয়া-মায়াও সংসারে দেখিনি।

ভারতীর চক্ষু সজল হইয়া উঠিল, তোমার সমস্ত কাহিনী একদিন আমাদের গল্প করে শোনাও না দাদা। ভগবান তোমাকে এত বুদ্ধি দিয়েছিলেন, শুধু কি এই অমূল্য প্রাণটার দাম বোঝাবার বুদ্ধিটুকুই দিতে ভুলে ছিলেন! সেই জাপানীদের দেশেই তুমি আবার যেতে চাও?

শশী কহিল, আমিও ঠিক সেই কথাই বলি ভারতী। বলি, অতবড় স্বার্থপর, লোভী, নীচাশয় জাতির কাছে কোন প্রত্যাশাই করবেন না। তারা কোনদিন আপনাকে কোন সাহায্যই করবে না।

ডাক্তার হাসিয়া কহিলেন, কোমরে সেই দড়ি-বাঁধার ঘটনাও শশী ভুললে না, জাপানীদের সে এ জীবনে মাপ করতেও পারলে না। কিন্তু এই তাদের সমস্তটুকু নয় ভারতী, এতবড় আশ্চর্য জাতও পৃথিবীতে আর নেই। শুধু আজকের কথা নয়, প্রথম দৃষ্টিতেই তারা সাদা-চামড়াকে চিনেছিল। আড়াই শ বৎসর আগে যে জাত আইন করতে পেরেছিল, চন্দ্র-সূর্য যতদিন বিদ্যমান থাকবে খ্রীষ্টান যেন না তাদের রাজ্যে ঢোকে, এবং সে যেন তার চরম শাস্তি ভোগ করে, সে জাত যাই কেন না করে থাক তারা আমার নমস্য!

বক্তার দুই চক্ষু একনিমেষেই প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। সেই বজ্রগর্ভ ভয়ঙ্কর দৃষ্টির সম্মুখে শশী যেন উদ্ভ্রান্ত হইয়া গেল। সে সভয়ে বারবার মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিল, সে ঠিক! সে ঠিক!

ভারতীর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, তাহার বুকের মধ্যেটা যেন অভূতপূর্ব অব্যক্ত আবেগে থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল আজ এই গভীর নিশীথে, আসন্ন বিদায়ের প্রাক্কালে একমুহূর্তের জন্য এই লোকটির সে স্বরূপ দেখিতে পাইল।

ডাক্তার নিজের বক্ষদেশে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া কহিলেন, কি বলছিলে ভারতী, এর মূল্য বোঝবার মত বুদ্ধি ভগবান আমাকে দেননি? মিছে কথা! শুনবে আমার সমস্ত ইতিহাস? ক্যান্টনের একটা গুপ্ত-সভার মধ্যে সুনিয়াৎ সেন্ আমাকে একবার বলেছিলেন—

ভারতী হঠাৎ ভয় পাইয়া বলিয়া উঠিল, কারা যেন সিঁড়ি দিয়ে উঠচে—

ডাক্তার কান খাড়া করিয়া শুনিলেন, পকেট হইতে ধীরে-সুস্থে পিস্তল বাহির করিয়া কহিলেন, এই অন্ধকারে আমাকে বাঁধতে পারে পৃথিবীতে কেউ নেই। এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু তাঁহার মুখের উপর উদ্বেগের ছায়া পড়িল।

কেবল বিচলিত হইল না শশী। সে মুখ তুলিয়া কহিল, আজ নবতারাদের একবার আসার কথা ছিল, বোধ হয়—

ডাক্তার হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন, বোধ হয় নয়, তিনিই। অত্যন্ত লঘুপদ। কিন্তু, সঙ্গে তাঁর 'দের'টা আবার কারা?

শশী বলিল, আপনি জানেন না? আমাদের প্রেসিডেন্ট এসেছেন যে। বোধ হয়—

ভারতী অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে প্রেসিডেন্ট? সুমিত্রাদিদি?

শশী মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ। এই বলিয়া সে দ্রুতপদে দ্বার খুলিতে অগ্রসর হইল।

ভারতী ডাক্তারের মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিল। তাহার মনে হইল, এতক্ষণে যেন সে তাঁহার এখানে আসিবার হেতু বুঝিয়াছে। আজ রাত্রিটা বৃথায় যাইবে না, প্রত্যাসন্ন বিক্ষেপের মুখে পথের-দাবীর শেষ মীমাংসা আজ অনিবার্য। হয়ত আইয়ার আছে, তলওয়ারকর আছে, কি জানি হয়ত নিরাপদ বুঝিয়া ব্রজেন্দ্রও শহর ছাড়িয়া আসিয়া এই বনেই আশ্রয় লইয়াছে। ডাক্তার তাঁহার

অভ্যাস ও প্রথামত পিস্তল গোপন করিলেন না, সেটা বাঁ হাতে তেমনি ধরাই রহিল। তাঁহার শান্ত মুখের উপর ভিতরের কোন কথাই পড়া গেল না সত্য, কিন্তু ভারতীর মুখ অধিকতর পাণ্ডুর হইয়া উঠিল।

পঁচিশ

একে একে ঘরের মধ্যে যাঁহারা প্রবেশ করিলেন, তাঁহার সকলেই সুপরিচিত। ডাক্তার মুখ তুলিয়া কহিলেন, এস। কিন্তু সেই মুখের ভাবেই ভারতীর মনে হইল, অন্ততঃ আজিকার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না।

সুমিত্রার খবর তিনি জানিতেন, কিন্তু ইতিমধ্যে সকলেই যে তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া এপারে আসিয়া একত্রিত হইয়াছে এ সংবাদ তাঁহার জানা ছিল না। ইহা কিছুতেই আকস্মিক ব্যাপার নহে, সুতরাং তাঁহার অজ্ঞাতসারে কোন একটা গূঢ় পরামর্শ যে হইয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আগুন্তুকের দল মেঝের উপরে আসিয়া নিঃশব্দে উপবেশন করিলেন, কাহারও আচরণে লেশমাত্র বিস্ময় বা চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইল না; স্পষ্টই বুঝা গেল, ভারতীর সম্বন্ধে না হউক, ডাক্তারের আসার কথা তাঁহারা যেমন করিয়াই হউক আগে হইতেই জানিতে পারিয়াছিলেন। অপূর্বর ব্যাপার লইয়া দলের মধ্যে যে একটা বিচ্ছেদ ঘটিবে এ আশঙ্কা ভারতীর ছিল, হয়ত আজই ইহার একটা কঠিন বুঝাপড়া হইয়া যাইবে, ইহাই মনে করিয়া ভারতীর বুকের ভিতরটায় যেন কাঁপুনি শুরু হইল।

সুমিত্রার মুখ শুষ্ক এবং বিষণ্ণ। ভারতীর সহিত সে কথা কহিল না, ভাল করিয়া চাহিয়াও দেখিল না। ব্রজেন্দ্র তাহার গেরুয়া রঙের মস্ত পাগড়ি খুলিয়া হাতের মোটা লাঠিটা চাপা দিয়া পাশে রাখিল, এবং নিজের বিরাট বপু কাঠের দেয়ালে হেলান দিয়া আরাম করিয়া বসিল। তাহার গোলাকার চক্ষের হিংস্রদৃষ্টি একবার ভারতীর ও একবার ডাক্তারের মুখের পরে যেন পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। রামদাস তলওয়ারকর নীরব ও স্থির, ব্যারিস্টার কৃষ্ণ আইয়ার সিগারেট ধরাইয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন, এবং সকলের হইতে দূরে গিয়া বসিল নবতারা। কিছুর সঙ্গেই যেন তাহার কিছুমাত্র সংস্রব নাই, আজ ভারতীকে

সে চিনিতেও পারিল না। মুখে কাহারও হাসি নাই, বাক্য নাই, সর্বনাশা ঝড়ের পূর্বাহ্নের মত এই নিশীথ সম্মিলন কিয়ৎকালের জন্য একান্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল।

সেদিনের ভয়ানক রাত্রির মত আজও ভারতী উঠিয়া আসিয়া ডাক্তারের অত্যন্ত সন্নিকটে ঘেঁষিয়া বসিল। ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, তোমাদের সবাইকে ভারতী ভয় করতে শুরু করেছে, শুধু ভয় নেই ওর আমাকে।

এইরূপ মন্তব্যের বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না, এবং ভারতী ভিন্ন বোধ হয় কেহ দেখিতেও পাইল না যে সুমিত্রা চোখের ইঙ্গিতে ব্রজেন্দ্রকে নিষেধ করিতেছে। কিন্তু ফল হইল না। হয় সে ইহার অর্থ বুঝিল না, না হয় গ্রাহ্য করিল না। তাহার কর্কশ ভাঙ্গাগলার স্বরে সকলকে চকিত করিয়া বলিয়া উঠিল, আপনার স্বেচ্ছাচারের আমরা নিন্দা করি এবং তীব্র প্রতিবাদ করি। অপূর্বকে যদি কখনো আমি পাই ত তার—

এই অসম্পূর্ণ পদ ডাক্তার নিজেই পূর্ণ করিয়া বলিলেন, তার প্রাণ নেবে। এই বলিয়া তিনি বিশেষ করিয়া সুমিত্রার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা সবাই কি এই লোকটাকে সমর্থন কর? সুমিত্রা মুখ নীচু করিয়া রহিল, এবং অন্য কেহই এ প্রশ্নের উত্তর দিল না। কয়েক মুহূর্ত স্থির থাকিয়া তিনি কহিতে লাগিলেন, ভাবে মনে হয় তোমরা সমর্থন কর। এবং ইতিমধ্যে তোমাদের আলোচনাও হয়ে গেছে—

ব্রজেন্দ্র কহিল, হাঁ হয়ে গেছে, এবং এর প্রতিবিধান হওয়া আবশ্যক মনে করি।

ডাক্তার তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, আমিও তাই মনে করি, কিন্তু তার পূর্বে একটা প্রয়োজনীয় কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, খুব সম্ভব অত্যন্ত ক্রোধের বশেই তোমাদের তা মনে ছিল না। আহমেদ দুরানী ছিল আমাদের সমস্ত উত্তর চীনের সেক্রেটারি, অমন নির্ভীক, কর্মদক্ষ লোক আমাদের দলে আর ছিল না। ১৯১০ সালে জাপান কোরিয়া রাজ্য আত্মসাৎ করে নেবার

মাস-খানেক পরেই সে মাঞ্চুরিয়ার কোন্ একটা রেলওয়ে স্টেশনে ধরা পড়ে। সাংহাইয়ে তার ফাঁসি হয়। সুমিত্রা, দুরানীকে তুমি দেখেছিলে, না?

সুমিত্রা মাথা নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

ডাক্তার কহিলেন, আমি তখন ছিতায় ভাঙ্গা-দল পুনর্গঠনে ব্যস্ত, একটা খবর পর্যন্ত পেলাম না যে আমার একখানা হাত ভেঙ্গে গেল। অথচ তার বিপক্ষে আদালতে বিচারের তামাশা যখন পুরোদমে চলছিল তখন রক্ষা করা তাকে একবিন্দু কঠিন ছিল না। আমাদের অধিকাংশ লোক তখন ঐখানেই বাস করছিল। তবুও, এত বড় দুর্ঘটনা কেন ঘটলো জানো? ফয়জাবাদের মথুরা দুবে তখন অতি তুচ্ছ অবিচার কুবিচারের পুনঃ পুনঃ অভিযোগে দলের মন একেবারে বিষ করে তুলেছিল। দুরানীর মৃত্যুতে সবাই যেন পরিত্রাণ পেলে। আমি ফিরে আসার পরে ক্যান্টনের মিটিঙে যখন সকল ব্যাপার জানা গেল তখন দুরানীও নেই, মথুরাও টাইফয়েড জ্বরে মরেছে। প্রতিকারের কিছুই আর ছিল না, কিন্তু ভবিষ্যতের ভয়ে সে-রাত্রের গুপ্ত-সভা অতিশয় কঠিন দুটো আইন পাশ করে। কৃষ্ণ আইয়ার, তুমি ত উপস্থিত ছিলে, তুমিই বল।

কৃষ্ণ আইয়ারের মুখ শুষ্ক হইয়া উঠিল, কহিল, আপনি কাকে ইঙ্গিত করছেন আমি ত বুঝতে পারচি নে ডাক্তার।

ডাক্তার লেশমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া বলিলেন, ব্রজেন্দ্রকে। একটা আইন এই ছিল, আমার আড়ালে আমার কাজের আলোচনা চলবে না,—

ব্রজেন্দ্র বিদ্রূপের স্বরে প্রশ্ন করিল, আলোচনাও চলবে না?

ডাক্তার উত্তর দিলেন না, আড়ালে চলবে না। কিন্তু চলে তা জানি। তার কারণ, সেদিনকার ক্যান্টনের সভায় উপস্থিত যাঁরা ছিলেন, দুরানীর মৃত্যুতে তাঁরা যতটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন, আমি ততটা হইনি, সুতরাং এ বস্তু চলেও আসচে, আমিও অবহেলা করেই আসচি। কিন্তু দ্বিতীয়টা গুরুতর অপরাধ, ব্রজেন্দ্র।

ব্রজেন্দ্র তেমনি উপেক্ষাভরে কহিল, সেটা প্রকাশ করে বলুন।

ডাক্তার কহিলেন, প্রকাশ করেই বলচি। আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টি করা মারাত্মক অপরাধ। দুরানীর মৃত্যুর পরে এ বিষয়ে সাবধান হওয়া আমার দরকার।

ব্রজেন্দ্র কঠিন হইয়া উঠিল, বলিল, সাবধান হওয়া দরকার অপরেরও ঠিক এমনি থাকতে পারে। জগতে প্রয়োজন শুধু আপনারই একচেটে নয়। এই বলিয়া সে সকলের দিকেই চাহিল, কিন্তু সকলেই মৌন হইয়া রহিল, কেহই তাহার জবাব দিল না।

ডাক্তার নিজেও অনেকক্ষণ নির্বাক্ হইয়া রহিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, এর শাস্তি হচ্ছে চরম দণ্ড । ভেবেছিলাম যাবার পূর্বে আর কিছু করব না, কিন্তু ব্রজেন্দ্র, তোমার আপনারই সবুর সইল না। পরের প্রাণ নিতে ত তুমি সদাই প্রস্তুত, কিন্তু নিজের বেলা কিরকম মনে হয়?

ব্রজেন্দ্রর মুখ কালো হইয়া উঠল। মুহূর্তকাল সে নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া দম্ভভরে কহিয়া উঠিল, আমি এনার্কিস্ট, আমি রেভোলিউশনারি, প্রাণ আমার কাছে কিছুই নয়,—নিতেও পারি, দিতেও পারি।

ডাক্তার শান্তকণ্ঠে বলিলেন, তাহলে আজ রাত্রে সেটা দিতে হবে,—কিন্তু বেল্ট থেকে ওটা টেনে বার করবার সময় হবে না ব্রজেন্দ্র, আমার চোখ আছে,—তোমাকে আমি চিনি। এই বলিয়া তিনি পিস্তল-সমেত বাঁ হাত তুলিয়া ধরিলেন; ভারতী ব্যাকুল হইয়া সেই হাতটা তাঁহার চাপিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেই তিনি ডান হাত দিয়া তাহাকে সরাইয়া দিয়া শুধু বলিলেন, ছি!

ঘরের মধ্যে চক্ষের নিমিষে যেন একটা বজ্রপাত ঘটিয়া গেল।

সুমিত্রার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল, বলিল, নিজেদের মধ্যে এ-সব কি বলুন ত?

তলওয়ারকর এতক্ষণ পর্যন্ত একটা কথাও কহে নাই, এখন সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার দলের সকল নিয়ম আমি জানিনে। আপনার

সঙ্গে মতভেদের শাস্তি কি এখানে মৃত্যু? অপূর্ববাবু বেঁচে গেছেন এতে আমি মনে মনে খুশীই হয়েছি, কিন্তু আপনার অন্যায় তাতে কম হয়নি, এ সত্য বলতে আমি বাধ্য।

কৃষ্ণ আইয়ার ঘাড় নাড়িয়া ইহাতে সায় দিল। ব্রজেন্দ্রের কণ্ঠস্বরে আর উপহাসের স্পর্ধা ছিল না, কিন্তু সে অনেকের সহানুভূতিতে বল পাইয়া বলিল, একজনের প্রাণ যাওয়া যখন চাই, তখন আমারই না হয় যাক। আমি প্রস্তুত।

সুমিত্রা বলিল, ট্রেটরের বদলে যদি একজন ট্রায়েড কম্রেডের রক্তেই তোমার প্রয়োজন, তখন আমিও ত দিতে পারি ডাক্তার!

ডাক্তার স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন, এই উচ্ছ্বাসের সহসা কোন জবাব দিবার চেষ্টা করিলেন না। মিনিট-দুই পরে নিজের মনেই একটুখানি মুচকিয়া হাসিয়া কহিলেন, সে-সব বহুকালের কথা, তখন কোথায়ই বা তোমরা? এই ট্রায়েড কম্রেডটিকে তখন থেকেই আমি জানি। সে যাক্। টোকিওর একটা হোটেলে বসে সুনিয়াৎ সেন্ একদিন বলেছিলেন, নৈরাশ্য সহ্য করার শক্তি যার যত কম সে যেন এ রাস্তা থেকে ততখানি দূরে দূরেই চলে। অতএব, এ আমার সইবে। কিন্তু ব্রজেন্দ্র, তোমাকে আমি মিথ্যে ভয় দেখাবার চেষ্টা করিনি। আমাকে অন্যত্র যেতে হচ্চে, কিন্তু ডিসিপ্লিন ভেঙ্গে গেলে ত আমার চলবে না। সুমিত্রাকে যদি তোমার দলেই পাও, আই উইশ ইউ গুড ল্যক। কিন্তু আমার পথ তুমি ছাড়। সুরাভায়ায় একবার এ্যাটেম্প্ট্ করেছ, পরশু আর একবার করেছ, কিন্তু এর পরে ইফ্ উই মিট—ইউ নো!

সুমিত্রা উদ্বেগে চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ-সব কথার মানে? এ্যাটেম্প্ট্ করার অর্থ?

ডাক্তার এ প্রশ্ন কানেও তুলিলেন না, কহিলেন, কৃষ্ণ আইয়ার, আই অ্যাম সরি!

আইয়ার মুখ অবনত করিল, কিন্তু উত্তর দিল না। ডাক্তার পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিলেন, ভারতীর হাত ধরিয়া একটুখানি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, এইবার চল তোমাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আমি যাই। ওঠ।

ভারতী স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় বসিয়া ছিল, ইঙ্গিতমাত্র নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে সম্মুখে রাখিয়া তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন, শুধু দ্বারের কাছে হইতে একবার সকলকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, গুড্ নাইট!

এই বিদায়-বাণীর কেহ প্রত্যুত্তর দিল না, অভিভূতের ন্যায় সকলে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। ভারতী নীচে নামিয়া গেলে, ডাক্তার উপরের দিকে চোখ রাখিয়া যখন ধীরে ধীরে নামিতেছিলেন, অকস্মাৎ কবাট খুলিয়া শশী মুখ বাহির করিয়া বলিল, কিন্তু আমার যে আপনাকে ভয়ানক প্রয়োজন ডাক্তার। এই বলিয়া সে দ্রুতপদে নামিয়া তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল । রুদ্ধশ্বাসে কহিল, আমি ত মানুষের মধ্যেই নই ডাক্তারবাবু, কোনদিন আপনার কোন কাজে লাগবার শক্তিই আমার নেই, কিন্তু আপনার ঋণ আমি চিরদিন মনে করে রাখবো। এ আমি ভুলব না।

ডাক্তার সস্নেহে তাহার হাতখানি টানিয়া লইয়া বলিলেন, কে বলে তোমাকে মানুষ নয়, শশি? তুমি কবি, তুমি গুণী, তুমি সকল মানুষের বড়। আর আমার কাছে তোমার ঋণ যদি কিছু সত্যিই থাকে, সে ত না ভোলাই ভাল।

শশী বলিল, না, আমি ভুলব না। কিন্তু, যেখানেই থাকুন, যা-কিছু আমার আছে সমস্তই আপনার—এ কথা কিন্তু আপনিও ভুলতে পাবেন না।

উভয়ে ভারতীর কাছে আসিয়া পৌঁছিতে সে উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি দাদা?

ডাক্তার সহাস্যে বলিলেন, অসময়ে ওর ত কোন বিপদই ছিল না, কিন্তু হঠাৎ সময়টা ভাল হয়ে পড়াতেই ওর মহা চিন্তা হয়েছে, পাছে কৃতজ্ঞতার ঋণ

আর মনে না থাকে। তাই ছুটে বলতে এসেছে, ওর যা-কিছু আছে সমস্তই আমার।

ভারতী বলিল, তাই নাকি শশিবাবু?

শশী চুপ করিয়া রহিল। ডাক্তার সকৌতুকে স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন, মনে থাকবে হে শশি, থাকবে। এ বস্তু জগতে এত সুলভ নয় যে কেউ সহজে ভোলে।

শশী কহিল, আপনি কবে যাবেন? তার আগে কি আর দেখা হবে না?

ডাক্তার বলিলেন, ধরে রাখো দেখা হবেই না। কিন্তু তুমি ত আমার বয়েসে ছোট, আমি আশীর্বাদ করে যাচ্চি, তুমি যেন সুখী হতে পারো।

শশী সবিনয়ে কহিল, আসচে শনিবারটা পর্যন্তও কি থাকতে পারেন না?

ভারতী কহিল, শনিবার যে ওঁদের বিয়ে।

ডাক্তার মুখ টিপিয়া হাসিলেন, কিন্তু কিছুই বলিলেন না। সম্মুখে নদী, কাঠের মাড়ের পাশে ক্ষুদ্র তরণী শেষ-ভাঁটায় কাদার উপরে কাত হইয়া পড়িয়া আছে। সোজা করিয়া ভারতীকে সযত্নে তুলিয়া দিয়া তিনি নিজেও উঠিয়া বসিলেন। শশী বলিল, শনিবারটা আপনাকে থেকে যেতে হবে। জীবনে অনেক ভিক্ষে দিয়েছেন, এটিও আমাকে দিন। ভারতী, আপনাকেও সেদিন আসতে হবে।

ভারতী মৌন হইয়া রহিল। ডাক্তার বলিলেন, ও আসবে না শশি, কিন্তু আমি যদি থেকে যেতে পারি অন্ধকারে গা ঢেকে এসে তোমাদের একবার আশীর্বাদ করে যাবো, আমি কথা দিয়ে যাচ্চি। আর যদি না আসি, নিশ্চয় জেনো সব্যসাচীর পক্ষেও তা সম্ভব ছিল না। কিন্তু যেখানেই থাকি, সেদিন তোমার জন্যে এই প্রার্থনাই করব, বাকী দিনগুলো যেন তোমার সুখে কাটে। এই বলিয়া তিনি হাতের লগি দিয়া কাঠের স্তূপে সজোরে ঠ্যালা দিতেই ছোট নৌকা কাদার উপর দিয়া পিছলাইয়া নদীর জলে গিয়া পড়িল।

জোয়ার তখনও আরম্ভ হয় নাই, কিন্তু ভাঁটার টানে ঢিমা পড়িয়া আসিয়াছে। সেই মন্দীভূত স্রোতে উচ্চ তীরভূমির অন্ধকার ছায়ার নীচে দিয়া

তাহাদের ক্ষুদ্র তরণী ধীরে ধীরে পিছাইয়া চলিতে লাগিল। ও-পারের জন্য পাড়ি দিতে তখনও বিলম্ব ছিল, ডাক্তার হাতের দাঁড় যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া স্থির হইয়া বসিলেন।

শ্রান্ত ভারতী তাঁহার ক্রোড়ের উপর কনুই রাখিয়া হেলান দিয়া বসিয়া বলিল, আজ একলা থাকলে আমি এমন কান্না কাঁদতাম যে নদীর জল বেড়ে যেতো। দাদা, ভবিষ্যতে সকলেরই সুখী হবার অধিকার আছে, নেই কি কেবল তোমার? শশীবাবু অতবড় বিশ্রী কাজ করতে উদ্যত, তাকেও তুমি মন খুলে আশীর্বাদ করে এলে,—শুধু কেউ নেই পৃথিবীতে সুখী হও বলে তোমাকেই আশীর্বাদ করবার? তুমি গুরুজন হও আর যাই হও, তোমাকেও আজ আমি ঠিক ওই বলে আশীর্বাদ করব, যেন তুমিও ভবিষ্যতে সুখী হতে পারো।

ডাক্তার সহাস্যে কহিলেন, ছোটর আশীর্বাদ খাটে না। উল্টো ফল হয়।

ভারতী বলিল, মিছে কথা। তা ছাড়া আমি শুধু ছোট নয়, আর একদিক দিয়ে তোমার বড়। যাবার আগে তুমি সমস্ত লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে সুমিত্রাদিদির সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়ে রেখে যেতে চাও।

সে আমি হতে দেব না। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিতে লাগিল, তুমি বলবে সুমিত্রাকে ত তুমি ভালবাস না। নাই বাসলে। তোমাদের পুরুষমানুষের ভালবাসার কতটুকু দাম দাদা, যা আজ আছে কাল নেই? অপূর্ববাবুও আমাকে ভালবাসতে পারেন নি, কিন্তু আমি ত পেরেছি। আমার পারাই যা-কিছু সব। বোলতার মধু সঞ্চয়ের শক্তি নেই বলে ঝগড়া করতে যাবো কার সঙ্গে? কিন্তু আজ তোমাকে বলচি দাদা, এই বিশ্ব-বিধানের প্রভু যদি কেউ থাকেন, নারী-হৃদয়ের এত বড় প্রেমের ঋণ শুধতে তাঁকে আমার হাতে এনে অপূর্ববাবুকে সঁপে দিতে হবেই হবে। এই বলিয়া ভারতী কিছু একটা উত্তরের আশায় ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া কহিল, দাদা, তুমি মনে মনে হাসচো?

কৈ, না!

নিশ্চয়। নইলে তুমি জবাব দিলে না কেন? এই বলিয়া সে অন্ধকারে যতদূর পারা যায় সব্যসাচীর মুখের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

ডাক্তার হেঁট হইয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া এইবার হাসিলেন, বলিলেন, জবাব দেবার কিছু ছিল না ভারতী। তোমার বিশ্ব-বিধানের প্রভুটিকে যদি এই জবরদস্তিই মেনে চলতে হতো, তোমার সুমিত্রাদিদির কি হতো জানো? ব্রজেন্দ্রের হাতেই নিজেকে সর্বপ্রকারে সঁপে দিয়ে তবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে হতো।

ভারতী বিশেষ চমকিত হইল না। আজিকার ব্যাপারের পরে এই সন্দেহই তাহার মনে ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল, জিজ্ঞাসা করিল, ব্রজেন্দ্র কি তাঁকে তোমার চেয়ে,—আমি বলচি, এত বেশী ভালবাসেন?

ডাক্তার সহসা উত্তর দিতে পারিলেন না। তারপর কহিলেন, বলা একটু কঠিন। এ যদি নিছক একটা আকর্ষণই হয় ত মানুষের সমাজে তার তুলনা হয় না। লজ্জা নেই, শরম নেই,সম্ভ্রম নেই,—হিতাহিতবোধলুপ্ত জানোয়ারের উন্মত্ত আবেগ যে চোখে না দেখেচে সে তার মনের পরিচয়ই পাবে না। ভারতী, তোমার দাদার এই হাত-দুটো বলে কোন বস্তু যদি সংসারে না থাকতো, সুমিত্রার আত্মহত্যা ছাড়া বোধ হয় আর কোন পথ খোলা থাকত না। তোমার বিশ্ব-বিধানের প্রভুটিও এতদিন এদের খাতির না করে পারেন নি। এই বলিয়া তিনি ভারতীর আনত মাথার পরে সেই হাত-দুটি রাখিয়া ধীরে ধীরে চাপড়াইতে লাগিলেন।

এতক্ষণে ভারতী শঙ্কায় ত্রস্ত হইয়া উঠিল, বলিল, দাদা, এত জেনেও তুমি এরই হাতে সুমিত্রাকে ফেলে রেখে যেতে চাচ্চো? এতবড় নিষ্ঠুর তুমি হতে পারো, আমি ভাবতেই পারিনে।

ডাক্তার কহিলেন, তাই ত আজ যাবার আগে সমস্ত চুকিয়ে দিয়ে যেতে চেয়েছিলাম,—কিন্তু সুমিত্রাই ত হতে দিলে না।

ভারতী সভয়ে প্রশ্ন করিল, হতে দিলে না কিরকম? তুমি কি সত্যিই ব্রজেন্দ্রকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলে নাকি?

ডাক্তার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, হাঁ, সত্যিই চেয়েছিলাম ! ইতিমধ্যে পুলিশের লোকে যদি না তাকে জেলে পাঠায় ত ফিরে এসে আর একদিন আমাকেই এ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

এতক্ষণ পর্যন্ত ভারতী তাঁহার ক্রোড়ের উপর হেলান দিয়া বসিয়া ছিল, এই কথার পরে উঠিয়া বসিয়া একেবারে স্তব্ধ হইয়া রহিল। সে যে অন্তরের মধ্যে একটা কঠিন আঘাত পাইল ডাক্তার তাহা বুঝিলেন, কিন্তু কোন কথা না কহিয়া পর-পারের জন্য প্রস্তুত হইয়া পার্শ্বে রক্ষিত দাঁড়-দুটা হাতে টানিয়া লইলেন।

অনেকক্ষণ পরে ভারতী আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা দাদা, আমি যদি তোমার সুমিত্রা হতাম, এমনি করে কি আমাকেও ফেলে যেতে পারতে?

ডাক্তার হাসিলেন, বলিলেন, কিন্তু তুমি ত সুমিত্রা নও, তুমি ভারতী। তাই তোমাকে আমি ফেলে যাবো না, কাজের জন্যে রেখে যাবো।

ভারতী ব্যগ্র হইয়া কহিল, রক্ষে কর দাদা, তোমাদের এই-সব খুনোখুনি রক্তারক্তির মধ্যে আমি আর নেই। তোমার গুপ্ত-সমিতির কাজ আমাকে দিয়ে আর হবে না।

ডাক্তার বলিলেন, তার মানে এঁদের মত তুমিও আমাকে ত্যাগ করে যেতে চাচ্চো?

এই উক্তি শুনিয়া ভারতী ক্ষোভে ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কহিল, এতবড় অন্যায় কথা তুমি আমাকে বলতে পারো দাদা? তুমি যা ইচ্ছে করতে পারো, কিন্তু, আমি নিজে থেকে তোমাকে ত্যাগ করে গেছি, এ কথা মনে হলে কি একটা দিনের জন্যেও বাঁচতে পারি তুমি ভাবো? আমি তোমারই কাজ করে যাবো, যতদিন না তুমি স্বেচ্ছায় আমাকে ছুটি দাও। একটুখানি থামিয়া কহিল, কিন্তু আমি ত জানি, মানুষ খুন করে বেড়ানোই তোমার আসল কাজ নয়, তোমার

কাজ মানুষকে মানুষের মত করে বাঁচানো। তোমার সেই কাজেই আমি লেগে থাকবো, এবং সেই ভেবেই ত তোমাদের মধ্যে আমি এসেছিলাম।

ডাক্তার একমুহূর্তের জন্য দাঁড়-টানা বন্ধ রাখিয়া প্রশ্ন করিলেন, সে কাজটা আমার কি?

ভারতী বলিল, আমাদের পথের-দাবীর ত কোন প্রয়োজন ছিল না গুপ্ত-সমিতি হয়ে ওঠা! কারখানার মজুর-মিস্ত্রীদের অবস্থা ত আমি নিজের চোখেই দেখে এসেছি। তাদের পাপ, তাদের কু-শিক্ষা, তাদের পশুর মত অবস্থা,—এর একবিন্দু প্রতিকারও যদি সারাজীবন করতে পারি, তার চেয়ে বড় সার্থকতা আমার আর কি হতে পারে? সত্যি বলো দাদা, একি তোমারই কাজ নয়?

ডাক্তার তখনই কোন জবাব দিলেন না, বহুক্ষণ নীরবে কত কি যেন চিন্তা করিয়া সহসা দাঁড়-দুটা জল হইতে তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, কিন্তু তোমার এ কাজ নয় ভারতী, তোমার অন্য কর্তব্য আছে। এ কাজ সুমিত্রার,—তাই, তার 'পরেই আমি এ ভার ন্যস্ত করে রেখেচি।

তখন নদীতে ভাঁটা শেষ হইয়া মোহানায় জোয়ার আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু সাগরের স্ফীত জলবেগ এখনও এতদূরে আসিয়া পৌঁছে নাই,—সেই স্তব্ধপ্রায় নদীবক্ষে তাঁহাদের ক্ষুদ্র তরণী মন্থর মন্দগতিতে ভাসিয়া চলিতে লাগিল, ডাক্তার তেমনি শান্ত মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, তোমাকে বলাই ভাল ভারতী, জন-কতক কুলি-মজুরের ভাল করার জন্যে পথের-দাবী আমি সৃষ্টি করিনি। এর ঢের বড় লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের মুখে হয়ত একদিন এদের ভেড়া-ছাগলের মতই বলি দিতে হবে,—তার মধ্যে তুমি থেকো না বোন, সে তুমি পারবে না।

ভারতী চমকিয়া উঠিয়া কহিল, এ-সব তুমি কি বোলচ দাদা? মানুষকে বলি দেবে কি!

ডাক্তার তেমনি শান্তস্বরে বলিলেন, মানুষ কোথায়? জানোয়ার বৈ ত নয়!

ভারতী ভীত হইয়া কহিল, মানুষের সম্বন্ধে তুমি ঠাট্টা করেও অমন কথা মুখে এনো না বলচি। সকল সময়ে সব কথা তোমার বোঝা যায় না—বুঝতেও পারিনে, তা মানি; কিন্তু তোমার মুখের কথার চেয়ে তোমাকে আমি ঢের বেশী বুঝি দাদা, মিথ্যে আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করো না।

ডাক্তার বলিলেন, না ভারতী, মিথ্যে নয়, তোমাকে সত্যি ভয় দেখাবার চেষ্টা করচি, যেন আমার যাবার পরে আর তুমি কারখানার কুলি-মজুরদের ভাল-করার মধ্যে না থাকো। এমন করে এদের ভালো করা যায় না,—এদের ভালো করা যায় শুধু বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে। এবং সেই বিপ্লবের পথে চালনা করার জন্যেই আমার পথের-দাবীর সৃষ্টি। বিপ্লব শান্তি নয়।

হিংসার মধ্যে দিয়েই তাকে চিরদিন পা ফেলে আসতে হয়,—এই তার বর, এই তার অভিশাপ। একবার ইউরোপের দিকে চেয়ে দেখ। হংগেরিতে তাই হয়েছে, রুসিয়ায় বার বার এমনি ঘটেছে, ৪৮ সালের জুন মাসের বিপ্লব ফরাসীদের ইতিহাসে আজও অক্ষয় হয়ে আছে। কুলি-মজুরদের রক্তে সেদিন শহরের সমস্ত রাজপথ একেবারে রাঙ্গা হয়ে উঠেছিল। এই ত সেদিনের জাপান,—সেদেশেও দিনমজুরের দুঃখের ইতিহাস একবিন্দু বিভিন্ন নয়। মানুষের চলবার পথ মানুষে কোনদিন নিরুপদ্রবে ছেড়ে দেয় না ভারতী।

ভারতী শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, সে আমি জানিনে, কিন্তু ওই-সব ভয়ানক উৎপাত কি তুমি এদেশেও টেনে আনবে নাকি? যাদের একফোঁটা ভালো করবার জন্যে আমরা অহর্নিশি পরিশ্রম করচি, তাদেরি রক্ত দিয়ে কারখানার রাস্তায় নদী বহাতে চাও নাকি?

ডাক্তার অবলীলাক্রমে কহিলেন, নিশ্চয় চাই। মহামানবের মুক্তি-সাগরে মানবের রক্তধারা তরঙ্গ তুলে ছুটে যাবে সেই ত আমার স্বপ্ন। এতকালের পর্বতপ্রমাণ পাপ তবে ধুয়ে যাবে কিসে? আর সেই ধোয়ার কাজে তোমার দাদার দু' ফোঁটা রক্তেরও যদি প্রয়োজন হয় ত আপত্তি করব না ভারতী।

ভারতী কহিল, ততটুকু তোমাকে আমি চিনি, দাদা। কিন্তু দেশের মধ্যে এই অশান্তি ঘটিয়ে তোলবার জন্যেই এতবড় ফাঁদ পেতে বসে আছো? এর চেয়ে বড় আদর্শ আর তোমার নেই?

ডাক্তার বলিলেন, আজও ত খুঁজে পাইনি বোন। অনেক ঘুরেছি, অনেক পড়েছি, অনেক ভেবেচি। কিন্তু তোমাকে ত আমি আগেও বলেছি, ভারতী, অশান্তি ঘটিয়ে তোলার মানেই অকল্যাণ ঘটিয়ে তোলা নয়। শান্তি! শান্তি! শান্তি! শুনে শুনে কান একেবারে ঝালাপালা হয়ে গেছে। কিন্তু এ অসত্য এতদিন ধরে কারা প্রচার করেছে জানো? পরের শান্তি হরণ করে যারা পরের রাস্তা জুড়ে অট্টালিকা প্রাসাদ বানিয়ে বসে আছে তারাই এই মিথ্যামন্ত্রের ঋষি। বঞ্চিত, পীড়িত, উপদ্রুত নরনারীর কানে অবিশ্রান্ত এই মন্ত্র জপ করে করে তাদের এমন করে তুলেছে যে, আজ তারাই অশান্তির নামে চমকে উঠে,—ভাবে এ বুঝি পাপ, এ বুঝি অমঙ্গল! বাঁধা গরু অনাহারে দাঁড়িয়ে মরতে দেখেচ? সে দাঁড়িয়ে মরে তবু সেই জীর্ণ দড়িটা ছিঁড়ে ফেলে মনিবের শান্তি নষ্ট করে না। তাইত হয়েছে, তাইত আজ দীন-দরিদ্রের চলার পথ একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেছে! তবুও তাদেরই অট্টালিকা প্রাসাদ চূর্ণ করার কাজে তাদেরি সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে যদি আমরাও আজ অশান্তি বলে কাঁদতে থাকি ত পথ পাবো কোথায়? না ভারতী, সে হবে না। ও প্রতিষ্ঠান যত প্রাচীন, যত পবিত্র, যত সনাতনই হোক,—মানুষের চেয়ে বড় নয়,—আজ সে-সব আমাদের ভেঙ্গে ফেলতেই হবে। ধূলো ত উড়বেই, বালি ত ঝরবেই, ইঁট-পাথর খসে মানুষের মাথাতে ত পড়বেই ভারতী, এই ত স্বাভাবিক।

ভারতী বলিল, তাও যদি হয়, দাদা, শান্তির পথ ছেড়ে দিয়ে আগে থেকেই অশান্তির পথে পা বাড়াবো কেন?

ডাক্তার বলিলেন, তার কারণ, শান্তির পথ ঐ সনাতন, পবিত্র ও সুপ্রাচীন সভ্যতার সংস্কার দিয়ে এঁটে বন্ধ করা আছে বলে । কেবল ঐ বিপ্লবের পথটাই আজও খোলা আছে।

ভারতী প্রশ্ন করিল, আমরা যে সেদিন কারখানার কারিগরদের সঙ্ঘবদ্ধ করে নিরুপদ্রব ধর্মঘট করাবার আয়োজন করেছিলাম সেও কি তবে তাদের মঙ্গলের জন্যে নয়? তুমি চলে গেলে পথের-দাবীর সে প্রচেষ্টাও কি আমাদের বন্ধ করে দিতে হবে?

ডাক্তার বলিলেন, না। কিন্তু সে কর্তব্য তোমার নয়, সুমিত্রার। তোমার কাজ আলাদা। ভারতী, ধর্মঘট বলে একটা বস্তু আছে, কিন্তু নিরুপদ্রব-ধর্মঘট বলে কোথাও কিছু নেই। সংসারে কোন ধর্মঘটই কখনো সফল হয় না, যতক্ষণ না পিছনে তার বাহুবল থাকে। শেষ পরীক্ষা তাকেই দিতে হয়।

ভারতী বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, কাকে দিতে হয়? শ্রমিককে?

ডাক্তার বলিলেন, হাঁ! তুমি জানো না, কিন্তু সুমিত্রা ভাল করেই জানে যে ধনীর আর্থিক ক্ষতি এবং দরিদ্রের অনশন এক বস্তু নয়। তার উপায়হীন, কর্মহীন দিনগুলো দিনের পর দিন তাকে উপবাসের মধ্যে ঠেলে নিয়ে যায়। তার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার ক্ষুধায় কাঁদতে থাকে,—তাদের অবিশ্রান্ত ক্রন্দন অবশেষে একদিন তাকে পাগল করে তোলে,—তখন পরের অন্ন কেড়ে খাওয়া ছাড়া জীবনধারণের আর সে পথ খুঁজে পায় না। ধনী সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করেই স্থির হয়ে থাকে। অর্থ-বল, সৈন্য-বল, অস্ত্র-বল সবই তার হাতে,—সে-ই ত রাজশক্তি। সেদিন সে আর অবহেলা করে না,—তোমার ঐ সনাতন শান্তি ও পবিত্র শৃঙ্খলার জয়জয়কার হোক, সেদিন নিরস্ত্র নিরন্ন দরিদ্রের রক্তে নদী বহে যায়।

ভারতী রুদ্ধশ্বাসে কহিল, তার পরে?

ডাক্তার বলিলেন, তার পরে আবার একদিন সেই-সব পীড়িত, পরাভূত, ক্ষুধাতুর শ্রমিকের দল এসে সেই হত্যাকারীর দ্বারেই হাত পেতে দাঁড়ায়। ভিক্ষা পায়।

ভারতী কহিল, তার পরে?

ডাক্তার বলিলেন, তারও পরে? তার পরে আবার একদিন সে দলবদ্ধ হয়ে পূর্ব-অত্যাচারের প্রতিকারের আশায় ধর্মঘট করে বসে, তখন আবার সেই পুরাতন কাহিনীর পুনরাভিনয় হয়।

ভারতীর মন মুহূর্তকালের জন্য একেবারে নিরাশায় ভরিয়া গেল, ধীরে ধীরে কহিল, তবে এমন ধর্মঘটে লাভ কি দাদা?

ডাক্তারের চোখের দৃষ্টি অন্ধকারেও জ্বলিয়া উঠিল, কহিলেন, লাভ? এই ত পরম লাভ ভারতী! এই ত আমার বিপ্লবের রাজপথ! বস্ত্রহীন, অন্নহীন, জ্ঞানহীন দরিদ্রের পরাজয়টাই সত্য হল, আর তার বুক জুড়ে যে বিষ উপচে উছলে ওঠে জগতে সে শক্তি সত্য নয়? সেই ত আমার মূলধন। কোথাও কোন দেশে নিছক বিপ্লবের জন্যই বিপ্লব বাধানো যায় না, ভারতী, একটা কিছু অবলম্বন তার চাই-ই চাই। সেই ত আমার অবলম্বন। যে মূর্খ এ কথা জানে না, শুধু মজুরির কম-বেশি নিয়ে ধর্মঘট বাধাতে চায়, সে তাদেরও সর্বনাশ করে, দেশেরও করে।

ভারতী সহসা কহিল, নৌকা বোধ হয় আমাদের অনেকখানি পেছিয়ে এসেছে দাদা।

ডাক্তার হাসিলেন, বলিলেন, সেদিকেও চোখ আছে দিদি, কোথায় যেতে হবে, তা ভুলিনি।

ভারতী কহিল, কেন যে এর মধ্যে থেকে আমাকে তুমি বিদায় দিতে চাও এতক্ষণে তা বুঝেচি। আমি ভারী দুর্বল। হয়ত, তাঁরি মতই দুর্বল। আমি কিছু নয়,—আজও তোমার সমস্ত ভরসা সেই সুমিত্রাদিদির ’পরেই।

কিন্তু এ কথা আমি কিছুতে মানবো না যে, এ ছাড়া আর পথ নেই,—মানুষের সমস্ত খোঁজাই একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে। একজনের মঙ্গলের জন্য আর একজনের অমঙ্গল করতেই হবে,—এ আমি কোনমতেই চরম সত্য বলে নেব না,—তুমি বললেও না।

সে আমি জানি বোন।

ভারতী কহিল, কিন্তু তোমার কাজ ছেড়েই বা আমি যাই কি করে? থাকবো কি নিয়ে? ফিরে যদি আর না এসো আমি বাঁচবো কি করে?

সেও আমি জানি।

ভারতী বলিল, জান তুমি সব। তবে?

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিল। উত্তর না পাইয়া ভারতী ধীরে ধীরে বলিল, বিপ্লব যে কি, কেন এর এত প্রয়োজন মনের মধ্যে আমি ধারণাই করতে পারিনে। তবু, তোমার মুখ থেকে যখন শুনি বুকের ভেতরটায় কেমন যেন কাঁদতে থাকে। মনে হয় মানুষের দুঃখের ইতিহাস তুমি কতই না চোখে দেখেচ। নইলে এমন করে তোমাকে পাগল করেছে কিসে? আচ্ছা, যাবার সময় কি আমাকে তুমি সঙ্গে নিতে পারো না দাদা?

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, তুমি ক্ষেপেচ ভারতী?

ক্ষেপেচি? তাই হবে। একটুখানি থামিয়া বলিল, মনে হয় আমি যেন তোমার কাজের বাধা। তাই, যেন কোথায় আমাকে আস্তে আস্তে সরিয়ে দিয়ে যাচ্চো। কিন্তু, আমি কি দেশের কোন ভাল কাজেই লাগতে পারিনে? এমন সুযোগ কি কোথাও কিছু নেই?

ডাক্তার বলিলেন, দেশে ভাল কাজ করার অসংখ্য অবকাশ আছে ভারতী, কিন্তু সুযোগ নিজে তৈরি করে নিতে হয়।

ভারতী আদর করিয়া বলিল, আমি পারিনে দাদা, তুমি তৈরি করে দিয়ে যাও।

ডাক্তার ক্ষণকাল মৌন হইয়া রহিলেন। তাঁহার হাসিমুখ সহসা যে গম্ভীর হইয়া উঠিল, অন্ধকারে ভারতী তাহা দেখিতে পাইল না। কহিলেন, দেশের মধ্যে ছোটবড় এমন অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, যারা দেশের ঢের ভাল কাজ করে। আর্তের সেবা, নরনারীর পুণ্যসঞ্চয়ে প্রবৃত্তি দান করা, লোকের জ্বর ও পেটের অসুখে

ঔষধ যোগানো, জল-প্লাবনে সাহায্য ও সান্ত্বনা দেওয়া—তাঁরাই তোমাকে পথ দেখিয়ে দেবেন, ভারতী, কিন্তু আমি বিপ্লবী। আমার মায়া নেই, দয়া নেই, স্নেহ নেই—পাপ-পুণ্য আমার কাছে মিথ্যা পরিহাস। ওই-সব ভাল কাজ আমার কাছে ছেলেখেলা। ভারতের স্বাধীনতাই আমার একমাত্র লক্ষ্য, আমার একটিমাত্র সাধনা। এই আমার ভাল, এই আমার মন্দ,—এ ছাড়া এ জীবনে আর আমার কোথাও কিছু নাই। ভারতী, আমাকে আর তুমি টেনো না।

ভারতী অন্ধকারে একদৃষ্টে তাঁহার প্রতি চাহিয়া ছিল, রুদ্ধ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

ছাব্বিশ

আজ শনিবার, শশী ও নবতারার বিবাহের দিন। শশীর সনির্বন্ধ প্রার্থনা এই ছিল যে, রাত্রির অন্ধকারে লুকাইয়া কোন এক সময়ে যেন ডাক্তার ভারতীকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া আজ তাহাদের আশীর্বাদ করিয়া যান। পঞ্চমীর খণ্ডচন্দ্র সেইমাত্র গাছের আড়ালে ঢলিয়া পড়িয়াছে, ভারতী একখানা কালো র্যাপারে সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া নিঃশব্দ পদক্ষেপে তাহার সেই জনশূন্য ঘাটের একধারে আসিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার নৌকায় অপেক্ষা করিতেছিলেন, ভারতী আরোহণ করিয়া বলিল, কত-কি যে ভাবতে ভাবতে আসছিলাম তার ঠিকানা নেই। জানি, আমাকে না বলে তুমি কিছুতেই চলে যাবে না, তবু ত ভয় ঘোচে না। ক'দিনই বা, কিন্তু, মনে হচ্ছিল যেন কত যুগ তোমাকে দেখতে পাইনি, দাদা। আমি নিশ্চয় তোমার সঙ্গে চীনেদের দেশে চলে যাবো তা বলে রাখছি।

ডাক্তার সহাস্যে কহিলেন, আমিও বলে রাখচি তুমি নিশ্চয়ই ও-রকম কিছু করবার চেষ্টা করবে না। এই বলিয়া তিনি ভাঁটার টানে নৌকা ছাড়িয়া দিলেন। বলিলেন, এইটুকু ত, বেশ যাওয়া যাবে, কিন্তু বড় নদীতে পড়ে উলটো স্রোত ঠেলে পৌঁছতে আজ আমাদের ঢের দেরি হবে।

ভারতী কহিল, হলই বা। এমনি কি শুভকর্মে যোগ দিতে চলেছ যে সময় বয়ে গেলে ক্ষতি হবে? আমার ত যাবার ইচ্ছেই ছিল না,—শুধু তুমি যাচ্চো বলেই যাওয়া। কি বিশ্রী নোংরা কাণ্ড বলত!

ডাক্তার ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন, শশীর নবতারার সঙ্গে বিয়ে অনেকের সংস্কারে বাধে, হয়ত বা দেশের আইনেও বাধে। কিন্তু সে দোষ ত শশীর নয়, আইন করা-না-করার জন্য দায়ী যারা, অপরাধ তাদের। আমার একমাত্র ক্ষোভ শশী আর কাউকে যদি ভালবাসতো ভারতী!

ভারতী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, শশীবাবু না হয় আর কাউকে ভালবাসলেন, কিন্তু সে বাসবে কেন? ওঁর মত মানুষকে সজ্ঞানে কোন মেয়েমানুষ ভালবাসতে পারে এ ত আমি ভাবতেই পারিনে। আচ্ছা তুমিই বল, পারে দাদা?

ডাক্তার মুচকিয়া হাসিলেন, বলিলেন, ওকে ভালবাসা শক্ত বৈ কি। তাই ত রয়ে গেলাম তাকে আশীর্বাদ করব বলে। মনে হল, সত্যকার শুভকামনার যদি কোন শক্তি থাকে শশী যেন তার ফল পায়।

তাঁহার কণ্ঠস্বরের আকস্মিক গভীরতায় ভারতী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, শশীবাবুকে তুমি বাস্তবিক ভালোবাসো, না দাদা?

ডাক্তার বলিলেন, হাঁ।

কেন?

তোমাকেই বা কেন এত ভালবাসি তারই কি কারণ দিতে পারি দিদি? বোধ হয় এমনিই।

ভারতী আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা দাদা, তোমার কাছে কি তবে আমরা দুজনে এক? কিন্তু পরক্ষণেই সহাস্যে বলিল, তবু ত নিজের দামটা এতদিনে টের পেলাম। চল, আমিও তোমার সঙ্গে গিয়ে এখন খুশী হয়ে তাদের আশীর্বাদ—না না, প্রণাম করে আসি গে।

ডাক্তারও হাসিলেন, বলিলেন, চল।

জোয়ারের আশায় নদীর এপারে কোথাও দীর্ঘকাল অপেক্ষা করা নিরাপদ নহে, তাই ভাঁটা ঠেলিয়া কষ্ট করিয়াই চলিতে হইল। খাঁড়ির মুখে একখানা জাপানী জাহাজ কিছুদিন হইতে বাঁধা ছিল, সেই স্থানটা নিঃশব্দে পার হইয়া ভারতী কথা কহিল। বলিল, এই কয়দিন থেকে থেকে কেবলি মনে হতো, দাদা, সমুদ্রের যেমন তল নেই, তোমারও তেমনি তল নেই। স্নেহ বল, ভালবাসা বল, কিছুই তোমাতে ভর দিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে না। সবই যেন কোথায় তলিয়ে চলে যায়।

ডাক্তার বলিলেন, প্রথমতঃ, সমুদ্রের তল আছে, সুতরাং, উপমা তোমার এ ক্ষেত্রে অচল।

ভারতী কহিল, এই নিয়ে বোধ হয় তোমাকে এক শ' বার বললাম যে, তুমি ছাড়া দুনিয়ায় আমার আর আপনার কেউ নেই,—তুমি চলে গেলে আমি দাঁড়াবো কোথায়? কিন্তু এ কথা তোমার কানেই পৌঁছল না। আর পৌঁছবে কি করে দাদা, হৃদয় ত নেই। আমি ঠিক জানি একবার চোখের আড়াল হলে তুমি নিশ্চয় আমাকে ভুলে যাবে।

ডাক্তার বলিলেন, না। তোমাকে নিশ্চয় মনে থাকবে।

ভারতী প্রশ্ন করিল, কি আশ্রয় করে আমি সংসারে থাকবো?

ডাক্তার বলিলেন, ভাগ্যবতী মেয়েরা যা আশ্রয় করে থাকে। স্বামী, ছেলেপুলে, বিষয়-আশয়, ঘরদোর—

ভারতী রাগ করিয়া বলিল, আমি যে অপূর্ববাবুকে একান্তভাবেই ভালবেসেছিলাম এ সত্য তোমার কাছে গোপন করিনি; তাঁকে পেলে একদিন যে আমার সমস্ত জীবন ধন্য হয়ে যেতো এ কথাও তুমি জানো,—তোমার কাছে কিছু লুকানোও যায় না,—কিন্তু তাই বলে আমাকে তুমি অপমান করবে কিসের জন্যে?

ডাক্তার আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, অপমান! অপমান ত তোমাকে আমি এতটুকু করিনি, ভারতী।

সহসা অশ্রু-আভাসে ভারতীর কণ্ঠ ভারী হইয়া উঠিল, কহিল, না, করনি বৈ কি! তুমি জানো কত শত-সহস্র বাধা, তুমি জানো তিনি আমাকে গ্রহণ করতেই পারেন না,—তবুও তুমি এই-সব বলবে!

ডাক্তার ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, এই ত মেয়েদের দোষ। তারা নিজেরা একদিন যা বলে, অপরে তাই আর একদিন উচ্চারণ করলেই তারা তেড়ে মারতে আসে। সেদিন সুমিত্রার কথায় বললে সে কাকে যেন একদিন পায়ের তলায়

টেনে এনে ফেলবে, আর আজ আমি তারই পুনরাবৃত্তি করায় কান্নায় গলা তোমার বুঁজে এলো!

ভারতী চোখ মুছিয়া বলিল, না, তুমি কখনো এ-সব কথা আমাকে বলতে পাবে না।

ডাক্তার কহিলেন, বেশ, বলব না। কিন্তু এ যাত্রা বেঁচে যদি ফিরে আসি বোন, এই আমারই পায়ের কাছে গলায় আঁচল দিয়ে স্বীকার করতে হবে,—দাদা, আমার কোটি কোটি অপরাধ হয়েছে,—নিশ্চয় তুমি হাত গুণতে জানো, নইলে সৌভাগ্যের এতবড় সত্যি কথা তখন বলেছিলে কি করে!

ভারতী ইহার উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া তিনি পুনশ্চ কথা কহিলেন, এবার কোথা দিয়া যেন কণ্ঠস্বরে তাঁহার অপরূপ সুর মিশিল, বলিলেন, সে-রাত্রে সুমিত্রার কথা যখন বলছিলে, ভারতী, আমি জবাব দিতে পারিনি। এ পথের পথিক নই আমি, তবু তোমার মুখের সুমিত্রার কাহিনীতে গায়ে আমার বার বার কাঁটা দিয়ে উঠেছিলো! দুনিয়া ঘুরে অনেক বস্তুরই হদিস পেয়েছি, পেলাম না শুধু এই নর-নারীর প্রেমের তত্ত্ব! দিদি, অসম্ভব বলে শব্দটা বোধ হয় সংসারে কেবল এদেরই অভিধানে লেখে না।

এ কথায় ভারতী লেশমাত্র ঔৎসুক্য প্রকাশ করিল না। উদাস-নিস্পৃহ স্বরে বলিল, তোমার বাক্যই সত্য হোক, দাদা, ও শব্দটা তোমাদের অভিধান থেকে যেন মুছে যায়। সুমিত্রাদিদির অদৃষ্ট যেন একদিন প্রসন্ন হয়। একটুখানি থামিয়া বলিল, আমি অনেক ভেবে দেখেচি, আমার নিজের কিন্তু ওতে আর আনন্দ নেই, ও আমি আর কামনাও করিনে। এই বলিয়া সে পুনরায় ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, অপূর্ববাবুকে আমি যথার্থই ভালবাসি। ভাল হোক, মন্দ হোক, তাঁকে আর আমি ভুলতে পারবো না। কিন্তু তাই বলে তাঁর স্ত্রী হয়ে তাঁর ঘর-সংসার না করতে পেলেই জীবন আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে কিসের জন্যে? এ আমার শোকের কথা নয় দাদা, তোমাকে অকপটে যথার্থই বলচি আমাকে তুমি

শান্তমনে আশীর্বাদ করে পথ দেখিয়ে দিয়ে যাও,—তোমার মত আমিও পরের কাজেই এ জন্মটা আমার সার্থক করে তুলব। নাও না দাদা, তোমার নিরাশ্রয় ছোট বোনটিকে সাথী করে!

ডাক্তার নিঃশব্দে তরী বাহিয়া চলিলেন, এতবড় সনির্বন্ধ অনুরোধের উত্তর দিলেন না। অন্ধকারে তাঁহার মুখের চেহারা ভারতী দেখিতে পাইল না, সে এই নীরবতায় আশান্বিতা হইয়া উঠিল। এবার তাহার কণ্ঠস্বরে সস্নেহ-অনুনয়ের নিবিড় বেদনা যেন উপচিয়া পড়িল, বলিল, নেবে দাদা সঙ্গে? তুমি ছাড়া এ আঁধারে যে এককোঁটা আলোও আর কোথাও দেখতে পাইনে!

ডাক্তার ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, অসম্ভব ভারতী। তোমার কথায় আজ আমার জোয়াকে মনে পড়ে; তোমারই মত তার অমূল্য জীবন অকারণে নষ্ট হয়ে গেছে। ভারতের স্বাধীনতা ছাড়া আমার নিজের আর দ্বিতীয় লক্ষ্য নেই, কিন্তু মানবজীবনে এর চেয়ে বৃহত্তর কাম্য আর নেই এমন ভুলও আমার কোন দিন হয়নি। স্বাধীনতাই স্বাধীনতার শেষ নয়। ধর্ম, শান্তি, কাব্য, আনন্দ—এরা আরও বড়। এদের একান্ত বিকাশের জন্যই ত স্বাধীনতা, নইলে এর মূল্য ছিল কোথা? এর জন্যে তোমাকে আমি হত্যা করতে পারব না বোন, তোমার মধ্যে যে হৃদয় স্নেহে, প্রেমে, করুণায়, মাধুর্যে এমন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, সে আমার প্রয়োজনকে অতিক্রম করে বহু উর্ধ্বে চলে গেছে,—তার নাগাল আমি হাত বাড়িয়ে পাবো না।

ভারতীর সর্বাঙ্গ পুলকে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সব্যসাচীর গভীর অন্তরের একটা অপরূপ মূর্তি যে যেন সহসা চক্ষে দেখিতে পাইল। ভক্তি ও আনন্দে বিগলিত হইয়া কহিল, আমিও ত তাই ভাবি দাদা, তোমার অজানা সংসারে কি আছে! আর তাই যদি হলো, কি হেতু তুমি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে আছো? দেশে-বিদেশে গুপ্ত-সমিতি সৃষ্টি করে বেড়ানো তোমার কিসের জন্যে? মানবের চরম কল্যাণ ত কোন দিনই এর মধ্যে থেকে হতে পারবে না।

ডাক্তার বলিলেন, ঠিক তাই। কিন্তু চরম কল্যাণের ভার আমরা বিধাতার হাতে ছেড়ে দিয়ে ক্ষুদ্র মানবের সাধ্যের মধ্যে যে সামান্য কল্যাণ তারই চেষ্টাতে নিযুক্ত আছি। নিজের দেশের মধ্যে স্বাধীনভাবে কথা কওয়া, স্বাধীনভাবে চলে-ফিরে বেড়ানোর অতি তুচ্ছ অধিকার,—এর অধিক সম্প্রতি আর আমরা কিছুই চাইনে, ভারতী।

ভারতী কহিল, সে ত সবাই চায়, দাদা, কিন্তু তার জন্যে নরহত্যার ষড়যন্ত্র কিসের জন্যে বল ত? কি তার প্রয়োজন? কিন্তু কথাটা উচ্চারণ করিয়া ফেলিয়া সে অত্যন্ত লজ্জিত হইল। কারণ এ অভিযোগ শুধু রূঢ় নয়, অসত্য!

তৎক্ষণাৎ অনুতপ্তচিত্তে কহিল, আমাকে মাপ কর দাদা, এ মিথ্যে আমি শুধু রাগের ওপরেই বলে ফেলেছি। আমাকে তুমি ফেলে চলে যাবে—এ যেন আমি ভাবতেই পারচি নে।

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, তা আমি জানি।

ইহার পরে বহুক্ষণ পর্যন্ত আর কোন কথাবার্তা হইল না। এই সময়ে কিছুদিন হইতে 'স্বদেশী' আন্দোলন ভারতবর্ষব্যাপী হইয়া উঠিয়াছিল। ভক্তিভাজন নেতৃবৃন্দ দেশোদ্ধারকল্পে আইন বাঁচাইয়া যে-সকল জ্বালাময়ী বক্তৃতা অবকাশ মত দিয়া বেড়াইতেছিলেন তাহারই সারাংশ সংবাদপত্র-স্তম্ভে মাঝে মাঝে পাঠ করিয়া ভারতী সশ্রদ্ধবিস্ময়ে আপ্লুত হইয়া উঠিত। বিগত রাত্রে এমনি ধারা কি একটা রোমাঞ্চকর রচনা খবরের কাগজে পাঠ করিয়া অবধি তাহার মনের মধ্যে উত্তেজনার তপ্ত বাতাস সারাদিন ধরিয়া আজ বহিয়া ফিরিতেছিল। তাহাই স্মরণ করিয়া কহিল, আমি জানি ইংরাজ রাজত্বে তোমার স্থান নেই। কিন্তু সমস্ত দুনিয়াই ত তাদের নয়! সেখানে গিয়ে তোমরা ত সরল, প্রকাশ্যভাবেই তোমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেষ্টা করতে পারো।

প্রশ্ন করিয়া ভারতী উত্তরের আশায় কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া বলিল, অন্ধকারে তোমার মুখ দেখতে পাচ্চিনে বটে, কিন্তু বেশ বুঝতে পারচি মনে মনে

তুমি হাসচো। কিন্তু, তুমি এবং তোমার বিভিন্ন দলগুলিই ত শুধু নয়, আরও যাঁরা দেশের কাজে,—তাঁরা প্রবীণ, বিজ্ঞ, রাজনীতিতে যাঁরা,—আচ্ছা দাদা, কালকের বাংলা খবরের কাগজটা—

বক্তব্য শেষ হইল না, ডাক্তার হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, রক্ষে কর ভারতী, আমাদের সঙ্গে তুলনা করে পূজনীয়গণের অমর্যাদা করো না।

ভারতী কহিল, বরঞ্চ, তুমিই তাঁদের বিদ্রূপ করচ।

ডাক্তার সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, মোটে না। তাঁদের আমি ভক্তি করি, এবং তাঁদের দেশোদ্ধারের বক্তৃতা আমাদের চেয়ে সংসারে কেউ বেশী উপভোগ করে না।

ভারতী ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, পথ তোমাদের এক না হতে পারে, কিন্তু উদ্দেশ্য ত একই।

ডাক্তার ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিলেন, এতক্ষণ হাসছিলাম সত্যি, এবার কিন্তু রাগ করব ভারতী। পথ আমাদের এক নয় এটা জানা কথা, কিন্তু লক্ষ্য যে আমাদের তার চেয়েও অধিক স্বতন্ত্র এ কি তুমিও এতদিন বোঝনি? পৃথিবীর বহুজাতিই স্বাধীন,—তার চেয়ে বড় গৌরব মানব-জন্মের আর নেই, সেই স্বাধীনতার দাবী করা, চেষ্টা করা ত ঢের দূরের কথা, তার কামনা করা, কল্পনা করাও ইংরাজের আইনে ভারতবাসীর রাজদ্রোহ। আমি সেই অপরাধেই অপরাধী! চিরদিন পরাধীন থাকাটাই এ দেশের আইন। সুতরাং, আইনের বাইরে এই-সব প্রবীণ পূজ্য ব্যক্তিরা ত কোন দিন কোন-কিছুই দাবী করেন না। চীনাদের দেশে মাঞ্চু রাজাদের মত এদেশেও যদি ইংরাজ আইন করে দিত—সবাইকে আড়াই হাত টিকি রাখতে হবে, তবে টিকির বিরুদ্ধে এঁরা কোনমতেই বে-আইনী প্রার্থনা করতেন না। এঁরা এই বলে আন্দোলন করতেন যে, আড়াই হাত আইনের দ্বারা দেশের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হয়েচে, এতে দেশের সর্বনাশ হয়ে যাবে, অতএব, একে সওয়া দু'হাত করে দেওয়া হোক। এই বলিয়া তিনি নিজের

রসিকতায় উৎফুল্ল হইয়া অকস্মাৎ অট্টহাস্যে নদীর অন্ধকার নীরবতা বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিলেন।

হাসি থামিলে ভারতী কহিল, তুমি যাই কেন না বল, তাঁরাও যে দেশের নমস্য ন'ন এ কথা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারব না। আমি সকলের কথাই বলচি নে, কিন্তু সত্য সত্যই যাঁরা রাষ্ট্রনীতিবিদ—যথার্থই যাঁরা দেশের শুভাকাঙ্ক্ষী, তাঁদের সকল শ্রমই ব্যর্থশ্রম, এ কথা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করা কঠিন। মত এবং পথ বিভিন্ন বলেই কাউকে ব্যঙ্গ করা সাজে না।

তাহার কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্য উপলব্ধি করিয়া ডাক্তার চুপ করিলেন। পিছন হইতে একটা স্টিম লঞ্চ যথেষ্ট শব্দ-সাড়া করিয়া তাঁহাদের ক্ষুদ্র তরণীকে রীতিমত দোল দিয়া বাহির হইয়া গেলে সব্যসাচী ধীরে ধীরে বলিলেন, ভারতী, তোমাকে ব্যথা দেওয়াও আমার উদ্দেশ্য নয়, তোমার নমস্যগণকে উপহাস করাও আমার অভিপ্রায় নয়। তাঁদের রাজনীতিবিদ্যার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধেও আমার ভক্তি কম নেই, কিন্তু কি জানো দিদি, গৃহস্থ গরুকে যখন খাটো করে বাঁধে, তখন তার সেই ছোট্ট দড়িটুকুর মধ্যে নীতি একটিমাত্রই থাকে। আমি সেইটুকু মাত্রই জানি। গরুর একান্ত নাগালের বাইরে খাদ্যবস্তুর প্রতি প্রাণপণে গলা এবং জিভ বাড়িয়ে লেহন করার চেষ্টার মধ্যে অবৈধতা কিছুমাত্র নেই, এমন কি অত্যন্ত আইনসঙ্গত। উৎসাহ দেবার মত হৃদয় থাকলে দিতেও পারো, রাজার নিষেধ নেই, কিন্তু বৃষের এই আন্তরিক প্রবল উদ্যম বাইরে থেকে যারা দেখে, তাদের পক্ষে হাস্য সংবরণ করা কঠিন।

ভারতী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, দাদা, তুমি ভারী দুষ্টু। বলিয়াই আপনাকে সংযত করিয়া কহিল, কিন্তু এ আমি ভেবে পাইনে, প্রাণ যার অহর্নিশি সরু সুতোয় ঝুলচে সে কি করে হাসি-তামাশা করে পরের কথা নিয়ে।

ডাক্তার সহজকণ্ঠে বলিলেন, তার কারণ, এ সমস্যার মীমাংসা পূর্বেই হয়ে গেছে ভারতী, যেদিন বিপ্লবের কাজে যোগ দিয়েছি। আর আমার ভাববারও

নেই, নালিশ করবারও নেই। আমি জানি, আমাকে হাতে পেয়েও যে রাজশক্তি ছেড়ে দেয়, হয় সে অক্ষম উন্মাদ নয় তার ফাঁসি দেবার দড়িটুকু পর্যন্ত নেই।

ভারতী বলিল, তাইত আমি তোমার সঙ্গে থাকতে চাই দাদা। আমি উপস্থিত থাকতে তোমার প্রাণ নিতে পারে সংসারে এমন কেউ নেই। এ আমি কোনমতেই হতে দেব না। বলিতে বলিতেই গলা তাহার চক্ষের পলকে ভারী হইয়া আসিল।

ডাক্তার টের পাইলেন। নিঃশব্দে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, নৌকায় জোয়ার লেগেছে ভারতী, পৌঁছতে আর আমাদের দেরি হবে না।

প্রত্যুত্তরে ভারতী শুধু কহিল, মরুক গে। কিছুই আমার ভাল লাগচে না। মিনিট-দুই পরে জিজ্ঞাসা করিল, এতবড় রাজশক্তিকে তোমরা গায়ের জোরে টলাতে পারো একি তুমি সত্যিই বিশ্বাস কর দাদা?

দ্বিধাহীন উত্তর আসিল, করি, এবং সমস্ত মন দিয়ে করি। এতবড় বিশ্বাস না থাকলে এতবড় ব্রত আমার অনেকদিন পূর্বেই ভেঙ্গে যেত।

ভারতী বলিল, তাই বোধ হয় ধীরে ধীরে তোমার কাজ থেকে আমাকে বার করে দিচ্চ,—না দাদা?

ডাক্তার স্মিতহাস্যে বলিলেন, না, তা নয় ভারতী। কিন্তু, বিশ্বাসই ত শক্তি, বিশ্বাস না থাকলে সংশয়ে যে কর্তব্য তোমার পদে পদে ভারাতুর হয়ে উঠবে। সংসারে তোমার অন্য কাজ আছে বোন—কল্যাণকর, শান্তিময় পথ, যা তুমি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস কর,—তাই তুমি কর গে।

অপরিসীম স্নেহবশেই যে এই লোকটি তাহার একান্ত বিপদসঙ্কুল বিপ্লব-পন্থা হইতে তাহাকে দূরে অপসারিত করিতে চাহিতেছে তাহা নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করিয়া ভারতীর সজল চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইয়া উঠিল। অলক্ষ্যে, অন্ধকারে ধীরে ধীরে মুছিয়া বলিল, দাদা, আমার কথায় কিন্তু রাগ করতে পাবে না। এতবড় রাজশক্তি, কত সৈন্যবল, কত উপকরণ, যুদ্ধের কত বিচিত্র ভয়ানক আয়োজন,

তার কাছে তোমার বিপ্লবী দল কতটুকু? সমুদ্রের কাছে গোষ্পদের চেয়েও ত তোমরা ছোট। এর সঙ্গে তোমরা শক্তি পরীক্ষা করতে চাও কোন্ যুক্তিতে? প্রাণ দিতে চাও দাও গে— কিন্তু এতবড় পাগলামি আমি ত সংসারে আর দ্বিতীয় দেখতে পাইনে। তুমি বলবে, তবে কি দেশের উদ্ধার হবে না? প্রাণের ভয়ে সরে দাঁড়াবো? কিন্তু তা আমি বলিনে। তোমার কাছে থেকে, তোমার চরিত্র হতে জননী জন্মভূমি যে কি সে আমি চিনেছি। তাঁর পদতলে সর্বস্ব দিতে পারার চেয়ে বড় সার্থকতা মানুষের যে আর নেই তোমাকে দেখে এ কথা যদি না আজও শিখতে পেরে থাকি ত আমার চেয়ে অধম নারী জন্মে কেউ জন্মায় নি। কিন্তু নিছক আত্মহত্যা করেই কোন্ দেশ কবে স্বাধীন হয়েছে? কোন মতে তোমার ভারতী যে কেবল বেঁচে থাকতেই চায় এতবড় ভুল ধারণা করেও আমার সম্বন্ধে তুমি রেখো না দাদা।

ডাক্তার নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তাই ত!

তাইত কি?

তোমার সম্বন্ধে ভুলই হয়েছে বটে। এই বলিয়া ডাক্তার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিলেন, বিপ্লব মানেই, ভারতী, কাটাকাটি রক্তারক্তি নয়। বিপ্লব মানে অত্যন্ত দ্রুত আমূল পরিবর্তন। সৈন্যবল, বিরাট যুদ্ধোপকরণ, এ সবই আমি জানি। কিন্তু শক্তি পরীক্ষা ত আমাদের লক্ষ্য নয়। আজ যারা শত্রু, কাল তারা বন্ধু হতেও ত পারে। নীলকান্ত শক্তি পরীক্ষা করতে যায়নি, তাদের মিত্র করতে গিয়েই প্রাণ দিয়েছিল। হায় রে নীলকান্ত! কেবা তার নাম জানে!

অন্ধকারেও ভারতী স্পষ্ট বুঝিতে পারিল দেশের বাহিরে, দেশের কাজে, যে ছেলেটি লোকচক্ষুর অগোচরে নিঃশব্দে প্রাণ দিয়াছে তাহাকে স্মরণ করিয়া এই নির্বিকার পরমসংযত মানুষটির গভীর হৃদয় ক্ষণিকের জন্য আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে। অকস্মাৎ যেন তিনি সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন, কি বলছিলে ভারতী, গোষ্পদ? তাই হবে হয়ত। কিন্তু যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জনপদ ভস্মসাৎ

করে ফেলে, আয়তনে সে কতটুকু জানো? শহর যখন পোড়ে সে আপনার ইন্ধন আপনি সংগ্রহ করে দগ্ধ হয়। তার ছাই হবার উপকরণ তারই মধ্যে সঞ্চিত থাকে, বিশ্ববিধানের এ নিয়ম কোন রাজশক্তিই কোন দিন ব্যত্যয় করতে পারে না।

ভারতী বলিল, দাদা, তোমার কথা শুনলে গা কাঁপে। রাজশক্তিকে যে তুমি দগ্ধ করতে চাও, তার ইন্ধন ত আমাদেরই দেশের লোক। এতবড় লঙ্কাকাণ্ডের কল্পনায় কি তোমার মনে করুণাও জাগে না?

প্রত্যুত্তরে লেশমাত্র দ্বিধা নাই, ডাক্তার স্বচ্ছন্দে কহিলেন, না। প্রায়শ্চিত্ত কথাটা কি শুধু মুখেরই কথা? পূর্ব-পিতামহগণের যুগান্তসঞ্চিত পাপের অপরিমেয় স্তূপ নিঃশেষ হবে কিসে বলতে পারো? করুণার চেয়ে ন্যায়ধর্ম ঢের বড় বস্তু, ভারতী।

ভারতী ব্যথা পাইয়া বলিল, এ তোমার সেই পুরানো কথা দাদা। ভারতের স্বাধীনতার প্রসঙ্গে তুমি যে কত নিষ্ঠুর হতে পারো তা যেন আমি ভাবতেই পারিনে। রক্তপাত ছাড়া আর কিছু যেন মনে তোমার জাগতেই পায় না। রক্তপাতের জবাব যদি রক্তপাতই হয়, তা হলে তারও ত জবাব রক্তপাত? এবং তারও ত জবাবে এই একই রক্তপাত ছাড়া আর কিছু মেলে না। এ প্রশ্নোত্তর ত সেই আদিম কাল থেকে হয়ে আসচে। তবে কি মানবের সভ্যতা এর চেয়ে বড় উত্তর কোন দিন দিতে পারবে না? দেশ গেছে, কিন্তু তার চেয়েও যে বড় সেই মানুষ ত আজও আছে। মানুষে মানুষে কি হানাহানি না করে কোনমতেই পাশাপাশি বাস করতে পারে না?

ডাক্তার কহিলেন, ইংরাজের একজন বড় কবি বলেছেন, পশ্চিম ও পূর্ব কোনদিনই মিলতে মিশতে পারে না।

ভারতী রুষ্ট হইয়া কহিল, ছাই কবি। বলুক গে সে। তুমি পরম জ্ঞানী, তোমাকে অনেকবার জিজ্ঞেসা করেচি, আজও জিজ্ঞেসা করচি, হোক তারা

পশ্চিমের, হোক তারা ইউরোপের মানুষ, কিন্তু তবু ত মানুষ? মানুষের সঙ্গে মানুষে কি কিছুতেই বন্ধুত্ব করতে পারে না? দাদা, আমি ক্রীশ্চান, ইংরাজের কাছে আমি বহু ঋণে ঋণী, তাদের অনেক সদ্গুণ আমি নিজের চোখে দেখেচি,—তাদের এত মন্দ ভাবতে আমার বুকে শূল বেঁধে। কিন্তু আমাকে তুমি ভুল বুঝো না দাদা, আমি বাঙালী ঘরেরই মেয়ে,—তোমারই বোন। বাঙলার মাটি, বাঙলার মানুষকে আমি প্রাণাধিক ভালবাসি। কে জানে, যে জীবন তুমি বেছে নিয়েছ, হয়ত আজই আমাদের শেষ দেখা। আজ আমাকে, তুমি শান্তমনে এই জবাবটি দিয়ে যাও, যেন এরই দিকে চোখ রেখে আমি সারা জীবন মুখ তুলে সোজা চলে যেতে পারি। বলিতে বলিতে শেষের দিকে তাহার কণ্ঠস্বর কান্নার ভারে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

ডাক্তার নীরবে তরী বাহিতে লাগিলেন। বিলম্ব দেখিয়া ভারতীর মনে হইল, বোধ হয় তিনি ইহার উত্তর দিতে চান না। সে হাত বাড়াইয়া নদীর জলে চোখ-মুখ ধুইয়া ফেলিল, অঞ্চল দিয়া বার বার ভাল করিয়া মুছিয়া পুনরায় কি একটা প্রশ্ন করিতেছিল, ডাক্তার কথা কহিলেন।

স্নিগ্ধ মৃদুকণ্ঠ, কোথাও লেশমাত্র উত্তেজনা বা বিদ্বেষের আভাস নাই,—যেন কাহার কথা কে বলিতেছে এমনি শান্ত সহজ। ভারতীর সেই প্রথম পরিচয়-দিনের স্কুলের নিরীহ নির্বোধ মাস্টার মহাশয়টিকে মনে পড়িল। অশুদ্ধ ইংরাজি উচ্চারণ, ব্যাকরণও তেমনি,—ভারতী কষ্টে হাসি চাপিয়া আলাপ করিয়াছিল। পরে তাই লইয়া রাগ করিয়া সে ডাক্তারকে অনেক দিন অনেক তিরস্কার করিয়াছে। সেই নিরুৎসুক নিঃস্পৃহকণ্ঠে কহিলেন, এক রকমের সাপ আছে, ভারতী, তারা সাপ খেয়েই জীবনধারণ করে। দেখেচ?

ভারতী বলিল, না দেখিনি, শুনেচি।

ডাক্তার বলিলেন, পশুশালায় আছে। এবার কলকাতায় গিয়ে অপূর্বকে হুকুম করো, সে দেখিয়ে আনবে।

বার বার ঠাট্টা করো না দাদা, ভাল হবে না বলচি।

না, ভাল হবে না আমিও তাই বলচি। পাশাপাশি বাস করাটা ঠিক ঘটে ওঠে না বটে, কিন্তু আর ও ঘনিষ্ঠভাবে একজনের জঠরের মধ্যে আর একজন বেশ নিরাপদেই স্থান পায়। বিশ্বাস না হয় জু'র অধ্যক্ষকে জিজ্ঞেসা করে দেখো।

ভারতী চুপ করিয়া রহিল।

ডাক্তার বলিলেন, তুমি তাদের সমধর্মাবলম্বী, তাদের কাছে অশেষ ঋণে ঋণী, তাদের অনেক সদ্গুণ চোখে দেখেচ,—দেখেচ তাদের বিশ্বগ্রাসী বিরাট ক্ষুধার পরিমাণ? এ দেশের মালিক তারা,—মালিকানার তারিখ মনে আছে ত? আজ ব্রিটিশ-সম্পদের তুলনা হয় না। কত জাহাজ, কত কল-কারখানা, কত শত-সহস্র ইমারত। মানুষ মারবার উপকরণ-আয়োজনের আর অন্ত নেই। তার সমস্ত অভাব, সর্বপ্রকার প্রয়োজন মিটিয়েও ইংরেজ ১৮১০ সাল থেকে সত্তর বছরের মধ্যে কেবল বাইরে দিয়েছিল ঋণ তিন হাজার কোটি টাকা! জানো এই বিরাট ঐশ্বর্যের উৎস কোথায়? আপনাকে তুমি বাঙলা দেশের মেয়ে বলছিলে, না? বাঙলার মাটি, বাঙলার জলবায়ু, বাঙলার মানুষ তোমার প্রাণাধিক প্রিয়, না? এই বাঙলার দশ লক্ষ নর-নারী প্রতি বৎসরে শুধু ম্যালেরিয়া জ্বরে মরে। এক-একটা যুদ্ধজাহাজের দাম জানো? এর একটার খরচে কেবল দশ লক্ষ মায়ের চোখের জল চিরদিনের তরে মোছানো যায়। ভেবেছ কখনো এ কথা? দেখেচ কখনো বুকের মধ্যে মায়ের মূর্তি? শিল্প গেল, বাণিজ্য গেল, ধর্ম গেল, জ্ঞান গেল,—নদীর বুক বুজে মরুভূমি হয়ে উঠছে, চাষা পেট পুরে খেতে পায় না, শিল্পী বিদেশীর দুয়ারে মজুরি করে,—দেশে জল নেই, অন্ন নেই, গৃহস্থের সর্বোত্তম সম্পদ সে গোধন নেই,—দুধের অভাবে শিশুদের শুকিয়ে মরতে দেখেচ ভারতী?

ভারতী চীৎকার করিয়া থামাইতে চাহিল, কিন্তু গলা দিয়া তাহার শুধু একটা অস্ফুট শব্দ বাহির হইল মাত্র।

সব্যসাচীর সেই ধীর সংযত কণ্ঠস্বর কোন্ একসময়ে অন্তর্হিত হইয়াছিল, বলিলেন, তুমি ক্রীশ্চান, মনে পড়ে একদিন কৌতূহলবশে ইউরোপের ক্রীশ্চান সভ্যতার স্বরূপ জানতে চেয়েছিলে? সেদিন ব্যথা দেবার ভয়ে বলিনি, কিন্তু আজ তার উত্তর দেব। তোমাদের কেতাবে কি আছে জানিনে, শুনেচি ভাল কথা ঢের আছে, কিন্তু বহুদিন একসঙ্গে বসবাস করে এর সত্যকার চেহারা আর আমার এতটুকু অগোচর নেই। লজ্জাহীন উলঙ্গ স্বার্থ এবং পশু-শক্তির একান্ত প্রাধান্যই এর মূলমন্ত্র। সভ্যতার নাম দিয়ে দুর্বল, অক্ষমের বিরুদ্ধে এতবড় মুষল মানুষের বুদ্ধি আর ইতিপূর্বে আবিষ্কার করেনি। পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে চেয়ে দেখ, ইউরোপের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা থেকে কোন দুর্বল জাতিই আজ আর আত্মরক্ষা করতে পারেনি।

দেশের মাটি, দেশের সম্পদ থেকে দেশের ছেলেরা বঞ্চিত হয়েছে কোন্ অপরাধে জানো ভারতী? একমাত্র শক্তিহীনতার অপরাধে। অথচ ন্যায়ধর্মই সকলের বড়, এবং বিজিতের অশেষ কল্যাণের জন্যেই এই অধীনতার শৃঙ্খল তার পায়ে পরিয়ে সেই পঙ্গুর সর্বপ্রকার দায়িত্ব বহন করাই ইউরোপীয় সভ্যতার চরম কর্তব্য,—এই পরম অসত্য লেখায়, বক্তৃতায়, মিশনারির ধর্মপ্রচারে, ছেলেদের পাঠ্যপুস্তকে অবিশ্রান্ত প্রচার করাই তোমাদের ক্রীশ্চান সভ্যতার রাজনীতি।

ভারতী মিশনারির হাতে মানুষ, অনেকের মহৎ-চরিত্র সে যথার্থই চোখে দেখিয়াছে; বিশেষতঃ তাহার ধর্মবিশ্বাসের প্রতি এইরূপ অহেতুক আক্রমণে সে ব্যথা পাইয়া বলিল, দাদা, যে-জন্যেই হোক, তোমার শান্ত-বুদ্ধি আজ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। ক্রীশ্চান-ধর্ম প্রচার করতে যাঁরা এদেশে এসেছেন তাঁদের সম্বন্ধে তোমার চেয়ে আমি ঢের বেশী জানি। তাঁদের প্রতি তুমি আজ নিরপেক্ষ সুবিচার করতে পারছ না। ইউরোপীয় সভ্যতা কি তোমাদের কোন ভাল করেনি? সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান-বিসর্জন—

ডাক্তার বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, চড়কের সময়ে পিঠ-ফোঁড়া, সন্ন্যাসীদের খাঁড়ার ওপর লাফানো, ডাকাতি, ঠগি, বর্গির হাঙ্গামা, গোঁড় ও খাসিয়াদের আষাঢ়ের নরবলি,—আর যে মনে পড়ছে না ভারতী—

ভারতী কথা কহিল না।

ডাক্তার বলিলেন, রসো, আরও দুটো স্মরণ হয়েছে। বাদশাদের আমলে গৃহস্থের বৌ-ঝি ঘরে রাখা যেত না,—নবাবেরা মেয়েদের পেট চিরে ছেলে-মেয়ে দেখত,—হায় রে হায়, এমনি করেই বিদেশীর লেখা ইতিহাস সামান্য এবং তুচ্ছ বস্তুকে বিপুল, বিরাট তৈরি করে দেশের প্রতি দেশের লোকের চিত্ত বিমুখ করে দিয়েছে! মনে আছে আমার ছেলেবেলায় স্কুলের পড়ার বইয়ে একবার পড়েছিলাম, বিলেতে বসে আমাদের কল্যাণ ভেবে ভেবেই কেবল রাজমন্ত্রীর চোখের নিদ্রা এবং মুখের অন্ন বিস্বাদ হয়ে গেছে। এই সত্য ছেলেদের কণ্ঠস্থ করতে হয়, এবং উদরান্নের দায়ে শিক্ষকদের কণ্ঠস্থ করাতে হয়। সভ্য রাজ্যতন্ত্রের এই রাজনীতি ভারতী। আজ অপূর্বকে দোষ দেওয়া বৃথা।

অপূর্বর লাঞ্ছনায় মনে মনে ভারতী লজ্জিত হইল, রুষ্ট হইল। কহিল, তুমি যা বলচ তা সত্য হতে পারে, হয়ত, কোথাও কেউ অতিভক্ত রাজকর্মচারী এমনিই করেছে, কিন্তু এতবড় সাম্রাজ্যের অসত্যই কখনো মূলনীতি হতে পারে না। এর ওপরে ভিত্তি করে এই বিপুল প্রতিষ্ঠান একটা দিনের তরেও স্থির থাকতে পারে না। তুমি বলবে কালের পরিমাণে এ ক'টা দিন? এমনি সাম্রাজ্য ত ইতিপূর্বেও ছিল, সে কি চিরস্থায়ী হয়েছে? তোমার কথা যদি যথার্থ হয়, এও চিরস্থায়ী হবে না। কিন্তু, এই শৃঙ্খলাবদ্ধ, সুনিয়ন্ত্রিত রাজ্য,—যত নিন্দেই কর না কেন,—এর ঐক্য, এর শান্তি থেকে কি কোন শুভ লাভই হয়নি? প্রতীচ্যের সভ্যতার কাছে কৃতজ্ঞ হবার কি কোন হেতুই পাওনি? স্বাধীনতা তোমরা ত বহুদিন হারিয়েছ, ইতিমধ্যে রাজশক্তির পরিবর্তন হয়েছে সত্য, কিন্তু তোমাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ত হয়নি। ক্রীশ্চান বলে আমাকে তুমি উলটো বুঝো না দাদা,

কিন্তু নিজেদের সমস্ত অপরাধ বিদেশীর মাথায় তুলে দিয়ে গ্লানি করাই যদি তোমার স্বদেশপ্রেমের আদর্শ হয়, সে আদর্শ তোমার হাত থেকেও আমি নিতে পারব না। এত বিদ্বেষ হৃদয়ের মধ্যে পুরে তুমি ইংরাজের ক্ষতি হয়ত করতেও পারো, কিন্তু তাতে ভারতবাসীর কল্যাণ হবে না এ সত্য নিশ্চয় জেনো।

তাহার সহসা উচ্ছ্বসিত তীক্ষ্নস্বর নিস্তব্ধ নদীবক্ষে আহত হইয়া সব্যসাচীর কানে পশিয়া তাঁহাকে চমকিত করিয়া দিল। ভারতীর এই রূপ অপরিচিত, এ মনোভাব অপ্রত্যাশিত। তথাপি যে ধর্ম-বিশ্বাস ও সভ্যতার ঘনিষ্ঠ প্রভাবের মধ্যে সে বালিকা বয়স হইতে মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই আঘাতে চঞ্চল ও অসহিষ্ণু হইয়া সে এই যে নির্ভীক প্রতিবাদ করিয়া বসিল, তাহা যত কঠিন ও প্রতিকূল হউক, সব্যসাচীর চক্ষে তাহাকে যেন নব-মর্যাদা দান করিল।

তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া ভারতী বলিল, কৈ জবাব দিলে না দাদা? এতবড় হিংসের আগুন বুকের মধ্যে জ্বালিয়ে তুমি আর যাই কর দেশের ভালো করতে পারবে না।

ডাক্তার কহিলেন, তোমাকে ত অনেকবার বলেছি দেশের ভালো যাঁরা করবেন তাঁরা চাঁদা তুলে দিকে দিকে অনাথ-আশ্রম, ব্রহ্মচর্যাশ্রম, বেদান্ত-আশ্রম, দরিদ্র-ভাণ্ডার প্রভৃতি নানা হিতকর কার্য করছেন, মহৎ লোক তাঁরা, আমি তাঁদের ভক্তি করি,—কিন্তু, দেশের ভালো করার ভার আমি নিইনি, আমি স্বাধীন করার ভার নিয়েছি। একটুখানি থামিয়া বলিলেন, আমার বুকের আগুন নেভে শুধু দুটো জিনিস দিয়ে। এক নিজের চিতাভস্মে, আর নেভে যেদিন শুনবো ইউরোপের ধর্ম, সভ্যতা, নীতি, সমুদ্রের অতল গর্ভে ডুবেছে।

ভারতী স্তব্ধ হইয়া রহিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, এই বিষকুম্ভের পরিপূর্ণ সওদা নিয়ে সমুদ্র পার হয়ে ইয়োরোপ যখন প্রথম বেসাতি করতে এসেছিল, তখন চিনতে পেরেছিল কেবল জাপান। তাই আজ তার এত সৌভাগ্য, তাই আজ সে ইউরোপের সমকক্ষ সম্ভ্রান্ত মিতা। কিন্তু চিনতে পারেনি ভারত,

চিনতে পারেনি চীন। তখন স্পেনের রাজ্য পৃথিবীময়, ক্ষুদ্র জাপান স্পেনের এক নাবিককে জিজ্ঞাসা করে, এত রাজ্য হল তোমাদের কি করে? নাবিক বললে, অতি সহজে, যে দেশ আত্মসাৎ করতে চাই, সেখানে নিয়ে যাই প্রথমে মাল, হাতে পায়ে পড়ে ব্যবসার জন্যে দেশের রাজার কাছে চেয়ে নিই এক-ফোঁটা জমি। তার পরে আনি মিশনারি, তারা যত না করে ক্রীশ্চান, তার বেশী করে সেদেশের ধর্মকে গালিগালাজ। লোকে ক্ষেপে উঠে হঠাৎ ফেলে দু-একটাকে মেরে। তখন আসে আমাদের কামান-বন্দুক, আসে আমাদের সৈন্যসামন্ত। আমাদের সভ্য দেশের মানুষ-মারা কল যে অসভ্য দেশের চেয়ে কত শ্রেষ্ঠ তা অচিরে প্রমাণিত করে দিই। শুনে জাপান বললে, প্রভু! আপনারা তাহলে গা তুলুন, আপনাদের আর ব্যবসাতে কাজ নেই। এই বলে তাদের বিদায় দিয়ে নিজেদের দেশের মধ্যে আইন জারি করে দিলে,—চন্দ্র-সূর্য যত দিন উদয় হবে ক্রীশ্চান যেন না আর আমাদের দেশে পা দেয়। দিলে তার প্রাণদণ্ড।

তাহার ধর্ম ও ধর্মযাজকদের প্রতি এই তীক্ষ্ণ ইঙ্গিত ভারতী বিষণ্ণ হইয়া বলিল, এ কথা তোমার কাছে আমি পূর্বেও শুনেছি, কিন্তু যে জাপানীদের তুমি ভক্তি কর, তারা কি?

ডাক্তার কহিলেন, ভক্তি করি? মিছে কথা। ওদের আমি ঘৃণা করি। কোরিয়ানদের বার বার প্রতিশ্রুতি এবং অভয় দিয়েও বিনা দোষে, মিথ্যা অজুহাতে তাদের রাজাকে বন্দী করে ১৯১০ সালে যখন কোরিয়া রাজ্য আত্মসাৎ করে নিলে, তখন আমি সাংহাইয়ে। সে দিনের সে-সব অমানুষিক অত্যাচার ভোলবার নয়, ভারতী। আর অভয় কি শুধু একা জাপানই দিয়েছিল? ইয়োরোপও দিয়েছিল। শক্তিমানের বিরুদ্ধে ইংরাজ কথা কইলে না, বললে, অ্যাঙ্গ্লো- জাপানী-সন্ধি-সূত্রে আমরা আবদ্ধ।

এবং সেই কথাই আমেরিকা-যুক্তরাজ্যের সভাপতি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে বললেন, প্রতিশ্রুতি তা কি! যে অক্ষম, শক্তিহীন জাতি আত্মরক্ষা

করতে পারে না তাদের রাজ্য যাবে না ত যাবে কাদের? ঠিকই হয়েছে! এখন আমরা যাবো তাদের উদ্ধার করতে? অসম্ভব! পাগলামি! এই বলিয়া সব্যসাচী একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া কহিলেন, আমিও বলি ভারতী,—অসম্ভব, অসঙ্গত, পাগলামি। প্রবল দুর্বলের সম্পদ কেন ছিনিয়ে নেবে না, এ কথা যে সভ্য ইয়োরোপের নৈতিক-বুদ্ধি ভাবতেই পারে না।

ভারতী নির্বাক হইয়া রহিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, আঠারো শতাব্দের শেষের দিকে ব্রিটিশদূত লর্ড ম্যাকার্টনি এলেন চৈনিক দরবারে কিঞ্চিৎ ব্যবসার সুবিধে করে নিতে। মাঞ্চুরাজ শিন্‌লুঙ ছিলেন তখন সমস্ত চীনের সম্রাট, অত্যন্ত দয়ালু; দূতের বিনীত আবেদনে খুশী হয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, দেখ বাপু, আমাদের স্বর্গীয় সাম্রাজ্যে অভাব কিছুরই নেই, কিন্তু তুমি এসেছ অনেক দূর থেকে, অনেক দুঃখ সয়ে। আচ্ছা, ক্যানটন শহরে ব্যবসা কর, স্থান দিচ্চি, তোমাদের ভাল হবে। রাজ-আশীর্বাদ নিষ্ফল হলো না, ভালই হলো। পঞ্চাশ বছর পেরুল না, চীনের সঙ্গে ইংরাজের প্রথম যুদ্ধ বাধলো।

ভারতী বিস্মিত হইয়া কহিল, কেন দাদা?

ডাক্তার কহিলেন, চীনেরই অন্যায়। বেয়াদপ হঠাৎ বলে বসলো আফিং খেয়ে খেয়ে চোখ-কান আমাদের বুজে গেল, বুদ্ধিশুদ্ধি আর নেই, দয়া করে ও-জিনিসটার আমদানি বন্ধ কর।

তারপরে?

তার পরের ইতিহাস খুব ছোট। বছর-দুয়ের মধ্যে পুনশ্চ আফিং খেতে রাজী হয়ে আরও পাঁচখানা বন্দরে শতকরা পাঁচ টাকা মাত্র শুল্কে বাণিজ্যের মঞ্জুরি-পরোয়ানা দিয়ে এবং সর্বশেষে হংকং বন্দর দক্ষিণা প্রদান করে বেয়াল্লিশ সালে যজ্ঞ সমাধা হল। ঠিকই হয়েছে। এত সস্তায় আফিং পেয়েও যে মূর্খ খেতে আপত্তি করে তার এমনি প্রায়শ্চিত্ত হওয়াই উচিত।

ভারতী বলিল, এ তোমার গল্প।

ডাক্তার কহিলেন, তা হোক, গল্পটা শুনতে ভালো। আর এই না দেখে ফ্রান্সের ফরাসী সভ্যতা বললে, আমার ত আফিং নেই, কিন্তু, খাসা মানুষ-মারা কল আছে। অতএব, যুদ্ধং দেহি। হলো যুদ্ধ। ফরাসী চীন-সাম্রাজ্যের আনাম প্রদেশটা কেড়ে নিলে। আর যুদ্ধের খরচা অধিকতর বাণিজ্যের সুবিধে, ট্রিটিপোর্ট ইত্যাদি ইত্যাদি—এ-সব তুচ্ছ কাহিনী থাক।

ভারতী কহিল, কিন্তু দাদা, তালি কি একহাতে বাজে? চীনের অন্যায় কি কিছু ছিল না?

ডাক্তার বলিলেন, থাকতে পারে। তবে তামাশা এই যে, ইউরোপীয় সভ্যতার অন্যায়বোধটা অপরের ঘর-চড়াও হয়েই হয়, তাঁদের নিজেদের দেশের মধ্য ঘটতে দেখা যায় না।

তারপরে?

বলচি। জার্মান সভ্যতা দেখলেন, বা রে বাঃ, এতো ভারী মজা! আমি যে ফাঁকে পড়ি। তিনি এক জাহাজ মিশনারি এনে লেলিয়ে দিলেন। ৯৭ সালে তাঁরা যখন তোমাদের প্রভু যিশুর মহিমা, শান্তি এবং ন্যায়ধর্ম প্রচারে ব্যাপৃত, তখন একদল চীনে ক্ষেপে উঠে পরম ধার্মিক জন-দুই প্রচারকের মুণ্ডু ফেললে কেটে। অন্যায়! চীনেরই অন্যায়। অতএব, গেল শ্যান্টঙ প্রদেশ জার্মানির উদর-বিবরে।

তারপরে এল বক্সার-বিদ্রোহ। ইয়োরোপের সমস্ত সভ্যতা এক হয়ে তার যে প্রতিশোধ নিলে, হয়ত, কোথাও তার আর তুলনা নেই। তার অপরিমেয় খেসারতের ঋণ কতকালে যে চীনেরা শোধ দেবে তা যিশুখ্রিষ্টই জানেন। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ-সিংহ, জারের ভালুক, জাপানের সূর্যদেব,—কিন্তু আর না বোন, গলা আমার শুকিয়ে আসচে। দুঃখের তুলনায় একা আমরা ছাড়া বোধ হয় এদের আর সঙ্গী নেই। সম্রাট শিন্‌লুঙের নির্বাণ লাভ হোক, তাঁর আশীর্বাদের বহর আছে!

ভারতী মস্তবড় একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

ভারতী!

কি দাদা?

চুপচাপ যে?

তোমার গল্পের কথাটাই ভাবচি। আচ্ছা দাদা, এই জন্যেই কি চীনেদের দেশে তোমার কার্যক্ষেত্র বেছে নিয়েছ? যারা শত অত্যাচারে জর্জরিত, তাদের উত্তেজিত করে তোলা কঠিন নয়, কিন্তু একটা কথা কি ভেবেচ? এই-সব নিরীহ, অজ্ঞান চাষাভূষোর দুঃখ এমনিই ত যথেষ্ট, তার ওপরে আবার কাটাকাটি রক্তারক্তি বাধিয়ে দিলে ত সে দুঃখের আর অবধি থাকবে না!

ডাক্তার কহিলেন, নিরীহ চাষাভূষোর জন্যে তোমার দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নেই ভারতী, কোন দেশেই তারা স্বাধীনতার কাজে যোগ দেয় না। বরঞ্চ, বাধা দেয়। তাদের উত্তেজিত করার মত পণ্ডশ্রমের সময় নেই আমার। আমার কারবার শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, ভদ্র-সন্তানদের নিয়ে। কোনদিন যদি আমার কাজে যোগ দিতে চাও ভারতী, এ কথাটা ভুলো না। আইডিয়ার জন্যে প্রাণ দিতে পারার মত প্রাণ, শান্তিপ্রিয়, নির্বিরোধী, নিরীহ কৃষকের কাছে আশা করা বৃথা। তারা স্বাধীনতা চায় না, শান্তি চায়। যে শান্তি অক্ষম, অশক্তের,—সেই পঙ্গুর জড়ত্বই তাদের ঢের বেশী কামনার বস্তু।

ভারতী ব্যাকুল হইয়া উঠিল, আমিও তাই চাই দাদা, আমাদের বরঞ্চ এই জড়ত্বের কাজেই তুমি নিযুক্ত করে দাও, তোমার পথের-দাবীর ষড়যন্ত্রের বাষ্পে নিঃশ্বাস আমার রুদ্ধ হয়ে আসচে।

সব্যসাচী হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা।

ভারতী থামিতে পারিল না, তেমনি ব্যগ্র উচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিল, ঐ একটা আচ্ছার বেশী আর কি তোমার কিছুই বলবার নেই দাদা?

কিন্তু আমরা যে এসে পড়েছি ভারতী, একটুখানি সাবধানে বসো দিদি, যেন আঘাত না লাগে—এই বলিয়া ডাক্তার ক্ষিপ্রহস্তে হাতের দাঁড় দিয়া ধাক্কা মারিয়া তাঁহার ছোট্ট নৌকাখানিকে অন্ধকার তীরের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে নামাইতে নামাইতে বলিলেন, জলকাদা নেই বোন, কাঠ পাতা আছে, পা দাও।

অন্ধকারে অজানা ভূপৃষ্ঠে হঠাৎ পা ফেলিতে ভারতীর দ্বিধা হইল, কিন্তু পা দিয়া সে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, দাদা, তোমার হাতে আত্মসমর্পণ করার মত নির্বিঘ্ন স্বস্তি আর নেই।

কিন্তু অপর পক্ষ হইতে এ মন্তব্যের উত্তর আসিল না। উভয়ে অন্ধকারে কিছুদূর অগ্রসর হইলে ডাক্তার বিস্ময়ের কণ্ঠে কহিলেন, কিন্তু ব্যাপার কি বলত? এ কি বিয়েবাড়ি? না আছে আলো, না আছে চীৎকার, না শোনা যায় বেহালার সুর,—কোথাও গেল নাকি এরা?

আরও কিছুদূর আসিয়া চোখ পড়িল সিঁড়ির উপরের সেই চিত্র-বিচিত্র কাগজের লণ্ঠন। ভারতী আশ্বস্ত হইয়া কহিল, ঐ যে সেই চীনে-আলো। এর মধ্যেই খরচের হুঁশিয়ারিটা শশী-তারার দেখবার বস্তু, দাদা। এই বলিয়া সে হাসিল।

দু'জনে সিঁড়ি বাহিয়া নিঃশব্দে উপরে উঠতেই খোলা দরজার সম্মুখে প্রথমেই চোখে পড়িল,—শশী মন দিয়া কি একখানা কাগজ পড়িতেছে। ভারতী আনন্দিত কলকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল, শশীবাবু, এই যে আমরা এসে পড়েছি,—খাবার বন্দোবস্ত করুন, নবতারা কৈ? নবতারা! নবতারা!

শশী মুখ তুলিয়া চাহিল, কহিল, আসুন। নবতারা এখানে নেই।

ডাক্তার স্মিতমুখে কহিলেন, গৃহিণীশূন্য গৃহ কিরকম কবি? ডাকো তাকে, আমাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাক, নইলে দাঁড়িয়ে থাকবো। হয়ত খাবোও না।

শশী বিষণ্ণমুখে বলিল, নবতারা এখানে নেই ডাক্তার। তারা সব বেড়াতে গেছে।

সহসা তাহার মুখের চেহারায় ভীত হইয়া ভারতী প্রশ্ন করিল, কোথায় বেড়াতে গেলো? আজকের দিনে? কি চমৎকার বিবেচনা!

শশী বলিল, তারা বিয়ের পরে রেঙ্গুনে বেড়াতে গেছে। না না, আমার সঙ্গে নয়,—সেই যে আহমেদ,—ফর্সা মতন,—চমৎকার দেখতে,—কুট সাহেবের মিলের টাইম-কিপার,—দেখেছেন না? আজ দুপুরবেলা তারই সঙ্গে নবতারার বিয়ে হয়েছে। সমস্তই তাদের ঠিক ছিল—আমাকে বলেনি।

আগন্তুক দুইজনে বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া রহিলেন,—বল কি শশী?

শশী উঠিয়া গিয়া ঘরের একটা নিভৃত স্থান হইতে একটা ন্যাকড়ার থলি আনিয়া ডাক্তারের পায়ের কাছে রাখিয়া দিয়া কহিল, টাকা পেয়েছি ডাক্তার। নবতারাকে পাঁচ হাজার দেব বলেছিলাম, দিয়ে দিয়েছি। বাকী আছে সাড়ে চার হাজার, পঞ্চাশ টাকা আমি নিলাম, কিন্তু—

ডাক্তার কহিলেন, এই টাকা কি আমাকে দিচ্চ?

শশী কহিল, হাঁ। আমার আর কি হবে? আপনি নিন। কাজে লাগবে।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু তাকে কবে টাকা দিলেন?

শশী কহিল, কাল টাকা পেয়েই তাকে দিয়ে এসেছি।

নিলে?

শশী মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ। আমেদ ত মোটে ত্রিশটি টাকা মাইনে পায়। তারা একটা বাড়ি কিনবে।

নিশ্চয়ই কিনবে! এই বলিয়া ডাক্তার সহাস্যে ফিরিয়া দেখিলেন, চোখে আঁচল দিয়া ভারতী বারান্দার একদিকে নিঃশব্দে সরিয়া যাইতেছে।

শশী কহিল, প্রেসিডেন্ট আপনাকে একবার দেখা করতে বলেছেন। তিনি সুরাবায়ায় চলে যাচ্চেন।

ডাক্তার বিস্ময়ে প্রকাশ করিলেন না, তবু প্রশ্ন করিলেন, কবে যাবেন?

শশী কহিল, বললেন ত শীঘ্রই। তাঁকে লোক এসেছে নিতে।

কথা ভারতীর কানে গেল, সে ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সুমিত্রাদিদি কি সত্যিই চলে যাবেন বলেছেন শশীবাবু?

শশী বলিল, হাঁ সত্যি। তাঁর মায়ের খুড়োর অগাধ সম্পত্তি। সম্প্রতি মারা গেছেন,— ইনি ছাড়া উত্তরাধিকারী আর কেউ নেই। তাঁর না গেলেই নয়।

ডাক্তার কহিলেন, না গেলেই যখন নয়, তখন যাবেন বৈ কি।

শশী ভারতীর মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, অনেক খাবার আছে, খাবেন কিছু? কিন্তু ভারতীর ইতস্ততঃ করিবার পূর্বেই ডাক্তার সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, নিশ্চয় নিশ্চয়,— চল, কি আছে দেখি গে। এই বলিয়া তিনি শশীর হাত ধরিয়া একপ্রকার জোর করিয়া তাহাকে ঘরের ভিতরে টানিয়া লইয়া গেলেন। যাবার পথে শশী আস্তে আস্তে বলিল, আর একটা খবর আছে ডাক্তার, অপূর্ববাবু ফিরে এসেছেন।

ডাক্তার বিস্ময়ে থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, সে কি শশি, কে বললে তোমাকে?

শশী কহিল, কাল বেঙ্গল ব্যাঙ্কে একেবারে মুখোমুখি দেখা। তাঁর মা নাকি বড় পীড়িত।

সাতাশ

শশী অতিশয়োক্তি করে নাই। ভিতরে প্রবেশ করিয়াই দেখা গেল খাদ্যবস্তুর অত্যন্ত বাহুল্যে ঘরের দক্ষিণ ধারটা একেবারে ভারাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে। ছোট-বড় ডেকচি, প্লেট, কাগজের ঠোঙা, মাটির বাসন পরিপূর্ণ করিয়া নানাবিধ আহার্য-দ্রব্যসম্ভার দোকানদার ও হোটেলওয়ালার দল নিজেদের রুচি ও মর্জি মত ওপার হইতে এপারে অবিশ্রাম সরবরাহ করিয়া স্তূপাকার করিয়াছে,— অভাব বা ত্রুটি কিছুরই ঘটে নাই, ঘটিয়াছে কেবল সেগুলি উদরসাৎ করিবার লোকের। ডাক্তার ক্ষণকালমাত্র নিরীক্ষণ করিয়াই সোল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, তোফা! তোফা! চমৎকার! শশী কি হিসেবী লোক দেখেচ ভারতী, কে কি খাবে না-খাবে সমস্ত চিন্তা করে দেখেচে! বহুৎ আচ্ছা!

ভারতী অন্য দিকে চাহিয়া রহিল, এবং শশী হাসিবার একটুখানি বিফল চেষ্টা করিল মাত্র। কোন দিক হইতে কোন সাড়া না পাইয়াও ডাক্তারের উল্লাস অকস্মাৎ অট্টহাস্যে ফাটিয়া পড়িল, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! গৃহস্থের জয়জয়কার হোক,— শশি! কবি! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

ভারতী আর সহিতে পারিল না, মুখ ফিরাইয়া সজলচক্ষে রুষ্ট দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, তোমার মনের মধ্যে কি একটু দয়ামায়াও নেই দাদা? কি করচ বলত?

বাঃ! যাদের কল্যাণে আজ ভাল ভাল জিনিস পেট পুরে খাবো,— তাদের একটু আশীর্বাদ— বাঃ! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

ভারতী রাগ করিয়া বারান্দায় চলিয়া গেল। মিনিট দুই-তিন পরে শশী গিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিলে সে প্লেটে করিয়া মাংস, পোলাও, ফলমূল, মিষ্টান্নাদি সযত্নে সাজাইয়া ডাক্তারের সম্মুখে রাখিয়া দিয়া কৃত্রিম কুপিতস্বরে

কহিল, নাও, এবার দশহাত বার করে রাক্ষসের মত খাও। হাসি বন্ধ হোক, পাড়ার লোকের ঘুম ভেঙ্গে যাবে।

ডাক্তার নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আহা! উপাদেয় খাদ্য! এর স্বাদ-গন্ধও ভুলে গেছি।

কথাটা ভারতীর বুকে গিয়া বিঁধিল। তাহার সে রাত্রের শুকনা ভাত ও পোড়া-মাছের কথা মনে পড়িল।

ডাক্তার আহারে নিযুক্ত হইয়া কহিলেন, কবিকে দিলে না ভারতী?

এই যে দিচ্চি, এই বলিয়া সে প্লেট সাজাইয়া আনিয়া শশীর কাছে রাখিয়া দিয়া ডাক্তারের সম্মুখে বসিয়া বলিল, কিন্তু সমস্ত খেতে হবে দাদা, ফেলতে পারবে না।

নাঃ—কিন্তু, তুমি খাবে না?

আমি? কোন মেয়েমানুষ এ-সব খেতে পারে? তুমিই বল?

কিন্তু রেঁধেছে যেন অমৃত।

ভারতী কহিল, এর চেয়ে ভাল অমৃত রেঁধে আমি রোজ রোজ তোমাকে খাওয়াতে পারি দাদা।

ডাক্তার বাঁ হাতটা নিজের কপালে ঠেকাইয়া কহিলেন, কি করবে দিদি, অদৃষ্ট! যাকে খাওয়াবার কথা, সে এ-সব খাবে না, যে খাবে তাকে একদিনের ওপর দু'দিন খাওয়াবার চেষ্টা করলেই সুখ্যাতিতে তোমার দেশ ভরে যাবে। ভগবানের এমনি উলটো বিচার! কি বল কবি, ঠিক না? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

এবার ভারতী নিজেও হাসিয়া ফেলিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ আপনাকে সংবরণ করিয়া লজ্জিত হইয়া বলিল, তোমার দুষ্টুমির জ্বালায় না হেসে পারা যায় না, কিন্তু এ তোমার ভারী অন্যায়। তার পর পেট পুরে খেয়ে-দেয়ে টাকার থলিটিও নিয়ে চলে যাবে নাকি?

ডাক্তার মুখের গ্রাস গিলিয়া লইয়া কহিলেন, নিশ্‌চয় নিশ্চয়,—অর্ধেকটা ত গেছে নবতারার বাড়ি তৈরির খাতায়, বাকীটা কি রেখে যাবো আহমেদ-আবদুল্লা সাহেবের গাড়ি-জুড়ি কিনতে? তামাশা সর্বাঙ্গসুন্দর করতে নেহাত মন্দ পরামর্শ দাওনি ভারতী। কি বল শশী? হাঃ হাঃ হাঃ—

ভারতী বলিল, দাদা, তোমাকে হাসি-ঠাট্টা করতে আগেও দেখেছি বটে, কিন্তু, এমন ক্ষ্যাপার মত হাসতে আর কখনো দেখিনি।

ডাক্তার জবাব দিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু ভারতীর মুখের প্রতি চাহিয়া সহসা কিছু বলিতে পারিলেন না। ভারতী পুনশ্চ কহিল, নর-নারীর ভালবাসা কি তোমারই মত সকলের উপহাসের বস্তু যে, তাসের ছক্কা-পঞ্জা হারার মত এর হার-জিতে অট্টহাসি করা ছাড়া আর কিছুই করবার নেই? স্বাধীনতা পরাধীনতা ছাড়া মানুষের ব্যথা পাবার কি দুনিয়ায় কিছুই তুমি ভাবতে পারবে না? দেখ ত একবার শশীবাবুর মুখের দিকে চেয়ে। একটা বেলার মধ্যে উনি কি হয়ে গেছেন! অপূর্ববাবু যখন চলে গেলেন, সেদিন আমাকে উপলক্ষ করেও হয়ত তুমি এমনি করেই হেসেছ।

না, না, সে হল—

ভারতী বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, না না বলছ কিসের জন্যে দাদা? শশীবাবু তোমার স্নেহের পাত্র, তুমি এই ভেবেই খুশী হয়ে উঠেছ যে, নির্বোধ তাঁকে ফাঁদের মধ্যে ফেলে নবতারা অনেক দুঃখ দিত। ভবিষ্যতের সেই দুঃখের হাত থেকে তিনি এড়িয়ে গেলেন। কিন্তু ভবিষ্যৎই কি মানুষের সব? আজকের এই একটিমাত্র দিন যে ব্যথার ভারে তাঁর সমস্ত ভবিষ্যৎকে ডিঙিয়ে গেল এ তুমি কি করে জানবে বল? তুমি ত কখনো ভালোবাসো নি!

শশী অতিশয় অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। সে কোনমতে বলিতে চাহিল যে তাহারই অন্যায়, তাহারই ভুল, সাংসারিক সাধারণ বুদ্ধি না থাকার জন্যই—

ভারতী ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, লজ্জা কিসের শশীবাবু? এ ভুল কি সংসারে একা আপনিই করেছেন? আপনার শতগুণ ভুল আমি করিনি? তারও সহস্রগুণ বেশী ভুল করে যে দুর্ভাগিনী নিঃশব্দে এ দেশ ছেড়ে চিরদিনের জন্যে চলে যেতে উদ্যত হয়েছে, তাকে কি ডাক্তার চেনেন না? নবতারা ঠকিয়েছে? ঠকাক্ না। তবু ত আমাদেরই বঞ্চনার গান গেয়ে জগতের অর্ধেক কাব্য অমর হয়ে আছে।

ডাক্তার বিস্মিতচক্ষে তাহার প্রতি চাহিলেন, কিন্তু ভারতী গ্রাহ্য করিল না। বলিতে লাগিল, শশীবাবু, সাংসারিক বুদ্ধি আপনার কম? কিন্তু আমার ত কম ছিল না? সুমিত্রাদিদির বুদ্ধির তুলনাই হয় না। অথচ, কিছুই ত কারও কাজে লাগেনি। এ শুধু পরাভূত হল, দাদা, তোমার বুদ্ধির কাছে। যে চিরদিন অজেয়, পথ যার কখনো বাধা পায়নি, সেও তোমারই পাষাণ-দ্বারে কেবল আছাড় খেয়ে খানখান হয়ে পড়ে গেল,—প্রবেশ করবার এতটুকু পথ পেলে না!

ডাক্তার এ অভিযোগের উত্তর দিলেন না, শুধু তাহার মুখপানে চাহিয়া একটুখানি হাসিলেন। ভারতী বলিল, শশীবাবু, আমি আপনার প্রতি মহা অপরাধ করেছি, আজ তার ক্ষমা চাই—

শশী বুঝিতে পারিল না, কিন্তু কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল। ভারতী নিমেষমাত্র মৌন থাকিয়া বলিতে লাগিল, একদিন দাদার কাছে বলেছিলাম, কোন মেয়েমানুষেই কোনদিন আপনাকে ভালবাসতে পারে না। সেদিন আপনাকে আমি চিনিনি। আজ মনে হচ্চে অপূর্ববাবুকে যে ভালবেসেছিল সে আপনাকে পেলে ধন্য হয়ে যেতো। সবাই আপনাকে উপেক্ষা করে এসেছে, শুধু একটি লোক করেনি, সে এই ডাক্তার।

ডাক্তার অধোমুখে একটুকরা মাংস হইতে হাড় পৃথক করিবার কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন, মুখ তুলিবার অবকাশ পাইলেন না। ভারতী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, দাদা, মানুষকে চিনে নিতে তোমার ভুল হয় না, তাই সেদিন দুঃখ

করে আমার কাছে বলেছিলে, শশী যদি আর কাউকে ভালবাসত! কিন্তু একটা দিনও কি তুমি আমাকে সাবধান করে বলে দিতে পারতে না, ভারতী, এতবড় ভুল তুমি করো না! পুরুষের দুই আদর্শ তোমরা দুজনে আমার সুমুখে বসে,— আজ আমার বিতৃষ্ণার আর অবধি নেই!

ডাক্তার মাংসখণ্ড মুখে পুরিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অপূর্ব কি বললে শশী?

জবাব দিল ভারতী। কহিল, মা পীড়িত। চিকিৎসার প্রয়োজন, অতএব, টাকা চাই। ফিরে এসে লুকিয়ে গোলামি করলে কেউ জানতে পারবে না। ভয় তলওয়ারকরকে, ভয় ব্রজেন্দ্রকে। কিন্তু, কাকা পুলিশ কর্মচারী,—সে ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হয়ে গেছে দাদা। তুমি-আমিও বোধ হয় এখন আর বাদ যাবো না। ক্ষুদ্র! লোভী! সঙ্কীর্ণচিত্ত ভীরু! ছি!

ডাক্তার মুচকিয়া হাসিলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন, যথার্থ ভাল না বাসলে এমন প্রাণ খুলে যশোগান করা যায় না। কবি, এবার তোমার পালা। বাগ্‌দেবীকে স্মরণ করে তুমি এবার নবতারার গুণকীর্তন শুরু কর—আমার অবহিত হই!

ভারতী চকিত হইয়া কহিল, দাদা, তুমি আমাকে তিরস্কার করলে?

ডাক্তার ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, তাই হবে হয়ত।

অভিমানে, ব্যথায়, ক্রোধে ভারতীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, বলিল, তুমি কখখনো আমাকে বকতে পাবে না। ভেবেছ, সবাই শশীবাবুর মত মুখ বুজে সইতে পারে? তুমি কি জানো কি হয় মানুষের! উচ্ছ্বসিত বেদনায় কণ্ঠস্বর তাহার অবরুদ্ধ হইয়া আসিস, কহিল, তিনি ফিরে এসেছেন, এবার আমাকে তুমি কোথাও সরিয়া নিয়ে যাও দাদা,—আমি এ কোন্ দুর্ভাগার পায়ে আমার সমস্ত বিসর্জন দিয়ে বসে আছি! বলিতে বলিতেই মেঝের উপর মাথা রাখিয়া ভারতী ছেলেমানুষের মত কাঁদিয়া ফেলিল।

ডাক্তার স্মিতমুখে নীরবে আহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার নির্বিকার ভাব দেখিয়া মনে হয় না যে, এই-সকল প্রণয়-উচ্ছ্বাস তাঁহাকে লেশমাত্র বিচলিত করিয়াছে। মিনিট পাঁচ-সাত পরে ভারতী উঠিয়া পাশের ঘরে গিয়া চোখ-মুখ ভাল করিয়া ধুইয়া মুছিয়া যথাস্থানে ফিরিয়া আসিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, আর তোমাদের কিছু দেব?

ডাক্তার পকেটে হইতে রুমাল বাহির করিয়া বলিলেন, বামুনের ছেলে, কিছু ছাঁদা বেঁধে দাও, দিন-দুই যেন নিশ্চিন্ত হতে পারি।

ময়লা রুমালটা ফিরাইয়া দিয়া ভারতী খোঁজ করিয়া একখানা ধোয়া তোয়ালে বাহির করিল, এবং রকমারি খাদ্যবস্তুর একটি পুঁটলি বাঁধিয়া ডাক্তারের পাশে রাখিয়া দিয়া কহিল, এই ত হল বামুনের ছেলের ছাঁদা। আর ঐ টাকার ছোট্ট থলিটি?

ডাক্তার সহাস্যে কহিলেন, ওটি হল বামুনের ছেলের ভোজন-দক্ষিণা।

ভারতী বলিল, অর্থাৎ তুচ্ছ বিবাহ-ব্যাপারটা ছাড়া আসল দরকারী কাজগুলা সমস্তই নির্বিঘ্নে সমাধা হল।

অকস্মাৎ, হাঃ হাঃ করিয়া আরম্ভ করিয়াই ডাক্তার সজোরে হাত দিয়া নিজের মুখ চাপিয়া ধরিয়া হাসি থামাইলেন, গম্ভীর হইয়া কহিলেন, কি যে ভগবানের অভিশাপ, ভারতী, হাসতে গেলেই মুখ দিয়ে আমার অট্টহাসি ছাড়া আর কিছু বার হতেই চায় না। অট্টকান্না কাঁদবার জন্যে তোমাকে সঙ্গে না নিয়ে এলে আজ মুখ দেখানোই ভার হতো।

দাদা, আবার জ্বালাতন করচ?

জ্বালাতন করচি? আমি ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টা করচি।

ভারতী রাগ করিয়া আর একদিকে মুখ ফিরাইল, জবাব দিল না।

শশী বরাবর চুপ করিয়াই ছিল, এতক্ষণে কথা কহিল। অকস্মাৎ অতিশয় গাম্ভীর্যের সহিত বলিল, আপনি যদি রাগ না করেন ত একটা কথা বলতে পারি।

কেউ কেউ ভয়ানক সন্দেহ করে যে, আপনার সঙ্গেই একদিন ভারতীর বিবাহ হবে।

ডাক্তার মুহূর্তের জন্য চমকিত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করিয়া উল্লাসভরে বলিয়া উঠিলেন, বল কি হে শশী, তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক, এমন সুদিন কি কখনো এতবড় দুর্ভাগার অদৃষ্টে হবে? এ যে স্বপ্নের অতীত, কবি!

শশী কহিল, কিন্তু অনেকে ত তাই ভাবেন।

ডাক্তার কহিলেন, হায়! হায়! অনেকে না ভেবে যদি একটিমাত্র লোক একটি পলকের জন্যও ভাবতেন!

ভারতী হাসিয়া ফেলিল। মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, দুর্ভাগার ভাগ্য ত একটি পলকেই বদলাতে পারে দাদা। তুমি হুকুম করে যদি বল, ভারতী, কালই আমাকে তোমার বিয়ে করতে হবে, আমি তোমার দিব্যি করে বলচি, বলব না যে আর একটা দিন সবুর কর।

ডাক্তার কহিলেন, কিন্তু অপূর্ব বেচারা যে প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে ফিরে এল, তার উপায়টা কি হবে?

ভারতী বলিল, তাঁর কনে-বৌ দেশে মজুদ আছে, তাঁর জন্যে তোমার দুশ্চিন্তার কারণ নেই। তিনি বুক ফেটে মারা যাবেন না।

ডাক্তার গম্ভীর হইয়া কহিলেন, কিন্তু আমাকে বিয়ে করতে রাজী হয়ে যাও, তোমার ভরসা ত কম নয় ভারতী!

ভারতী কহিল, তোমার হাতে পড়ব তার আর ভয়টা কিসের?

ডাক্তার শশীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন, শুনে রেখো কবি! ভবিষ্যতে যদি অস্বীকার করি তোমাকে সাক্ষী দিতে হবে।

ভারতী বলিল, কাউকে সাক্ষী দিতে হবে না দাদা, আমি তোমার নাম নিয়ে এতবড় শপথ কখনো অস্বীকার করব না। শুধু তুমি স্বীকার করলেই হয়।

ডাক্তার কহিলেন, আচ্ছা দেখে নেবো তখন।

দেখো। এই বলিয়া ভারতী হাসিয়া কহিল, দাদা, আমিই বা কি আর সুমিত্রাই বা কি,—স্বর্গের ইন্দ্রদেব যদি উর্বশী মেনকা রম্ভাকে ডেকে বলতেন, সেকালের মুনি-ঋষিদের বদলে তোমাদের একালের সব্যসাচীর তপস্যা ভঙ্গ করতে হবে, ত আমি নিশ্চয় বলচি দাদা, মুখে কালি মেখে তাঁদের ফিরে যেতে হতো। রক্ত-মাংসের হৃদয় জয় করা যায়, কিন্তু পাথরের সঙ্গে কি লড়াই চলে! পরাধীনতার আগুনে পুড়ে সমস্ত বুক তোমার একেবারে পাষাণ হয়ে গেছে।

ডাক্তার মুচকিয়া হাসিলেন। ভারতীর দুই চক্ষু শ্রদ্ধা ও স্নেহে অশ্রুসজল হইয়া উঠিল, কহিল, এ বিশ্বাস না থাকলে কি এমন করে তোমাকে আত্মসমর্পণ করতে পারতাম? আমি ত নবতারা নই। আমি জানি, আমার মস্ত ভুল হয়ে গেছে,—কিন্তু এ জীবনে সংশোধনের পথও আর নেই। একদিনের জন্যেও যাঁকে মনে মনে—

ভারতীর চোখ দিয়া পুনরায় জল গড়াইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, দাদা, ফেরবার সময় হয়নি? ভাঁটার দেরি কত?

ডাক্তার দেওয়ালের ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিলেন, এখনো দেরি আছে বোন। তাহার পরে ধীরে ধীরে ডান হাত বাড়াইয়া ভারতীর মাথার উপরে রাখিয়া কহিলেন, আশ্চর্য! এত দুর্দশাতেও এ অমূল্য রত্নটি আজও বাঙলার খোয়া যায়নি। থাক না নবতারা, তবু ত ভারতীও আমাদের আছে। শশী, সমস্ত পৃথিবীতে এর আর জোড়া মেলে না! এখানে সহস্র সব্যসাচীর সাধ্য নেই তুচ্ছ অপূর্বকে আড়াল করে দাঁড়ায়! ভাল কথা শশী। মদের বোতল কৈ?

প্রশ্ন শুনিয়া শশী যেন কিছু লজ্জিত হইল, বলিল, কিনিনি ডাক্তার। ও আমি আর খাবো না।

ভারতী বলিল, তোমার মনে নেই দাদা, নবতারা ওঁকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন?

শশী তাহারই সায় দিয়া কহিল, সত্যিই নবতারার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম মদ আর খাবো না। এ সত্য আমি ভাঙবো না, ডাক্তার।

ডাক্তার সহাস্যে বলিলেন, কিন্তু বাঁচবে কি করে শশী? মদ গেল, নবতারা গেল, যথাসর্বস্ব-বিক্রি-করা টাকা গেল, একসঙ্গে এত সইবে কেন?

শশীর মুখের দিকে চাহিয়া ভারতী ব্যথা পাইল, কহিল, তামাশা করা সহজ দাদা, কিন্তু সত্যি সত্যি একবার ভেবে দেখ দিকি?

ডাক্তার বলিলেন, ভেবে দেখেই বলচি ভারতী। এই টাকাটার ওপরে যে শশীর কতখানি আশা-ভরসা ছিল তা আমার চেয়ে বেশী আর কেউ জানে না। ওর পরিচিত এমন একটা লোকও নেই যে, এ বিবরণ শোনেনি। তার পরে এলো নবতারা। ছ'-সাত মাস ধরে সেই ছিল ওর ধ্যান-জ্ঞান। আর মদ? সে ত শশীর সুখ-দুঃখের একমাত্র সাথী। কাল সবই ছিল, আজ ওর জীবনের যা-কিছু আনন্দ, যা-কিছু সান্ত্বনা একদিনে একসঙ্গে চক্রান্ত করে যেন ওকে ত্যাগ করে গেল। তবু, কারও বিরুদ্ধে ওর বিদ্বেষ নেই, নালিশ নেই,—এমন কি আকাশের পানে চেয়ে একবার সজলচক্ষে বলতে পারলে না যে, ভগবান! আমি কারও মন্দ চাইনে, কিন্তু তুমি সত্যির যদি হও ত এর বিচার করো!

ভারতীর মুখ দিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল, কহিল, তাই তোমার এত স্নেহ।

ডাক্তার বলিলেন, শুধু স্নেহ নয়, শ্রদ্ধা। শশী সাধু লোক, সমস্ত অন্তরখানি যেন গঙ্গাজলের মত শুদ্ধ, নির্মল। ভারতী, আমি চলে গেলে, বোন, একে একটু দেখো। তোমার হাতেই শশীকে আমি দিয়ে গেলাম, ও দুঃখ পাবে, কিন্তু দুঃখ কখনো কাউকে দেবে না।

শশী লজ্জা ও কুণ্ঠায় আরক্ত হইয়া উঠিল। ইহার পরে কিছুক্ষণ পর্যন্ত বোধ করি কথার অভাবেই তিনজনেই নীরব হইয়া রহিলেন।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু এখন থেকে কি করবে কবি? তোমার বাকী রইল ত কেবল ওই বেহালাখানি। আগের মত আবার দেশে দেশে বাজিয়ে বেড়াবে?

এবার শশী হাসিমুখেই বলিল, আপনার কাজে আমাকে ভর্তি করে নিন,—বাস্তবিকই আমি আর মদ খাবো না।

তাহার কথা এবং কথা বলার ভঙ্গী দেখিয়া ভারতী হাসিল। ডাক্তার নিজেও হাসিলেন, স্নেহার্দ্রকণ্ঠে কহিলেন, না, কবি, ওতে তোমার আর ভর্তি হয়ে কাজ নেই। তুমি আমার এই বোনটির কাছে থেকো, তাতেই আমার ঢের বড় কাজ হবে।

শশী মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া সঙ্কোচের সহিত কহিল, আগে আমি কবিতা লিখতে পারতাম ডাক্তার,—হয়ত এখনও পারি।

ডাক্তার খুশি হইয়া কহিলেন, তাও ত বটে। আর তাতেই যে আমার মস্ত কাজ হবে কবি।

শশী কহিল, আমি আবার আরম্ভ করব। চাষাভূষা কুলি-মজুরদের জন্যেই এবার শুধু লিখব।

কিন্তু তারা ত পড়তে জানে না কবি?

শশী কহিল, নাই জানলে, তবু তাদের জন্যেই আমি লিখবো।

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, সেটা অস্বাভাবিক হবে, এবং অস্বাভাবিক জিনিষ টিকবে না। অশিক্ষিতের জন্যে অন্নসত্র খোলা যেতে পারে, কারণ, তাদের ক্ষুধা-বোধ আছে, কিন্তু সাহিত্য পরিবেশন করা যাবে না। তাদের সুখ-দুঃখের বর্ণনা করার মানেই তাদের সাহিত্য নয়। কোনদিন যদি সম্ভব হয়, তাদের সাহিত্য

তারাই করে নেবে,—নইলে, তোমার গলায় লাঙ্গলের গান লাঙ্গলধারীর গীতিকাব্য হয়ে উঠবে না। এ অসম্ভব প্রয়াস তুমি করো না কবি।

শশী ঠিক বুঝিতে পারিল না, সন্দিগ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তবে আমি কি করব?

ডাক্তার বলিলেন, তুমি আমার বিপ্লবের গান করো। যেখানে জন্মেছ, যেখানে মানুষ হয়েছ, শুধু তাদেরই—সেই শিক্ষিত ভদ্র জাতের জন্যেই।

ভারতী বিস্মিত হইল, ব্যথিত হইল, কহিল, দাদা, তুমিও জাত মানো? তোমার লক্ষ্যও সেই কেবল ভদ্র জাতের দিকে?

ডাক্তার বলিলেন, আমি ত বর্ণাশ্রমের কথা বলিনি, ভারতী, সেই জোর-করা জাতিভেদের ইঙ্গিত ত আমি করিনি! সে বৈষম্য আমার নেই,—কিন্তু শিক্ষিত-অশিক্ষিতে জাতিভেদ, সে ত আমি না মেনে পারিনে! এই ত সত্যকার জাতি,—এই ত ভগবানের হাতেগড়া সৃষ্টি। ক্রীশ্চান বলে কি তোমাকে ঠেলে রাখতে পেরেছি দিদি? তোমার মত আপনার জন আমার কে আছে?

ভারতী শ্রদ্ধা-বিগলিত-চক্ষে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, কিন্তু তোমার বিপ্লবের গান ত শশীবাবুর মুখে সাজবে না দাদা! তোমার বিদ্রোহের গান, তোমার গুপ্ত সমিতির—

ডাক্তার বাধা দিয়া বলিলেন, না, আমার গুপ্ত সমিতির ভার আমার পরেই থাক বোন,—ও বোঝা বইবার মত জোর,—না না, সে থাক—সে শুধু আমার! এই বলিয়া তিনি ক্ষণকাল যেন আপনাকে সামলাইয়া লইলেন। কহিলেন, তোমাকে ত বলেছি ভারতী, বিপ্লব মানেই শুধু রক্তারক্তি কাণ্ড নয়,—বিপ্লব মানে অত্যন্ত দ্রুত আমূল পরিবর্তন! রাজনৈতিক বিপ্লব নয়,—সে আমার। কবি, তুমি প্রাণ খুলে শুধু সামাজিক বিপ্লবের গান শুরু করে দাও। যা কিছু সনাতন, যা কিছু প্রাচীন, জীর্ণ, পুরাতন,—ধর্ম, সমাজ, সংস্কার—সমস্ত ভেঙ্গে-চুরে ধ্বংস হয়ে যাক,— আর কিছু না পারো, শশী, কেবল এই মহাসত্যই মুক্তকণ্ঠে প্রচার করে

দাও,—এর চেয়ে ভারতের বড় শত্রু আর নেই—তারপরে থাক দেশের স্বাধীনতার বোঝা আমার এই মাথায়! কে?

শশী কান খাড়া করিয়া বলিল, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ যেন—

ডাক্তার চক্ষের পলকে পকেটের মধ্যে হাত পুরিয়া দিয়া নিঃশব্দ দ্রুতপদে অন্ধকার বারান্দায় বাহির হইয়া গেলেন, কিন্তু ক্ষণেক পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, ভারতী, সুমিত্রা আসছেন।

আটাশ

এই নিশীথ রাত্রে সুমিত্রার আগমন-সংবাদ যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি অপ্রীতিকর। ভারতী কুণ্ঠিত ও ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল পরে সে প্রবেশ করিতে ডাক্তার সহজকণ্ঠে অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন, বসো। তুমি কি একলা এলে নাকি?

সুমিত্রা বলিল, হাঁ। ভারতীর প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভাল আছ ভারতী?

এই মিনিট-খানেক সময়ের মধ্যেই ভারতী কত কি যে ভাবিতেছিল তাহার সীমা নাই। সেদিনকার মত আজিও যে সুমিত্রা তাহাকে গ্রাহ্য করিবে না ইহাই সে নিশ্চিত জানিত, কিন্তু শুধু এই কুশল প্রশ্নে নয়, তাহার কণ্ঠস্বরের স্নিগ্ধ কোমলতায় ভারতী সহসা যেন চাঁদ হাতে পাইল। অহেতুক কৃতজ্ঞতায় অন্তর পরিপূর্ণ করিয়া বলিল, ভালো আছি দিদি। আপনি ভাল আছেন? আজ আর তাহাকে তুমি বলিয়া ডাকিতে ভারতীর সাহস হইল না। হাঁ,আছি,—বলিয়া জবাব দিয়া সুমিত্রা একধারে উপবেশন করিল। কথোপকথন বেশী করা তাহার প্রকৃতি নয়,—একটা স্বাভাবিক ও শান্ত গাম্ভীর্যের দ্বারা চিরদিনই সে ব্যবধান রাখিয়া চলিত, আজও সে রীতির ব্যত্যয় হইল না। ইহা প্রচ্ছন্ন ক্রোধ বা বিরক্তির পরিচায়ক নহে তাহা জানিয়াও কিন্তু ভারতীর নিজে হইতে দ্বিতীয় প্রশ্ন করিতে ভরসা হইল না।

ডাক্তার কথা কহিলেন। বলিলেন, শশীর মুখে শুনলাম, তুমি প্রচুর বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে জাভায় ফিরে যাচ্চ।

সুমিত্রা কহিল, হাঁ, আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে লোক এসেছে।

কবে যাবে?

প্রথম স্টিমারেই—শনিবারে।

ডাক্তার একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, যাক, এবারে তাহলে তুমি বড়লোক হলে।

সুমিত্রা ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল, কহিল, হাঁ, সমস্ত পেলে তাই বটে।

ডাক্তার বলিলেন, পাবে। এটর্নির পরামর্শ ছাড়া কাজ করো না। আর, একটু সাবধানে থেকো। যাঁরা তোমাকে নিতে এসেছেন, তাঁরা পরিচিত লোক ত?

সুমিত্রা বলিল, হাঁ, তাঁরা বিশ্বাসী লোক, সকলকেই আমি চিনি।

তাহলে ত কথাই নেই, এই বলিয়া ডাক্তার মুখ ফিরাইয়া ভারতীকে লক্ষ্য করিয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ শশী কথা কহিল; বলিল, এ হল মন্দ নয় ডাক্তার। যে তিনজন বাঙালী মহিলাকে আপনি নিলেন—নবতারা গেলেন, স্বয়ং প্রেসিডেন্ট যেতে উদ্যত, শুধু ভারতী—

ডাক্তার সহাস্যে বলিলেন, তোমার দুশ্চিন্তার হেতু নেই, কবি, ভারতীও মহাজনের পন্থা অনুসরণ করবেন তা একপ্রকার স্থির হয়ে গেছে।

প্রত্যুত্তরে ভারতী শুধু ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল, কিন্তু জবাব দিল না।

ডাক্তারের পরিহাসের মধ্যে যে ব্যথা আছে শশী ইহাই অনুমান করিয়া কহিল, আপনাকেও শীঘ্র চলে যেতে হচ্চে। তাহলেই দেখুন, আপনার পথের-দাবীর এ্যাক্টিভিটি বর্মায় অন্ততঃ শেষ হয়ে গেল।

কে আর চালাবে! এই বলিয়া শশী গভীর নিঃশ্বাস মোচন করিল। তাহার এই দীর্ঘশ্বাস অকৃত্রিম এবং যথার্থই বেদনায় পূর্ণ, কিন্তু আশ্চর্য এই যে, ডাক্তারের মুখের পরে ইহার লেশমাত্র প্রতিবিম্ব পড়িল না। তেমনি হাসিমুখে কহিলেন, ও কি কথা কবি? এতকাল এত দেখেশুনে শেষে তোমারই মুখে সব্যসাচীর এই সার্টিফিকেট! তিনজন মহিলা চলে যাবেন বলে পথের-দাবী শেষ হয়ে যাবে? মদ ছেড়ে দিয়ে কি এই হল নাকি? তার চেয়ে বরঞ্চ তুমি আবার ধরো।

কথাটা তামাশার মত শুনাইলেও যে তামাশা নয় তাহা বুঝিয়াও ভারতী ঠিকমত বুঝিতে পারিল না। কটাক্ষে চাহিয়া দেখিল, সুমিত্রা নতনেত্রে নিঃশব্দে বসিয়া আছে। তখন সে মুখ তুলিয়া ডাক্তারের মুখের প্রতি স্থির দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, দাদা, আমার ত আর বোঝবার জন্যে মদ ধরবার আবশ্যক নেই, কিন্তু তবু ত বুঝতে পারলাম না। নবতারা কিছুই নয়, আর আমি তার চেয়েও অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু সুমিত্রাদিদি—যাঁকে তুমি নিজে থেকে প্রেসিডেন্টের আসন দিয়েছ,—তিনি চলে গেলেও কি তোমার পথের-দাবীতে আঘাত লাগবে না? সত্যি কথা বলো দাদা, শুদ্ধমাত্র কাউকে লাঞ্ছনা করবার জন্যেই রাগ করে যেন বলো না! এই বলিয়া সে চোখাচোখি হইবার নিঃসন্দিগ্ধ ভরসায় পলকমাত্র সুমিত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই চক্ষু অন্যত্র অপসারিত করিল। চোখে চোখ মিলিল না, সুমিত্রা সেই যে মুখ নীচু করিয়া বসিয়া ছিল, ঠিক তেমনি নির্বাক নতমুখে মূর্তির মত বসিয়া রহিল।

ডাক্তার ক্ষণকাল মৌন হইয়া রহিলেন, তাহার পরে ধীরে ধীরে কহিলেন, আমি রাগ করে বলিনি ভারতী, সুমিত্রা অবহেলার বস্তু নয়। কিন্তু তুমি হয়ত জানো না, কিন্তু নিজে সুমিত্রা ভালরূপেই জানেন যে এ-সকল ব্যাপারে আমাদের ক্ষতির পরিমাণ গণনা করতে নেই। তা ছাড়া প্রাণ যাদের এমন অনিশ্চিত তাদের মূল্য স্থির হবে কি দিয়ে বল ত? মানুষ ত যাবেই। যত বড়ই হোক, কারও অভাবকেই যেন না আমরা সর্বনাশ বলে ভাবি, একজনের স্থান যেন জলস্রোতের মত আর একজন স্বচ্ছন্দে এবং অত্যন্ত অনায়াসেই পূর্ণ করে নিতে পারে এই শিক্ষাই ত আমাদের প্রথম এবং প্রধান শিক্ষা ভারতী!

ভারতী কহিল, কিন্তু এ ত আর সংসারে সত্যই ঘটে না! এই যেমন তুমি। তোমার অভাব কেউ কোনদিন পূর্ণ করতে পারে এ কথা ত আমি ভাবতেই পারিনে দাদা।

ডাক্তার বলিলেন, তোমার চিন্তার ধারা স্বতন্ত্র, ভারতী। আর, এই যেদিন টের পেয়েছিলাম, সেই দিন থেকেই তোমাকে আর আমি দলের মধ্যে টানতে পারিনি। কেবলি মনে হয়েছে, জগতে তোমার অন্য কাজ আছে।

ভারতী বলিল, আর কেবলই আমার মনে হয়েছে আমাকে অযোগ্য জ্ঞানে তুমি দূরে সরিয়ে দিতে চাচ্চো। যদি আমার অন্য কাজ থাকে, আমি তারই জন্যে এখন থেকে সংসারে বার হবো, কিন্তু আমার প্রশ্নের ত জবাব হল না, দাদা। আসলে কথাটা তুচ্ছ। তোমার অভাব জলস্রোতের মতই পূর্ণ হতে পারে কি না? তুমি বলছ পারে,—আমি বলচি, পারে না। আমি জানি, পারে না, আমি জানি, মানুষ শুধু জলস্রোত নয়—তুমি ত নও-ই।

মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া সে পুনশ্চ কহিল, কেবল এই কথাটাই জানবার জন্যে তোমাকে আমি পীড়াপীড়ি করতাম না। কিন্তু যা নয়, যা নিজে জানো তুমি সত্য নয়, তাই দিয়ে আমাকে ভোলাতে চাও কেন?

ডাক্তার হঠাৎ উত্তর দিতে পারিলেন না, উত্তরের জন্য ভারতী অপেক্ষাও করিল না। কহিল, এদেশে আর তোমার থাকা চলে না,—তুমিও যাবার জন্যে পা তুলে আছো। আবার তোমাকে ফিরে পাওয়া যে কত অনিশ্চিত এ কথা ভাবতেও বুকের মধ্যে জ্বলতে থাকে, তাই ও আমি ভাবিনে, তবুও এ সত্য ত প্রতিমুহূর্তেই অনুভব না করে পারিনে। এ ব্যথার সীমা নেই, কিন্তু তার চেয়েও আমার বড় ব্যথা তোমাকে এমন করে পেয়েও পেলাম না! আজ আমার কত দিনের কত প্রশ্নই মনে হচ্চে দাদা, কিন্তু যখনি জিজ্ঞাসা করেছি তুমি সত্য বলেছ, মিথ্যা বলেছ, সত্যি-মিথ্যায় জড়িয়ে দিয়ে বলেছ,—কিন্তু কিছুতেই সত্য জানতে দাওনি। তোমার পথের-দাবীর সেক্রেটারি আমি, তবু যে তোমার কাজের পদ্ধতিতে আমার এতটুকু আস্থা ছিল না এ কথা তোমাকে ত আমি একটা দিনও লুকোই নি। তুমি রাগ করোনি, অবিশ্বাস করোনি,—হাসিমুখে শুধু বারবার সরিয়ে দিতে চেয়েছ। অপূর্ববাবুর জীবন-দানের কথা আমি ভুলিনি। মনে হয়, আমার ছোট্ট জীবনের

কল্যাণ কেবল তুমিই নির্দেশ করে দিতে পারো। দোহাই দাদা, যাবার পূর্বে আর নিজেকে গোপন করে যেয়ো না,—তোমার, আমার, সকলের যা পরম সত্য তাই আজ অকপটে প্রকাশ কর।

এই অদ্ভুত অনুনয়ের অর্থ না বুঝিয়া শশী ও সুমিত্রা উভয়েই বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল, এবং তাহাদেরই উৎসুক চোখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভারতী নিজের ব্যাকুলতায় নিজেই লজ্জিত হইয়া উঠিল। এই লজ্জা ডাক্তারের দৃষ্টি এড়াইল না। তিনি সহাস্যে কহিলেন সত্য, মিথ্যা, এবং সত্য-মিথ্যায় জড়িয়ে ত সবাই বলে ভারতী, আমার আর বিশেষ দোষ হল কি? তা ছাড়া লজ্জা যদি পাবার থাকে ত সে আমার, কিন্তু লজ্জা পেলে যে তুমি!

ভারতী নতমুখে নীরব হইয়া রহিল। সুমিত্রা ইহার জবাব দিয়া কহিল, লজ্জা যদি তোমার না-ই থাকে ডাক্তার, কিন্তু মেয়েরা সত্যি কথাটাও মুখের উপর স্পষ্ট করে বলতে লজ্জা বোধ করে। কেউ কেউ বলতেই পারে না।

এই মন্তব্যটি যে কাহাকে উদ্দেশ করিয়া কিসের জন্য বলা হইল তাহা বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না, কিন্তু যে শ্রদ্ধা ও সম্মান তাঁহার প্রাপ্য, বোধ হয় তাহাই অপর সকলকে নিরুত্তর করিয়া রাখিল। মিনিট দুই-তিন এমনি নিঃশব্দে কাটিলে ডাক্তার ভারতীকে পুনরায় লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, ভারতী, সুমিত্রা বললেন, আমার লজ্জা নেই, তুমি দোষ দিলে আমি সুবিধামত সত্য ও মিথ্যা দুই-ই বলি। আজও তেমনি কিছু বলেই এ প্রসঙ্গ শেষ করে দিতে পারতাম, যদি না এর সঙ্গে আমার পথের-দাবীর সম্বন্ধ থাকতো। এর ভাল-মন্দ দিয়েই আমার সত্য-মিথ্যা নির্ধারিত হয়। এই আমার নীতিশাস্ত্র, এই আমার অকপট মূর্তি!

ভারতী অবাক হইয়া কহিল, বল কি দাদা, এই তোমার নীতি, এই তোমার অকপট মূর্তি?

সুমিত্রা বলিয়া উঠিল, হাঁ, ঠিক এই! এই ওঁর যথার্থ স্বরূপ। দয়া নেই, মায়া নেই, ধর্ম নেই—এই পাষাণমূর্তি আমি চিনি ভারতী।

তাঁহার কথাগুলা যে ভারতী বিশ্বাস করিল তাহা নয়, কিন্তু সে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

ডাক্তার কহিলেন, তোমরা বল চরম সত্য, পরম সত্য;—এই অর্থহীন নিষ্ফল শব্দগুলো তোমাদের কাছে মহা মূল্যবান। মূর্খ ভোলাবার এতবড় যাদুমন্ত্র আর নেই। তোমরা ভাবো মিথ্যোকেই বানাতে হয়, সত্য শাশ্বত, সনাতন, অপৌরুষেয়? মিছে কথা। মিথ্যার মতই একে মানবজাতি অহরহ সৃষ্টি করে চলে। শাশ্বত, সনাতন নয়,—এর জন্ম আছে মৃত্যু আছে। আমি মিথ্যা বলিনে, আমি প্রয়োজনে সত্য সৃষ্টি করি।

এ পরিহাস নয়, সব্যসাচীর অন্তরের উক্তি। ভারতী যেন ফ্যাকাশে হইয়া গেল, অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, এই কি তোমার পথের-দাবীর নীতি?

ডাক্তার জবাব দিলেন, ভারতী, পথের-দাবী আমার তর্কশাস্ত্রের টোল নয়—এ আমার পথ চলার অধিকারের জোর! কে কবে কোন্ অজানা প্রয়োজনে নীতিবাক্য রচনা করে গেল পথের-দাবীর সেই হবে সত্য, আর এর তরে যার গলা ফাঁসির দড়িতে বাঁধা, তার হৃদয়ের বাক্য হবে মিথ্যে? তোমার পরম সত্য কি আছে জানিনে, কিন্তু পরম মিথ্যা যদি কোথাও থাকে ত সে এই!

উত্তেজনায় সুমিত্রার চোখের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল, কিন্তু এই ভয়ানক কথা শুনিয়া ভারতী শঙ্কায় ও সংশয়ে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল।

কবি!

আজ্ঞে।

শশীর কি ভক্তি দেখেছ? এই বলিয়া ডাক্তার হাসিলেন, কিন্তু এ হাসিতে কেহ যোগ দিল না। ডাক্তার দেয়ালের ঘড়ির প্রতি চাহিয়া কহিলেন, জোয়ার শেষ হতে আর দেরি নেই, আমার যাবার সময় হয়ে এল। তোমার তারাবিহীন শশি-তারা লজে আর আসার সময় পাবো না।

শশী কহিল, কালই আমি এ বাসা ছেড়ে দেব।

কোথায় যাবে?

শশী কহিল, আপনার আদেশমত ভারতীর কাছে গিয়ে থাকবো।

ডাক্তার সহাস্যে কহিলেন, দেখেচ ভারতী, শশী আমার আদেশ অমান্য করে না। ও বাসাটার নাম কি দেবে কবি? শশী-ভারতী লজ? বার-তিনেক ফসকাতে ত আমিই দেখলাম, এবারে হয়ত লাগতেও পারে। ভারতী লোক ভাল। ওর শরীরে দয়া-মায়া আছে।

এত কষ্টেও ভারতী হাসিয়া ফেলিল। সুমিত্রা হাসিমুখে মাথা নত করিল।

ডাক্তার বলিলেন, তোমার টাকার থলিটি কিন্তু সঙ্গে নিলাম। ভারতীর কাছে রেখে যাবো, ও একটা বাড়ি কিনবে।

ভারতী বলিল, দাদা, কাটা-ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়া কি তোমার থামবে না?

শশী বলিল, টাকা আপনি নিন ডাক্তার, আপনাকে আমি দিলাম। আমার দেশের বাড়ি-ঘর সর্বস্ব-বেচা টাকা যেন দেশের কাজেই লাগে।

ডাক্তার হাসিলেন, কিন্তু তাঁহার চোখ ছলছল করিয়া আসিল। বলিলেন, টাকা আমার আছে, শশি, এখন আর দরকার নেই। তা ছাড়া, আর বোধ হয় টাকার অভাব হবে না। এই বলিয়া তিনি স্মিতমুখে সুমিত্রার প্রতি চাহিলেন।

সুমিত্রার দুই চক্ষে কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। মুখে সে কিছুই বলিল না, কিন্তু তাহার সর্বাঙ্গ দিয়া এই কথাটাই ফুটিয়া বাহির হইল, সবই ত তোমার, কিন্তু সে কি তুমি ছোঁবে?

ডাক্তার দৃষ্টি অপসারিত করিয়া কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধভাবে থাকিয়া ডাকিলেন, কবি!

বলুন।

ব্রাহ্মণ-ভোজনটা একটু আগাম সেরে নিলাম বলে তুমি দুঃখ করো না। কারণ, শুভক্ষণ যখন সত্যি এসে পৌঁছবে তখন দ্বিতীয়বার আর আমি ফুরসত

পাবো না। কিন্তু সেদিন আসবে। নানাবিধ সুখাদ্যে পরিতৃপ্ত হয়ে আজ তোমাকে বর দিলাম, তুমি সুখী হবে। কিন্তু দুটি কাজ তুমি কখনো করো না। মদ খেয়ো না, আর রাজনীতিক বিপ্লবের মধ্যে যেয়ো না। তুমি কবি, তুমি দেশের বড় শিল্পী—রাজনীতির চেয়ে তুমি বড় এ কথা ভুলো না।

শশী ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, আপনি যাতে আছেন, আমি তার মধ্যে থাকলে দোষ হবে,—আমি কি আপনার চেয়েও বড়?

ডাক্তার কহিলেন, বড় বৈ কি! তোমার পরিচয়ই ত জাতির সত্যকার পরিচয়। তোমরা ছাড়া এর ওজন হবে কি দিয়ে? একদিন এই স্বাধীনতা-পরাধীনতা-সমস্যার মীমাংসা হবেই,—এর দুঃখ-দৈন্যের কাহিনী সেদিন জনশ্রুতির অধিক মূল্য পাবে না, কিন্তু তোমার কাজের মূল্য নিরূপণ করবে কে? তুমিই ত দিয়ে যাবে দেশের সমস্ত বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ধারাকে মালার মত গেঁথে।

সুমিত্রা মৃদুহাস্যে বলিল, কবে গাঁথবেন সে উনিই জানেন, কিন্তু তুমি কথা গেঁথে গেঁথে যে মূল্য ওঁর এখনি বাড়িয়ে দিলে, ভারতী সামলাবে কি করে?

শুনিয়া সবাই হাসিল, ডাক্তার কহিলেন, শশী হবে আমাদের জাতীয় কবি। হিন্দুর নয়, মুসলমানের নয়, খ্রীষ্টানের নয়,—শুধু আমার বাঙলা দেশের কবি। সহস্র নদ-নদী প্রবাহিত আমার বাঙলা দেশ, আমার সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা মাঠের পরে মাঠে-ভরা বাঙলা দেশ। মিথ্যা রোগের দুঃখ নেই, মিথ্যা দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা নেই, বিদেশী শাসনের সুদুঃসহ অপমানের জ্বালা নেই, মনুষ্যত্বহীনতার লাঞ্ছনা নেই,—তুমি হবে শশি, তারই চারণ-কবি! পারবে না ভাই?

ভারতীর সর্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, শশী ভ্রাতৃ-সম্বোধনের মাধুর্যে বিগলিত হইয়া বলিল, ডাক্তার, চেষ্টা করলে আমি ইংরাজিতেও কবিতা লিখতে পারি। এমন কি—

ডাক্তার বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, না না, ইংরাজি নয়, ইংরাজি নয়,—শুধু বাংলা, শুধু এই সাত কোটি লোকের মাতৃভাষা! শশি, পৃথিবীর প্রায় সকল

ভাষাই আমি জানি, কিন্তু সহস্রদলে বিকশিত এমন মধু দিয়ে ভরা ভাষা আর নেই! আমি অনেক সময়ে ভাবি ভারতী, এমন অমৃত এ দেশে কবে কে এনেছিল?

ভারতীর চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িল, সে কহিল, আর আমি ভাবি দাদা, দেশকে এতখানি ভালবাসতে তোমাকে কে শিখিয়েছিল। কোথাও যেন এর সীমা নেই!

ইহারই প্রতিধ্বনি তুলিয়া শশী উচ্ছ্বসিতস্বরে বলিয়া উঠিল, এই বিগত গৌরবের গানই হবে আমার গান, এই ভালবাসার সুরই হবে আমার সুর। নিজের দেশকে বাঙলা দেশের লোকে যেন আবার তেমনি করে ভালবাসতে পারে এই শিক্ষাই হবে আমার শিক্ষা দেওয়া।

ডাক্তার বিস্মিত চোখে মুহূর্তকাল শশীর প্রতি চাহিয়া সুমিত্রার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অবশেষে উভয়েই হাসিলেন। কিন্তু এই হাসির মর্ম অপর দুইজনে উপলব্ধি না করিতে পারিয়া দুইজনেই অপ্রতিভ হইয়া পড়িল।

ডাক্তার কহিলেন, আবার তেমনি করে ভালবাসবে কি? তুমি যে ভালবাসার ইঙ্গিত করছ শশি, সে ভালবাসা বাঙালী কস্মিনকালেও বাঙলাদেশকে বাসেনি। তার তিলার্ধ থাকলেও কি বাঙালী বিদেশীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে এই সাত কোটি ভাই-বোনকে অবলীলাক্রমে পরের হাতে সঁপে দিতে পারতো? জননী জন্মভূমি ছিল শুধু কথার কথা! মুসলমান বাদশার পায়ের তলায় অঞ্জলি দেবার জন্যে হিন্দু মানসিংহ হিন্দু প্রতাপাদিত্যকে জানোয়ারের মত করে বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল। আর তাকে রসদ যুগিয়ে পথ দেখিয়ে এনেছিল বাঙালী! বর্গীরা দেশ লুট করতে আসত, বাঙালী লড়াই করত না, মাথায় হাঁড়ি দিয়ে জলে বসে থাকতো। মুসলমান দস্যুরা মন্দির ধ্বংস করে দেবতাদের নাক-কান কেটে দিয়ে যেতো, বাঙালী ছুটে পালাত, ধর্মের জন্যে গলা দিতো না। সে বাঙালী আমাদের কেউ নয়, কবি, গৌরব করবার মত তাদের কিচ্ছু ছিল না। তাদের আমরা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে চলবো,—তাদের ধর্ম, তাদের অনুশাসন, তাদের ভীরুতা, তাদের

দেশদ্রোহিতা, তাদের সামাজিক রীতি-নীতি,—তাদের যা-কিছু সমস্ত। সেই ত হবে তোমার বিপ্লবের গান, সেই ত হবে তোমার সত্যকার দেশপ্রেম!

শশী বিমূঢ়ের মত চাহিয়া রহিল, এই উক্তির মর্ম গ্রহণ করিতে পারিল না।

ডাক্তার বলিতে লাগিলেন, তাদের কাপুরুষতায় আমরা বিশ্বের কাছে হেয়, স্বার্থপরতার ভারে দায়গ্রস্ত, পঙ্গু। শুধু কি কেবল দেশ? যে ধর্ম তারা আপনারা মানতো না, যে দেবতাদের পরে তাদের নিজেদের আস্থা ছিল না, তাদেরই দোহাই দিয়ে সমস্ত জাতির আপাদমস্তক যুক্তিহীন বিধি-নিষেধের সহস্র পাকে বেঁধে দিয়ে গেছে! এ অধীনতা অনেক দুঃখের মূল।

শশী ধীরে ধীরে কহিল, এ-সব আপনি কি বলচেন?

ভারতীর ক্ষোভের অবধি রহিল না, বলিল, দাদা, আজ আমি ক্রীশ্চান, কিন্তু তাঁরা আমারও পূর্বপিতামহ। তাঁদের আর যা দোষ থাক, ধর্মবিশ্বাসে প্রবঞ্চনা ছিল,—এরকম অন্যায় কটূক্তি তুমি করো না।

সুমিত্রা চুপ করিয়াই শুনিতেছিল, এখন কথা কহিল। ভারতীর প্রতি চাহিয়া বলিল, কারও সম্বন্ধেই কটূক্তি করা অন্যায়, কিন্তু অশ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা করাও অন্যায়, এমন কি তিনি পূর্বপিতামহ হলেও। এতে মিষ্টতা থাকতে পারে কিন্তু যুক্তি নেই ভারতী, যা কুসংস্কার তাকে পরিত্যাগ করতে শেখো।

ভারতী নির্বাক হইয়া রহিল। ডাক্তার শশীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, কোন বস্তু কেবলমাত্র প্রাচীনতার জোরেই সত্য হয়ে ওঠে না, কবি। পুরাতনের গুণগান করতে পারাই বড় গুণ নয়। তাছাড়া, আমরা বিপ্লবী, পুরাতনের মোহ আমাদের জন্যে নয়। আমাদের দৃষ্টি, আমাদের গতি, আমাদের লক্ষ্য শুধু সুমুখের দিকে। পুরাতনের ধ্বংস করেই ত শুধু আমাদের পথ করতে হয়! এর মধ্যে মায়া-মমতার অবকাশ কৈ? জীর্ণ, মৃত পথ জুড়ে থাকলে আমরা পথের-দাবীর পথ পাবো কোথায়?

ভারতী কহিল, আমি কেবল তর্কের জন্যেই তর্ক করছি নে, আমি সত্যই তোমার কাছ থেকে আমার জীবনের পথ খুঁজে বেড়াচ্ছি। তুমি পুরাতনের শত্রু, কিন্তু কোন একটা সংস্কার বা রীতিনীতি কেবলমাত্র প্রাচীন হয়েছে বলেই কি তা নিষ্ফল, বৃথা, এবং পরিত্যাজ্য হয়ে যাবে? মানুষে তাহলে অসংশয়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবে কার পরে দাদা?

ডাক্তার বলিলেন, এতখানি ভারসহ বস্তু দুনিয়ায় কি আছে তা জানিনে। তবে এ কথা জানি, ভারতী, বয়সের সঙ্গে একদিন সমস্ত জিনিসই প্রাচীন, জীর্ণ এবং অকেজো, সুতরাং পরিত্যাজ্য হয়ে ওঠে। প্রত্যহ মানুষেই এগিয়ে যাবে, আর তার পিতামহের প্রতিষ্ঠিত সহস্র বর্ষের প্রাচীন রীতিনীতি একই স্থানে অচল হয়ে থাকবে, এমন হলে হয়ত ভাল হয়, কিন্তু তা হয় না। শুধু একটা বিপদ হয়েচে এই যে, কেবলমাত্র বছরের সংখ্যা দিয়েই কোন একটা সংস্কারের প্রাচীনতা নিরূপণ করা যায় না। না হলে তুমিও আজ আমাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলতে, দাদা, যা-কিছু পুরাতন, যা-কিছু জীর্ণ সমস্ত নির্বিচারে নির্মম হয়ে ধ্বংস করে ফেলো, আবার নূতন মানুষ, নূতন জগতের প্রতিষ্ঠা হোক।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, নিজে তুমি পারো?

কি পারি, বোন?

যা-কিছু প্রাচীন, যা-কিছু পবিত্র, সমস্ত নির্মম-চিত্তে ধ্বংস করে ফেলতে?

ডাক্তার বলিলেন, পারি। সেই ত আমাদের ব্রত। পুরাতন মানেই পবিত্র নয়, ভারতী। মানুষ সত্তর বছরের প্রাচীন হয়েছে বলেই সে দশ বছরের শিশুর চেয়ে বেশী পবিত্র হয়ে ওঠে না। তোমার নিজের দিকেই চেয়ে দেখ, মানুষের অবিশ্রাম চলার পথে ভারতের বর্ণাশ্রম ধর্ম ত সকল দিকেই মিথ্যে হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, কেউ ত আর সে আশ্রম অবলম্বন করে নেই। থাকলে তাকে মরতে হবে। সে যুগের সে বন্ধন আজ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে। তবুও তাকেই পবিত্র মনে করে কে জানো, ভারতী? ব্রাহ্মণ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকেই নিরতিশয়

পবিত্র জ্ঞানে কারা আঁকড়ে থাকতে চায় জানো? জমিদার। এর স্বরূপ বোঝা ত শক্ত নয় বোন! যে সংস্কারের মোহে অপূর্ব আজ তোমার মত নারীকেও ফেলে দিয়ে যেতে পারে তার চেয়ে বড় অসত্য আর আছে কি? আর শুধু কি অপূর্বর বর্ণাশ্রম? তোমার ক্রীশ্চান ধর্মও আজ তেমনি অসত্য হয়ে গেছে, ভারতী, এর প্রাচীন মোহ তোমাকে ত্যাগ করতে হবে।

ভারতী ভীত হইয়া বলিল, যে ধর্মকে ভালবাসি, বিশ্বাস করি, তাকেই তুমি ত্যাগ করতে বল দাদা?

ডাক্তার কহিলেন, বলি। কারণ সমস্ত ধর্মই মিথ্যা,—আদিম দিনের কুসংস্কার। বিশ্বমানবতার এতবড় পরম শত্রু আর নেই।

ভারতী বিবর্ণমুখে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। বহুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বলিল, দাদা, যেখানেই থাকো, তোমাকে আমি চিরদিন ভালবাসবো, কিন্তু এই যদি তোমার সত্যকার মত হয়, আজ থেকে তোমার আমার পথ একেবারে বিভিন্ন। একটা দিনও আমি ভাবিনি, এত বড় পাপের পথই তোমার পথের-দাবীর পথ।

ডাক্তার মুচকিয়া একটুখানি হাসিলেন।

ভারতী কহিল, আমি নিশ্চয় জানি, তোমার এই দয়াহীন নিষ্ঠুর ধ্বংসের পথে কিছুতেই কল্যাণ নেই। আমার স্নেহের পথ, করুণার পথ, ধর্ম-বিশ্বাসের পথ,—সেই পথই আমার শ্রেয়ঃ, সেই পথই আমার সত্য।

তাই ত তোমাকে আমি টানতে চাইনি, ভারতী। তোমার সম্বন্ধে ভুল করেছিলেন সুমিত্রা, কিন্তু আমার ভুল একটা দিনও হয়নি। তোমার পথেই তুমি চল গে। স্নেহের আয়োজন, করুণার প্রতিষ্ঠান জগতে অনেক খুঁজে পাবে, পাবে না শুধু পথের-দাবী,—পাবে না শুধু—বলিতে বলিতে তাঁহার চোখের দৃষ্টি পলকের জন্য জ্বলিয়াই যেন নিবিয়া গেল। কণ্ঠস্বর স্থির, গভীর। ভারতী ও সুমিত্রা উভয়েই বুঝিল, সব্যসাচীর এই শান্ত মুখশ্রী, এই সংযত, অচঞ্চল ভাষাই সবচেয়ে ভীষণ।

তিনি মুখ তুলিয়া বলিলেন, তোমাকে ত বহুবার বলেছি, ভারতী, কল্যাণ আমার কাম্য নয়, আমার কাম্য স্বাধীনতা। প্রতাপ চিতোর যখন জনহীন অরণ্যে পরিণত করেছিলেন, তখন, সমস্ত মারবাড়ে তার চেয়ে অকল্যাণের মূর্তি আর কোথাও ছিল না—সে আজ কত শতাব্দের কথা,— তবু সেই অকল্যাণই আজও সহস্র কল্যাণের চেয়ে বড় হয়ে আছে! কিন্তু থাক এ-সব নিষ্ফল তর্ক, যা আমার ব্রত তার কাছে কিছুই আমার অসত্য, অকল্যাণ নেই।

ভারতী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তর্ক এবং মতভেদ অনেকদিন ত অনেকবারই হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এমন ধারা নয়। আজ তাহার সমস্ত মন যেন বিষণ্ণ ও ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

ডাক্তার ঘড়ির দিকে চাহিলেন, তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পরে সেই স্নিগ্ধ, সহজ হাসিমুখে কহিলেন, কিন্তু এদিকে যে নদীতে ফের জোয়ার এসে পড়বার সময় হয়ে এল ভারতী, ওঠো।

ভারতী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, চল।

ডাক্তার খাবারের পুঁটুলি হাতে করিয়া উঠিলেন, কহিলেন, সুমিত্রা, ব্রজেন্দ্র কোথায়?

সুমিত্রা উত্তর দিল না, নতমুখে মৌন হইয়া রহিল।

তোমাকে কি পৌঁছে দিয়ে আসবো?

সুমিত্রা ঘাড় নাড়িয়া শুধু বলিল, না।

ডাক্তার কি একটা পুনরায় বলিতে গেলেন, কিন্তু আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া শুধু কহিলেন, আচ্ছা। ভারতীকে কহিলেন, আর দেরি করো না দিদি, এস। এই বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

সুমিত্রা তেমনি নতমুখে বসিয়া রহিল। ভারতী তাঁহাকে নিঃশব্দে নমস্কার করিয়া ডাক্তারের অনুসরণ করিল।

ঊনত্রিশ

স্বপ্ন-চালিতের ন্যায় ভারতী নৌকায় আসিয়া বসিল, এবং নদী-পথের সমস্তক্ষণ নির্বাক নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। রাত্রি বোধ হয় তৃতীয় প্রহর হইবে; আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রালোকে পৃথিবীর অন্ধকার স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে, নৌকা আসিয়া সেই ঘাটে ভিড়িল। হাত ধরিয়া ভারতীকে নামাইয়া দিয়া সব্যসাচী নিজে নামিবার উপক্রম করিতে ভারতী বাধা দিয়া কহিল, আমাকে পৌঁছে দিতে হবে না দাদা, আমি আপনিই যেতে পারবো।

একলাটি ভয় করবে না?

করবে। কিন্তু তা বলে তোমাকে আসতে হবে না।

সব্যসাচী কহিলেন, এইটুকু বৈ ত নয়, চল না তোমাকে খপ করে পৌঁছে দিয়ে আসি, বোন। এই বলিয়া তিনি নীচে সিঁড়ির উপরে পা বাড়াইতেই ভারতী হাতজোড় করিয়া কহিল, রক্ষে কর দাদা, তুমি সঙ্গে গিয়ে ভয় আমার হাজার গুণে বাড়িয়ে দিয়ো না। তুমি বাসায় যাও।

বাস্তবিক, সঙ্গে যাওয়া যে অত্যন্ত বিপজ্জনক তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই ডাক্তার আর জিদ করিলেন না, কিন্তু ভারতী চলিয়া গেলেও বহুক্ষণ পর্যন্ত সেই নদীকূলে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বাসায় আসিয়া ভারতী চাবি খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল, আলো জ্বালিয়া চারিদিক সাবধানে নিরীক্ষণ করিল, তাহার পরে কোনমতে একটা শয্যা পাতিয়া লইয়া শুইয়া পড়িল। দেহ অবশ, মন অবসন্ন, তন্দ্রাতুর দুই চক্ষু শ্রান্তিতে মুদিয়া রহিল, কিন্তু কিছুতেই ঘুমাইতে পারিল না। ঘুরিয়া ফিরিয়া সব্যসাচীর এই কথাই তাহার বারংবার মনে হইতে লাগিল যে, এই পরিবর্তনশীল জগতে সত্যোপলব্ধি বলিয়া কোন নিত্যবস্তু নাই। তাহার জন্ম আছে, মৃত্যু আছে,—যুগে যুগে কালে

কালে মানবের প্রয়োজনে তাহাকে নূতন হইয়া আসিতে হয়। অতীতের সত্যকে বর্তমানে স্বীকার করিতেই হইবে এ বিশ্বাস ভ্রান্ত, এ ধারণা কুসংস্কার।

ভারতী মনে মনে বলিল, মানবের প্রয়োজনে, অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতার প্রয়োজনে নূতন সত্য সৃষ্টি করিয়া তোলাই ভারতবাসীর সব চেয়ে বড় সত্য। অর্থাৎ, ইহার কাছে কোন পন্থাই অসত্য নয়; কোন উপায়, কোন অভিসন্ধিই হেয় নয়। এই যে কারখানার কদাচারী কুলি-মজুরদের সৎপথে আনিবার উদ্যম, এই যে তাহাদের সন্তানদের বিদ্যাশিক্ষা দিবার আয়োজন, এই যে তাহাদের নৈশ বিদ্যালয়,—ইহার সমস্ত লক্ষ্যই আর কিছু—এ কথা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করিয়া লইতে সব্যসাচীর কোন দ্বিধা, কোন লজ্জা নাই। পরাধীন দেশের মুক্তিযাত্রায় আবার পথের বাচবিচার কি? একদিন সব্যসাচী বলিয়াছিলেন, পরাধীন দেশে শাসক এবং শাসিতের নৈতিক বুদ্ধি যখন এক হইয়া দাঁড়ায় তাহার চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর দেশের নাই, ভারতী! সেইদিন এ কথার তাৎপর্য সে বুঝিতে পারে নাই, আজ সে অর্থ তাহার কাছে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

ঘড়িতে তিনটা বাজিয়া গেল। ইহার পরে কখন যে তাহার চৈতন্য নিদ্রায় ও তন্দ্রায় আবিষ্ট হইয়া পড়িল তাহার মনে নাই, কিন্তু মনে পড়িল নিদ্রার ঘোরে সে বারবার আবৃত্তি করিয়াছে, দাদা, অতিমানুষ তুমি, তোমার পরে ভক্তি শ্রদ্ধা স্নেহ আমার চিরদিনই অচল হয়ে থাকবে, কিন্তু, তোমার এ বিচার-বুদ্ধি আমি কোনমতেই গ্রহণ করতে পারবে না।

জগদীশ্বর করুন, তোমার হাত দিয়েই যেন তিনি স্বদেশের মুক্তি দান করেন, কিন্তু, অন্যায়কে কখনও ন্যায়ের মূর্তি দিয়ে দাঁড় করিয়ো না। তুমি পরম পণ্ডিত, তোমার বুদ্ধির সীমা নেই, তর্কে তোমাকে এঁটে ওঠা যায় না,—তুমি সব পারো। বিদেশীর হাতে পরাধীনের লাঞ্ছনা যে কত, দুঃখের সমুদ্রে কত যে আমাদের প্রয়োজন, দেশের মেয়ে হয়ে সে কি আমি জানিনে দাদা? কিন্তু তাই

বলে প্রয়োজনকেই যদি সকলের শীর্ষে স্থান দিয়া দুর্বলচিত্ত মানবের কাছে অধর্মকেই ধর্ম বলে সৃষ্টি কর, এ দুঃখের আর কখনো তুমি অন্ত পাবে না।

পরদিন ভারতীর যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন বেলা হইয়াছে। ছেলেরা দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া ডাকাডাকি করিতেছে, সে তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুইয়া নীচে আসিয়া কবাট খুলিতেই জন-কয়েক ছাত্র ও ছাত্রী বই-শ্লেট লইয়া ভিতরে ঢুকিল। তাহাদের বসিতে বলিয়া ভারতী কাপড় ছাড়িতে উপরে যাইতেছিল, হোটেলের মালিক সরকার ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইল। কহিল, অপূর্ববাবু তোমাকে কাল রাত থেকে খুঁজছেন দিদি।

ভারতী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, রাত্রে এসেছিলেন?

ঠাকুরমহাশয় কহিল, হাঁ। আজও সকাল থেকে বসে আছেন, গিয়ে পাঠিয়ে দি গে?

ভারতীর মুখ পলকের জন্য শুষ্ক হইয়া উঠিল, কহিল, আমাকে তাঁর কি দরকার?

ব্রাহ্মণ বলিল, সে ত জানিনে দিদি। বোধ হয় তাঁর মায়ের অসুখের সম্বন্ধেই কিছু বলতে চান।

ভারতী হঠাৎ রুষ্ট হইয়া উঠিল, বলিল, কোথায় তাঁর মায়ের কি অসুখ হয়েছে তার আমি কি করব?

ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইল। অপূর্ববাবুকে সে ভাল করিয়াই চিনিত, তিনি পদস্থ ব্যক্তি, আগেকার দিনে এই গৃহে তাঁহার যত্ন এবং সমাদরের ত্রুটি ছিল না, সময়ে ও অসময়ে তাহার অনেক মালমশলা হোটেল হইতে তাহাকেই যোগাইয়া দিতে হইয়াছে। আজ অকস্মাৎ এই উত্তাপের সে হেতু বুঝিল না। কহিল, আমি ত সে-সব কিছু জানিনে দিদি, গিয়ে তাঁকে পাঠিয়ে দিচ্চি। এই বলিয়া সে যাইতে উদ্যত হইতেই ভারতী ডাকিয়া বলিল, সকালে আমার অনেক কাজ, ছেলে-মেয়েরা

এসেছে, তাদের পড়া বলে দিতে হবে, বলে দাও গে দেখা করবার এখন সময় হবে না।

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিল, তবে দুপুরে কি বৈকাল আসতে বলে দেব?

ভারতী কহিল, না, আমার সময় নেই। এই বলিয়া এ প্রস্তাব এইখানেই বন্ধ করিয়া দিয়া দ্রুতপদে উপরে চলিয়া গেল।

স্নান সারিয়া প্রস্তুত হইয়া যখন সে ঘণ্টা-খানেক পরে নীচে নামিয়া আসিল, তখন ছেলে-মেয়েতে ঘর ভরিয়া গিয়াছে ও তাহাদের বিদ্যালাভের ঐকান্তিক উদ্যমে সমস্ত পাড়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। পূর্বে দু'বেলাই পাঠশালা বসিত, এখন লোকের অভাবে নৈশ বিদ্যালয়টা প্রায় বন্ধ হইয়াই গিয়াছে; সুমিত্রা নাই, ডাক্তার আত্মগোপন করিয়াছেন, নবতারা অন্যত্র গিয়াছে, শুধু নিজের বাসা বলিয়া সকালবেলাটার কাজ ভারতী চালাইয়া লইতেছিল। প্রাত্যহিক নিয়মে আজও সে পড়াইতে বসিল, কিন্তু কিছুতেই মনঃসংযোগ করিতে পারিল না। পড়া দেওয়া এবং লওয়া আজ শুধু নিষ্ফল নয়, তাহার আত্মবঞ্চনা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তবুও কোনমতে এমনি করিয়া ঘণ্টা-দুই কাটিলে পড়ুয়ারা যখন গৃহে চলিয়া গেল, তখন কি করিয়া যে সে আজিকার সমস্ত দিন কাটাইবে তাহা কোনমতেই ভাবিয়া পাইল না। আর সকল ভাবনার মাঝে মাঝে আসিয়া অবিশ্রাম বাধা দিয়া যাইতে লাগিল অপূর্বর চিন্তা।

তাহাকে এভাবে প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে অশোভনতা যতই থাক, তাহাকে প্রশ্রয় দেওয়া যে ঢের মন্দ হইত এ বিষয়ে ভারতীর সন্দেহ ছিল না। কোন একটা অজুহাতে দেখা করিয়া সে পূর্বেকার অস্বাভাবিক সম্বন্ধটাকে আরও বিকৃত করিয়া তুলিতে চায়, না হইলে মায়ের অসুখ যদি, তবে সে এখানে বসিয়া করিতেছে কি? মা তাহার, ভারতীর নয়। তাঁহারই সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদে শয্যাপার্শ্বে ফিরিয়া যাওয়া যে পুত্রের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য তাহা কি পরের সহিত বিচার করিয়া স্থির করিতে হইবে? তাহার মনে পড়িল রোগের সম্বন্ধে

অপূর্বর নিদারুণ ভয়। তাহার কোমলচিত্ত বাহিরে হইতে ব্যথায় ব্যাকুল হইয়া যত ছটফটই করুক, রুগ্নের সেবা করিবার তাহার না আছে শক্তি, না আছে সাহস। এ ভার তাহার প্রতি ন্যস্ত করার মত সর্বনাশ আর নাই। এ সমস্তই ভারতী জানিত, সে ইহাও জানিত জননীকে অপূর্ব কতখানি ভালবাসে। মায়ের জন্য করিতে পারে না পৃথিবীতে এমন তাহার কিছু নাই। তাঁহারই কাছে না যাইতে পারার দুঃখ অপূর্বর কত, ইহাই কল্পনা করিয়া একদিকে যেমন তাহার করুণার উদয় হইল, অন্যদিকে এই অসহ্য ভীরুতার ক্রোধে তাহার সর্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল। ভারতী মনে মনে বলিল, শুশ্রূষা করিতে পারে না বলিয়াই কি পীড়িতা মায়ের কাছে গিয়া কোন লাভ নাই? এই উপদেশ আমার কাছে অপূর্ব প্রত্যাশা করে নাকি?

এমনি করিয়া এই দিক দিয়াই তাহার চিন্তার ধারা অবিশ্রাম প্রবাহিত হইতে লাগিল। মাতার অসুখের সম্বন্ধে অপূর্বর আর কিছু যে জিজ্ঞাস্য থাকিতে পারে, এ ছাড়া অন্য কিছু যে ঘটিতে পারে যাহা তাহার প্রত্যাবর্তনের পথ রুদ্ধ করিয়াছে, ইহার আভাস পর্যন্ত তাহার মাথায় প্রবেশ করিল না।

ক্ষুধার লেশমাত্র ছিল না বলিয়া আজ ভারতী রাঁধিবার চেষ্টা করিল না। বেলা যখন তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে, একখানা ঘোড়ার গাড়ি আসিয়া তাহার দ্বারে লাগিল। ভারতী উপরের জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া বিস্ময় ও শঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মোটঘাট গাড়ির ছাদে চাপাইয়া শশী আসিয়া উপস্থিত। গতরাত্রের হাসি-তামাশাকে জগতে যে কোন মানুষই এমন বাস্তবে পরিণত করিয়া তুলিতে পারে, ভারতী বোধ হয় তাহা কল্পনা করিতেও পারিত না। কিন্তু ইহার কাছে অভাবনীয় কিছু নাই। রহস্য একেবারে মূর্তিমান সত্যরূপে সশরীরে আসিয়া হাজির হইল।

ভারতী দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গিয়া কহিল, একি ব্যাপার শশিবাবু? শশী স্মিতমুখে কহিল, বাসা তুলে দিয়ে এলাম। এবং তৎক্ষণাৎ গাড়োয়ানকে হুকুম করিয়া দিল, সমান সব কুছ্ উপরমে লে যাও—

ভারতী বিরক্তি দমন করিয়া কহিল, উপরে জায়গা কোথায় শশিবাবু?

শশী কহিল, আচ্ছা বেশ, তাহলে নীচের ঘরেই রাখুক।

ভারতী বলিল, নীচের ঘরে পাঠশালা, সেখানেও সুবিধে হবে না।

শশী চিন্তিত হইয়া উঠিল। ভারতী তাহাকে ভরসা দিয়া কহিল, এক কাজ করা যাক শশীবাবু। হোটেলে ডাক্তারের ঘরটা ত আজও খালি পড়ে আছে, আপনি সেখানেই বেশ থাকবেন। খাওয়া-দাওয়ারও কষ্ট হবে না, চলুন।

কিন্তু ঘরের ভাড়া লাগবে ত?

ভারতী হাসিয়া ফেলিল, কহিল, না, তাও লাগবে না, ছ মাসের ভাড়া দাদা দিয়ে গেছেন।

শশী খুশী না হইলেও এই ব্যবস্থায় রাজী হইল। সমস্ত জিনিসপত্র-সমেত দাদাঠাকুরের হোটেলের মধ্যে কবিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভারতী যখন ফিরিয়া আসিল তখন রাত্রি হইয়াছে। আজ সকল দিক দিয়া তাহার শ্রান্তি ও চিন্তার আর অবধি ছিল না, পাছে শশী কিংবা আর কেহ আসিয়া তাহার নিঃসঙ্গ স্তব্ধতায় বিঘ্ন ঘটায় এই আশঙ্কায় সে নীচের ও উপরের সমস্ত দরজা-জানালা রুদ্ধ করিয়া দিয়া নিজের শোবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

অভ্যাসমত পরদিন প্রত্যূষে যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল তখন অনাহারের দুর্বলতায় সমস্ত শরীর এমনি অবসন্ন যে শয্যাত্যাগ করিতেও ক্লেশ বোধ হইল। তৃষ্ণায় বুকের মধ্যেটা শুকাইয়া মরুভূমি হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং দেহ-ধারণের এ দিকটায় অবহেলা করিলে আর চলিবে না, তাহা সে বুঝিল।

খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করিয়াও যে ভারতী খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে সত্যই বাচবিচার করিয়া চলিত, এ কথা বলিলে তাহার প্রতি অবিচার করা হয়। তথাপি,

মনে হয় সে সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত হইতেও পারে নাই। যে ব্যক্তিকে তাহার জননী বিবাহ করিয়াছিলেন, সে অত্যন্ত অনাচারী ছিল, তাহার সহিত একত্রে বসিয়াই ভারতীকে ভোজন করিতে হইত, তাই বলিয়া পূর্বেকার দিনের অখাদ্য-বস্তু কোনদিনও তাহার খাদ্য হইয়া উঠে নাই। ছোঁয়াছোঁয়ির বিড়ম্বনা তাহার ছিল না, কিন্তু যেখানে-সেখানে যাহার-তাহার হাতে খাইতেও তাহার অত্যন্ত ঘৃণা বোধ হইত। মায়ের মৃত্যুর পরে হইতে সে খরচের দোহাই দিয়া বরাবর নিজে রাঁধিয়াই খাইত। শুধু অসুস্থ হইয়া পড়িলে, বা কাজের ভিড়ে অতিশয় ক্লান্তি বা একান্ত সময়াভাব ঘটিলেই, কদাচিৎ কখনও ঠাকুর-মহাশয়ের হোটেল হইতে সাগু বার্লি বা রুটি আনাইয়া খাইত! বিছানা হইতে উঠিয়া সে হাত-মুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া অন্যান্য দিনের ন্যায় প্রস্তুত হইল, কিন্তু রান্না করিয়া লইবার মত জোর বা প্রবৃত্তি আজ তাহার ছিল না, তাই হোটেল হইতে রুটি ও কিছু তরকারি তৈরি করিয়া দিবার জন্য ঠাকুর-মহাশয়কে খবর পাঠাইল। সোমবারে তাহাদের পাঠশালা বন্ধ থাকিত বলিয়া আজ এ দিকের পরিশ্রম তাহার ছিল না।

অনেক বেলায় ঝি খাবারের থালা হাতে করিয়া আনিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া কহিল, বড্ড বেলা হয়ে গেল দিদিমণি—

ভারতী তাহার নিজের থালা ও বাটি আনিয়া টেবিলের উপরে রাখিল। হিন্দু হোটেলের শুচিতা রক্ষা করিয়া ঝি দূর হইতে সেই পাত্রে রুটি ও তরকারি এবং বাটিতে ডাল ঢালিয়া দিতে দিতে কহিল, নাও বসো, যা পারো দুটো মুখে দাও।

ভারতী তাহার মুখের প্রতি একবার চাহিয়া দেখিল, কিছু বলিল না। ঝির বক্তব্য তখনও শেষ হয় নাই, সে বলিতে লাগিল, ওখান থেকে ফিরে এসে শুনি তোমার অসুখ। একলা হাতে তখন থেকে ধড়ফড় করে মরচি দিদিমণি, কিন্তু এমন কেউ নেই যে দুখানা রুটি বেলে দেয়। আর দেরি করো না দিদি, বসো।

ভারতী মৃদুকণ্ঠে কহিল, তুমি যাও ঝি, আমি বসচি।

ঝি কহিল, যাই। চাকরটা ত সঙ্গে গেল, একলা সমস্ত ধোয়া মাজা,—যাহোক, ফিরে এসে কুড়িটি টাকা আমার হাতে দিয়ে বাবু কেঁদে ফেলে বললেন, ঝি, শেষ সময়ে তুমি যা করলে, মার মেয়ে কাছে থাকলে এমন করতে পারতো না। তিনিও যত কাঁদেন আমিও তত কাঁদি, দিদিমণি! আহা, কি কষ্ট! বিদেশ-বিভুঁই, কেউ নেই আপনার লোক কাছে,—সুমুদ্দুর পথ, টেলিগ্রাফ করলেই ত আর বউ-ব্যাটা উড়ে আসতে পারে না—তাদেরই বা দোষ কি ?

ভারতীর বুকের ভিতরটা উদ্বেগ ও অজানা আশঙ্কায় হিম হইয়া উঠিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিতে না পারিয়া শুধু স্থির হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ঝি বলিতে লাগিল, ঠাকুরমশাই ডেকে বললেন, বাবুর মায়ের বড় ব্যামো, তোমাকে যেতে হবে ক্ষান্ত। আমি আর না বলতে পারলুম না। একে নিমোনিয়া রুগী, তাতে ধর্মশালার ভিড়, জানালা-কবাট সব ভাঙ্গা, একটাও বন্ধ হয় না—কি আতান্তর! মারা গেলেন বেলা পাঁচটার সময়, কিন্তু মেসের বাবুদের সব খবর দিতে, ডাকতে হাঁকতে, মড়া উঠলো সেই দুটো-আড়াইটে রাতে। ফিরে আসতে তাঁদের বেলা হল,—একলাটি সমস্ত ধোয়া মোছা—

এইবার ভারতীর বুঝিতে আর কিছু বাকী রহিল না। ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, অপূর্ববাবুর মা মারা গেলেন বুঝি?

ঝি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ দিদিমণি, তাঁর বর্মায় যেন মাটি কেনা ছিল। সেই যে কথায় কি বলে, লা ভাড়া করে যায় সেখানে—এ ঠিক তাই। অপূর্ববাবুও এখান থেকে বেরিয়েছেন, তিনিও ব্যাটার সঙ্গে ঝগড়া করে সেখানে জাহাজে উঠেছেন, সঙ্গে কেবল একজন চাকর। জাহাজেই জ্বর, ধর্মশালায় নেমে একবারে অজ্ঞান অচৈতন্য। বাড়িতে পা দিয়েই বাবু ফিরতি জাহাজে ফিরে এসে দেখেন মা যায়-যায়। গেলেনও তাই,—কিন্তু দাঁড়িয়ে এক দণ্ড কথা কবার জো নেই

দিদিমণি, এখনি সবাই আবার বার হবে। আসবো তখন সন্ধ্যাবেলায়,—এই বলিয়া সে গল্প করার প্রলোভন সংবরণ করিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

রুটির থালা তেমনি পড়িয়া রহিল, প্রথমে দুই চক্ষু তাহার ঝাপসা হইয়া উঠিল, তাহার পরে বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা গণ্ড বাহিয়া ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। অপূর্ব্বর মাকে সে দেখেও নাই, এবং স্বামী-পুত্র লইয়া এ জীবনে তিনি অনেক দুঃখ পাইয়াছেন—এ ছাড়া তাঁহার সম্বন্ধে সে বিশেষ কিছু জানিতও না, কিন্তু কতদিন নিজের নিরালা ঘরের মধ্যে সে রাত্রি জাগিয়া এই বর্ষীয়সী বিধবা রমণীর সম্বন্ধে কত কল্পনাই না করিয়াছে! সুখের মাঝে নয়, দুঃখের দিনে কখনো যদি দেখা হয়, যখন সে ছাড়া আর কেহ তাঁহার কাছে নাই, তখন ক্রীশ্চান বলিয়া কেমন করিয়া তাহাকে তিনি দূরে সরাইয়া দিতে পারেন—এ কথা জানিবার তাহার ভারী সাধ ছিল। বড় সাধ ছিল দুর্দ্দিনের সেই অগ্নিপরীক্ষায় আপন-পর সমস্যার সে শেষ সমাধান করিয়া লইবে। ধর্ম্মমতভেদই এ জগতে মানুষের চরম বিচ্ছেদ কি না, এই সত্য যাচাই করিবার সেই পরম দুঃসময়ই ভাগ্যে তাহার আসিয়াছিল, কিন্তু সে গ্রহণ করিতে পারে নাই। এ রহস্য এ জীবনে অমীমাংসিতই রহিয়া গেল!

আর, অপূর্ব! সে যে আজ কত বড় নিঃসহায়, কতখানি একা, ভারতীর অপেক্ষা তাহা কে বেশী জানে? হয়ত, মাতার একান্ত মনের আশীর্বাদই তাহাকে কবচের মত অদ্যাবধি রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, আজ তাহা অন্তর্হিত হইল। ভারতী মনে মনে বলিল, এ-সকল তাহার আকাশকুসুম, তাহার নিগূঢ় হৃদয়ের স্বপ্ন-রচনা বৈ আর কিছু নয়, তবু যে সেই স্বপ্ন তাহার নির্দ্দেশহীন ভবিষ্যতের কতখানি স্নিগ্ধ-শ্যাম-শোভায় অপরূপ করিয়া রাখিত সে ছাড়া এ কথাই বা আর কে জানে? কে জানে তাহার চেয়ে বেশী, ঘরে-বাহিরে অপূর্ব আজ কিরূপ নিরুপায়, কতখানি সঙ্গিহীন!

এই প্রবাসভূমে হয়ত অপূর্বর কর্ম নাই, হয়ত আত্মীয়-স্বজন তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে, ভীরু লোভী নীচাশয় বলিয়া বন্ধুজনমধ্যে সে নিন্দিত,—আর সকল দুঃখের বড় দুঃখ মা আজ তাহার লোকান্তরিত। ভারতীর মনে হইল, পরিচিত কাহারও কাছে অপূর্ব লজ্জায় যাইতে পারে নাই বলিয়াই বোধ হয় সকল লজ্জা বিসর্জন দিয়া সে বারবার তাহারই কাছে ছুটিয়া আসিয়াছিল।

উদ্যমের পটুতা, ব্যবস্থার শৃঙ্খলা, কার্যের তৎপরতা কিছুই তাহার নাই, অথচ, অতিথিশালার অসহ্য জনতা ও কোলাহল, এবং সর্ববিধ অভাব ও অসুবিধার মধ্যে সেই মায়ের মৃত্যু যখন আসন্ন হইয়া আসিয়াছে, তখন একাকী কি করিয়া যে তাহার মুহূর্তগুলি কাটিয়াছে এই কথা কল্পনা করিয়া চোখের জল তাহার যেন থামিতে চাহিল না। চোখ মুছিতে মুছিতে যে কথা তাহার বহুবার মনে হইয়াছে, সেই কথাই স্মরণ হইল, যেন সকল দুঃখের সূত্রপাত অপূর্বর তাহার সহিত পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই জন্ম লইয়াছে। না হইলে, পিতা ও অগ্রজের উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিকূলে যখন সে মাতার পক্ষ অবলম্বন করিয়া শতেক দুঃখ সহিয়াছে তখন স্বার্থবুদ্ধি তাহাকে সত্যপথ-ভ্রষ্ট করে নাই কেন? দুর্বলতা তখন ছিল কোথায়? স্বধর্মাচরণে আস্থা ও প্রগাঢ় নিষ্ঠা,—সমস্তই যাহার মায়ের মুখ চাহিয়া, সে কি সত্যই এমনি ক্ষুদ্রাশয়? তাহার পূজা-অর্চনা, তাহার গঙ্গাস্নান, তাহার টিকি রাখা,—তাহার সকল কার্য, সকল অনুষ্ঠান—হোক না ভ্রান্ত, হোক না মিথ্যা, তবু ত সে সকল বিদ্রূপ, সকল আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া অটল হইয়া ছিল! এ কি অপূর্বর অস্থিরচিত্ততার এত বড়ই নিদর্শন? আজ তবে সেই লোক বর্মায় আসিয়া এমন হইয়া গেল কিরূপে? এবং এতকাল এতখানি দুর্বলতা তাহার লুকানো ছিল কোনখানে? সব্যসাচীর কাছে উত্তর জানিতে গিয়া কতদিন এই প্রশ্নই তাহার মুখে বাধিয়া গিয়াছে। শুধু ত কৌতূহলবশেই নয়, হৃদয়ের ব্যথার মধ্যে দিয়াই সে কতবার ভাবিয়াছে, এ সংসারে যাহা কিছু জানা যায় দাদা ত সমস্তই

জানেন, তবে এ সমস্যারও উচ্ছেদ তিনিই করিয়া দিবেন। কেবল সঙ্কোচ ও শরমেই সে অপূর্বর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে পারে নাই।

ভাবিতে ভাবিতে সহসা নূতন প্রশ্ন তাহার মনে আসিল। কর্মদোষে যখন সবাই অপূর্বর প্রতি বিরূপ, তখনও শুদ্ধমাত্র যে লোকটির সহানুভূতি হইতে সে বঞ্চিত হয় নাই,—সে সব্যসাচী। কিন্তু, কিসের জন্য? শুধু কি কেবল ভগিনী বলিয়া তাহারই সমবেদনায়? তাঁহার স্নেহ পাইবার মত নিজস্ব কি অপূর্বর কিছুই ছিল না? সত্য সত্যই কি ভারতী এত ক্ষুদ্রেই এত বৃহৎ ভালবাসা সমর্পণ করিয়া বসিয়াছে! সে দুর্দিনে সতর্ক করিবার মত পুঁজি কি কিছুই তাহার ছিল না? হৃদয় কি তাহার এমনি কাঙাল, এমনি দেউলিয়া হইয়াই ছিল!

এমনি করিয়া একভাবে বসিয়া ঘণ্টা-দুই সময় যখন কোথা দিয়া কাটিয়া গিয়াছে, ঝি ফিরিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন হোটেলের জরুরী কাজের মধ্যে সমস্ত আলোচনা নিঃশেষ করিয়া যাইবার তাহার অবসর ছিল না, এখন একটুখানি ছুটি পাইয়াছে। অপূর্ব ও ভারতীর মাঝখানে যে একটি রহস্যময় মধুর সম্বন্ধ আছে তাহা আভাসে-ইঙ্গিতে অনেকেই জানিত, ঝিরও অবিদিত ছিল না। তবে, সহসা এমন কি ঘটিল যাহাতে অপূর্বর এতবড় বিপদের দিনেও ভারতী তাহার ছায়া-স্পর্শ করিল না? স্ত্রীলোক হইয়া এতবড় সংবাদটা না জানা পর্যন্ত ক্ষান্তর মুখে অন্ন-জল রুচিতেছিল না। তাই সে কোন একটা অছিলায় উপস্থিত হইয়া প্রথমে অবাক হইল, পরে কহিল, কিছুই ত ছোঁওনি দেখচি।

ভারতী লজ্জা পাইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া বলিল, না!

ঝি মাথা নাড়িয়া কণ্ঠস্বর করুণ করিয়া কহিল, খাওয়া যায় না, দিদিমণি, যে কাণ্ড চোখে দেখে এলুম। বিশ্বাস না হয় গিয়ে দেখবে চল, ভাতের থালা আমার যেমন তেমনি পড়ে রয়েছে,—মুখ দিয়েছি কি না দিয়েছি।

ইহার অবাঞ্ছিত সমবেদনায় ভারতীর সঙ্কোচের অবধি রহিল না। জোর করিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, কাউকে দিয়ে একখানা গাড়ি ডাকিয়ে দাও না ঝি।

যাবে বুঝি?

হাঁ, একবার দেখি গিয়ে কি হল।

ক্ষান্ত বলিল, আজ সকালে ঠাকুরমশায়কে কি সাধ্যি-সাধনা! আমি শুনে বলি সে কি কথা! মানুষের আপদে-বিপদে করব না ত করব কবে? হাতের কাজ পড়ে রইল, যেমন ছিলুম, তেমনি বেরিয়ে পড়লুম। ভাগ্যি তবু—

সেই-সমস্ত পুনরাবৃত্তির আশঙ্কায় ভারতী ব্যস্ত হইয়া উঠিল। বাধা দিয়া কহিল, তুমি অসময়ে যা করেছ তার তুলনা নেই। কিন্তু, আর দেরি কর না ঝি, গাড়ি একখানা আনিয়ে দাও। আমার যেতে হলে একটু বেলাবেলি যাওয়াই ভাল। ঘরের কাজকর্ম ততক্ষণ সেরে রাখি।

ঝি লোক মন্দ নয়। সে গাড়ি ডাকিতে গেল, এবং দুঃসময়ে সাহায্য করিবার আগ্রহে এমন কথাও জানাইল যে, ঘরের কাজকর্ম আজ না হয় সে-ই করিয়া দিবে। এমন কি খাবার জিনিসগুলো যখন ছোঁয়া যায় নাই, তখন তাহাও পরিষ্কার করিয়া দিতে তাহার বাধা নাই। শেষে কাপড় ছাড়িয়া গঙ্গাজল মাথায় দিলেই চলিবে। বিদেশ-বিভুঁয়ে এমন করিতেই হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মিনিট-পনেরো পরে গাড়ি আসিয়া পৌঁছিলে ভারতী সঙ্গে কিছু টাকা লইয়া ঘরে-দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। পান্থশালায় আসিয়া যখন উপস্থিত হইল, তখনও বেলা আছে। দ্বিতলের একখানা উত্তর ধারের ঘর দেখাইয়া দিয়া হিন্দুস্থানী দরোয়ান জানাইয়া দিল যে, বাঙালী বাবু ভিতরেই আছেন; এবং বাঙালী রমণীর কাছে বাংলা ভাষাতেই প্রকাশ করিয়া জানাইল যে, যেহেতু তিন দিনের বেশী থাকার রুল নাই, অথচ ছয় দিন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তখন ম্যানিজর্ সাবের লুটীশ হইলে তাহার নোক্রিতে বহুত গুলমাল হইয়া যাইবে।

ভারতী ইঙ্গিত বুঝিল। অঞ্চল খুলিয়া গুটি-দুই টাকা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া তাহারই নির্দেশমত উপরের ঘরে আসিয়া দেখিল, সমস্ত মেঝেটা তখনও জলে থৈথৈ করিতেছে, জিনিসপত্র চারিদিকে ছড়ানো, এবং তাহারই একধারে একখানা কম্বলের উপরে অপূর্ব উপুড় হইয়া পড়িয়া। নূতন উত্তরীয় বস্ত্রখানা মুখের উপর চাপা দেওয়া,—সে জাগিয়া আছে কিংবা ঘুমাইতেছে তাহা বুঝা গেল না। ভারতী শুনিয়াছিল সঙ্গে চাকর আসিয়াছে, কিন্তু কাছাকাছি কোথাও সে ছিল না, কারণ, অপরিচিত তাহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কেহ নিষেধ করিল না। মিনিট পাঁচ-ছয় স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া ভারতী ধীরে ধীরে ডাকিল, অপূর্ববাবু!

অপূর্ব উঠিয়া বসিয়া তাহার মুখের দিকে একবার চাহিল, তারপরে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া ক্ষণকাল নিঃশব্দ স্থিরভাবে থাকিয়া চোখ তুলিয়া সোজা হইয়া বসিল। সদ্যমাতৃ-বিয়োগের সীমাহীন বেদনা তাহার মুখের উপরে জমাট হইয়া বসিয়াছে, কিন্তু, আবেগের চাঞ্চল্য নাই,—শোকাচ্ছন্ন গভীর দৃষ্টির সম্মুখে এ পৃথিবীর সমস্ত কিছুই যেন তাহার একেবারে মিথ্যা হইয়া গেছে। মাতার পক্ষপুটচ্ছায়াবাসী যে অপূর্বকে একদিন সে চিনিয়াছিল, এ সে মানুষ নয়। আজ তাহাকে মুখোমুখি দেখিয়া ভারতী বিস্ময়ে এমনি অবাক হইয়া রহিল যে, কোন্ কথা বলিবে, কি বলিয়া ডাকিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু ইহার মীমাংসা করিয়া দিল অপূর্ব নিজে। সে-ই কথা কহিল, বলিল, এখানে বসবার কিছু নেই, ভারতী, সমস্তই ভিজে, তুমি বরঞ্চ ঐ তোরঙ্গটার উপরে বস।

ভারতী উত্তর দিল না, কবাটের চৌকাঠ ধরিয়া নতনেত্রে যেমন দাঁড়াইয়া ছিল তেমনি স্থির হইয়া রহিল। তাহার পরে বহুক্ষণ অবধি দুজনের কেহই কোন কথা কহিতে পারিল না।

হিন্দুস্থানী চাকরটা তেল কিনিতে দোকানে গিয়াছিল, সে ঘরে ঢুকিয়া প্রথমে বিস্মিত হইল, পরে হারিকেন লণ্ঠনটা তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।

অপূর্ব কহিল, ভারতী, বস।

ভারতী বলিল, বেলা নেই, বসলে সন্ধ্যে হয়ে যাবে যে!

এখখুনি যাবে? একটুও বসতে পারবে না?

ভারতী ধীরে ধীরে গিয়া সেই তোরঙ্গটার উপরে বসিয়া একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া বলিল, মা যে এখানে এসেছিলেন আমি জানতাম না। তাঁকে দেখিনি, কিন্তু বুকের ভেতরটা আমার পুড়ে যাচ্চে। এ নিয়ে তুমি আমাকে আর দুঃখ দিয়ো না। বলিতে বলিতে চোখ দিয়া তাহার জল গড়াইয়া পড়িল।

অপূর্ব স্তব্ধ হইয়া রহিল। ভারতী অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া কহিল, সময় হয়েছিল, মা স্বর্গে গেছেন। প্রথমে মনে হয়েছিল, এ জন্মে তোমাকে আর আমি মুখ দেখাতে পারবো না, কিন্তু এমন করে তোমাকে ফেলে রেখেই বা আমি থাকবো কি করে? সঙ্গে গাড়ি আছে, ওঠো, আমার বাসায় চল। আবার তাহার চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইয়া উঠিল।

ভারতীর ভয় ছিল অপূর্ব হয়ত শেষ পর্যন্ত ভাঙ্গিয়া পড়িবে, কিন্তু তাহার শুষ্ক চক্ষে জলের আভাস পর্যন্ত দেখা দিল না, শান্তস্বরে কহিল, অশৌচের অনেক হাঙ্গামা ভারতী, ওখানে সুবিধে হবে না। তাছাড়া এই শনিবারের স্টিমারেই আমি বাড়ি ফিরে যাবো।

ভারতী বলিল, শনিবারের এখনো চার দিন দেরি। মায়ের মৃত্যুর পরে হাঙ্গামা যে একটু থাকে সে আমি জানি, কিন্তু সইতে পারবো না আমি, আর পারবে এই অতিথিশালার লোকে? চল।

অপূর্ব মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

ভারতী কহিল, না বললেই যদি এই অবস্থায় ফেলে রেখে তোমাকে যেতে পারতাম, আমি আসতাম না, অপূর্ববাবু। এই বলিয়া সে একমুহূর্ত নিঃশব্দে থাকিয়া কহিল, এতদিনের পরে তোমাকে ঢেকে বলবার, লজ্জা করে বলবার আর আমার কিছুই নেই। মায়ের শেষ কাজ বাকী—শনিবারের জাহাজে তোমাকে বাড়ি

ফিরে যেতেই হবে এবং তার পরে যে কি হবে সেও আমি জানি। তোমার কোন ব্যবস্থাতেই আমি বাধা দেব না, কিন্তু এ সময়ে এ কটা দিনও যদি তোমাকে চোখের ওপর না রাখতে পারি ত তোমারই দিব্যি করে বলচি, বাসায় ফিরে গিয়ে আজ আমি বিষ খেয়ে মরবো। মায়ের শোক তাতে বাড়বে বৈ কমবে না, অপূর্ববাবু।

অপূর্ব অধোমুখে মিনিট-দুই চুপ করিয়া রহিল, তাহার পরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, চাকরটাকে তাহলে ডাকো, জিনিসপত্রগুলো সব বেঁধে ফেলুক।

জিনিসপত্র সামান্যই ছিল, গুছাইয়া বাঁধিয়া গাড়িতে তুলিতে আধ-ঘণ্টার অধিক সময় লাগিল না। পথের মধ্যে ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, দাদা আসতে পারলেন না?

অপূর্ব কহিল, না, তাঁর ছুটি হলো না।

এখানকার চাকরি কি ছেড়ে দিয়েছ?

হাঁ, সে একরকম ছেড়েই দেওয়া।

মা'র কাজকর্ম চুকে গেলে কি এখন বাড়িতেই থাকবে?

অপূর্ব কহিল, না। মা নেই, প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা দিনও ও-বাড়িতে আমি থাকতে পারবো না। শুনিয়া ভারতীর মুখ দিয়া শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

ত্রিশ

পরিত্যক্ত, পতনোন্মুখ, ঘন-বনাচ্ছন্ন যে জীর্ণ মঠের মধ্যে একদিন অপূর্বর অপরাধের বিচার হইয়াছিল, আজ আবার সেই কক্ষেই পথের-দাবী আহূত হইয়াছে। সেদিনের সেই অবরুদ্ধ গৃহতলে যে দুর্জয় ক্রোধ ও নির্মম প্রতিহিংসার অগ্নি দাউদাউ করিয়া জ্বলিয়াছিল, আজ তাহার স্ফুলিঙ্গমাত্র নাই। সে বাদী নাই, প্রতিবাদী নাই, কাহারো বিরুদ্ধে কাহারো নালিশ নাই, আজ শঙ্কা ও নৈরাশ্যের দুঃসহ বেদনায় সমস্ত সভা নিষ্প্রভ, বিষণ্ণ, ম্রিয়মাণ। ভারতীর চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু,—সুমিত্রা অধোমুখে নীরব, স্থির। তলওয়ারকর ধরা পড়িয়াছে; রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষতদেহে সে জেলের হাসপাতালে,—আজও তাহার ভাল করিয়া জ্ঞান হয় নাই। তাহার স্ত্রী শিশুকন্যা লইয়া পথে পথে ঘুরিয়া অনেক দুঃখে কাল সন্ধ্যায় কে একজন মারহাট্টি ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় পাইয়াছে। সুমিত্রা সন্ধান লইয়া তাহার পিতৃগৃহে আজ তার করিয়াছে কিন্তু এখনও জবাব আসে নাই।

ভারতী ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, তলওয়ারকর-বাবুর কি হবে দাদা?

ডাক্তার কহিলেন, হাসপাতাল থেকে যদি বেঁচে ওঠে, জেল খাটবে।

ভারতী মনে মনে শিহরিয়া উঠিল, বলিল, না বাঁচতেও ত পারেন?

ডাক্তার কহিলেন, অন্ততঃ অসম্ভব নয়। তারপরে সুদীর্ঘ কারাবাস।

ভারতী ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল, তাঁর স্ত্রী, তাঁর ছোট্টমেয়ে,—তাদের কি হবে?

সুমিত্রা এ কথার জবাব দিয়া কহিল, হয়ত দেশ থেকে তাঁর বাপ এসে নিয়ে যাবেন।

ভারতী বলিল, হয়ত! ধরুন, যদি কেউ না আসেন? যদি কেউ না থাকে?

ডাক্তার হাসিলেন, বলিলেন, বিচিত্র নয়। সেক্ষেত্রে মানুষ অকস্মাৎ মারা গেলে তার নিরুপায় বিধবার যে দশা হয়, এদেরও তাই হবে। একটুখানি থামিয়া কহিলেন, আমরা গৃহী নই, আমাদের ধনসম্পদ নেই, বিদেশীর আইনে নিজের জন্মভূমিতেও আমাদের মাথা রাখবার ঠাঁই নেই,—বন্য পশুর মত আমরা বনে-জঙ্গলে লুকিয়ে বেড়াই,—সংসারীর দুঃখ মোচন করবার ত আমাদের শক্তি নেই ভারতী।

ভারতী ব্যথিত হইয়া কহিল, তোমাদের নেই, কিন্তু যাঁদের এ-সব আছে,—আমাদের এই দেশের লোকে কি এঁদের দুঃখ দূর করতে পারে না দাদা?

ডাক্তার ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, কিন্তু করবে কেন দিদি? তারা ত এ কাজ করতে আমাদের বলে না! বরঞ্চ আমরা তাদের স্বস্তির বাধা, আরামের অন্তরায়,—আমাদের তারা সোনার চক্ষে দেখে না। ইংরাজ যখন দম্ভভরে প্রচার করে, ভারতবর্ষীয়েরা স্বাধীনতা চায় না, পরাধীনতাই কামনা করে, তখন ত তারা নেহাত মিথ্যে বলে না! আর যুগ-যুগান্তের অন্ধকারের মধ্যে বসে দু চোখের দৃষ্টি যাদের বন্ধ হয়ে গেছে, তাদের বিরুদ্ধেই বা হাহুতাশ করবার কি আছে ভারতী!

মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, বিদেশী রাজার জেলের মধ্যে যদি আজ তলওয়ারকরকে মরতেই হয়, পরলোকে দাঁড়িয়ে স্ত্রী-কন্যাকে পথে পথে ভিক্ষে করতে দেখে চোখ দিয়ে তার জল গড়িয়ে পড়বে, কিন্তু নিশ্চয় জেনো, দেশের লোকের বিরুদ্ধে সে ভগবানের কাছেও কখনো একটা নালিশ জানাবে না। আমি তাকে চিনি, লজ্জায় তার মুখ ফুটবে না।

ভারতী অস্ফুটে কহিল, উঃ!

কৃষ্ণ আইয়ার বাংলা বলিতে পারিত না, কিন্তু, মাঝে মাঝে বুঝিত; সে ঘাড় নাড়িয়া শুধু কহিল, ইয়েস্, ট্রু!

ডাক্তার বলিলেন, হাঁ, এই ত সত্য! এই ত বিপ্লবীর চরম শিক্ষা! কান্না কার তরে? নালিশ কার কাছে? দাদার যদি ফাঁসি হয়েছে শোনো, জেনো,

বিদেশীর হুকুমে সে ফাঁসি তার দেশের লোকেই তার গলায় বেঁধে দিয়েছে! দেবেই ত! কসাইখানা থেকে গরুর মাংস গরুতেই ত বয়ে নিয়ে আসে? তার আবার নালিশ কিসের বোন?

ভারতী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, দাদা, এই ত তোমাদের পরিণাম!

ডাক্তারের চোখ জ্বলিয়া উঠিল, কহিলেন, একি তুচ্ছ পরিণাম ভারতী? জানি, দেশের লোকে এর দাম বুঝবে না, হয়ত উপহাসও করবে, কিন্তু যাকে এই ঋণ একদিন কড়ায় গণ্ডায় শোধ দিতে হবে, হাসি তার মুখে কিন্তু সহজে যোগাবে না। এই বলিয়া সহসা নিজেই হাসিয়া কহিলেন, ভারতী, নিজে ক্রীশ্চান হয়ে তুমি তোমার ধর্মের গোড়ার কথাটাই ভুলে গেলে? যিশুখ্রীষ্টের রক্তপাত কি সংসারে ব্যর্থই হয়েছে ভাবো?

সকলেই স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, ডাক্তার পুনশ্চ কহিলেন, তোমরা ত জানো বৃথা নরহত্যার আমি কোনদিন পক্ষপাতী নই, ও আমি সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি। নিজের হাতে আমি একটা পিঁপড়ে মারতেও পারিনে। কিন্তু প্রয়োজন হলে,—কি বল সুমিত্রা?

সুমিত্রা সায় দিয়া বলিল, সে আমি জানি, নিজের চোখেই ত আমি বার-দুই দেখেচি।

ডাক্তার কহিলেন, দূর থেকে এসে যারা জন্মভূমি আমার অধিকার করেছে, আমার মনুষ্যত্ব, আমার মর্যাদা, আমার ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল,—সমস্ত যে কেড়ে নিলে, তারই রইল আমাকে হত্যা করবার অধিকার, আর রইল না আমার? এই ধর্মবুদ্ধি তুমি কোথায় পেলে ভারতী? ছি!

কিন্তু আজ ভারতী অভিভূত হইল না, সে প্রবলবেগে মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিল, না দাদা, আজকে আমাকে তুমি কিছুতেই লজ্জা দিতে পারবে না। এ-সব পুরানো কথা,—হিংসার পথে যারাই প্রবৃত্তি দেয়, তারাই এমনি করে বলে। এই শেষ কথা নয়, জগতে এর চেয়েও বড়, ঢের বড় কথা আছে।

ডাক্তার কহিলেন, কি আছে বল শুনি?

ভারতী উচ্ছ্বসিতস্বরে বলিয়া উঠিল, আমি জানিনে, কিন্তু তুমি জানো। যে বিদ্বেষ তোমার সত্যবুদ্ধিকে এমন একান্তভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, একবার তাকে ত্যাগ করে শান্তির পথে ফিরে এসো, তোমার জ্ঞান, তোমার প্রতিভার কাছে পরাস্ত মানবে না এমন সমস্যা পৃথিবীতে নেই। জোরের বিরুদ্ধে জোর, হিংসার বদলে হিংসা, অত্যাচারের পরিবর্তে অত্যাচার এ তো বর্বরতার দিন থেকেই চলে আসচে। এর চেয়ে মহৎ কিছু কি বলা যায় না?

কে বলবে?

ভারতী অকুণ্ঠিতস্বরে কহিল, তুমি।

ঐটি আমাকে মাপ করতে হবে ভাই। সাহেবের বুটের তলায় চিত হয়ে শুয়ে শান্তির বাণী আমার মুখ দিয়ে ঠিক বার হবে না,—হয়ত আটকাবে। বরঞ্চ ও ভার শশীকে দাও, তোমার খাতিরে ও পারবে। এই বলিয়া ডাক্তার হাসিলেন।

ভারতী ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, তুমি ঠাট্টা করলে বটে, কিন্তু যাঁদের পরে তোমার এত বিদ্বেষ, সেই ইংরেজ মিশনারীদেরই অনেকের কাছে বলে দেখেচি তাঁরা সত্যই আনন্দলাভ করেন।

ডাক্তার স্বীকার করিয়া কহিলেন, অত্যন্ত স্বাভাবিক ভারতী। সুন্দরবনের মধ্যে নিরস্ত্র দাঁড়িয়ে শান্তির বাণী প্রচার করলে বাঘ-ভালুকের খুশী হবারই কথা। তাঁরা সাধু ব্যক্তি।

ভারতী এই বিদ্রূপে কান দিল না, কহিতে লাগিল, আজ ভারতের যত দুর্ভাগ্যই আসুক, চিরদিন এমন ছিল না। একদিন ভারতবাসী সভ্যতার উচ্চশিখরে আরোহণ করেছিল। সেদিন হিংসা বিদ্বেষ নয়, ধর্ম এবং শান্তিমন্ত্রই এই ভারতবর্ষ থেকে দিকে দিকে প্রচারিত হয়েছিল। আমার বিশ্বাস সেদিন আবার আমাদের ফিরে আসবে।

বহুক্ষণ হইতেই ভারতীর বাক্যে শশীর কবি-চিত্ত শ্রদ্ধায় ও অনুরাগে বিগলিত হইয়া আসিতেছিল। সে গদগদকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, ভারতীকে আমি সম্পূর্ণ অনুমোদন করি ডাক্তার। আমারও বিশ্বাস সে সভ্যতা ভারতে ফিরে আসবেই আসবে।

ডাক্তার উভয়ের মুখের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, তোমরা ভারতের কোন্ যুগের সভ্যতার ইঙ্গিত করচ আমি জানিনে, কিন্তু সভ্যতার একটা সীমা আছে। ধর্ম, অহিংসা এবং শান্তির নেশায় তাকে অতিক্রম করে গেলে মরণ আসে। কোন দেবতাই তাকে রক্ষা করতে পারে না। ভারতবর্ষ হূনদের কাছে কবে পরাজয় স্বীকার করেছিল জানো? যখন তারা ভারতবাসী শিশুদের মশালের মত করে জ্বালাতে আরম্ভ করেছিল, নারীর পিঠের চামড়া দিয়ে লড়াইয়ের বাজনা তৈরি করতে শুরু করেছিল। সে অভাবিত নৃশংসতার জবাব ভারতবাসী দিতে শেখেনি। তার ফল কি হল? দেশ গেল, রাজ্য গেল, দেবমন্দির ধ্বংস বিধ্বস্ত হয়ে গেল,—সে অক্ষমতার শাস্তি আজও আমাদের ফুরোয় নি।

ভারতীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, তুমি কবির শ্লোক প্রায় আবৃত্তি করে বল, গিয়াছে দেশ দুঃখ কি, আবার তোরা মানুষ হ। কিন্তু দেশ ফিরে পাবার মত মানুষ হওয়া কাকে বলে শুনি? ভেবেচ, মানুষ হবার পথ তোমার অবারিত? মুক্ত? ভেবেচ, দেশের দরিদ্র নারায়ণের সেবা আর ম্যালেরিয়ার কুইনিন জুগিয়ে বেড়ানোকেই মানুষ হওয়া বলে? বলে না। মানুষ হয়ে জন্মানোর মর্যাদা-বোধকেই মানুষ হওয়া বলে। মৃত্যুর ভয় থেকে মুক্তি পাওয়াকেই মানুষ হওয়া বলে।

মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, তোমার বিশেষ অপরাধ নেই ভারতী। ওদের আবহাওয়ার মধ্যেই তুমি প্রতিপালিত, তাই তোমার মনে হয় ইউরোপের ক্রীশ্চান সভ্যতার চেয়ে বড় সভ্যতা আর নেই। অথচ, এতবড় মিছে কথাও আর নেই। সভ্যতার অর্থ কি শুধু মানুষ-মারা কল তৈরি করা? দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না,—অতএব আত্মরক্ষার ছলে এর নিত্য-নূতন সৃষ্টিরও আর

বিরাম নেই। কিন্তু সভ্যতার যদি কোন তাৎপর্য থাকে ত সে এই যে, অক্ষম ও দুর্বলের ন্যায্য অধিকার যেন প্রবলের গায়ের জোরে পরাভূত না হয়। কোথাও দেখেচ এদের এই নীতি, এই ন্যায়ের গৌরব দিতে? একদিন তোমাকে বলেছিলাম পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে চেয়ে দেখতে। স্মরণ আছে সে কথা? মনে আছে আমার মুখে চীনদেশের বক্সার বিদ্রোহের গল্প? সুসভ্য ইউরোপিয়ান পাওয়ারের দল ঘর-চড়াও হয়ে তাদের যে প্রতিহিংসা দিলে, কোথায় লাগে তার কাছে চেঙ্গিস খাঁ ও নাদির শার বীভৎসতার কাহিনী? সূর্যের কাছে দীপের মত সে অকিঞ্চিৎকর। হেতু যত তুচ্ছ এবং যত অন্যায়ই হোক, লড়াইয়ের ছুতো পেলে এদের আর কিছুই বাধে না। বৃদ্ধ, শিশু, নারী,—সঙ্কোচ নেই, দ্বিধা নেই—যে পাপের সীমা হয় না, ভারতী, সেই বিষাক্ত বাষ্পের নরহত্যাতেও নৈতিক বুদ্ধি এদের বাধা দেয় না।

উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রয়োজনে যে-কোন উপায়, যে-কিছু পথই এদের সুপবিত্র। কেবল নীতির বাধা, ধর্মের নিষেধ কি শুধু নির্বাসিত পদদলিত আমারই বেলায়?

ভারতী নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। এই-সকল অভিযোগের প্রতিবাদের সে কি জানে? যে নির্মম, একান্ত দৃঢ়চিত্ত, শঙ্কাহীন, ক্ষমাহীন বিপ্লবী, জ্ঞান, বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের যাহার অন্ত নাই, পরাধীনতার অনির্বাণ অগ্নিতে যাহার সমস্ত দেহমন অহর্নিশি শিখার মত জ্বলিতেছে, যুক্তি দিয়া তাহাকে পরাস্ত করিবার সে কোথায় কি খুঁজিয়া পাইবে? জবাব নাই, ভাষা তাহার মূক হইয়া রহিল, কিন্তু তাহার কলুষহীন নারী-হৃদয় অন্ধ করুণায় নিঃশব্দে মাথা খুঁড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

সুমিত্রা অনেকদিন হইতেই এই-সকল বাদ-প্রতিবাদে যোগ দেওয়া বন্ধ করিয়াছিল, আজিও সে অধোমুখে স্তব্ধ হইয়া রহিল, শুধু অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল কৃষ্ণ আইয়ার। আলোচনার বহু অংশই সে বুঝিতে পারিতেছিল না, এই নীরবতার

মাঝখানে সে জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের সভার কাজ আরম্ভ হবার আর বিলম্ব কত?

ডাক্তার কহিলেন, কোন বিলম্বই নেই। সুমিত্রা, তোমার জাভায় ফিরে যাওয়াই স্থির?

হাঁ।

কবে?

বোধ হয় এই বুধবারে। গত শনিবারে পারিনি।

পথের-দাবীর সংস্পর্শ তুমি ত্যাগ করলে?

সুমিত্রা মাথা নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

প্রত্যুত্তরে ডাক্তার শুধু একটুখানি হাসিলেন। তারপরে পকেট হইতে কয়েকখানা টেলিগ্রামের কাগজ বাহির করিয়া সুমিত্রার হাতে দিয়া বলিলেন, পড়ে দেখ। হীরা সিং কাল রাতে দিয়ে গেছে।

আইয়ার ঝুঁকিয়া পড়িল, ভারতী প্রজ্বলিত মোমবাতিটা তুলিয়া ধরিল। সুদীর্ঘ টেলিগ্রাম, ভাষা ইংরাজি, অর্থও স্পষ্ট, কিন্তু সুমিত্রার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। মিনিট দুই-তিন পরে সে মুখ তুলিয়া কহিল, কোডের সমস্ত কথা আমার মনে নেই। আমাদের সাংহাইয়ের জ্যামেকা ক্লব এবং ক্রুগার তার পাঠিয়েছে, এ ছাড়া আর কিছুই বুঝতে পারলাম না।

ডাক্তার বলিলেন, ক্রুগার ওয়্যার করেছে ক্যানটন থেকে। সাংহাইয়ের জ্যামেকা ক্লব ভোররাত্রে পুলিশ ঘেরাও করে,—তিনজন পুলিশ আর আমাদের বিনোদ মারা গেছে। দুই ভাই মহতপ ও সূর্যসিংহ একসঙ্গে ধরা পড়েছে। অযোধ্যা হংকঙে,—দুর্গা, সুরেশ পেনাঙে,—সিঙ্গাপুরের জ্যামেকা ক্লবের জন্যে পুলিশ সমস্ত শহর তোলপাড় করে বেড়াচ্চে। মোট সুসংবাদটা এই!

খবর শুনিয়া কৃষ্ণ আইয়ার পাণ্ডুর হইয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল, ড্যন!

ডাক্তার কহিলেন, ওরা দু'ভাই যে রেজিমেন্ট ছেড়ে কবে, এবং কেন সাংহাইয়ে এলো জানিনে। সুমিত্রা, ব্রজেন্দ্র বাস্তবিক কোথায় জানো কি?

প্রশ্ন শুনিয়া সুমিত্রা পাথর হইয়া গেল।

জানো?

প্রথমে তাহার গলা দিয়া কিছুতেই স্বর ফুটিল না, তাহার পরে ঘাড় নাড়িয়া কেবল বলিল, না।

কৃষ্ণ আইয়ার কহিল, সে এ কাজ করতে পারে আমার বিশ্বাস হয় না।

ডাক্তার হাঁ-না কিছুই বলিলেন না,—নিঃশব্দে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন।

শশী কহিল, ব্রজেন্দ্র জানে আপনি হাঁটাপথে বর্মা থেকে বেরিয়ে গেছেন।

ডাক্তার এ কথারও উত্তর দিলেন না, তেমনি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

মুখে শব্দ নাই, বাক্য নাই, মূর্তির মত সকলে নিঃশব্দে বসিয়া। সম্মুখে টেলিগ্রাফের সেই কাগজগুলা পড়িয়া। বাতি পুড়িয়া নিঃশেষ হইতেছিল, শশী আর একটা জ্বালিয়া মেঝের উপর বসাইয়া দিল। মিনিট-দশেক এইভাবে কাটিবার পরে, প্রথম চেতনার লক্ষণ দেখা দিল আইয়ারের দেহে। সে পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া বাতির আগুনে ধরাইয়া লইয়া ধুঁয়ার সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, নাউ ফিনিশ্‌ড!

ডাক্তার তাহার মুখের প্রতি চাহিলেন। প্রত্যুত্তরে সে সিগারেটে পুনশ্চ একটা বড় টান দিয়া শুধু ধূম উদ্গীর্ণ করিল। শশী মদ খাইত, কিন্তু তামাকের ধূঁয়া সহ্য করিতে পারিত না। এখন সে খামকা একটা চুরুট ধরাইয়া ঘন ঘন টানিয়া ঘর অন্ধকার করিয়া তুলিল।

আইয়ার কহিল, ওয়ার্স্ট লাক্। উই মস্ট স্টপ্!

শশী কহিল, আমি আগেই জানতাম। কিছুই হবে না, শুধু—

ডাক্তার সহসা প্রশ্ন করিলেন, তুমি কবে যাবে বললে? বুধবারে?

সুমিত্রা মুখ তুলিয়া চাহিল না, মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ।

শশী পুনরায় বলিল, এতবড় পৃথিবী-জোড়া শক্তিমান রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিপ্লবের চেষ্টা করা শুধু নিষ্ফল নয়, পাগলামি। আমি ত বরাবরই বলে এসেছি ডাক্তার, শেষ পর্যন্ত কেউ থাকবে না।

আইয়ার কি বুঝিল সেই জানে, মুখ দিয়া অপর্যাপ্ত ধূম নিষ্কাশন করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, ট্রু।

ডাক্তার সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, আজকের মত সভা আমাদের শেষ হল।

সঙ্গে সঙ্গে সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইল, সকলেই অভিমত ব্যক্ত করিল, করিল না শুধু ভারতী। সে নীরবে ডাক্তারের পাশে আসিয়া তাঁহার ডান হাতটি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া চুপি চুপি বলিল, দাদা, আমাকে না বলে কোথাও চলে যাবে না বল।

ডাক্তার মুখে কিছুই বলিলেন না, শুধু তাঁহার বজ্রকঠিন মুঠার মধ্যে যে ক্ষুদ্র কোমল হাতখানি ধরা ছিল তাহাতে একটুখানি চাপ দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

একত্রিশ

পরদিন প্রভাত হইতেই আকাশে ধীরে ধীরে মেঘ জমা হইতেছিল, রাত্রে ফোঁটা-কয়েক জলও পড়িয়াছিল, কিন্তু আজ মধ্যাহ্নকাল হইতে বৃষ্টি এবং বাতাস চাপিয়া আসিল। কাল ভারতী সুমিত্রাকে যাইতে দেয় নাই, কথা ছিল, আজ খাওয়া-দাওয়ার পরে সে বিদায় লইয়া বাসায় যাইবে। কিন্তু এমন দুর্যোগ শুরু হইল যে, বাহিরে পা বাড়ানো শক্ত, নদী পার হওয়া ত দূরের কথা। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, দিবাবসানের সঙ্গে সঙ্গে ঝড় ও জল উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিতে লাগিল। শশী হিন্দুহোটেলে থাকে, দুপুরবেলা বেড়াইতে আসিয়াছিল, এখনও ফিরিতে পারে নাই। বেলা কখন শেষ হইল, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল জানাও গেল না। ভারতীর উপরের ঘরে জানালা-কবাট বন্ধ করিয়া আলো জ্বালিয়া বৈঠক বসিয়াছে। সুমিত্রা আপাদমস্তক চাপা দিয়া আরামকেদারায় শুইয়া, শশী খাটের উপরে উবু হইয়া বসিয়া, নীচে কম্বলের শয্যায় অপূর্ব, এবং তাহারই জলযোগের আয়োজনে মেঝের উপরে বঁটি পাতিয়া বসিয়া ভারতী ফল ছাড়াইতেছে। অনতিদূরে একধারে স্টোভের উপরে মুগের ডালের খিচুড়ি টগবগ করিয়া ফুটিতেছে।

অপূর্ব বলিয়াছিল সংসারে তাহার আর রুচি নাই, সন্ন্যাসই তাহার একমাত্র শ্রেয়ঃ। শশী এই প্রস্তাব অনুমোদন করিতে পারে নাই, সে যুক্তি-সহযোগে খণ্ডন করিয়া বুঝাইতেছিল যে, এরূপ অভিসন্ধি ভাল নহে, কারণ, সন্ন্যাসের মধ্যে আর মজা নাই; বরঞ্চ, বরিশাল কলেজে প্রফেসারির আবেদন যদি মঞ্জুর হয় ত গ্রহণ করাই কর্তব্য।

অপূর্ব ক্ষুণ্ণ হইল, কিন্তু কথা কহিল না। ভারতী সমস্তই জানিত, তাই সে-ই ইহার জবাব দিয়া বলিল, জীবনে মজা করে বেড়ানো ছাড়া কি মানুষের

আর বড় উদ্দেশ্য থাকতে পারে না, শশীবাবু? পৃথিবীতে সকলের চোখের দৃষ্টিই এক নয়।

তাহার কথা বলার ধরনে শশী অপ্রতিভ হইল। ভারতী পুনশ্চ কহিল, ওঁর মনের অবস্থা এখন ভাল নয়, এ সময়ে ওঁর ভবিষ্যৎ কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করা শুধু নিষ্ফল নয়, অবিহিত। তার চেয়ে বরঞ্চ আমাদের নিজেদের—

আমার মনে ছিল না ভারতী।

শশীর মনে না থাকা কিছুই বিচিত্র নয়। ইতিমধ্যে অপূর্বর আরও একটা ব্যাপার ঘটিয়াছে, যাহা ভারতী ব্যতীত অপরে জানিত না। সাংসারিক হিসাবে তাহার ফল ও পরিণাম মাতৃবিয়োগের অপেক্ষা বিশেষ কম নহে। জননীর মৃত্যুসংবাদে অপূর্বর দাদা বিনোদবাবু দুঃখ করিয়া তার করিয়াছেন, কিন্তু ইহার অধিক আর কিছু নহে। মা রাগ করিয়া, সম্ভবতঃ, অত্যন্ত অপমানিত হইয়াই অবশেষে গঙ্গাবিহীন, ম্লেচ্ছদেশ বর্মায় আপনাকে নির্বাসিত করিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া অপূর্ব দুঃখে, ক্ষোভে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল। যে দুইদিন কলিকাতায় ছিল, বাটীতে খায় নাই, শোয় নাই এবং ফিরিবার মুখে রীতিমত কলহ করিয়াই আসিয়াছিল। তথাপি, এতবড় ভয়ানক দুর্ঘটনায় সকলের কনিষ্ঠ হইয়া তাহার নিঃসন্দিগ্ধ ভরসা ছিল, তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য কেহ না কেহ আসিবেই আসিবে। তেওয়ারী থাকিলে কি হইত বলা যায় না, কিন্তু সে-ও নাই, ছুটি লইয়া দেশে গিয়াছে।

বাঙ্গালী পুরোহিত এখানেও আছে, আজই সকালে অপূর্ব ভারতীকে ডাকিয়া কহিয়াছিল, সে কলিকাতায় যাইবে না, যেমন করিয়া পারে মাতৃশ্রাদ্ধ এখানেই সম্পন্ন করিবে।

মাতার আকস্মিক আগমনের হেতু যে ছেলেদের প্রতি দুর্জয় মান-অভিমান,— এ খবর অপূর্ব জানিয়া আসিয়াছিল, শুধু, কতখানি যে ক্রীশ্চান-কন্যা

ভারতীর কাহিনী সংশ্লিষ্ট ছিল ইহাই জানে নাই। সাজ্ঘাতিক পীড়িতা অচৈতন্যপ্রায় জননীর বলিবার অবকাশ ঘটিল না, এবং বিনোদবাবু রাগ করিয়া বলিলেন না।

সহসা মুখের আবরণ সরাইয়া সুমিত্রা উঠিয়া বসিল, কহিল, নীচেকার দরজা খুলে কে যেন ঢুকলো, ভারতী।

বাতাস ও বারিপাতের অবিশ্রান্ত ঝরঝর শব্দের মাঝখানে আর কিছুই শুনিতে পাওয়া কঠিন। শঙ্কায় সকলেই চকিত হইয়া উঠিল, ভারতী একমুহূর্ত কান খাড়া করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, না, কেউ নয়। অপূর্ববাবুর চাকরটা শুধু নীচে বসে আছে। কিন্তু পরক্ষণেই সে সিঁড়িতে পরিচিত পদশব্দে আনন্দ-কলরোলে চীৎকার করিয়া উঠিল, আরে, এ যে দাদা! এক হাজার, দশ হাজার, বিশ হাজার, এক লক্ষ ওয়েলকম্! হাতের ফল এবং বঁটি ফেলিয়া সিঁড়ির মুখে ছুটিয়া গিয়া বলিল, এক ক্রোড় দশ ক্রোড় বিশ ক্রোড় হাজার হাজার ক্রোড় গুড্ ইভ্নিং দাদা, শীগ্গির এসো!

সব্যসাচী ঘরে ঢুকিয়া পিঠের প্রকাণ্ড বোঁচকা নামাইতে নামাইতে সহাস্যে কহিলেন, গুড্ ইভনিং!

গুড্ ইভ্নিং! গুড্ ইভ্নিং।

ভারতী তাঁহার দুই হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিল, এই দেখ দাদা, তোমার জন্যে খিচুড়ি রাঁধচি। ওভারকোটটা আগে খোলো। ইঃ— জুতোটুতো সব ভিজে গেছে, দাঁড়াও আগে আমি খুলে দি। এই বলিয়া সে আগে কোট খুলিবে, না হেঁট হইয়া বুটের ফিতা খুলিবে ঠিক করিতে পারিল না। চেয়ারের কাছে টানিয়া আনিয়া জোর করিয়া বসাইয়া দিয়া বলিল, আমি জুতো খুলে দি। আচ্ছা, এই বৃষ্টিতে একটা গাড়ি করে আসতে নেই! হাঁ দাদা, ও-বেলা কি খেয়েছিলে? পেট ভরেছিল? ভালো কথা! ঠাকুরমশায়ের হোটেলে আজ মাংস রান্না হয়েছে আমি খবর পেয়েছি, আনবো দাদা, ছুটে গিয়ে এক বাটি? খাবে? সত্যি বল!

ডাক্তার হাসিমুখে কহিলেন, আরে, এ আমাকে আজ পাগল করে দেবে নাকি!

ভারতী জুতা খুলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া মাথায় তাঁহার হাত দিয়া বলিল, যা ভেবেচি ঠিক তাই। ঠিক যেন নেয়ে উঠেচ এমনি ভিজে। এই বলিয়া সে আলনা হইতে তাড়াতাড়ি তোয়ালে আনিতে গেল।

মিনিট-খানেকের মধ্যে ছেলেমানুষের মত এমনি কাণ্ড করিল যে, শশী হাসিয়া ফেলিল। বলিল, আপনাকে যেন ভারতী দু'-দশ বচ্ছর পরে দেখতে পেয়েছেন।

ডাক্তার কহিলেন, তার চেয়েও বেশী। এই বলিয়া ভারতীর হাত হইতে তোয়ালে টানিয়া লইয়া কহিলেন, ওর আদরের জ্বালায় আমার প্রাণটা গেল।

প্রাণ গেল? তবে, থাকো বসে। এই বলিয়া ভারতী কৃত্রিম অভিমান ভরে তাহার ফল ছাড়াইতে ফিরিয়া গিয়া বঁটি লইয়া বসিল।

তাহার বন্ধু, সখা, সহোদরের অধিক আত্মীয়—আজিকার এই দুর্যোগের মধ্যে তাঁহার অপ্রত্যাশিত, অভাবিত আগমনে স্নেহে, শ্রদ্ধায়, গর্বে ও স্বার্থহীন নিষ্পাপ প্রীতিতে তাহার হৃদয় উপচিয়া পড়িয়াছে,—আপনাকে সে সংবরণ করিবে কি দিয়া? আতিশয্য যদি হইয়াই থাকে তাহাকে বাধা দিবে কিসে? সুমিত্রা নিঃশব্দে দেখিতেছিল, নীরবে রহিল, কিন্তু ঘৃণা ও নিগূঢ় ঈর্ষায় রচিত যে দুর্ভেদ্য যবনিকা এতদিন তাহার চোখের দৃষ্টিকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, অকস্মাৎ অপসারিত হইয়া যতদূর দেখা যায় শুধু অনাবিল সৌহৃদ্যের স্বচ্ছ স্রোতস্বতীই সে এই দুটি নর-নারীর মাঝখানে প্রবাহিত দেখিতে পাইল। মুহূর্তের জন্যও কখনো যে তথায় কলুষ স্পর্শ করিয়াছে, মনে করিতে আজ তাহার মাথা হেঁট হইল। গোপন করিয়া করিবার, লজ্জা করিয়া করিবার ভারতীর কিছুই ছিল না বলিয়াই সে এমন লজ্জাহীনার মত সব্যসাচীর আপনার হইয়া উঠিতে পারিয়াছিল, এ কথা আজ সুমিত্রা বুঝিল।

এতক্ষণ মানুষটিকে লইয়াই ভারতী ব্যস্ত ছিল, এখন বোঁচকাটির প্রতি তাহার লক্ষ্য পড়িল। উদ্বিগ্ন শঙ্কায় ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, এই ঝড়জলের মধ্যে সহচরটিকে সঙ্গে এনেছ কেন বলত? কোথাও চলে যাচ্চো না ত? মিথ্যে বলে ঠকাতে পারবে না তা বলে রাখচি, দাদা।

ডাক্তার হাসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহার মুখের চেহারায় নিজের মুখে আর হাসি আসিল না, তথাপি তামাশার ভঙ্গীতে লঘু করিয়া কহিলেন, যাবো না ত কি রামদাসের মত ধরা পড়ব নাকি?

শশী মাথা নাড়িয়া বলিল, ঠিক তাই।

ভারতী রাগ করিয়া কহিল, ঠিক তাই! আপনি কি জানেন শশীবাবু যে মতামত দিচ্চেন!

বাঃ জানিনে?

কিচ্ছু জানেন না।

ডাক্তার হাসিমুখে কহিলেন, ঝগড়া করলে খিচুড়ি নষ্ট হয়ে যাবে। আচ্ছা অপূর্ববাবু, কালকের জাহাজে না গেলে ত আপনি সময়মত পৌঁছতে পারবেন না।

অপূর্ব গম্ভীর হইয়া বলিল, মায়ের শ্রাদ্ধ আমি এখানেই করব ডাক্তার।

এখানে? হেতু?

অপূর্ব মৌন হইয়া রহিল, ভারতীও জবাব দিল না।

ডাক্তার মনে মনে বুঝিলেন কি একটা ঘটিয়াছে যাহা প্রকাশ করিবার নয়। কহিলেন, বেশ, বেশ। তাহলে ফিরে যাবারই বা দরকার কি? চাকরিটা আপনার আছে না?

অপূর্ব ইহারও উত্তর দিল না। শশী কহিল, অপূর্ববাবু সন্ন্যাস নেবেন।

ডাক্তার হাসিয়া ফেলিলেন, সন্ন্যাস? এ আবার কি কথা!

তাঁহার হাসিতে অপূর্ব ক্ষুণ্ণ হইল। কহিল, সংসারে যার রুচি নেই, জীবন বিস্বাদ হয়ে গেছে, এ ছাড়া তার আর পথ কি আছে, ডাক্তার?

ডাক্তার কহিলেন, এ-সব বড় বড় আধ্যাত্মিক ব্যাপার, অপূর্ববাবু, এর মধ্যে অনধিকারচর্চা করতে আমাকে আর প্রলুব্ধ করবেন না, তার চেয়ে বরঞ্চ শশীর মত নিন, ও জানে শোনে। ইস্কুলে ফেল হয়ে একবার ও বছর-খানেক ধরে এক সাধু-বাবার চেলাগিরি করেছিল।

শশী সংশোধন করিয়া বলিল, দেড় বছরের ওপর। প্রায় দু বছর।

সুমিত্রা ও ভারতী হাসিতে লাগিল।

অপূর্বর গাম্ভীর্য ইহাতে টলিল না, সে কহিল, মায়ের মৃত্যুর জন্যে আমার নিজেকেই যেন অপরাধী মনে হয়, ডাক্তার। সেদিন থেকে আমি নিরন্তর এই কথাই ভেবে আসচি। যথার্থই সংসারে আমার প্রয়োজন নেই, এ আমার কাছে তিক্ত হয়ে এসেছে।

ডাক্তার ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া বোধ হয় তাহার হৃদয়ে সত্যকার ব্যথা উপলব্ধি করিলেন, সস্নেহ-মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, মানুষের এই দিকটা কখনো আমার ভেবে দেখবার আবশ্যক হয়নি অপূর্ববাবু, কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে মনে হয়, হয়ত, এ ভুল হবে। তিক্ততার মধ্যে দিয়ে সংসার ছেড়ে শুধু হতভাগ্য লক্ষ্মীছাড়া জীবনই যাপন করা চলে, কিন্তু বৈরাগ্য-সাধনা হয় না। করুণার মধ্যে দিয়ে, আনন্দের মধ্যে দিয়ে না গেলে কি—কিন্তু, ঠিক ত জানিনে—

ভারতী অকস্মাৎ যেন এক নূতন জ্ঞান লাভ করিল। ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তুমি ঠিক জানো দাদা, তোমার মুখ দিয়ে কখনো বেঠিক কিছু বার হয় না,—হতে পারে না। এই সত্য।

ডাক্তার বলিলেন, মনে ত তাই হয়। মা মারা গেলেন। কেন এসেছিলেন, কিসের জন্যে আপনি যেতে চান না কিছুই আমি জানিনে, জানবার কৌতূহলও নেই, কিন্তু কারও আচরণে তিক্ততাই যদি পেয়ে থাকেন, সমস্ত অনাগত কালের

তাই শুধু সত্য হল, আর অমৃত যদি কোথাও লাভ হয়ে থাকে, জীবনে তার কোন দাম দেবেন না?

অপূর্ব কহিতে গেল, সংসারে দাদা যদি—

ডাক্তার বলিলেন, সংসারে অপূর্বর দাদা বিনোদবাবুই আছেন, ভারতীর দাদা সব্যসাচী কি নেই? সে গৃহে যদি স্থান আপনার নাও থাকে, কলকাতার সেই ছোট্ট বাড়িটুকুই কি বামনের বিশ্বব্যাপী পদতলের ন্যায় পৃথিবীতে কোথাও আপনার আর ঠাঁই রাখেনি? অপূর্ববাবু, হৃদয়াবেগ দুর্মূল্য বস্তু, কিন্তু চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করতে দিলে এতবড় শত্রু আর মানুষের নেই।

অপূর্ব অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু ধর্মসাধনা বা আত্মার মুক্তির কামনায় আমি সংসার ত্যাগ করতে চাইনি ডাক্তার, যদি করি, পরার্থেই করব। আমাকে আপনাদের বিশ্বাস করা কঠিন, না করলেও দোষ দেবার নেই, কিন্তু একদিন যে অপূর্বকে আপনারা জানতেন, মায়ের মৃত্যুর পরে সে অপূর্ব আমি আর নেই।

ডাক্তার উঠিয়া আসিয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া বলিলেন, তোমার এ কথাটা যেন সত্য হয় অপূর্ব।

অপূর্ব গাঢ়কণ্ঠে বলিল, এখন থেকে আমি দেশের কাজে, দশের কাজে, দীন-দরিদ্রের কাজেই আত্মনিয়োগ করব। এই বলিয়া সে ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া কহিতে লাগিল, কলকাতায় আমার বাড়ি, শহরেই আমি মানুষ, কিন্তু শহরের সঙ্গে আর আমার কিছুমাত্র সম্বন্ধ রইল না। এখন থেকে পল্লীসেবাই হবে আমার একমাত্র ব্রত। একদিন কৃষিপ্রধান ভারতের পল্লীই ছিল প্রাণ, পল্লীই ছিল তার অস্থি-মজ্জা-শোণিত। আজ সে ধ্বংসোন্মুখ। ভদ্রজাতি তাদের ত্যাগ করে শহরে এসেছে, সেখান থেকে তাদের অহর্নিশি শাসন করে এবং শোষণ করে। এ ছাড়া আর কোন সম্বন্ধ-বন্ধন তারা রাখেনি। না রাখুক, কিন্তু চিরদিন যারা এঁদের মুখের অন্ন এবং পরনের বস্ত্র যুগিয়ে দেয়, সেই কৃষককুল আজ নিরন্ন, নিরক্ষর এবং

নিরুপায় হয়ে মৃত্যুপথে দ্রুতবেগে চলেছে। এখন থেকে আমি তাদের কল্যাণেই আত্মনিয়োগ করব, এবং ভারতীও আমাকে প্রাণপণে সাহায্য করবেন প্রতিশ্রুত হয়েছেন। গ্রামে গ্রামে পাঠশালা খুলে, আবশ্যক হলে কুটীরে কুটীরে গিয়ে তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করবার ভার উনি নেবেন। আমার সন্ন্যাস দেশের জন্যে, নিজের জন্যে নয় ডাক্তার।

ডাক্তার বলিলেন, সাধু প্রস্তাব।

তাঁহার মুখ হইতে কেবল এই দুটি কথাই কেহ প্রত্যাশা করে নাই। ভারতী ম্লান হইয়া কহিল, আর একদিক দিয়ে ধরলে, এ ত তোমারই কাজ দাদা। এই কৃষিপ্রধান দেশে কৃষক বড় হয়ে না উঠলে ত কোন কিছুই হবে না।

ডাক্তার কহিলেন, আমি ত প্রতিবাদ করিনি ভারতী।

কিন্তু তোমার উৎসাহও তো নেই দাদা!

ডাক্তার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, দরিদ্র কৃষকের ভালো করতে চাও, তোমাদের আমি আশীর্বাদ করি। কিন্তু আমার কাজে সাহায্য করচ মনে করবার প্রয়োজন নেই। চাষারা রাজা হোক, তাদের ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক, কিন্তু সাহায্য তাদের কাছ থেকে আমি আশা করি নে।

অপূর্বর প্রতি চাহিয়া কহিলেন, কারও ভালো করতে হবে বলে আর কারও গায়ে কালি ছড়াতে হবে, তার মানে নেই অপূর্ববাবু। এদের দুঃখ-দৈন্যের মূলে শিক্ষিত ভদ্রজাতি নয়, সে মূল বার করতে হলে তোমাকে আর একদিকে খুঁড়ে দেখতে হবে।

অপূর্ব কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। কহিল, কিন্তু এই কি সকলে আজ বলে না?

বলুক। যা ভুল তা তেত্রিশ কোটী লোকে মিলে বললেও ভুল। বরঞ্চ এই শিক্ষিত ভদ্রজাতির চেয়ে লাঞ্ছিত, অবমানিত, দুর্দশাগ্রস্ত সমাজ বাঙলা দেশে আর নেই। তার উপরে মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে তাদের ভরাডুবি করাতে চাও কেন? পরদেশের সকল যুক্তি এবং সকল সমস্যাই কি নিজের দেশে খাটে

ভেবেচ? বাইরের অনাচার যখন পলে পলে সর্বনাশ নিয়ে আসচে, তখন আবার অন্তর্বিদ্রোহ সৃষ্টি করতে চাও কিসের জন্যে? অসন্তোষে দেশ ভরে গেল,—স্নেহের বাঁধন, শ্রদ্ধার বাঁধন চূর্ণ হয়ে এলো কিসের জন্যে জানো? তোমাদের দু-দশ জনের দোষে,—শিক্ষিতের বিরুদ্ধে শিক্ষিতের অভিযানে। শশী, একদিন তোমাকে আমি এ কাজ করতে নিষেধ করেছিলাম মনে আছে? নিজেদের বিপক্ষে নিজেদের দুর্নাম ঘোষণার মধ্যে একটা নিরপেক্ষ স্পষ্টবাদিতার দম্ভ আছে, একপ্রকার সস্তা খ্যাতিও মুখে মুখে প্রচারিত হয়, কিন্তু এ শুধু ভুল নয়, মিথ্যা। মঙ্গল তাদের তোমরা কর গে, কিন্তু অপরের কলঙ্ক রটনা করে নয়, একের প্রতিকূলে অপরকে উত্তেজিত করে নয়,—বিশ্বের কাছে তাদের হাস্যাস্পদ করে নয়! সুদূর-ভবিষ্যতে হয়ত সে একদিন এসে পৌঁছবে, কিন্তু আজও তার বিলম্ব আছে।

সকলেই নীরব হইয়া রহিল, শুধু ভারতী ধীরে ধীরে কহিল, কিছু মনে করো না দাদা, কিন্তু বরাবরই আমি দেখে এসেছি পল্লীর প্রতি তোমার সহানুভূতি কম, তোমার দৃষ্টি শুধু শহরের উপরে। কৃষকদের প্রতি তুমি সদয় নও, তোমার দু চক্ষু আছে কেবল কারখানার কুলি-মজুর-কারিগরদের দিকে। তাই তোমার পথের-দাবী খুলেছিলে এদেরই মাঝখানে আর হৃদয় বলে যদি কোন বালাই তোমার থাকে, সে শুধু ছেয়ে পড়ে আছে মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত, ভদ্র-জাতি নিয়ে। এরাই তোমার আশা-ভরসা, এরাই তোমার আপনার জন। বল, এ কি মিথ্যা কথা?

ডাক্তার বলিলেন, মিথ্যে নয় বোন, অত্যন্ত সত্য। কতবার ত বলেছি তোমাকে, 'পথের-দাবী' চাষা-হিতকারিণী প্রতিষ্ঠান নয়, এ আমার স্বাধীনতা অর্জনের অস্ত্র। শ্রমিক এবং কৃষক এক নয় ভারতী। তাই, পাবে আমাকে কুলি-মজুর-কারিকরের মাঝখানে, কারখানার ব্যারেকে, কিন্তু পাবে না খুঁজে পাড়াগাঁয়ে চাষার কুটীরে। কিন্তু কথায় কথায় শ্রেষ্ঠ কর্তব্যটি যেন ভুলে যেয়ো না দিদি। এই

বলিয়া স্টোভের প্রতি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কহিলেন, দেশোদ্ধার দু-দিন দেরি হলে সইবে, কিন্তু তৈরি খিচুড়ি পুড়ে গেলে সইবে না।

ভারতী ছুটিয়া গিয়া হাঁড়ির ঢাকা খুলিয়া পরীক্ষা করিয়া হাসিমুখে কহিল, ভয় নেই দাদা, বাদল রাতের খিচুড়িভোগ তোমার মারা যাবে না।

কিন্তু বিলম্ব কত?

ভারতী বলিল, মিনিট পনেরো-কুড়ি। কিন্তু তাড়া কিসের বল ত?

ডাক্তার হাসিয়া কহিলেন, আজ যে তোমাদের কাছে আমি বিদায় নেতে এলাম।

কথা যেমনই হউক, তাঁহার হাসিমুখের দিকে চাহিয়া কেহই তাহা বিশ্বাস করিল না। বাহিরে ঝড়-জলের বিরাম নাই, ভারতী ক্ষণিকের জন্য জানালা খুলিয়া নিরীক্ষণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল, বাপ রে বাপ! পৃথিবী বোধ হয় ওলটপালট হয়ে যাবে। বিদায় নেবারই সময় বটে, দাদা! চোখের পলকে তাহার অন্য কথা মনে পড়িল, কহিল, আজ কিন্তু তোমাকে ওই ছোট্ট ঘরটিতে শুতে হবে। নিজের হাতে আমি চমৎকার করে বিছানা করে দেব, কেমন? এই বলিয়া সে হৃদয়ের নিগূঢ় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া রান্নার কাজে লাগিল। ডাক্তারের নিকট হইতে যে কোন উত্তরই আসিল না তাহা লক্ষ্যও করিল না।

যথাসময়ে আহার্য প্রস্তুত হইলে, ডাক্তার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না, সে হবে না ভারতী, পরিবেষণের অছিলায় তুমি বাকী থাকলে চলবে না। আজ আমরা সকলে একসঙ্গে খেতে বসব।

ভারতী সম্মত হইয়া বলিল, তাই হবে দাদা, চারজনে আমরা গোল হয়ে খেতে বসব।

ডাক্তার কহিলেন, গোল হয়ে খেতে পারি, কিন্তু বুভুক্ষু অপূর্ববাবু না নজর দিয়ে আমাদের হজমে গোল বাধান। সেটা ওঁকে বল।

অপূর্ব হাসিল, ভারতীও হাসিমুখে কহিল, সে ভয় আমাদের থাকতে পারে, কিন্তু তোমার হজমে গোল বাধাবে কে দাদা? ও আগুনে পাহাড়-পর্বত গুঁড়িয়ে দিলেও ত ভস্ম হয়ে যাবে। যে খাওয়া খেতে দেখেছি! এই বলিয়া ভারতী আর এক দিনের খাওয়া স্মরণ করিয়া মনে মনে যেন শিহরিয়া উঠিল।

ভোজন-পর্ব আরম্ভ হইল। অন্ন-ব্যঞ্জনের সুখ্যাতিতে এবং লঘু হাস্য-পরিহাসে ঘরের আবহাওয়া যেন মুহূর্তের মধ্যে পরিবর্তিত হইয়া গেল। খাওয়া যখন পূর্ণ উদ্যমে চলিতেছে, সহসা রসভঙ্গ করিয়া ফেলিল অপূর্ব। সে কহিল, দিন-দুই পূর্বে খবরের কাগজে একটা সুসংবাদ পড়েছিলাম, ডাক্তার। যদি সত্য হয়, আপনার বিপ্লবের প্রয়াস একেবারে নিরর্থক হয়ে যাবে। ভারত গবর্নমেন্ট তাঁদের শাসনযন্ত্রের আমূল সংস্কার করতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

শশী চক্ষের পলকে রায় দিল, মিছে কথা! ছল!

ভারতী ঠিক যে বিশ্বাস করিল তাহা নয়, কিন্তু অকৃত্রিম উদ্বেগের সহিত কহিল, ছলনা নাও ত হতে পারে শশিবাবু। যাঁরা নেতা যাঁরা এই অর্ধশতাব্দকাল ধরে,—না দাদা, তুমি হাসতে পারবে না বলচি!—তাঁদের প্রাণপণ আন্দোলনের কি কোন ফল নেই ভাবো? বিদেশী শাসক হলেও ত তাঁরা মানুষ, ধর্মজ্ঞান এবং নৈতিক বুদ্ধি ফিরে আসা ত একেবারে অসম্ভব নয়!

শশী তেমনি অসঙ্কোচে অভিমত প্রকাশ করিল, অসম্ভব! মিছে কথা! ধাপ্পাবাজি!

অপূর্ব কহিল, অনেকে এই সন্দেহই করেন সত্য।

ভারতী বলিল, সন্দেহ তাঁদের মিথ্যে। ভগবান কি নেই নাকি? এবং পরক্ষণেই অপরিসীম আগ্রহভরে বলিয়া উঠিল, শাসন-পদ্ধতির পরিবর্তন, অত্যাচার-অনাচারের সংস্কার,—এ-সব যদি সত্যই হয়, তোমার বিপ্লবের আয়োজন, বিদ্রোহের সৃষ্টি—তখন ত একেবারেই অর্থহীন হয়ে যাবে দাদা!

শশী কহিল, নিশ্চয়!

অপূর্ব কহিল, নিঃসন্দেহ!

ভারতী তাঁহার মুখপানে চাহিয়া কহিল, দাদা, তখন এই ভয়ঙ্কর মূর্তি ছেড়ে আবার শান্তমূর্তি নেবে বল?

ডাক্তার দেওয়ালের ঘড়ির দিকে চাহিয়া মনে মনে হিসাব করিয়া কতকটা যেন নিজেকেই কহিলেন, বেশী দেরি নেই আর। তাহার পরে ভারতীকে উদ্দেশ করিয়া অকস্মাৎ অত্যন্ত স্নিগ্ধভাব ধারণ করিয়া বলিলেন, ভারতী, এ আমার ভয়ঙ্কর কিংবা শান্তমূর্তি আমি আপনিই জানিনে, শুধু জানি, এ জীবনে এ রূপ আমার আর পরিবর্তন হবার নয়। আর তোমার নমস্য নেতাদের,—ভয় নেই দিদি, আজ তাঁদের নিয়ে আমোদ করবার আমার সময়ও নেই, অবস্থাও নয়। বিদেশী শাসনের সংস্কার যে কি, প্রাণপণ আন্দোলনের ফলে কি তাঁরা চান, তার কতটুকু আসল, কতটুকু মেকী,—কি পেলে শশীর ধাপ্পাবাজি হয় না, এবং নমস্যগণের কান্না থামে, তার কিছুই আমি জানিনে। বিদেশী গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে চোখ রাঙ্গিয়ে যখন তাঁরা চরম বাণী প্রচার করে বলেন, আমরা আর ঘুমিয়ে নেই, আমরা জেগেছি। আমাদের আত্মসম্মানে ভয়ানক আঘাত লেগেছে। হয় আমাদের কথা শোন, নইলে বন্দেমাতরমের দিব্যি করে বলছি তোমাদের অধীনে আমরা স্বাধীন হবই হব। দেখি, কার সাধ্য বাধা দেয়!—এ যে কি প্রার্থনা, এবং কি এর স্বরূপ সে আমার বুদ্ধির অতীত। শুধু জানি, তাঁদের এই চাওয়া এবং পাওয়ার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নেই।

একটুখানি থামিয়া বলিলেন, সংস্কার মানে মেরামত,—উচ্ছেদ নয়। গুরুভারে যে অপরাধ আজ মানুষের অসহ হয়ে উঠেছে তাকেই সুসহ করা; যে যন্ত্র বিকল হয়ে এসেছে, মেরামত করে তাকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করার যে কৌশল বোধ হয় তারই নাম শাসন-সংস্কার। একটা দিনের জন্যও এ ফাঁকি আমি চাইনি, একটা দিনের জন্যও বলিনি কারাগারের পরিসর আমার আর একটুখানি বাড়িয়ে দিয়ে আমাকে ধন্য কর। ভারতী, আমার কামনায়, আমার তপস্যায় আত্মবঞ্চনার

অবসর নেই। এ তপস্যা সাঙ্গ হবার শুধু দুটিমাত্র পথ খোলা আছে,—এক মৃত্যু, দ্বিতীয় ভারতের স্বাধীনতা।

তাঁহার এই কথাগুলির মধ্যে নূতন কিছুই ছিল না, তথাপি, মৃত্যু ও এই ভয়াবহ সঙ্কল্পের পুনরুল্লেখে ভারতীর বুকের মধ্যে অশ্রু আলোড়িত হইয়া দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল।কহিল, কিন্তু, একাকী কি করবে দাদা, একে একে সবাই যে তোমাকে ছেড়ে দূরে সরে গেল?

ডাক্তার বলিলেন, যাবেই ত। আমার দেবতা যে ফাঁকি সইতে পারেন না বোন।

ভারতীর মুখে আসিল, সংসারে সবাই ফাঁকি নয় দাদা, হৃদয় পাথর না হয়ে গেলে তা টের পেতে। কিন্তু এ কথা আজ সে উচ্চারণ করিল না।

আহার শেষ হইলে ডাক্তার হাতমুখ ধুইয়া চেয়ারে আসিয়া বসিলেন। কেহই লক্ষ্য করিল না যে, তাঁহার চোখের দৃষ্টি কিসের উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় ধীরে ধীরে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছে। এবং একটা কান যে বহুক্ষণ হইতেই সদর দরজায় সজাগ হইয়া ছিল তাহা কেহই জানিত না। পথের ধারে কি একটা শব্দ হইল, তাহা আর কেহ গ্রাহ্য করিল না, কিন্তু ডাক্তার সচকিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, নীচে অপূর্ববাবুর চাকর আছে না? জেগে আছে? ওহে হনুমন্ত, দোরটা একবার খুলে দাও।

কোথায় কাহার কিরূপ শয্যা প্রস্তুত হইবে তাহাই ভারতী সুমিত্রাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, সবিস্ময়ে মুখ ফিরাইয়া কহিল, কাকে দাদা? কে এসেছেন?

ডাক্তার বলিলেন, হীরা সিং। তার আসার আশায় পথ চেয়ে আছি। বল কবি, কতকটা কাব্যের মত শোনাল না? এই বলিয়া তিনি হাসিলেন।

ভারতী বলিল, এই দুর্যোগে তোমার একার কাব্যের জ্বালাতেই আমারা সন্ত্রস্ত হয়ে আছি। আবার ভগ্নদূত কিসের জন্যে?

শশী কহিল, ভগ্নদূত তুচ্ছ নয় ভারতী, সে না হলে অতবড় মেঘনাদবধ কাব্য রচনাই হতো না।

দেখি, ইনি কোন্ কাব্য রচনা করেন! এই বলিয়া ভারতী উঁকি মারিয়া দেখিল, অপূর্বর ভৃত্য বাহিরের কবাট খুলিতে যে ব্যক্তি প্রবেশ করিল সে সত্যই হীরা সিং। ক্ষণেক পরে আগন্তুক উপরে আসিয়া সকলকে অভিবাদন করিল, এবং হাতজোড় করিয়া সব্যসাচীকে প্রণাম করিল। পরনে তাহার সেই অতি সুপরিচিত সরকারী উর্দি, সরকারী চাপরাশ, সরকারী মুরাঠা, কোমরে টেলিগ্রাফ পিয়নের চামড়ার ব্যাগ,—এ সমস্তই ভিজিয়া ভারী হইয়া উঠিয়াছে। বিপুল দাড়ি-গোঁফ বাহিয়া জল ঝরিতেছে,-বাঁ হাত দিয়া নিংড়াইয়া বোধ হয় নিজেকে কিঞ্চিৎ হালকা করিবার চেষ্টা করিল, এবং তাহারই ফাঁক দিয়া অস্ফুটধ্বনি শুনা গেল, রেডি।

ডাক্তার লাফাইয়া উঠিলেন, থ্যাঙ্ক ইউ! থ্যাঙ্ক ইউ! থ্যাঙ্ক ইউ সরদারজী! কখন?

নাউ। এই বলিয়া সে সকলকে পুনশ্চ অভিবাদন করিয়া নীচে যাইতেছিল, কিন্তু সকলেই সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, কি হয়েছে সরদারজী? কি নাউ?

অথচ, সবাই জানিত এই মানুষটির গলায় ছুরি দিলে রক্ত ছুটিবে, কিন্তু বিনা-হুকুমে কথা ফুটিবে না। সুতরাং, উত্তরের পরিবর্তে তাহার ঘনকৃষ্ণ শ্মশ্রুগুম্ফ ভেদ করিয়া গুটিকয়েক দাঁত ছাড়া আর যখন কিছু বাহির হইল না।তখন বিস্ময়াপন্ন কেহই হইল না। সবাই জানিত, ইহার নিন্দা-খ্যাতি, মান-অপমান, শত্রু-মিত্র নাই; দেশের কাজে সব্যসাচীকে সে সর্দার মানিয়া এ জীবনের সমস্ত ভাল-মন্দ, সমস্ত সুখ-দুঃখ বিসর্জন দিয়া কঠোর সৈনিকবৃত্তি মাথায় তুলিয়া লইয়াছে। আর তাহার তর্ক নাই, আলোচনা নাই, সময়-অসময়ের হিসাব নাই, কিছু একটা কঠিন কাজের ভার ছিল, কর্তব্য পালন করিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া

গেল। ইঁহাদের কৌতূহল নিবৃত্তি করিয়া ডাক্তার নিজে যাহা বলিলেন, তাহা সংক্ষেপে এইরূপ—

ক্ষতি এবং অনিষ্ট কত যে হইয়াছে দূর হইতে নিরূপণ করা শক্ত। সম্ভবতঃ যথেষ্ট হইয়াছে। কিন্তু যতই হউক, দুটা কাজ তাঁহাকে করিতেই হইবে। তাঁহাদের জ্যামেকা ক্লবের যে অংশটা সিঙ্গাপুরে আছে তাহাকে বাঁচাইতেই হইবে, এবং যেখানে হউক, এবং যেমন করিয়া হউক ব্রজেন্দ্রকে তাঁহার খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। নদীর দক্ষিণে সিরিয়মের সন্নিকটে একখানা চীনা জাহাজ মাল বোঝাই করিয়া দেশে চলিয়াছে, কাল অতি প্রত্যূষেই তাহা ছাড়িয়া যাইবে, ইহাতেই কোনমতে একটা স্থান পাওয়া গিয়াছে। সেই সংবাদই হীরা সিং এইমাত্র দিয়া গেল।

শুনিয়া সুমিত্রার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। খুব সম্ভব, ব্রজেন্দ্র এখন সিঙ্গাপুরে। এবং, যে ব্যক্তি তাহার সন্ধানে চলিল, তাহার দৃষ্টি হইতে স্বর্গে-মর্ত্যে কোথাও তাহার পরিত্রাণ নাই। তখন বিশ্বাসঘাতকতার শেষ-বিচারের সময় আসিবে। ইহার দণ্ড যে কি তাহা দলের মধ্যে কাহারও অবিদিত নহে, সুমিত্রাও জানে। ব্রজেন্দ্র তাহার কিছুই নহে, এবং অপরাধ যদি সে করিয়াই থাকে শাস্তি তাহার হউক, কিন্তু যে কারণে সুমিত্রা অকস্মাৎ এমন হইয়া গেল, তাহা ব্রজেন্দ্রের দণ্ডের কথা স্মরণ করিয়া নহে, তাহা এই যে, ব্রজেন্দ্র পতঙ্গ নহে। সে আত্মরক্ষা করিতে জানে। শুধু তাহার পকেটের সুগুপ্ত পিস্তল নহে, তাহার মত ধূর্ত, কৌশলী ও একান্ত সতর্ক ব্যক্তি সংসারে বিরল। তাহার মস্ত ভুল এই হইয়াছে যে ডাক্তার হাঁটা-পথে বর্মা ত্যাগ করিয়া গেছেন এই কথা সে যাবার পূর্বে নিশ্চয় বিশ্বাস করিয়া গেছে। এখন কোন মতে যদি সে ডাক্তারের খোঁজ পায় ত বধ করিবার যতকিছু অস্ত্র তাহার তূণে আছে প্রয়োগ করিতে মুহূর্তের দ্বিধাও করিবে না। বস্তুতঃ, জীবন-মরণ সমস্যায় অপরের বলিবারই বা কি আছে!

কিছুই নাই। শুধু হীরা সিংহের শান্ত মৃদু দুটি শব্দ ‘নাউ’ এবং ‘রেডি়’ তাহাদের সকলের কানের মধ্যেই সহস্রগুণ ভীষণ হইয়া সহস্র দিক দিয়া আঘাত-প্রতিঘাত করিয়া ফিরিতে লাগিল। ভারতীর মনে পড়িল তাহাদের মৌলমিনের বাটীতে একদিন জন্মতিথি উৎসবের পরিপূর্ণ আনন্দের মাঝখানে অতিথি এবং সর্বোত্তম বন্ধু রেভারেণ্ড লরেন্স আহারের টেবিলে হৃদ্রোগে মারা গিয়াছিলেন। আজিও ঠিক তেমনি অকস্মাৎ হীরা সিং ঘরে ঢুকিয়া মৃত্যুদূতের ন্যায় একমুহূর্তে সমস্ত লণ্ডভণ্ড করিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

হঠাৎ শশী কথা বলিয়া উঠিল। মুখ দিয়া ফোঁস করিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, সব যেন ফাঁকা হয়ে যাচ্চে ডাক্তার।

কথাটা সাদা এবং নিতান্তই মোটা কথা। কিন্তু সকলের বুকের উপর যেন মুগুরের ঘা মারিল।

ডাক্তার হাসিলেন। শশী কহিল, হাসুন আর যাই করুন, সত্যি কথা। আপনি কাছে নেই মনে হলে সমস্ত যেন ব্ল্যাঙ্ক,—ফাঁকা, ঝাপসা হয়ে আসে। কিন্তু আপনার প্রত্যেকটি হুকুম আমি মেনে চলবো।

যথা?

যথা, মদ খাবো না, পলিটিক্সে মিশবো না, ভারতীর কাছে থাকবো এবং কবিতা লিখবো।

ডাক্তার ভারতীর মুখের দিকে একবার চাহিলেন, কিন্তু দেখিতে পাইলেন না। তখন রহস্যভরে প্রশ্ন করিলেন, চাষাড়ে কবিতা লিখবে না কবি?

শশী কহিল, না। তাদের কাব্য তারা লিখতে পারে লিখুক, আমি লিখচি নে। আপনার সে কথা আমি অনেক ভেবে দেখেচি। এবং, এ উপদেশও কখনো ভুলবো না যে, আইডিয়ার জন্য সর্বস্ব বিসর্জন দিতে পারে শুধু শিক্ষিত ভদ্র-সন্তান,অশিক্ষিত কৃষকে পারে না। আমি হব তাদেরই কবি।

ডাক্তার বলিলেন, যাই হয়ো। কিন্তু এইটেই শেষ-কথা নয় কবি, মানবের গতি এইখানেই নিশ্চল হয়ে থাকবে না। কৃষকের দিনও একদিন আসবে, যখন তাদের হাতেই জাতির সকল কল্যাণ-অকল্যাণের ভার সমর্পণ করতে হবে।

শশী কহিল, আসুক সেদিন। তখন, স্বচ্ছন্দ শান্তচিত্তে সব দায়িত্ব তাদের হাতেই তুলে দিয়ে আমরা ছুটি নেব। কিন্তু আজ না। আজ আত্মবলিদানের গুরুভার তারা বইতে পারবে না।

ডাক্তার উঠিয়া আসিয়া তাহার কাঁধের উপর ডান হাত রাখিয়া চুপ করিয়া রহিলেন, কিছুই বলিলেন না।

অপূর্ব এতক্ষণ নিঃশব্দে স্থির হইয়া শুনিতেছিল, ইঁহাদের কোন আলোচনাতেই কথা কহে নাই। কিন্তু শশীর শেষের দিকের মন্তব্য তাহার ভারী খারাপ ঠেকিল। যে কৃষকের মঙ্গলোদ্দেশে আত্মনিয়োগের সঙ্কল্প সে স্থির করিয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে এই-সকল অভিমতে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হইয়া বলিয়া উঠিল, মদ খাওয়া খারাপ, বেশ, উনি ছেড়ে দিন; কাব্যচর্চা ভালো, তাই করুন; কিন্তু কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের কৃষককুল কি এমনি তুচ্ছ, এতই অবহেলার বস্তু? এবং, এরাই যদি বড় হয়ে না ওঠে, আপনাদের বিপ্লবই বা করবে কে? এবং, করবেই বা কেন? আর পলিটিক্স! যথার্থ বলচি ডাক্তার, কৃষকের কল্যাণে সন্ন্যাসব্রত যদি আমি না নিতাম, আজ স্বদেশের রাজনীতিই হতো আমার জীবনের একমাত্র কর্তব্য।

ডাক্তার ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সহসা, প্রসন্ন স্নিগ্ধোজ্জ্বল হাস্যে তাঁহার মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। কহিলেন, আমি কায়মনে প্রার্থনা করি তোমার সদুদ্দেশ্য যেন সফল হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রও তাচ্ছিল্যের সামগ্রী নয়। দেশের ও দশের কল্যাণে বৈরাগ্যই যদি গ্রহণ করে থাকো, কারও সঙ্গেই তোমার বিরোধ বাধবে না। আমি শুধু এই কথাই বলি, অপূর্ববাবু, সকলে কিন্তু সকল কাজের যোগ্য হয় না।

অপূর্ব স্বীকার করিয়া বলিল, আমার চেয়ে এ শিক্ষা আর কার বেশী হয়েছে ডাক্তার? আপনি দয়া না করলে বহুদিন পূর্বেই ত এই ভ্রমের চরম দণ্ড আমার হয়ে যেতো। এই বলিয়া পূর্বস্মৃতির আঘাতে তাহার সর্বদেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

শশী এ ঘটনা জানিত না, জানানো কেহ আবশ্যক বিবেচনাও করে নাই। অপূর্বর কথাটাকে সে প্রচলিত বিনয় ও শ্রদ্ধাভক্তির নিদর্শনের অতিরিক্ত কিছুই মনে করিল না। কহিল, ভ্রম ত করে অনেকেই, কিন্তু দণ্ডভোগ করে চলে যে নিজের জন্মভূমি। আমি ভাবি, ডাক্তার, আপনার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি কে আছে? কার এতখানি জ্ঞান? জাতি ও দেশ নির্বিশেষে কার এতখানি রাষ্ট্রতন্ত্রের অভিজ্ঞতা? কার এত ব্যথা? অথচ, কিছুই কাজে এলো না। চায়নার আয়োজন নষ্ট হয়ে গেল, পিনাঙের গেল, বর্মার কিছুই রইল না, সিঙ্গাপুরেরও যাবে নিশ্চয়ই,—এক কথায়, আপনার এতকালের সমস্ত চেষ্টাই ধ্বংস হাবার উপক্রম হয়েছে। শুধু প্রাণটাই বাকী, সেও কোন দিন যায়!

ডাক্তার মুখ টিপিয়া একটুখানি হাসিলেন। শশী কহিল, হাসুন আর যাই করুন, এ আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

ডাক্তার তেমনি হাসিমুখে প্রশ্ন করিলেন, দিব্যচক্ষে আর কিছু দেখতে পাও না কবি?

শশী বলিল, তাও পাই। তাইত আপনাকে দেখলেই মনে হয়, নিরুপদ্রব, শান্তিময় পথে যদি আমাদের সত্যকার পথের-দাবী সূচ্যগ্র মাত্রও খোলা থাকতো!

অপূর্ব বলিয়া উঠিল, বাঃ! একই সঙ্গে একেবারে দুই উলটো কথা।

সুমিত্রা হাসি গোপন করিতে মুখ ফিরাইল, ডাক্তার নিজেও হাসিয়া বলিলেন, তার কারণ, ওঁর মধ্যে দুটো সত্তা আছে অপূর্ববাবু। একজন শশী, আর একজন কবি। এইজন্যই একের মুখের কথা অপরের মনের কথায় গিয়ে ধাক্কা দিয়ে এমন বেসুরার সৃষ্টি করে। একটু থামিয়া বলিলেন, বহু মানবের মধ্যেই

এমনি আর একজন নিভৃতে বাস করে। সহজে তাকে ধরা যায় না। তাই, মানুষের কথার ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব-মাত্রই তার কঠোর বিচার করলে অবিচারের সম্ভাবনাই থাকে বেশী। অপূর্ববাবু, আমি তোমাকে চিনতে পেরেছিলাম, কিন্তু পারেন নি সুমিত্রা। ভারতী, জীবনযাত্রার মাঝখানে যদি এমনি আঘাত কখনো পাও দিদি, পরলোকগত দাদার এই কথাটি তখন যেন ভুলো না। কিন্তু, এইবার আমি উঠি। ঘাটে আমার নৌকা বাঁধা আছে, ভাটার মুখে অনেকখানি দাঁড় না টানলে আর ভোর-রাত্রে জাহাজ ধরতে পারব না।

ভারতী শঙ্কায় আকুল হইয়া উঠিল, কহিল, এই ভয়ঙ্কর নদীতে? এই ভীষণ ঝড়ের রাত্রে?

তাহার ব্যাকুল-কণ্ঠস্বরে সুমিত্রার আত্মসংযমের কঠিন বাঁধ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে পাংশুমুখে প্রশ্ন করিল, সত্যি সত্যিই কি তুমি সিঙ্গাপুরে নামবে নাকি? এ কাজ কখখনো করো না ডাক্তার, সেখানকার পুলিশে তোমাকে ভাল করেই চেনে। এবার তাদের হাত থেকে তুমি কিছুতেই—কথা তাহার শেষ হইল না, উত্তর আসিল, তারা কি এখানেই আমাকে চেনে না সুমিত্রা?

কিন্তু এই লইয়া তর্ক করিয়া ফল নাই, যুক্তি দেখাইবার অবসর নাই,—হয়ত-বা, প্রশ্নটা সুমিত্রা শুনেও নাই; যে কথা বাহিরে আসিবার ব্যাকুলতায় এতদিন মাথা কুটিয়া মরিতেছিল তাহাই অন্ধবেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আসিল,—কেবল একটিবার ডাক্তার, শুধু এইবারটির মত আমার উপরে নির্ভর করে দেখ, তোমাকে আমি সুরবায়ায় নিতে যেতে পারি কি না! তারপরে টাকায় কি না হয় বল!

ডাক্তার হেঁট হইয়া জুতায় ফিতা বাঁধিতেছিলেন, বাঁধা শেষ করিয়া মুখ তুলিয়া কহিলেন, টাকায় অনেক কাজ হয় সুমিত্রা, তার অপচয় করতে নেই।

সকলেই বুঝিল, এ আলোচনা বৃথা। উপায়হীন বেদনায় হৃদয় পূর্ণ করিয়া সুমিত্রা অশ্রুপ্লাবিত চক্ষে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল, ভারতী কহিল, আমাকে অকূল সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে চললে দাদা, অথচ, বার বার বলতে আমাকে,—আর

শুধু আমাকে কেন আমাদের মত বয়সের যেখানে যত মেয়ে আছে তাদের প্রতি তোমার বড় লোভ, সকলকেই তুমি অত্যন্ত ভালোবাসো, সে কি এই?

ডাক্তার সায় দিয়া বলিলেন, সত্যই ভালবাসি, ভারতী। মেয়েদের পরে যে আমার কত লোভ, কত ভরসা, সে কথা নিজে তোমাদের জানাবার সুযোগ হল না, কিন্তু পারো যদি দাদার হয়ে এই কথাটা তাদের জানিয়ে দিয়ো বোন।

ভারতী সহসা কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, জানাবো এই যে, আমাদের শুধু তুমি বলি দিতে চাও।

ডাক্তার মুহূর্তকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, বেশ তাই বলো। বাঙলা দেশের একটি মেয়েও যদি তার অর্থ বোঝে, আমি তাতেই ধন্য হব। এই বলিয়া তাঁহার সুবৃহৎ বোঁচকাটা কাঁধে তুলিয়া লইলেন। তাঁহার পিছনে পিছনে সকলেই নীচে নামিয়া আসিল। ভারতী শেষ-চেষ্টা করিয়া কহিল, দেশের আয়োজন যার নিষ্ফল হয়ে যায় বিদেশের আয়োজনে তার কি হয় দাদা? যারা অন্তরঙ্গ সুহৃৎ একে একে সবাই ছেড়ে গেল, এখন যে তুমি একেবারে নিঃসঙ্গ,—একেবারে একা!

ডাক্তার স্বীকার করিয়া কহিলেন, ঠিক তাই। কিন্তু, একাই আরম্ভ করেছিলাম ভারতী! আর বিদেশ? কিন্তু, ভগবান এইটুকু দয়া করেছেন মানুষের মর্জিমত ছোট-বড় প্রাচীরের বেড়া তুলে তাঁর পৃথিবীকে আর সহস্র কারাকক্ষে পৃথক করে রাখবার তিনি জো রাখেন নি। উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে যতদূর দৃষ্টি যায় বিধাতার রাজপথ একেবারে উন্মুক্ত হয়ে গেছে। একে রুদ্ধ করে রাখবার চক্রান্ত মানুষের হাতের নাগাল ডিঙ্গিয়ে গেছে। এখন একপ্রান্তের অগ্ন্যুৎপাত অপর প্রান্তে স্ফুলিঙ্গ উড়িয়ে আনবেই আনবে ভারতী, সে তাণ্ডব দেশ-বিদেশের গণ্ডী মানবে না।

কিন্তু, এদিকে যে রুদ্রের সত্যকার তাণ্ডব ঘরের বাহিরে তখন কি উন্মাদ-মূর্তিই ধারণ করিয়াছিল, ভিতর হইতে তাহা কেহই উপলব্ধি করে নাই। বিদ্যুতে,

ঝঞ্ঝায়, প্লাবনে ও বজ্রাঘাতে সে যেন একেবারে প্রলয় শুরু হইয়া গিয়াছিল। এবং, ডাক্তার অর্গল মুক্ত করিতেই এক ঝলক সুতীক্ষ্ণ বৃষ্টির ছাট ভিতরে ঢুকিয়া সকলকে ভিজাইয়া, আলো নিবাইয়া, সমস্ত ওলটপালট করিয়া ঘর ও বাহির চক্ষের পলকে অন্ধকারে একাকার করিয়া দিল।

ডাক্তার ডাকিলেন, সরদারজী!

বাহিরে হইতে সাড়া আসিল, ইয়েস্ ডক্টর, রেডি।

সকলে চমকিত হইল। এই দুঃসহ বায়ু ও মুষলধার বৃষ্টি মাথায় পাতিয়া কেহ যে এই সূচীভেদ্য আঁধারে দাঁড়াইয়া নিশ্চল-নিঃশব্দ প্রহরায় নিযুক্ত থাকিতে পারে এ কথা যেন সহসা কেহ ভাবিতেই পারিল না।

ডাক্তার রহস্যভরে কহিলেন, তাহলে আসি এখন! এই বলিয়া বাহিরে পা বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গেই অপূর্ব ব্যগ্র-ব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, একদিন যে আমি প্রাণ পেয়েছিলাম এ কথা চিরদিন মনে রাখবো, ডাক্তার।

অন্ধকার হইতে জবাব আসিল, তুচ্ছ পাওয়ার ব্যাপারটাকেই কেবল বড় করে দেখলে অপূর্ববাবু, যে দিলে তাকে মনে রাখলে না?

অপূর্ব চীৎকার করিয়া কহিল, মনে? এ জীবনে ভুলব না। এ ঋণ মরণ পর্যন্ত আমি—

দূরে আঁধারের মধ্যে হইতে প্রত্যুত্তর আসিল, তাই যেন হয়। প্রার্থনা করি সত্যকার দাতাকে যেন একদিন তুমি চিনতে পারো, অপূর্ববাবু! সেদিন সব্যসাচীর ঋণ—

কথার শেষটা আর শুনা গেল না, অস্ফুটধ্বনি বায়ুবেগে শূন্যে ভাসিয়া গেল। তাহার পরে ক্ষণকালের জন্য যেন কাহারও সংজ্ঞা রহিল না! অচেতন জড়মূর্তির ন্যায় কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল থাকিয়া ভারতী অকস্মাৎ চকিত হইয়া উঠিল, এবং দ্রুতবেগে উপরে উঠিয়া আসিতেই সবাই তাহার পিছনে পিছনে ছুটিয়া আসিল। সে ক্ষিপ্রহস্তে জানালা উন্মুক্ত করিয়া দিয়া যতদূর দৃষ্টি যায় নিষ্পলক

চক্ষু-দুটি অন্ধকারে একাগ্র করিয়া পাথরের মত দাঁড়াইয়া রহিল। এমন কতক্ষণ কাটিল। সহসা ভীষণ শব্দে হয়ত কাছে কোথাও বাজ পড়িল এবং তাহারই সুতীব্র বিদ্যুৎ-শিখা শুধু পলকের জন্যই আকাশ ও ধরাতল উদ্ভাসিত করিয়া একবার শেষ দেখা দেখাইয়া দিল।

এই ভয়ানক দুর্যোগে বাটীর বাহিরে আসিয়া ইঁহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার মত উন্মাদ বোধ হয় পুলিশের মধ্যে কেহ ছিল না, তথাপি রাজপথ এড়াইয়া উভয়ে মাঠের দক্ষিণ-প্রান্ত ঘুরিয়া ধীরে ধীরে চলিয়াছে। মাঝে মাঝে ঝোপ-ঝাড় ও কাঁটাগাছের বেড়া; এই সূচীভেদ্য আঁধারে পিচ্ছিল পথহীন পথে বিপুল বোঝার ভারে একজন আনতদেহে সাবধানে অগ্রসর হইয়াছে, এবং অপরে বিরাট পাগড়ির নীচে প্রচণ্ড বারিপাত হইতে যথাসম্ভব নিজের মাথাটা বাঁচাইয়া তাঁহার অনুসরণ করিয়াছে।

নিমিষ মাত্র। নিমিষমাত্র পরেই সমস্ত বিলুপ্ত করিয়া দিয়া রহিল শুধু নিবিড় অন্ধকার।

হঠাৎ গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া শশী বলিয়া উঠিল, দুর্দিনের বন্ধু! নমস্কার সরদারজী।

সঙ্গে সঙ্গে অপূর্বও তাহার দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া তাঁহারই উদ্দেশে নিঃশব্দে নমস্কার করিল। তাহার মনের মধ্যে হইতে যেন একটা ভার নামিয়া গেল।

ভারতী তেমনি পাষাণমূর্তির মতই অন্ধকারে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। শশীর কথাও যেমন তাহার কানে গেল না, তেমনি জানিতেও পারিল না ঠিক তাহারই মত আর একজন নারীর দুই চক্ষু প্লাবিয়া তখন এমনি অশ্রুপ্রবাহই বহিয়া যাইতেছিল।